কলিকাল

সমরেশ মজুমদার

Bir Chandra State Central Library
Agartala, West Tripura

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ★ কলিকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৩৩৯

প্রচ্ছদপট
অংকন—সুধীর মৈত্র
মুদ্রণ—রাজা প্রিন্টার্স

KOLIKAL
by
Samaresh Mazumder
A novel Published by Mitra & Ghosh Publishers Pvt. Ltd.
10 Shyama Charan Dey Street, Calcutta-700 073.

I S B N 81-7293 083 6

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩
হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও বাণী মুদ্রণ, ১২ নরেন সেন
স্কোয়ার, কলিকাতা-৯ হইতে বংশীধর সিংহ কর্তৃক মুদ্রিত

কলিকাল কলিকাল

শুরুর আগে

্পিয়ে বরফ পড়ছে। কাচের জানালার ওপাশে পৃথিবীটা নীলচে ু নেমেছে মাইনাস তিরিশে। উননব্বই সালের ডিসেম্বরের শেষে এই সময় থাকতে হয়েছিল কিছুদিন আমেরিকায় ওয়াহিও শহরে। অভিভাবকরা গা ওই ঠাণ্ডাতেও যে যার অফিসে। সারাদিন আমি একা, একদম একা। দেব সাধ্য কি! কোল্ড স্ট্রোক শব্দটার মাহাত্ম্য জানার শখ নেই। লেখার টেবিলে। কাগজ কলম নিয়ে জানালার বাইরের বরফ দেখতে কেন জানি না বাংলাদেশের গ্রামের কথা মনে পড়ল। কাদা প্যাচপ্যাচে শীতের নিটোল ফসল তোলা গ্রাম। যে গ্রাম আমি চোখে দেখিনি, বই-এ বরফ দেখতে দেখতে সেই গ্রামকে নিয়ে গল্প লেখার শখ হল। শখই। যেনি তা নিয়ে লেখার বাসনা আমার কখনও হয়নি, স্পর্ধাও। এতদিন সেটাকে চালাকি বলে ভাবতাম। কিন্তু ওই বরফ, সাদা প্রাণহীন জমাট স্তব্ধতা আমাকে কেন জানি না শ্যামল সবুজ বাংলাদেশের দিকে টেনে দিচ্ছিল। বিকেলে যখন অভিভাবকরা ফিরে এলেন তখন পাতা দশেক হয়ে গেছে। আমেরিকায় বসে বরফ দেখতে দেখতে গ্রামের গল্প লিখছি শুনে তাঁরা আগ্রহে শুনতে বসলেন। এবং শোনার পর তাঁরা জানতে চাইলেন, 'আপনার বাল্যকাল গ্রামে কেটেছে, না?'

না। কবির মনভূমি এবং রামের জন্মভূমির দোহাই আমি দেব না। এই উপন্যাসের গ্রাম যদি বাস্তব না হয় তা আমারই অক্ষমতায়। এই গ্রাম বিশেষ কোন জেলার নয়, অথচ উত্তরবঙ্গ উল্লেখের কারণে সেখানেই চিহ্নিত করলে ভুল হবে। এই গ্রাম আমার কল্পনার। ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খাওয়ার আনন্দে যে মৌমাছিটি সে যেমন আমার বন্ধু।

লিখতে লিখতে সেই গ্রামকে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যেতে দেখছি! রক্তাক্ত প্রকৃতি আর হরিহর যেন পরস্পরকে জড়িয়ে ধ'রে যন্ত্রণায় অস্থির। মনে যাদের দেখেছি চোখে দেখার অভাব তাকে কতটা রক্তশূন্য করেছে সে-বিচারের ভার পাঠকের উপর।

এই উপন্যাসের শেষ অনেক রকমের হতে পারত। হরিহর মারাও যেতে পারতেন। তাঁকে নিঃস্ব করে গেল ধর্মের নামে কিছু প্রতারক, তাঁকে নিঃস্ব করতে গিয়েও মুখ লুকোল রাজনীতির অন্ধকার। কিন্তু হরিহর নন, নারায়ণপুর গ্রামের মানুষ চিরকালের জন্যে বিক্রি হয়ে গেল শহুরে জটিলতার কাছে। হরিহরকে যদি শেষ আরাম দিয়ে থাকে সে সবিতারাণী, সবিতারাণীর আঙুলের স্পর্শ-দের বেঁচে থাকার শক্তি যুগিয়ে যাচ্ছে, এই রকমই হয়ে থাকে।

কথাসাহিত্যে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের সময় প্রথমে উপন্যাসের কোন নাম-করণ না করে পাঠকদের ওপর নির্ভর করেছিলাম। প্রচুর সাড়া পেয়েছি। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের এক পাঠিকার মত অনুসারে পত্রিকায় নাম দেওয়া হয়েছিল, 'মুশকিল আসান।' তখন লেখার সময় মনে হয়েছিল জীবনের যাবতীয় জটিলতার হয়তো একটা সমাধান খুঁজে পাওয়া যায়।

পরে দেখা গেল এই নামে আর একটি উপন্যাস বিদ্যমান। দ্বিতীয়ত, রচনা তার পথ নিজেই তৈরি করে নিচ্ছিল অন্যদিকে। এই সমস্ত এবং তার নিষ্ঠুর দগদগে মুখের ঘা গুলোর দিকে তাকালে পুরাণবর্ণিত কলিকাল শব্দটিকে সবচেয়ে যথার্থ বলে মনে হয়। তাই পত্রিকাতেই নাম-পরিবর্তিত হয়েছিল।

এই যে নিজেই নিজেকে ভাঙ্গা, ভেঙ্গে পাল্টানো, এও বোধহয় কলিকালের দান।

॥ ১ ॥

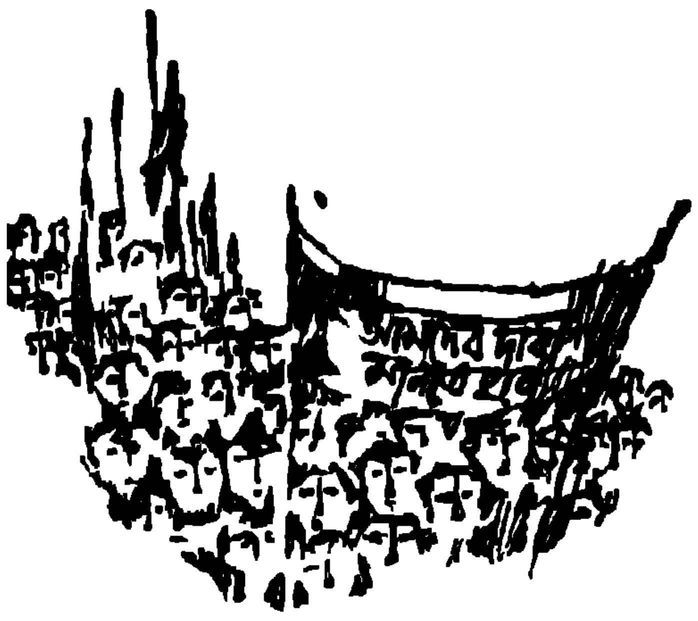

হরিপুরের মাড়োয়ারির দোকানে কুড়ি টাকায় ফুলশার্ট পাওয়া যায়। সঙ্গে তিরিশ টাকা যোগ করলে একটা প্যাণ্ট। দোকানটা হয়েছে বছর দুয়েক। তার আগে হরিপুরে কেউ প্যাণ্টশার্ট বিক্রি করত না। ছিটের ফুলহাতা ধুতিশার্ট অবশ্য বিকোয় দেদার। চড়কের মেলা থেকে সবাই কেনে, বছরভর চলে যায় বেশ। তার দামও সস্তা। অন্তত ফসল-বেচা টাকা হাতে থাকলে কিনতে গায়ে লাগে না। এ গ্রামের সবাই তাই পরত এতকাল। এখন ছেলেছোকরা পয়সা জমিযে প্যাণ্ট কিনতে যায় হরিপুরের মাড়োয়ারির দোকানে। মাত্র তিন ক্রোশ পথ।

কাকভোরে দাঁতন কণতে করতে শ্রীনিবাস এইসব ভাবছিল। গতকালই তার বন্ধু নগেন নীল প্যাণ্ট আর সাদা শার্ট কিনে এনেছে সত্তর টাকায়। ঘরের আলু পাইকারের হাতে তুলে দিয়ে ওই টাকাটা ট্যাঁকে গুঁজে ছুটেছিল হরিপুরে।' বারংবার নিষেধ করেছিল শ্রীনিবাস। কথা কানে নেয়নি। ব্যাটা বুঝবে ঠেলা। কিন্তু কিনে যখন নিয়ে এল তখন শ্রীনিবাসের বুকের ভেতরটা টনটনিয়ে উঠেছিল। এবং সাধটা পাকাপাকি জেঁকে বসেছিল।

কাকভোরে দাঁতন করতে করতে শ্রীনিবাস আকাশের দিকে তাকাল। ইদানীং মাঝেমধ্যে বৃষ্টি পড়ছে। বর্ষা এল বলে। মাঠে লাঙ্গল দেওয়া হয়ে গেছে এক খেপ। এরপর ঢল নামলে প্যাণ্ট পরা বেরিয়ে যাবে। হরিপুরে যাওয়ার মেঠো পথটায় হাঁটুভর কাদা থকথক করবে। গাঁয়ের পথে পা টিপে না হাঁটলে আছাড় খেতে দেরি হবে না। তখন প্যাণ্টশার্ট পরার কথা ভাববে না কেউ। এই মালকোঁচা গুটিয়ে তবে পথ চলা। প্যাণ্ট পরার সুখ সেই অঘ্রাণ এলে। শীতের মাস কয়েকটা তো ফুড়ুৎ করে কেটে যায়। তদ্দিন পর্যন্ত না হয় টাকাটা জমিয়ে রেখে দেবে সে। সাকুল্যে তো একশ সত্তর টাকা তোরঙ্গে তোলা আছে। অবশ্য এই খবরটা তিনভুবনের কেউ জানে না।

একসময় মুখের ভেতরটা কষাটে হয়ে আসতে শ্রীনিবাস রাস্তা ছেড়ে পুকুরের ঢালে নামল। এখনও সূর্যদেব ওঠেননি। মাথার ওপরে আকাশটায় সবে ছোপ লাগছে। গাছগাছালির পাতলা আঁধারমাখা ডালে পাখিরা ক্রমাগত চিৎকার করে চলেছে। এই সময়টা বড় ভাল লাগে শ্রীনিবাসের। এমন জায়গা ছেড়ে কেউ কখনও কোথাও যায়? অথচ নগেন প্রায়ই বলে, 'এ শালা ধ্যাড়ধেড়ে গোবিন্দপুরে পচে মরার কোন মানে হয় না। থাকতে হলে আলিপুরদুয়ারে গিয়ে থাকতে হয়। ফিবছর সার্কাস আসে, যেমন জন্তুজানোয়ার তেমনি মেয়েমানুষ। বায়োস্কোপ দেখার হল আছে, রিক্সা, মিষ্টির দোকান, কাঁচা পয়সা। পায়ের ওপর পা তুলে থাকো।'

'থাকবি কোথায় ? ঘরভাড়া করতে কত টাকা লাগবে জানিস ?'

'রোজগার করব। একটা রিক্সাওয়ালা কত রোজগার করে বল তো প্রতিদিন ? দিয়েথুয়ে অন্তত চার টাকা। ভাবতে পারিস ?' চোখ বড় করেছিল নগেন।

'তাই বলে তুই এই গ্রাম ছেড়ে আলিপুরদুয়ারে গিয়ে রিক্সা চালাবি নগেন ?'

নগেন একটু ইতস্তত করল, 'না। রিক্সা কেন, কত কাজ আছে সেখানে—তার একটা করব। ওখানে গিয়ে খাটো ধুতি আর ছিটের শার্ট পরলে কেউ পাত্তা দেবে না। তাই একটা প্যান্টশার্ট কিনতেই হবে আমাকে। কাঁচা পয়সা রোজগার করব আর সেই সঙ্গে ফুর্তি। এ গ্রামের লোকের চোখ টেরা হয়ে যাবে দেখিস।'

কথা রেখেছে নগেন। আলু বেচে শার্ট প্যান্ট কেনা হয়ে গিয়েছে। এখন শহরে চলে গেলেই হয়। হরিপুরের গঞ্জ নয়, একেবারে শহর। এ জেলার দ্বিতীয় শহর। সঙ্গে সঙ্গে নগেনের বউটার কথা মনে পড়ল। সতের বছর বয়স। দু বছর আগে পনের বছরের বউ এনেছিল ঘরে নগেনের বাবা। বাচ্চাকাচ্চা হয়নি। অষ্টমঙ্গলার পর সেই যে বাড়ির ভেতরে ঢুকেছে, আজ পর্যন্ত তার মুখ দ্যাখেনি শ্রীনিবাস। অষ্টমীর দিন হরিহরকাকার বাড়িতে যখন ঠাকুর দেখতে গিয়েছে তখন গলা পর্যন্ত ঘোমটা। ধীরেন বলেছিল, 'কলাবউ-এর দরকার কি, নগেনের বউটাকে দাঁড় করিয়ে দিলেই হয়!' নগেন শুনে চুপ করে ছিল। তা এমন ঠান্ডা বউকে ফেলে নগেন আলিপুরদুয়ারে গিয়ে কি করে থাকবে তা জানার আগ্রহ হয়েছিল শ্রীনিবাসের।

প্রশ্ন শুনে নগেন থমকে গিয়েছিল, তারপর বলেছিল, 'প্রথম প্রথম এট্টুক মনখারাপ করবে। খুব ভাল পা টিপে দেয় বউটা। কিন্তু তারপর সব সয়ে যাবে। এই যেমন তোর বাপ যখন মারা গেল কত কান্নাকাটি করলি। এখন করিস ? করিস না। একসময় সব সয়ে যায়। তবে যাচ্ছি বলে কি একবারে যাচ্ছি! মাঝেমধ্যে আসব ঠিক।'

'বউ ছেড়ে থাকার কষ্ট সহ্য হয়ে যাবে তোর ?' বিশ্বাস করতে পারছিল না শ্রীনিবাস। তার নিজের বিয়ে হয়নি। কিন্তু যাদের হয়েছে তাদের তো সে দেখেছে। দিনভর যতই ঝগড়া করুক তারা, মাঝরাত্রে কেউ গলা খোলে না। কাদুবুড়ি বলে, 'সারাদিন গালমন্দ, রাত্তিরেতে লাগে ধন্দ, নিদ নেই সুপুত্তুরের যদি না পায় বউ-এর গন্ধ।' তা এমন যখন অবস্থা তখন নগেন শহরে গিয়ে থাকবে কি করে ? শুনে নগেন হা-হা করে হেসেছিল। বলেছিল, 'বুড়ি চোখে দ্যাখে না, কানে শোনে না যেমন তেমনি নাকেও বাস পায় না। বউ-এর গায়ে শালা দিনভরের ঘামের গন্ধ। মাল না খেলে বমি আসে। আর শহরে ? ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় নাকি ? তারা পাউডার মাখে। ভুরভুর করে মিষ্টি বাস।'

'তুই এত জানলি কি করে শ্রীনিবাস ?'

'জানি, জানতে হয়। হরিপুরের সনাতনদা বলেছে।'

লোকটার চেহারা মনে পড়ল। রোগা পাকানো চেহারা। সারা পৃথিবী ঘুরেছে, কথাবার্তা শুনলে মনে হয়। অনেক ঘাট ঘুরে এখন এ-হাটে ও-হাটে

মনিহারি জিনিস বিক্রি করে। একদম নেশা করা চেহারা। উঠতি বয়সের ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গে খুব ভাব তার। নগেন যখনই হরিপুরে যায় তখনই গিয়ে জোটে তার আখড়ায়।

পুকুরের জলে হাত রাখতেই মন ভরে গেল শ্রীনিবাসের। আহা, কি শীতল! আঁজলা করে খানিক নিয়ে মুখে দিতেই হাসির আওয়াজ বাজল। মেয়েমানুষের হাসি। ঘাড় ঘুরিয়ে পেছন ফিরতেই ছবিবউদি এগিয়ে এল কলসী কাঁখে। ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, 'দিলে তো জল এঁটো করে! এখন আমি কি করি? কোন্ পুকুরে যাই?'

তোতলা হয়ে যায় শ্রীনিবাস নিজের অজান্তে, 'আমি কি—কি—কি করলাম?'

এক হাত কোমরের কলসীতে পেঁচানো, অন্য হাতের আঙুলে চিবুক ছুঁয়ে আড়চোখে তাকাল ছবিবউদি শরীর বেঁকিয়ে, 'ওমা! কি কথা! নেকু! কি করলে জানো না?'

'সত্যি বলছি, আমি জানি না।'

'আমাকে আসতে দেখে তুমি এঁটো হাত জলে দাওনি?'

'তোমাকে আসতে আমি দেখিইনি। তাছাড়া পুকুরে তো সবাই এমনিই করে হাতমুখ ধোয়।'

'তা ধোয়। কিন্তু ভোর হবার আগে তো নয়। এই সময় সারারাতের শিশির মেখে জল পবিত্র থাকে। সেই জল নিয়ে গেলে তবে আমার শাশুড়ী ঠাকুরপুজো রান্না করবেন। কেউ আগেভাগে হাত দিলে জল এঁটো হয়ে গেল, বুঝলে হাঁদা গঙ্গারাম?'

'সত্যি অন্যায় হয়ে গিয়েছে।' উঠে দাঁড়াল শ্রীনিবাস, 'বিশ্বাস কর আমি জেনেশুনে এমন করিনি। তুমি একটু কষ্ট করে হরিহরকাকার পুকুর থেকে জল তুলে নাও।'

'আহা, গরম কড়াই থেকে একেবারে জ্বলন্ত উনুনে পড়ি আর কি! শকুনচোখে বুড়ো বসে আছে এখন আমগাছের গোড়ায়। জল তুলতে গেলে শাড়ি ভেদ করে শরীর দেখবে। মরণ! আমার বুঝি মতিভ্রম হয়েছে? যাও ঘুরে এসো, আমি জল নিয়ে স্নান করে যাই—তারপর বাকি মুখ ধুয়ে নিও।' জলের দিকে এগিয়ে গেল ছবিবউদি।

'কিন্তু এ পুকুরের জল আমি—।'

'চুপ। না দেখলে সাতখুন মাপ। আমি দেখিনি। বেশী দূরে নয়, ওই গাছটার গোড়ায় গিয়ে দাঁড়াও। কাউকে আসতে দেখলে আমাকে সাবধান করে দেবে। এই তোমার শাস্তি।' বলে ঠোঁট ঘুরিয়ে হাসল ছবিবউদি। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল শ্রীনিবাস। মাথা নেড়ে দ্রুত চলে এল সে কাঁঠাল গাছের নিচে। এ গ্রামের সবাই দুগ্‌গামাসীকে জানে। যা মুখ, কাকগুলো পর্যন্তও বাড়ির আকাশ মাড়ায় না। ছবিবউদি যদি গিয়ে বলে দিত তাহলে আজ আর গ্রামে থাকা যেত না।

মুখের ভেতরটায় এখনও অস্বস্তি। শ্রীনিবাস মুখ তুলে দেখল এঁচোড়গুলো বেশ পুরুষ্টু হয়েছে। এই গ্রামে কাঁঠাল আর আম গাছের ছড়াছড়ি। একমাত্র

হরিহরকাকার বাগানের গাছেই অবশ্য মিষ্টি রসাল আম পাওয়া যায়। বাকি সবগুলোতে পাকবার সঙ্গে সঙ্গেই পোকা বাসা করে ফেলে। কেটেকুটে বাদ দিয়ে দু-তিন কুচি মুখে পুরতে পারলে ভাগ্য। কিন্তু কাঁঠালে পোকা নেই। নিজেরা খাও গরুকে খাওয়াও। সমস্ত গ্রাম ম-ম করতে থাকে কাঁঠাল পাকলে। এখন অবশ্য রোজই এঁচোড়ের ঝোল আর ভাত হচ্ছে। মন্দ না। হঠাৎ শ্রীনিবাসের মনে হল কেউ একজন আসছে। মেয়েছেলে। মেয়েছেলে পুকুরে নামলে ছবি-বউদিকে সাবধান করে দিতে হবে নাকি? হনহনিয়ে যে আসছে তাকে দেখতে পেয়েই কাঁঠালগাছের আড়ালে চলে গেল সে। সর্বনাশ! দুগ্‌গামাসী! ছেলের বউকে পুকুরে পাঠিয়ে দেখতে আসছে কেন? বুড়ির মাথা কদমফুলের মত ছাঁটা। গতর প্রস্থে অংেকখানি। গায়ের থানটার অবস্থা ভাল নয়। পুকুরের কাছাকাছি এসেই বুড়ির চলন থেমে গেল। তারপর পা টিপে টিপে আকন্দফুলের গাছগুলোর মধ্যে গিয়ে দাঁড়িয়ে উঁকি মারল।

বুড়িকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে শ্রীনিবাস। ভয়ে বুক ঢিপ ঢিপ করছে। বুড়ি তার বউকে সন্দেহ করে একথা সবাই জানে। তাই বলে লুকিয়েচুরিয়ে দেখতে আসবে তা সে জানত না। মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পুকুরটাকে ভাল করে দেখে বুড়ি যেন হতাশ হল। তারপর কপালে দুটো হাত জোড করে ঠেকিয়ে কি সব বিড়বিড় করে বলে বেরিয়ে এল আকন্দের জঙ্গল থেকে। যেমন এসেছিল তেমন চলে গেল হনহনিয়ে।

পাথরের মত দাঁড়িয়ে ছিল শ্রীনিবাস। এখনও গ্রামের লোক বিছানা ছাড়েনি। কেউ জানতে পারল না ঘটনাটা। হঠাৎ সে ডাক শুনল, 'ও বড়ঠাকুরের পো! আর পাহারা দিতে হবে না, আমার হয়ে গিয়েছে। এসে মুখ ধুয়ে নাও।'

শ্রীনিবাস মুখ নিচু করে আড়াল ছাড়ল। শব্দ হচ্ছে। চুল ঝাড়ছে ছবিবউদি। গামছা দু হাতে নিয়ে বাড়ি মারছে চুলে। শেষ জলটুকুও ঝেড়ে ফেলতে চায়। চটপট চোখ সরিয়ে নিল সে। দু হাত ওপরে তোলায় ছবিবউদির জলে ভেজা একপরতা কাপড়ের তলায় যেন ভূমিকম্প হচ্ছে। কাপড় ভেদ করে কমলারঙের আভা ছিটকে উঠছে।

'আড়াল থেকে এর বেশী কিছু দ্যাখোনি তো ঠাকুরপো?'

'তোমার শাশুড়ী এসেছিল।'

'জানি।' হাসি ছিটকে উঠল।

'জানো মানে? তোমাকে দেখবে বলে ওই গাছগুলোর আড়ালে লুকিয়েছিল!'

'তাও জানি। এতদিন ঘর করছি আর কার কিরকম চরিত্র জানব না? আমি কি ছেলেমানুষ? সব জানি। বুড়ি সবসময় তক্কে থাকে, আমায় বেকায়দায় ধরতে না পারা পর্যন্ত ওর সুখ নেই। তাই তো এসেই তোমাকে সরিয়ে দিলাম।'

'মানে?'

'আহা ন্যাকা! তুমি এখানে বসে থাকলে আমি স্নান করতে পারতাম না নাকি? তোমার চোখে তো এখনও বিষ নামেনি। যা দেখবে তা মা কালীর বুক দেখার মত দেখবে। মেয়েমানুষের শরীরে যতক্ষণ হাত না দিচ্ছে ততক্ষণ

ব্যাটাছেলেরা এমনই পবিত্র থাকে, বুঝলে হাঁদারাম ?' কলসী তুলে নিয়ে ছবিবউদি হাসল, 'বিয়ে করা মিনসেগুলো তাই হাড়বজ্জাত হয়। তুমি কবে বিয়ে করবে গো ?'

'ধ্যাৎ! কি যা-তা বলছ ?' লজ্জা পেল শ্রীনিবাস।

'আমার এক মাসতুতো বোন আসছে এখানে। তাকে দেখে পছন্দ হলে বলো, এই আষাঢ়েই লাগিয়ে দেব। তারপর কিন্তু আর পাহারা দিতে ডাকব না।' হাসতে হাসতে চলে গেল ছবিবউদি।

বাংলাদেশের কয়েকটি গ্রামের মত নারায়ণপুরের জমি একটু বেশীমাত্রায় উর্বরা। ফসল ফলে আর পাঁচটা গ্রামের মনে ঈর্ষা জাগিয়ে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে কিন্তু এখনও নতুন চাষব্যবস্থার ঢেউ এসে লাগেনি এখানে। মহকুমা শহর আলিপুরদুয়ারে বাস যায় হরিপুর গঞ্জ থেকে। তাও দিনে একটা। যেতে আসতেই সন্ধ্যে। গঞ্জ বলতে যে রকম বাড়বাড়ন্ত চেহারা মনে আসে হরিপুর তার কাছাকাছি পেঁছায় না। তবে স্বাধীনতার পরে সেখানে একটা থানা হয়েছে। একজন অফিসার আর তার তিনজন কনেস্টবল নিয়ে সেই থানা টিমটিমিয়ে চলে। বড়বাবুর মনে বড় দুঃখ। পানিশমেণ্ট পোস্টিং ছাড়া কেউ এমন থানায় আসে না। গত তিন বছরে একটিও খুন হয়নি। চুরিচামারি মাঝেমধ্যে হয়, তবে তা গরুবাছুরের মধ্যে সীমাবদ্ধ। চারটে মানুষের তাই সময় কাটতেই চায় না।

নারায়ণপুর থেকে হরিপুর পেঁছাতে যে তিন ক্রোশ পথ তা শীতকালে থাকে খটখটে। তখন ইচ্ছে হলেই দিনে যত খুশি যাওয়া আসা যায়। হরিপুরে মেলা বসে। বছরের ওই সময় একবারই নারায়ণপুরের মেয়েরা যায় হরিপুরে মেলা দেখতে। সূর্য ডোবার আগেই ফিরে আসে সবাই। যাত্রা ম্যাজিক দেখার জন্যে ছেলেছোকরা অবশ্য রাতটা থেকে যায় সেখানেই। আনন্দ-টানন্দ বলতে এটুকুই। গত বছর নগেন সবাইকে জড় করে নাটক করার কথা বলেছিল। এ আসে তো ও আসে না। রিহার্সালই শেষ হয়নি। তবে নারায়ণপুরে পুজা হয়। একটাই পুজো এবং তা হরিহরকাকার বাড়িতে। সেই কদিন গ্রামের কোন মানুষ দুপুরে বাড়িতে খায় না। খিচুড়িভোগ পেট ভরিয়ে দেয়।

নারায়ণপুরের মানুষেরা যে সবাই নিজের নিজের জমির মালিক তা নয়। অর্ধেকের বেশী কাগজেকলমে লেখা আছে হরিহরকাকার অধিকারে। তিনিই বীজধান দেন, শোকে আনন্দে পাশে এসে দাঁড়ান। ফসল যা হয় তার তিনভাগের একভাগ দিয়ে দিতে হয় হরিহরকাকাকে। কিন্তু যে জমিতে চাষ করছে তা নিজের নয় এই ভাবনা মাথাতেই আসে না মানুষগুলোর। যখন তোলা ফসলে টান পড়ে তখন তারা হাত পাতে হরিহরকাকার কাছে। তিনি যেমন পারেন দেন আবার ফসল তুললে নিয়েও নেন। এ নিয়ম চলছে চক্রবৎ' কিন্তু কখনও এই দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপার নিয়ে অশান্তি হয়নি। আর যাদের নিজের জমি তারা আছে বহাল তবিয়তে। পেটের ভাত আর পরনের কাপড় জুটে গেলেই তাদের জীবন শান্তিতে ভরে যায়। গ্রামটির বয়স কত তা কারো জানা নেই কিন্তু এই নিয়ম চলে আসছে

কয়েক প্রজন্ম ধরে। আর এতেই তারা অভ্যস্ত হয়ে আছে।

ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। নগেন তো সেদিনের ছেলে, শহরে পা বাড়াবার কথা ভাবছে। তার অনেক আগেই একজন গিয়েছে মিলিটারিতে। তা অন্তত বছর দশেক তো হল। একটু কাঠখোট্টা একরোখা লোক ছিল শিবরাম। দুগ্গামাসীর ছেলে। আজ এর সঙ্গে ঝগড়া কাল ওর সঙ্গে হাতাহাতি। পেটে ভাত জুটতো না বছরভর কিন্তু মেজাজ ছিল মিলিটারির। সে কথাটাই সবাই বলত তাকে। বছর কুড়ি বয়স হতেই হরিপুরে গিয়ে পড়ে থাকত মাঝে মাঝে। হঠাৎ একদিন ঘরে ফিরে এসে চীৎকার করে বলল, 'শালা, আমার সঙ্গে পারবি তোরা? এবার পকেটভর্তি টাকা আনব। আমাকে অকালকুষ্মাণ্ড বলা? আমি মিলিটারিতে কাজ নিচ্ছি। উল্টোপাল্টা বললে সব শালাকে গুলি করব।'

দুগ্গামাসীর গলা যতই ধারালো হোক, ছেলেকে দেখলে মধু ঝরত। তিনি ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'ও শিবু, এ কি বলছিস তুই? কোথায় যাবি?'

'মিলিটারি। একেবারে গবমেণ্টের খাস লোক। কাল নাম লিখিয়ে এসেছি।'

'অ্যাঁ! সে কি রে? কোথায় যেতে হবে তোকে?' বুড়ি ককিয়ে ওঠে।

'তা আমি জানি নাকি? ইঁহা সে উঁহা—মিলিটারি বলে কথা!' বুক ফুলিয়ে বলেছিল শিবরাম। আর তার কণ্ঠস্বর এমন উঁচুতে ছিল যে উঁকিঝুঁকি আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। দুগ্গামাসী পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসেছিলেন। সাতজন্মে তাঁকে কেউ ওভাবে কাঁদতে দ্যাখেনি। কান্নার সঙ্গে তিনি বিলাপ করেছিলেন, ওরে আমার কি হবে গো! আমার শিবরাত্তিরের সলতের মাথাটা কোন শাকচুন্নী খেয়ে নিল গো! গবমেণ্টের মাথায় আমি ঝাড়ু মারব গো!'

সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড ধমকে উঠেছিল শিবরাম, 'অ্যাই! চোপ! খবরদার বলছি গবমেণ্টকে গালাগাল দেবে না। এখন থেকে আমি গবমেণ্টের চাকর। মনিবের নিন্দে সহ্য করতে পারব না।'

ঘাবড়ে গেলো দুগ্গামাসী। ততক্ষণে ভিড় হয়ে গিয়েছে বাড়ি ঘিরে। হরিহরকাকা চলে এসেছেন খবর পেয়ে। এসে হুড়মুড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'একি কথা শিবু, তুমি নাকি মিলিটারিতে নাম লিখিয়েছ?'

শিবরাম সদর্পে এগিয়ে এল সামনে, 'তাতে আপনার আনন্দ হচ্ছে না?'

'তা কি করে হবে! মিলিটারিতে গেলে শুনেছি চরিত্র খারাপ হয়ে যায়।' হরিহরকাকা বলেছিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ করে উঠেছিল দুগ্গামাসী, 'ওরে বাবারে! তোর বাপ-ঠাকুর্দার চরিত্র ছিল সোনার মত। তাদের বংশের ছেলে হয়ে তুই চরিত্র খোয়াতে যাচ্ছিস, এ আমি সইব কি করে…!'

শিবরাম ধমকে উঠেছিল, 'আঃ! ফ্যাচফ্যাচ করো না তো! আমি ঠিক থাকলে আমার চরিত্র নিয়ে যাওয়া কি এত সোজা? করকরে নগদ টাকায় মাইনে পাব। প্যাণ্ট শার্ট জুতো পরব। আর মাস মাস তোমার নামে টাকা পাঠাব। তখন দেমাকে তোমার পা মাটিতেই পড়বে না।'

হরিহরকাকা হাত তুললো, 'কিন্তু বাবা শিবু, সংসার বলতে তো তুমি আর তোমার মা। তা তুমি চলে গেলে মাঠে লাঙ্গল দেবে কে? চাষ না করলে ধান আসবে কি করে?'

'তার ব্যবস্থা করে যাব। তিন ভাগের এক ভাগ আপনার, এক ভাগ মায়ের আর বাকি এক ভাগ যে চাষ করবে তার। এমন সুযোগ পেলে কেউ হাতছাড়া করবে ভেবেছেন?' হাসল শিবরাম।

সঙ্গে সঙ্গে বুড়ি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন, 'ওরে মা রে, কি হল গো! ওরে মাগো মরে যাব!'

শিবরাম ধমকালো, 'আঃ! আবার ওরকম করছ? আমি ভাল বলে জানিয়ে যাচ্ছি, কত ছেলে না বলে চলে যাচ্ছে। আমারও তাই করা উচিত ছিল দেখতে পাচ্ছি।'

সঙ্গে সঙ্গে দুর্গামাসী উঠে বসলেন, 'তুই চলে গেলে আমি থাকব কি করে? একা একা আমি থাকব কি করে? সেই কথাটা একবারও ভাবলি না বাবা?'

শিবরাম থমকালো। এমন একটা যুক্তি উঠবে তা তার মাথায় আসেনি। সে কাঁধ নেড়ে বলল, 'এমনিতেও মাসের অর্ধেকদিন একা থাকো। থাকো না?'

'সে থাকা আর এ থাকা! আমি একা থাকতে পারব না।'

কেউ একজন বলল, 'তা ঠিক, একা কি থাকা যায়? ঘরে বউ এলে না হয় একটা কথা ছিল।'

কথাটা শোনামাত্র দুর্গামাসী চনচনিয়ে উঠলো, 'বেশ। যাবি বলছিস যখন তখন আমাকে একটা বউ এনে দিয়ে যা। তাকে নিয়ে থাকি আমি।'

'বউ?' ঘাবড়ে গেল শিবরাম।

'হ্যাঁ। বউ থাকলে পিছুটান থাকবে। ঘনঘন আসবি। ঘরে বউ থাকলে চরিত্র নষ্ট হবে না তোর। আমি নিশ্চিন্তিতে থাকব।'

'কিন্তু হুট বলতে বউ পাব কোথায়?'

'তুই একবার হ্যাঁ বল—তাতেই হবে।'

শিবরাম অসহায় গলায় বলল, 'বলছ যখন তখন ব্যবস্থা করো। তবে আমার হাতে মাত্র তিনদিন সময় আছে। তার মধ্যে বউ এলে আসবে নইলে নয়।'

যেন বেওয়ারিস জিনিস পড়ে আছে, যার যেমন ইচ্ছে তুলে নাও। দুর্গামাসীর তাড়নায় সন্ধ্যের অনেক আগেই খবর পাওয়া গেল তিনটে পাত্রীর। কাছাকাছি গাঁয়ের মেয়ে তারা। সবাই বিবাহযোগ্যা। মুশকিল হল দেনাপাওনা নিয়ে। হাতে সময় নেই। ইচ্ছেমত দর হেঁকে পাত্রের মা হিসেবে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকার উপায় নেই। আর মানুষজন এমন যে সুযোগ পেয়ে যার আছে সেও নেই বলছে। আর তাদের ছিরি যা চোখ বন্ধ না রাখলে ঘর করা যায় না। শেষ পর্যন্ত ধেউমানি থেকে লোক এল। পাত্রীর মামা। বাপ-মা-মরা মেয়ে মানুষ করেছেন। দিতেথুতে পারবেন না কিছু। তবে মেয়ের রূপ নাকি ডানাকাটা পরীর মত। যেমন নাকচোখ তেমনি শরীরের গড়ন। কাজকর্মে কেউ খুঁত ধরতে পারবে না।

ধেউমানি যেতে হবে হরিপুর হয়ে। বাস যায় গ্রামের পাশ দিয়ে। সকালবেলায় ভাবী মামাশ্বশুর এবং গ্রামের কয়েকজনকে নিয়ে শিবরাম যাত্রা করল। মেয়ে পছন্দ হলে সে একেবারে বিয়ে করে ফিরবে। না পছন্দ হলে দুপুরে পাশের গাঁয়ে যাবে। শেষবার দুগ্গামাসী চেষ্টা করেছিলেন কিছু আদায় করার। সব শুনে মেয়ের মামা জবাব দিয়েছিল, 'ভাগ্নীকে শুধু শাঁখা-সিঁদুর পরিয়ে পাঠাবো এমন ভাবছেন কেন? যা পারি তা দেব। তবে ব্যাপারটা কি জানেন, আপনার ছেলে মিলিটারিতে যাচ্ছে, ফট করে শত্রুর গুলি বুকে লেগে গেলেই আমার ভাগ্নী বিধবা হবে। ওর প্রাণ তো পদ্মপাতার জল। সেটাও ভাবতে হবে।'

ব্যাস! মুখে কুলুপ এঁটেছিলেন দুগ্গামাসী। যদিও তাঁর খুব কষ্ট হয়েছিল।

বিয়ে যে সেই ধেউমানিতে হচ্ছে এ খবর নিয়ে লোক ফিরে এল আগাম। তার মুখে জানা গেল মেয়ে নাকি যা বলা হয়েছে তার থেকে একচিলতে কম সুন্দরী নয়। তবে বয়স হয়েছে। দেনাপাওনার কারণেই এতকাল পাত্র জোটেনি। শিবরামের থেকে বছর দুয়েকের ছোট হবে। তাই শুনে দুগ্গামাসীর মাথায় হাত। ধেড়ে পাখি পোষ মানে না। ঈশ্বর এমনও কপালে লিখেছিলেন! চোদ্দ-পনের হলে স্বস্তি ছিল। একা-একাই চিৎকার করতে লাগলেন। তিনি। শেষ পর্যন্ত হরিহরকাকা আসায় একটু শান্তি এল। বিয়ে যখন হচ্ছেই এবং মেয়ে যখন আজই গ্রামে আসছে তখন আচার-অনুষ্ঠানের আয়োজন করা উচিত। লোক-খাওয়ানো নমো নমো করে হলেও করতে হবে। দুগ্গামাসী মুখের ওপর বলে দিলেন, 'একটা আধলা মুখপোড়ারা দিচ্ছে না, ঘরে কি আছে যে পিণ্ডি দেব! আমার দ্বারা ওসব হবে না।'

হরিহরকাকা বললেন, 'বিয়ে আপনিই চেয়েছিলেন বউঠান। তাই না বললে তো হবে না। ঠিক আছে, গ্রামের সম্মান নিয়ে কথা, আমি দিচ্ছি চাল ডাল আলু সবজি--ব্যবস্থা হোক।'

শিবরাম কনে নিয়ে ফিরল সন্ধ্যের পর। যেহেতু সময়টা শীতকাল তাই আসা গেল। কনের মুখ দেখে গ্রামের লোক খুব খুশী। ভাগ্যে থাকলে এমন বউ ঘরে আসে। আর নেই নেই করেও কনে কম আনেনি সঙ্গে। হেসে বলল, 'এসব আমার মায়ের রেখে যাওয়া জিনিস।'

তৎক্ষণাৎ তাকে সতর্ক করলেন দুগ্গামাসী, 'দ্যাখো বাপু, বিয়ের কনে হয়েও তুমি মুখ খুলেছ, পরে যে কি বাক্য বলবে তা বুঝতে পারছি। ওসব একদম বলবে না এখানে। সাত চড়েও যদি রা কাড়ো তাহলে ফেরত পাঠিয়ে দেব মামার বাড়ি।'

কনেবউ বলেছিল, 'সাত চড় খাওয়ার পর আমি বেঁচে থাকব তো?'

মেয়েরা হেসে উঠেছিল। বোঝা গেল এ বাড়িতে নিত্য নতুন নাটক হবে।

কালরাত্রি সেইদিনই। পরদিন ফুলশয্যা। ব্যস! শিবরাম চলে গেল মিলিটারির চাকরি নিয়ে। টাকা আসতে লাগল নিয়মিত। নারায়ণপুরের ইতিহাসে এই প্রথম হরিপুর থেকে পিয়ন আসছে মনিঅর্ডার নিয়ে। সেই টাকা

দুর্গামাসী আঁচলে বেঁধে ঘুমোন। ছেলে যদিও বউয়ের সঙ্গে ছিল একটা রাত, তা মেয়েছেলের জীবনে একটা রাতই যথেষ্ট। তাঁর পেটে শিবরাম এসেছিল প্রথম রাত্রেই। অনেক আশায় তিনি মাসগুলো গুনলেন। তা সত্ত্বেও যখন বউয়ের নিয়ম করে শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে প্রতিমাসে তখন আর না বলে পারলেন না, 'হ্যাঁগো পরের বাড়ির মেয়ে, আমার ছেলে তোমাকে ছুঁয়েছিল তো ?'

চোখ কপালে তুলেছিল নতুন বউ, 'আপনি মা, মা হয়ে জানতে চাইছেন ?'

'আহা, মায়ের কাছেই তো সব বলা যায়।'

'তা যদি জানতে চান তাহলে বলি ওঁর নিশ্চয়ই সিংহ রাশি রাক্ষসগণ !'

'কি ? এত বড় কথা ? আমার ছেলে সিংহ, রাক্ষস ? ওর দেবগণ মেষরাশি, তা জানো ? কি মেয়ে এল ঘরে ! আর রাক্ষসই যদি হবে তাহলে পাঁচ মাসেও তার লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না কেন ? কি জানি বাবা, তুমি বাঁজা নাকি ?'

নতুন বউয়ের নাম ছবি। সে হেসে গড়িয়ে পড়েছিল।

দেড় বছরের মাথায় ফিরেছিল শিবরাম দু মাসের ছুটি পেয়ে। তখন তাকে চেনাই যায় না। গোঁফ রেখেছে কায়দা করে, শার্ট প্যান্ট জুতো পরে হাঁটে। চোখে কালো চশমা। হাতে ঘড়ি। জিনিসপত্র এনেছে অনেক। মায়ের জন্যে থান সেমিজ আর বউয়ের জন্যে যাবতীয়। গ্রামের মেয়েরা গিয়ে দেখে এল কান্তা সেন্টের শিশি, হিমালয় বুকে পাউডার, সোনালী রং করা তামার চুড়ি।

কয়েকদিন শিবরামের বন্ধুরা বিলিতি সিগারেট খেল। শিবরাম এখন কথায় কথায় একটা-আধটা ইংরেজি শব্দ উচ্চারণ করে। সে নাকি সুয়েজ খাল পাহারা দিতে গিয়েছিল। সুয়েজ খালটা কোথায় তা এই গ্রামের অনেকেই জানে না। কিন্তু সেটা মুসলমানদের দেশে যদিও, সাহেবরা নাকি বিশেষ অনুরোধ করায় গবর্মেন্ট তাদের পাঠিয়েছিল। সেই গল্প নানান রকম করে শুনিয়ে গেল শিবরাম। সেখানকার মেয়েছেলেরা যেন আকাশের পরী। যেমন গায়ের রঙ আর তেমনি তাদের শরীর। শিবরামের সঙ্গে যারা গিয়েছিল তাদের অনেকেই নাকি রোজ সন্ধ্যাবেলায় সেই সব মেয়েদের কাছে পয়সা দিয়ে যেত। বন্ধুরা জানতে চেয়েছিল শিবরাম নিজে গিয়েছে কিনা, জবাবে সে শুধু হেসেছে। কিন্তু গ্রামে রটে গেল শিবরাম গরু শুয়োরের মাংস খেত সেখানে। তাই নিয়ে প্রচণ্ড হৈচৈ, যতক্ষণ না হরিহরকাকা বললেন, 'বিদেশে নিয়ম নাস্তি।'

সেবার শিবরামের হাতে কাঁচা টাকা ছিল, হাতে রঙিন ঘড়ি। দুর্গামাসী দিনরাত ছেলের কাছে বউয়ের নামে সাতকাহন গাইতেন কিন্তু শিবরাম নাকি সেসব কানে তোলেনি। যদ্দিন ছিল তদ্দিন ছবিবউদির গুমর দ্যাখে কে! বিকেলে যখন গাঁয়ের বউরা গল্প শুনতে আসত তখন আগের রাত্রের শোনা কাহিনী রসিয়ে রসিয়ে বলত ছবিবউদি। এই গাঁয়ে তখনও মেয়েরা বাইরে না গেলে বডিস পরত না। তা সেসব বডিস হাতে সেলাই করা। সেমিজের চল ছিল বেশী। ছবিবউদি অনেক লজ্জা নিয়ে কয়েকজনকে দেখিয়েছিল তার স্বামী সুয়েজ থেকে কালো রঙের বগলস দেওয়া বডিস এনেছে। তাই দেখে সবার চক্ষু চড়কগাছ! পারলে সবাই একবার পরে দ্যাখে! কিন্তু দেখিয়েই তোরঙ্গে তুলে রেখেছিল ছবিবউদি। গল্পটা

চাউর হতে বেশী সময় লাগেনি। অতএব শিবরামের কানে গিয়েছিল একসময়। শিবরাম এদের অজ্ঞতায় ঠোঁট বেঁকিয়েছিল, 'তোরা মাইরি সত্যি গেঁয়ো! আরে সমুদ্রের ধারে শুধু ওই ওপরে পরে মেয়েরা শুয়ে শুয়ে রোদ পোহায়, কেউ চেয়েও দ্যাখে না, বুঝলি! কি লাইফ!'

ছুটি ফুরোলে ফিরে গিয়েছিল শিবরাম। তখন কি কান্নাকাটি। ছবিবউদির কান্না শুনে কেউ কেউ বলেছিল, ভাতার মরলেও এ গাঁয়ের বউ অমন কাঁদে না। এবং তার সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে দুর্গামাসী বলেছিলেন, 'ঢঙ! ছেলের বাপ মরলেও তো আমি অমন বেশরম হইনি!'

তারপর আবার বছর ঘুরল। এর মধ্যে গাঁয়ের হাওয়া বদলে গিয়েছে কিছুটা। একা শিবরামই সবার চোখে হিরো হয়ে গেছে। যুবকরা কেউ কেউ মিলিটারিতে যাওয়ার কথা ভাবল। একই সঙ্গে টাকা আর মেমসাহেবের শরীর দেখার লোভ পেয়ে বসল অনেককেই। হরিপুরে গিয়ে খোঁজখবর রাখতে লাগল অনেকে। কিন্তু মিলিটারিতে নাম লেখাতে হলে যেতে হবে এখন জলপাইগুড়ি। গাঁয়েগঞ্জে ঘুরে ঘুরে লোক সংগ্রহ করা আর হচ্ছে না। অতদূরে যেতে ঠিক সাহস পাচ্ছিল না তারা। কিন্তু শার্ট-প্যান্ট কেনার ধুম পড়ল। সেই সঙ্গে সস্তার সিগারেট। এখন গ্রামের একমাত্র মুদির দোকানেও সেই সিগারেট থাকে। আড়ালে-আবডালে এসে ছেলেছোকরারা কিনে নিয়ে খায়।

বছর ঘুরতে লাগল। পরিবর্তন হয়েছে কিছুটা পটভূমির। পরপর চার মাস ঠিক সময়ে টাকা পাঠিয়েছিল শিবরাম। তারপর হঠাৎ যে বন্ধ হল আর আসে না। দুর্গামাসী একে ওকে দিয়ে রোজ খবর নিতে পাঠায় হরিপুরের পোস্ট অফিসে। না, কোন মনিঅর্ডার আসেনি। একটু একটু করে অভাবের কালো ছায়া নামছে সংসারে। তার ওপর এবারও মাস গুনে দিশেহারা দুর্গামাসী। এবার এক রাত নয়, ছুটির অতগুলো রাত ছেলে কাটিয়ে গেছে বউয়ের সঙ্গে। কিন্তু বাচ্চা পেটে এলে যেসব লক্ষণ চোখ বুঁজেও দেখা যায় তার কোন হদিস পাচ্ছিলেন না তিনি। মেয়েছেলের পেট খালি রাখতে নেই, এটাই তাঁর বিশ্বাস। হয় পেটে রাখো, নয় পেটের বাইরে কোলে। বিশেষ করে অমন টগবগে মেয়েছেলের তো গতিক সুবিধে হবার কথা নয় পেটে কিছু না এলে! পাঁচ মাসের মাথায় রেগেমেগে কারণ জানতে চাইলেন তিনি। ছবিবউদি মুখ ঘুরিয়ে বলেছিল, 'আপনার ছেলে এখনই বাচ্চা চায় না।'

'ওমা, এ কি কথা গো! বাচ্চা চায় না আবার কি! চাওয়াচায়ি কে শুনছে! সবই তো ভগবানের হাত। তা ও বউমা, সে তোমার সঙ্গে শুয়েছিল তো?'

'নিজের ছেলেকে জানেন না? একটা রাত আমাকে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে দিয়েছে?'

'তবে? না চাওয়ার কি কথা বলছ?'

'সে শিখে এসেছে কি করলে বাচ্চা না হয়। আমি চেয়েছিলাম কিন্তু সে ধমকালো। বলল, এক বাচ্চার মাকে একলা রেখে যাওয়া নাকি আরও বিপদ। আমাকে দোষ দিয়ে কোন লাভ নেই, ছেলে এলে জিজ্ঞাসা করবেন সত্যি বলছি কিনা।' ছবিবউদি সরে গিয়েছিল সামনে থেকে।

মিলিটারিতে শিবরামের দেওয়া ঠিকানায় পর পর বারোটা চিঠি গিয়েছিল। আট নম্বর চিঠি থেকে বাকি চারটে ফেরত এল। প্রাপক নেই। যতদিন চিঠি আসেনি ততদিন তবু একরকম ছিল, এবার গুঞ্জন উঠল। ছবিবউদি কেঁদে ভাসাল, দুর্গামাসী একদম চুপ। হরিহরকাকা হরিপুরের পোস্টমাস্টারকে দিয়ে মিলিটারিতে চিঠি লেখালেন ইংরেজিতে, যদি শিবরামের খবর পাওয়া যায়। চিঠির উত্তর এল ইংরেজিতে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন ছুটি থেকে কাজে যোগ দেওয়ার মাস চারেক বাদে শিবরাম যৌনব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে যায়। সেখানে তার চিকিৎসা চলছিল। কিন্ত হঠাৎ একদিন সে হাসপাতাল থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে। যাওয়ার আগে জানিয়ে গিয়েছে চিঠিতে যে সে চাকরি ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছে। সে তার দেশের যে ঠিকানা দিয়েছিল সেই ঠিকানায় এই ব্যাপার জানিয়ে নাকি সময়মত চিঠি দিয়েছিলেন কর্তৃপক্ষ।

অথচ সেই চিঠি নারায়ণপুরে আসেনি। শিবরাম সঠিক ঠিকানা দিয়েছিল কিনা সে-ব্যাপারে সন্দেহ হল। ইংরেজি চিঠি হরিপুরের পোস্টমাস্টার পড়ে শোনালে হরিহরকাকা বিপাকে পড়লেন। এক মুহূর্ত চিন্তা করে তিনি পোস্টমাস্টারকে অনুরোধ করলেন, এই চিঠির সম্পূর্ণ বিষয় যেন তিনি গোপন রাখেন। ছেলে বা স্বামীর যৌনব্যাধি হয়েছে এই খবর কোন মা বা স্ত্রীর পক্ষে সহ্য করা মুশকিল। তাই তিনি গ্রামে ফিরে এসে জানালেন, হঠাৎ অসুখে ভুগে শিবরামের সংসার সম্পর্কে বিরাগ এসেছিল। সে সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছে।

শিবরামের সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়ার সব দায় গিয়ে পড়ল তার স্ত্রীর ওপরে। দুর্গামাসী নিজের ছেলেকে হারানোর জন্যে উঠতে বসতে দায়ী করেন পুত্রবধূকে। কান্না শোক একসময় চাপা পড়লেও তার আগুন আজও নিভে যায়নি। গ্রামে শিবরামের ব্যাপারটা যে ঢেউ তুলেছিল তাও থেমে গিয়েছে একসময়। তবে মিলিটারিতে গেলে অসুখে পড়তে হয় এমন ধারণা তৈরি হওয়ায় যারা কাঁচা টাকার লোভ দেখেছিল তারা থমকে গিয়েছে। শহর অনেক দূর, না শিবরামের উদাহরণ—কোন্‌টা তাদের নিরুৎসাহ করল তা অবশ্য বোঝা গেল না। হরিপুরের পোস্টমাস্টার হরিহরকাকাকে বলেছিলেন, 'যৌনরোগ বড় ছোঁয়াচে, বুঝলেন? আমি এ বিষয়ে অনেক বই পড়েছি। বলছেন ছুটিতে কিছুদিন গ্রামে থেকে স্ত্রীসঙ্গ করে গিয়েছে, এখন রোগটা স্ত্রীকে দিয়ে গেল কিনা তা কে বলতে পারে! ডাক্তার দিয়ে ওর স্ত্রীর রক্ত যদি পরীক্ষা করে নেন তাহলে ভাল হয়। স্বামী-পরিত্যক্তা স্ত্রী তো, কখন কার সঙ্গে মন-মজামজি হয়ে যায় কে বলতে পারে? সেই সঙ্গে স্বামীর দেওয়া রোগ শরীরে থাকলে তো কথাই নেই!'

মজামজির ব্যাপারটা বাদ দিয়ে বাকি কথাগুলো বেশ যুক্তিপূর্ণ বলে মনে হয়েছিল হরিহরকাকার। তিনি সমস্যায় পড়লেন। রক্ত পরীক্ষার কথা বলতে গেলে শিবরামের অসুখের কথা বলতে হবে দুর্গাবউঠানকে। তাছাড়া পরীক্ষা তো হরিপুরেও হবে না। যেতে হবে সেই আলিপুরদুয়ারে। তার হ্যাপা বইবে কে? তিনকুলে কেউ নেই তাঁর। স্ত্রী গত হয়েছেন বছর দশেক। থাকার মধ্যে আছে দুটো কাজের লোক। বহু বছর ধরে আছে। আর আছে গোলাভরা ধান, গ্রামের অর্ধেক

জমির মালিকানা। অবশ্য বেশ কিছু গয়নাগাঁটি আছে মাটিতে পোঁতা। এগুলো যাওয়ার সময় কাকে দিয়ে যাবেন তাই নিয়ে খুব চিন্তা হয়। বেঁচে থাকতে কাউকে হাতে করে দিতে পারবেন না তিনি। মরে গেলেও সুখ পাবেন না, এই হয়েছে জ্বালা। খুঁজলে কি লতায়পাতায় কোন উত্তরাধিকারী পাবেন না? কিন্তু তাদের দুচক্ষে দেখতে পারেন না তিনি। ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে দেন না। অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করলেন শিবরামের বউটাকে এখনই কিছু না বলাই ভাল। যতই ছোঁয়াচে হোক রোগটা, এখান থেকে যাওয়ার পরেও বাধতে পারে। আর রোগ এমন জাতের যে শিবরামের বউয়ের হলে চেপে রাখতে পারবে না। তখন না হয় মামার বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেই হবে। এইসব ভেবে তিনি একটু স্থির হয়েছিলেন।

তা এসব ঘটনা কিছুকাল আগের। না, শিবরামের বউ তো দিব্যি সুস্থ আছে। একদিন হরিহরকাকা ভোর-ভোর বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁতন করছিলেন বাগানে ঘুরে ঘুরে, হঠাৎ পুকুরে জলের শব্দ শুনে ব্যাপারটা দেখতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিলেন। আঁধারঢাকা আলোয় স্নান করছে শিবরামের বউ। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে পড়ল অসুখটার কথা। এখন বউয়ের শরীরে কাপড় রয়েছে অগোছাল-ভাবে সেঁটে। বুক পেট পিঠ এবং নিতম্ব দেখে ঘাটের কাছে পৌঁছেও মাথা ঘুরে গেল তাঁর। তিনি সরে আসার শক্তি পেলেন না। স্নান করে যাওয়ার সময় বউ যে তাঁকে দেখেছে এটাও যেন খেয়াল ছিল। সেটা হতেই মনে হল, শিবরামের স্ত্রী সম্পূর্ণ সুস্থ। দেহের গোপন অংশেও কোন চিহ্ন নেই। ওই রোগ শরীরে ঢুকলে চামড়া অমন মাখনের মত নরম থাকতে পারে না। মন থেকে একমণি পাথর নেমে গেল তাঁর।

সাতসকালে আজকাল ঘুম ভাঙে হরিহরের। আসলে ঘুম কখন আসে কখন যায় তা তিনি টেরই পান-না। বয়স বাড়লে শরীর আর ঘুমাতে চায় না বোধহয়। তখন সে নিজের অতীত দ্যাখে। ভবিষ্যৎ বলে যখন আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না তখনই অতীত দেখার বয়স। এই বিষয়সম্পত্তি অথচ উত্তরাধিকারী নেই। বউ মারা গিয়েছিল যখন তাঁর বয়স বছর চল্লিশেক। এমন কিছুই না। চেষ্টাচরিত্র করলে বছর আঠারো-উনিশের পাত্রী জোটানো এমন কিছু অসাধ্যকর্ম ছিল না। তিনি না বলতেই অনেক গরীব পাত্রীর বাবা হামলে পড়েছিল সেই সময়। কিন্তু কিছুতেই রাজী হননি। কি হবে বিয়ে করে? লোকে জানে তাঁর স্ত্রীর সন্তানধারণের ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু চরম সত্যিটা তিনি জানেন আর তিনদিনের নিমোনিয়ায় ভুগে যে গেল সে-ই জানত। আঠারো বছরের মেয়েকে ঘরে এনে আর একটা সাক্ষী বাড়াবার কোন মানে হয় না। চল্লিশে পৌঁছে শুধু বিষয়সম্পত্তির লোভ দেখিয়ে আঠারোর যৌবনকে কতদিন বশ মানানো যায়! বেনোজল ঢুকতই। তখন অশান্তি আসত [illegible] চেয়ে স্বস্তি ঢের ভাল। এসব কথা তিনি কাউকে বলতে পারেননি। ঠিক জমিদার বলতে যা বোঝায় তা তিনি নন। তবে জোতদার তো বটে। কিন্তু কেউ বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবে না তিনি বিষয়সম্পত্তি বাড়াবার জন্যে গ্রামের মানুষের ওপর অত্যাচার

Birchandra State Central Library
P.R.R.L
Agartala, West Tripura

করেছেন। অত্যাচার দূরের কথা, তিনি কারো কাছে সুযোগ পর্যন্ত নেননি। তবে হ্যাঁ, দানখয়রাত করা তাঁর ধাতে নেই, আর তা করলে এতসব সম্পত্তি কয়েকদিনেই ফুড়ুৎ হয়ে যেত বলে তিনি যে যখন এসেছে তখন খুবই ন্যায্যচুক্তিতে বীজ এবং টাকা ধারে দিয়েছেন। সেটা করেছেন লিখিত-পড়িত ভাবে। বাল্যকালে তিনি ক্লাস সিক্স পর্যন্ত পড়ার সুযোগ পেলেও আইনকানুন, বিশেষ করে বিষয়সম্পত্তির ব্যাপারে, ভালই জানেন। কাউকে ঠকাননি। তোমার টাকার দরকার তাই জমি বাঁধা রাখতে এসেছ। আমি যাইনি তোমার কাছে। তা তিনি আছেন বলেই নারায়ণপুরের জমি আজ পর্যন্ত বাইরের লোকের কাছে বাঁধা পড়েনি। সেটা কম নয়। কিন্তু তার বদলে তিনি কি দিচ্ছেন? গ্রামের দুর্গাপুজো তো তিনি পয়সা না দিলে কখনই হত না। কালীপুজো থেকে আরম্ভ করে যা কিছু উৎসব তিনি সামনে দাঁড়ান বলেই সুচারুভাবে হয়। তবে হ্যাঁ, গ্রামের মানুষজন তাঁকে মানে। ঘরের বিবাদ থেকে আরম্ভ করে সামাজিক যে কোন সমস্যাতে তাঁর বক্তব্যই শেষ কথা। এইটুকুর জন্যে বেঁচে থাকা। কিন্তু তিনি চলে গেলে এই বিষয়সম্পত্তির কি হাল হবে? কেউ কেউ বলে, সরকার নিজের হাতে তুলে নিয়ে নিলাম করবে। অথবা পাঁচভূতে লুটেপুটে খাবে।

এইসব চিন্তায় রাত বাড়লেও ঘুম আসে না। হরিপুরের অবিনাশ কবিরাজ ঘুমের ওষুধ দিয়েছেন। খুব সঙ্গীন হলেই তিনি সেই ওষুধ খান। কাল খেয়েছিলেন। হরিপুরের পোস্টমাস্টার কাল বলেছিলেন, 'খুব ভুল করেছিলেন রায়মশাই। চল্লিশে বউ মরা মানে সাতজন্মের পুণ্য না থাকলে হয় না। তখনই আর একটা জাহাজ আনা উচিত ছিল। আরে মেয়েমানুষের ছায়া ঘরে না পড়লে কি প্রাণ জুড়োয়! তবে আপনার স্বাস্থ্য তো এখনও ভাল আছে। আমাদের মত দুমড়ে মুচড়ে যায়নি। পশ্চিমে শুনেছি বুড়ো বয়সে মানুষ ঘরে বউ আনে সঙ্গ পাবার জন্যে। নিঃসঙ্গতা খুব পাজী রোগ।'

হরিহরের চোখ বড় হয়ে গিয়েছিল, 'ছি ছি! আপনি এই বয়সে আমাকে বিয়ে করতে বলছেন?'

পোস্টমাস্টার বলেছিলেন, 'এই তো! চট করে ছি-ছি বলে ফেললেন! আপনাকে কি আমি ভোরের কুসুম ঘরে আনতে বলছি? তা কি মানায়?'

'তাহলে?' নিজের কণ্ঠস্বর কেমন খসখসে, অচেনা শোনালো হরিহরের।

'দেখেশুনে বয়স্থা বিধবা বিবাহ করুন। যার তিনকুলে কেউ নেই, যৌবন যায় যায় অথচ মনে এখনও সংসার করার বাসনা আছে। অত্যন্ত স্নেহময়ী। আপনার সঙ্গ পেলে যার জীবনে আর মরুভূমি থাকবে না। এমন মেয়ে যার কোন চাহিদা নেই, সংসার থেকে কিছু পায়নি—।'

অবিশ্বাসের হাসি হেসেছিলেন হরিহর, 'তাহলে কুমোরপাড়ায় অর্ডার দিতে হয়!'

'বিশ্বাস হচ্ছে না আপনার? আমি মশাই এই গবর্মেন্টের চাকরি করতে গিয়ে সারা বাংলাদেশ ঘুরলাম। কত দেখেছি। বারোয় বিয়ে তেরোয় বিধবা। তারপর বাপের বাড়ি ফিরে এসে হাঁড়ি ঠেলে যাচ্ছে সমানে। আইবুড়ো ছেলেরা

যখন বিয়ের কনে খোঁজে তখন তো কুমারী চায়। অতএব ওদের তো বিয়ে হবে না কোন কালে। আপনার এমন পাত্রী দরকার।'

'তাদের বয়স কত?' ফ্যাসফ্যাসে হয়ে গিয়েছিল গলা হরিহরের।

'তারা আবার কি? আপনি এমন ভাবে বলছেন সবাই একসঙ্গে থাকে। তা ধরুন বছর চল্লিশেক। আপনার সঙ্গে কুড়ি বছরের পার্থক্য হবে কিন্তু এই বয়সে সেটা কেউ ধরবে না। দেখুন, যদি রাজি থাকেন তাহলে আমিই না হয় চেষ্টাচরিত্র করি।' পোস্টমাস্টার মাথা নেড়েছিলেন।

পরামর্শ শুনে গ্রামে ফিরে গুম হয়ে বসেছিলেন হরিহর। দুটো বুড়ো চাকর ছাড়া এই বিশাল বাড়িতে কোন মানুষের অস্তিত্ব নেই। স্বামীর ঘর না করা বিধবা চল্লিশ বছরে পৌঁছে কি রকম থাকবে? যাকে ছাব্বিশ-সাতাশ বছর হাঁড়ি ঠেলতে হয়েছে, তার চেহারা কতটা নরম হবে? আর চল্লিশ বছর কম নাকি! যাকে বলে ধাড়ি মেয়ে, তাই। সে যদি অবাধ্য হয়, বুড়ো বলে অবহেলা করে, তাহলে তো তিনি ফেলতে পারবেন না। গলায় বেঁধা কাঁটার মত বহন করে যেতে হবে আমরণ। শুয়ে শুয়ে মাথা নেড়েছিলেন তিনি। এখন তাঁর জীবন কতগুলো নিয়মে বাঁধা। সকালে কি খান, দুপুরে ভাতের পাশে কি কি থাকে, রাত্রের খাবার, সব অভ্যেসের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে। নতুন মানুষ এলে এসব উল্টোপাল্টা হয়ে যেতে বাধ্য। আর তখনই তাঁর শরীর খারাপ করবে। তার রান্নায় যদি ঝাল দেবার ঝোঁক থাকে তাহলেই হয়ে গেল! এই বাড়ির কোথায় কোন্ জিনিস রয়েছে তা তিনি জানেন। অন্ধ হয়ে গেলেও একটুও অসুবিধে হবে না তাঁর। তিনি এলে তো সব কিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে! একটা বড় নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি। এবং তখনই ওষুধ খেয়েছিলেন। এর আগেও তাঁর অবিনাশ কবিরাজের ওষুধে কাজ হয়েছে। অকাতরে ঘুমিয়েছেন। কিন্তু আজ স্বপ্ন দেখলেন। বাড়িটা কেমন স্নিগ্ধ হয়ে গিয়েছে। নতুন মানুষ তাঁকে ঘুম ভাঙিয়ে খাওয়ার জল দিচ্ছে। তিনি যা যা চান তাই সে করছে কিন্তু তার মধ্যে একটু বাড়তি যত্ন রয়েছে। বাড়িঘরের আর ছন্নছাড়া ভাব নেই। নিত্য নতুন নতুন খাবার হচ্ছে। রাত্তিরে নিজের হাতে তাঁকে মশারি গুঁজতে হচ্ছে না। নতুন মানুষ তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে। বাড়ি থেকে বেরুবার সময় হাতে হাতে সব কিছু এগিয়ে দিচ্ছে। এমন কি তাঁর রঙ-ওঠা বিবর্ণ জুতোটাও চকচকে চেহারা পেয়ে গিয়েছে। তিনি অন্যমনস্ক হয়ে তার গায়ে হাত দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই চল্লিশ বছরের শরীরটা আদুরে বেড়ালের মত তাঁর বুকে মুখ রেখে বলল, 'আমি এমন সুখ পাবো তা কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি গো। আমি বড় অসহায়। তুমি আমাকে জীবন দিয়েছ, তুমি আমার দেবতা।'

আর সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে গেল। সমস্ত বুক জুড়ে তখন আতিপাতি করছে কিছু। রাত্রে তিনি হ্যারিকেন নিভিয়ে শোন। অতএব অন্ধকারে কষ্টটা আরও বেড়ে গেল। বিছানা শূন্য। চাদরটা বোধহয় দিনচারেক ধরে বদলানো হয়নি। তিনি উঠে বসলেন। খুব কষ্ট হচ্ছিল নিজের জন্যে।

একসময় ভোর এগিয়ে এল। হরিহর দরজা খুলে বাগানে এলেন। প্রচুর

গাছগাছালি। পাখিরা জেগে উঠেছে। সে থাকলে নিশ্চয়ই এই সময় উঠতে দিত না। কারণ সে চল্লিশ বছরে চলে গিয়েছিল, তারও স্বভাব একই রকমের ছিল। কি করবেন তিনি? পোস্টমাস্টারকে বলে দেবেন যে তিনি রাজী আছেন?

কাল রাত্রে কি স্বপ্নের সময় বৃষ্টি হয়েছিল? মাটি ঘাস এমন ভেজা-ভেজা কেন? হঠাৎ নজরে পড়ল ছায়া-ছায়া ছায়ায় লাউশাক নেতিয়ে আছে। আলো পড়লেই চেহারা পাল্টে যাবে। মনে পড়ল গতকালই দুর্গাবউঠান আবদার করেছিল লাউশাক খাওয়ার। বুড়ির মুখ খুব, কিন্তু তাঁকে মান্য করে। তিনি কয়েকটা ডাঁটা কেটে নিলেন। ঘুম ভাঙার আগেই গাছের শরীর কাটতে একটু খারাপ লাগল আজ। অন্যদিন লাগে না। লাউশাক যতটা সম্ভব গোল করে হরিহর সদর দরজার দিকে এগোলেন। এবং তখনই তাঁর নিজের বাড়ি আরও স্পষ্ট চোখে পড়ল। কি তরতাজা গাছপালা!

গেট খুলতেই দেখতে পেলেন কাদুবুড়ি লাঠি ঠুকতে ঠুকতে এগিয়ে আসছে। তিনকুলে কেউ নেই বুড়ির। যা পায় তাই খায়। অবশ্য খাওয়াটা রোজ এই বাড়িতেই হয়ে থাকে। ভোরবেলায় এসে বসে থাকে বুড়ি। মাজা ভাঙা, হাঁটতে কষ্ট হয়, চুলে জটা। হরিহরের হুকুম দেওয়া আছে, গতরাতে যা কিছু বেঁচেছে তা বুড়িকে দিয়ে দিতে হবে। এটা অবশ্য বুড়ি নিজেই চেয়েছে। সে টাটকা রান্না করা খাবার কিছুতেই খাবে না। কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলেছিল, 'সব কুল গিয়েছে আমার। হে হে, এখন আর টাটকা খাবারে স্বোয়াদ পাইনে। বাসি শরীরটার জন্যে বাসি খাবার চাই।' কেউ কেউ ধরলে বলে, 'না বাপু। তোমাদের যা বাঁচে তাই খেলে কেউ কিছু মনে করবে না। টাটকা খাবার দুদিন খেলেই হাত গুটিয়ে নেবে তোমরা। তা ছাড়া চেয়েচিন্তে বাসি খাবার খেতে খেতে পেটে সয়ে গিয়েছে। টাটকা খাবার খেলে পেট ছাড়বে গো!'

'ও হরিহর, সাতসকালে চললে কোথায়? হাতে ওটা কি?' খোনা গলায় জানতে চায় কাদুবুড়ি।

'লাউ-এর ডগা।' হরিহর দাঁড়ান।

'আহা গো! কতকাল লাউ-এর শাক খাইনি!'

'ঠিক আছে, আজ রাঁধতে বলব, কাল এসে নিয়ে যেও।'

'তা দিচ্ছ কাকে?

'শিবরামের মাকে। চেয়েছিল।'

'অ। ভাল। দিয়ে এসো। ছেলে গেল, স্বামী গেল, কম কষ্ট নাকি! তার ওপর অমন সুন্দরী বউ গলায় কাঁটা হয়ে ঝুলছে। সেটাও তো কষ্ট। যাও দিয়ে এসো।' কাদুবুড়ি খোলা গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে হাঁকলো, 'কই, উঠেছিস নাকি তোরা? বাবুর ভোর হয়ে গিয়েছে কখন আর তোদের কেন চোখ খোলে না তাই আমি বুঝতে পারি না। ওরে, কোথায় তোরা?'

হাঁকটা চাকরবাকরদের উদ্দেশে। হরিহর আর দাঁড়ালেন না।

নারায়ণপুরে এখনও পিচের রাস্তা হয়নি, হওয়ার কথা কেউ কল্পনাও করে না। ভেজা মাটির পথ ধরে হরিহর হাঁটছিলেন। সমস্ত গ্রামই এখন ঘুমন্ত। অবশ্য

কেউ কেউ জাগে। যেমন শিবরামের বউ। সোজা কাকভোরে নিজের পুকুরে স্নান করতে দেখে তিনি চমকে উঠেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল ছবি রোজই তাঁর পুকুরে স্নান করতে আসে। সাধারণত গ্রামের মানুষ অন্য পুকুর ব্যবহার করে। তিনি কিন্তু আশা করেছিলেন ছবি আবার পরের দিন কাকভোরে তাঁর পুকুরে স্নান করতে আসবে। রাত থাকতেই তিনি গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ভোর হল, আলো ফুটল কিন্তু কেউ স্নানে এল না। হঠাৎ নিজের কাছে নিজেই লজ্জিত হয়েছিলেন। মেয়েটা গতকাল তাকে কি ভেবে গেল কে জানে? তিনি তো কোন মতলব নিয়ে তাকে দ্যাখেননি। চোখে পড়ে যাওয়ায় আজ আবার এসেছিলেন। আজ কেন গাছের আড়ালে দাঁড়িয়েছিলেন সেই কৈফিয়ৎ নিজের কাছে অবশ্য দিতে পারেননি। কিন্তু আজ এই ছায়া-ছায়া ভোরের পথে হাঁটতে হাঁটতে তাঁর মনে হল ছবির বয়স যদি চল্লিশে পেঁছাতো তাহলে পোস্টমাস্টারের কাছে গিয়ে প্রস্তাবটা দিতে একটুও আপত্তি হত না। স্বামী সন্ন্যাসী হয়ে গেছে আর মারা গিয়েছে, এ দু'টো কথা অবশ্য এক নয়। তবু ছবির মত কোনো মেয়ে পেলে অবশ্যই রাজী হতেন তিনি। এমন ভাবা অবশ্য ঠিক হচ্ছে না, কিন্তু মনে এলে না ভেবে পার পাওয়াও তো যায় না।

বাঁক ঘুরতেই হরিহরের চোখে পড়ল একটা আমগাছের পাশে শ্রীনিবাস হাঁদা গঙ্গারামের মত দাঁড়িয়ে আছে। চট করে মনে হয় পাথরের মূর্তি। এই সাতসকালে ঘুম থেকে উঠে রাস্তা ছেড়ে ওখানে গিয়ে সে কি করছে। তিনি যে আসছেন তাও নজরে নেই।

গলাখাঁকারি দিয়ে হরিহর জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওহে শ্রীনিবাস, ওখানে কি করছ?'

হকচকিয়ে গেল শ্রীনিবাস। যেন চৈতন্য ফিরল তার। কি করবে, কি বলবে বুঝে উঠতে সময় নিল সে। ততক্ষণে সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন হরিহর, 'কি হে, চুপ মেরে আছ কেন?'

'আজ্ঞে, এমনি। এমনি দাঁড়িয়েছিলাম।' গরুচোরের মত মুখ করল শ্রীনিবাস।

'এমনি? রাত্রে ঘুমাও না?'

'না। মানে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, তাই গাছগাছালি দেখতে বেরিয়েছিলাম।'

'ও। তোমার এমন গুণ আছে তা জানতাম না তো! গাছগাছালি! বাড়ির পেছনটা তো জঙ্গল হয়ে গিয়েছে, ওটা পরিষ্কার করলে তো পারো! মা কেমন আছেন?'

'আজ্ঞে, আছেন। বড় অম্বল হয়।'

'অম্বল? ওষুধ খাওয়াচ্ছো? অবিনাশ কবিরাজের কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে এসো।'

'আজ্ঞে মাকে আপনি যদি একটু বুঝিয়ে বলেন, আমার কথা শুনতেই চায় না।'

'বুঝিয়ে বললে শুনবে না কেন? বাড়ি যাবে তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'এসো। হাঁ, যে কথা বলছিলাম। ছেলে হিসেবে তুমি মন্দ না। মানে বখে যাওনি। মায়ের মনে কোন কষ্ট দিয়েছ বলে তো শুনিনি। তা তাঁর

শরীরটাকে সুস্থ রাখতে হবে তো ?'

'সে তো নিশ্চয়ই।'

'যা ধান পাচ্ছ তাতেই দেখছি সংসার চলে যাচ্ছে। খুব ভাল কথা।'

'আজ্ঞে, দুই ফসলী জমি। পেট তো দুটো। খরচ আর বেশী কি!'

'তোমার মত বোঝদার ছেলে যদি ঘরে ঘরে হতো হে শ্রীনিবাস! ওই যে নগেনটা, কেবলই উড়ু-উড়ু ভাব। হরিপুরের সনাতনের সঙ্গে এত ভাব কেন বল তো ? তোমারই তো বন্ধু!'

'আমি ঠিক জানি না।'

'হুম।'

কথা বলতে বলতে তারা চলে এসেছিল শ্রীনিবাসের বাড়ির সামনে। তিনখানা শোওয়ার ঘর, উঠোন, রান্নাঘর। শ্রীনিবাস বলল, 'আপনি কি একবার বাড়িতে আসবেন ?'

'না, এখন নয়। দিন গড়াক, নিশ্চয়ই আসব। তোমার মাকে বলো।'

শ্রীনিবাস মাথা নাড়তেই ভেতর থেকে গলা শোনা গেল, 'ঠাকুরপো যে, এই সকালে ?' শ্রীনিবাসের মা মাথায় ঘোমটা টানতে টানতে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন খুবই শীর্ণ চেহারা।

নমস্কার করলেন হরিহর, 'শিবরামের মা এইটে হুকুম করেছেন, পৌঁছে দিতে যাচ্ছি। তা ছেলের মুখে শুনলাম খুব গোলমাল করছে শরীর! অবেলায় খেয়ে খেয়ে পেটের অবস্থা বারোটা। বললে যে কানে নেবেন এমন ভরসা পাই না। তবু ছেলের মুখ চেয়ে এবার ওষুধবিষুধে না বলবেন না।'

'ছেলে! ওর জন্যে তো রাত্রে ঘুম আসে না ঠাকুরপো। এবার ভাবছি একটা ভাল মেয়ে দেখে সংসারী করে দিই। আমি না থাকলে বউ ওকে দেখবে।'

মায়ের কথা শেষ হওয়ামাত্র শ্রীনিবাস ভেতরে পা বাড়ালো। হরিহর হাসলেন, 'ভাতকাপড়ের অভাব নেই যখন তখন কথাটা মন্দ বলেননি। কিন্তু আপনাকে ওষুধ খেতে হবে তার আগে।'

শ্রীনিবাসের মা হাসলেন। খুবই বিবর্ণ হাসি। ওই সময় মহিলার চেহারা মোটেই ভাল লাগল না হরিহরের। শ্রীনিবাসের বাবা মহাদেবের সঙ্গে তাঁর খুবই সদ্ভাব ছিল। একবার হরিপুরের মাঠে রাসলীলা দেখে ফিরে আসার পথে সাপে কামড়ালো। আর গ্রামে ফিরে আসতে পারেনি লোকটা। শ্রীনিবাসের বয়স তখন সাত। ঠিক সময়ে বাচ্চা হলে শ্রীনিবাসের মত ছেলে হত তাঁর। দরজায় দাঁড়ানো বিধবা মহিলাকে নমস্কার করে তিনি আবার হাঁটতে শুরু করলেন। বাংলাদেশের বিধবা মহিলারা তিরিশ পার হতেই শরীরে একটা না একটা অসুখ বাধিয়ে বসে। আলোচাল, অবেলায় খাওয়া, শুচিবাই মেজাজ—অসুখ হবে না তো কি! চল্লিশ পর্যন্ত যিনি ভাইয়ের সংসারে হাঁড়ি ঠেলছেন তাঁরও তো একই দশা হবে! পোস্টমাস্টার যাই বলুক।

পথে গৌরাঙ্গের সঙ্গে দেখা। হাতে ঝুড়ি। হরিহর জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় চললে হে গৌরাঙ্গ ?'

'যাই, একটু জমিটা দেখে আসি।'

'এখন আর জমি দেখার কি আছে। মাটি তৈরি। জল ঝরলেই তো কাজ আরম্ভ হবে।'

'তা হবে। কিন্তু মন টানছে। দেখি কোন আগাছা মুখ তুলল কিনা।'

মাথা নাড়লেন হরিহর। এখনো এই গ্রামের কিছু মানুষ মাটিকে ভালবাসে। তারা আছে বলেই ভাল ফসল হয়। কিন্তু যে ধরনের ছেলেছোকরা ওদের ঘরে ঘরে বড় হচ্ছে তাতে তাঁর খুব সন্দেহ, বছর দশেক বাদে কেউ লাঙ্গল দিতে মাঠে যাবে কিনা। সাতজন্মে এই গ্রামে কেউ প্যান্ট-শার্ট পরেনি। শিবরামের হাওয়া গায়ে লেগেছে আজকাল ছেলেছোকরাদের। শার্ট-প্যান্ট কেনার টাকার জন্যে ঘরে ঘরে এখন বিবাদ শুরু হয়ে গিয়েছে। খুব খারাপ দিন আসছে সামনে।

দূর থেকে তিনি দুগ্গামাসীকে দেখতে পেলেন। দাওয়ায় পা ঝুলিয়ে বসে সমানে কথা বলে যাচ্ছেন। ওঁর সামনে কোনও মানুষ নেই। হরিহর গলাখাঁকারি দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কথা বলা বন্ধ হল। চোখ পড়া মাত্র ঘোমটা টানলেন দুগ্গামাসী, 'ওমা, আপনি?'

'এই সাতসকালে কে আপনাকে বিরক্ত করল বউঠান?'

'কপাল যখন পোড়া হয় তখন বিরক্ত করার মানুষ যেচে ঘরে আসে। ছেলে ভেবে যাকে দশ মাস পেটে ধরেছিলাম সে ছেলে নয়, শত্রু। সন্ন্যাসী হয়েছে! উঃ, জ্বলে যাচ্ছে বুক!'

'জীবন তো এই রকমই বউঠান। মেনে নিতেই হয়।'

'মেনে তো নিয়েইছি। কিন্তু গলায় তো একটা কাঁটা বিঁধিয়ে দিয়ে গিয়েছে সে!'

'কাঁটা!'

'তড়িঘড়ি বিয়ে করে যাকে ঘরে রেখে গেল তাকে সামলাই কি করে?'

হরিহর বুঝতে পারলেন। তাঁর গলার স্বর নিচে নামল, 'আহা কাঁটা বলছেন কেন? অমন সুন্দরী বউ এই গ্রামে কোন্ ঘরে আছে বলুন?'

'সেটাই তো আমার জ্বালা। তুই যখন সন্ন্যাসী হয়েই যাবি তখন একটা কেলেকুলো পেঁচিকে ঘরে বউ করে আনলে পারতিস! পাতে সন্দেশ পড়ে থাকলে পিঁপড়ে দূরে থাকে নাকি?'

'সে কি! এমন ঘটনা ঘটেছে নাকি এই গ্রামে?'

'এখনও ঘটেনি। ঘটতে কতক্ষণ?'

'তাই বলুন। নিন আপনার লাউশাক। ভোরে পুকুরে গিয়ে মনে পড়ল আপনার কথা। তাই নিয়ে এলাম।' লাউশাক দাওয়ায় নামিয়ে রাখলেন হরিহর ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে। স্পর্শ হয়ে গেলে কি হবে কে বলতে পারে! দুগ্গামাসী অনেকক্ষণ ধরে হরিহরের হাতের দিকে লোভার্ত চোখে চেয়েছিলেন। এখন হুড়মুড়িয়ে উঠে লাউশাক তুলে নিলেন, 'আহা কি নধর গো! অ বউমা, কানের মাথা খেয়েছো নাকি? গ্রামের সেরা মাতব্বর বাড়ি বয়ে শাক দিয়ে গেল আর তিনি পটের বিবি হয়ে বসে আছেন! বেরিয়ে এসে শাকগুলো রান্নাঘরে রেখে

এসো। অ বউমা!'

হরিহর দেখলেন কিছুটা সময় নিয়েই শিবরামের বউ ছবিরাণী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল ঘোমটা মাথায়। শরীরটা বেশ লম্বা এবং ভরাট। শাড়ির আড়াল ভেদ করেও গড়ন বোঝা যাচ্ছে। অবহেলায় শাক তুলে নিয়ে ছবিরাণী ভেতরে চলে গেল।

দুর্গামাসী বললেন, 'সন্ন্যেসী হবার খবর পাবার পর ভেবেছিলাম, দেব দূরে করে মামার বাড়ি পাঠিয়ে। ছেলেই যখন আর ফিরবে না তখন ছেলের বউকে আমার কি হবে? তা কি বলব আপনাকে, বলে কিনা এ আমার স্বামীর ভিটে, এই ভিটে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। ফসল যা ওঠে তার অর্ধেক ভাগও নাকি তার। তা আজকাল শুনছি নানান আইনকানুন হচ্ছে। মেনে নিতে হল। কিন্তু সত্যি বলছি আপনাকে, রাতে ঘুম হয় না। কি যে করি!'

হরিহর মাথা নাড়লেন, 'আপনি অনর্থক চিন্তা করছেন বউঠান। আপনার বউমাকে যতটুকু দেখেছি তাতে মনে হয় তিনি সেরকম মানুষ নন। বিয়ের পর থেকে একা আছেন—সে তো কম দিন হল না! কোন জিনিস পচা হলে তার গন্ধ এতকাল ঢেকে রাখতে পারতেন? অতএব ওসব নিয়ে ভাববেন না।'

হরিহর আর দাঁড়ালেন না। তাঁর মন খুব প্রফুল্ল হয়ে উঠেছিল। চোখের সামনে ছবিরাণীর পুকুরে স্নান-করা চেহারা ভেসে উঠছিল। আহা, কি শরীর! এইভাবে লুকিয়ে-চুরিয়ে দেখার অভ্যেস তাঁর কোনকালে ছিল না। আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোন মানুষ মেয়েছেলের ব্যাপারে চরিত্র নিয়ে কোন দোষ তাঁকে দিতে পারেনি। অথচ এখন কেন বারংবার ওই দৃশ্যটি মনে আসছে? তাঁর চিন্তা কি নিম্নমুখী হল? গ্রামের লোক যদি জানতে পারে তাহলে আর কি তারা শ্রদ্ধা করবে? হাঁটতে হাঁটতে মনকে বোঝাতে লাগলেন তিনি। তাঁর নিজের বিয়ে করা বউয়ের শরীর মনে করতে চেষ্টা করলেন। কতদিন আগের কথা! মারা গিয়েছে মাত্র বিশ-একুশ বছর। কিন্তু তার শরীর দ্যাখেননি অনেক অনেককাল। সেই নিজের অক্ষমতা আবিষ্কার করার দিনগুলো ছিল প্রথমদিকেই. এখন আবছা আবছা মনে পড়ে। তারপর মাসের পর মাস, বছরের পর বছর সেই বউ তাঁর ঘরে একখাটে শুয়েছে কিন্তু কেউ কারো শরীর স্পর্শ করার তাগিদ বিন্দুমাত্র অনুভব করেনি। এইটে ভুল হল। তিনি তখন করেননি বটে কিন্তু ওপক্ষের মনের কথা তো জানা ছিল না। হিন্দুঘরের সতীসাবিত্রী বউরা মন চেপে জীবন কাটিয়ে দিতে পারে।

এই সময় কানে ঘণ্টার আওয়াজ ভেসে এল। হরিহরের খেয়াল হল তিনি গ্রামের প্রান্তে চলে এসেছেন। এদিকে এককালে নদী ছিল, নদীতে স্রোত ছিল। সেই ছেলেবেলায় জল বয়ে যেতে দেখেছেন তিনি। আস্তে আস্তে নদীর জল শুকোল। এখান থেকে মাইলখানেক ওপরে নদী আচমকা নতুন পথ তৈরি করে নেওয়ায় শীতে জল আসা বন্ধ হল। গ্রীষ্মে একদম খটখটে। বর্ষা নামলে বাড়তি জল জমলে এদিকে স্রোত বয়। কিন্তু নদী বলে আর মনে হয় না। নদী শুকিয়ে গেলে যে জমি বের হয় তাতে চাষবাস হয় না। জমিটা কার তা নিয়ে একসময় দ্বন্দ

লেগেছিল। হরিহরের পিতাঠাকুর নদী কিনে নিয়েছিলেন। নদী কেনার কথা সেই প্রথম আর শেষবার শুনেছিলেন হরিহর! আজ ব্যাপারটা ভাবতে মজা লাগল। নদী যে চিরকাল একই খাতে মার্কা দেওয়া জমির ওপর দিয়ে বয়ে যাবে এমন নয়। সে তার খুশিমত খাত তৈরি করে। তবে এই নদী তেমন খামখেয়ালী ছিল না। কুড়ি গজ এপাশ-ওপাশের বাইরে সে কখনও নড়াচড়া করত না। হরিহরের পিতামহ ঘোষণা করেছিলেন, যার চাষের জমিতে নদী ছোবল মারবে তাকে সেই পরিমাণ ক্ষতিপূরণ করে দেবেন তিনি।

আজ সেইসব কথা কেউ বলে না। কারণ বর্ষার সময় যেটুকু জল বয়ে যায় তাতে ছোবল মারার শক্তিটুকুও থাকে না। হরিহর দেখলেন এখন আধ-ইঞ্চিটাক জল স্থির হয়ে আছে। অর্থাৎ মূল নদী ভরাট হয়নি। তিনি ডানদিকে তাকালেন। নদীর পাশেই শ্মশান। শ্মশানের গায়ে মায়ের মন্দির। ঘণ্টা বাজছিল সেখানে। হঠাৎ থেমে যাওয়ায় মনে হচ্ছে আরও নিস্তব্ধ হয়ে গেল চারধার। এদিকে বাড়িঘর নেই। মৃতদেহ দাহ করার সময় যে গন্ধ বের হয় তা নাকে নিতে চায় না কেউ। কিন্তু মায়ের মন্দিরে জগা পাগলা থাকে। নামেই পাগলা কিন্তু লোকটি ঘোর শাক্ত। তবে মোটেই মতলববাজ নয়। মন্দির এবং নদীর বাইরে কোথাও যেতে চায় না। কেউ যদি মায়ের পুজো দিতে আসে আপত্তি নেই কিন্তু বেশি প্রশ্নটশ্ন করলে ক্ষেপে মারতে আসে। কালীপুজোর রাত্রে এখানে যখন সমস্ত গ্রাম ভেঙে পড়ে তখন জগা পাগলা হাওয়া হয়ে যায়। ভাসান পর্যন্ত কেউ খুঁজে পায় না তাকে। আশি পেরিয়ে গেছে মানুষটা।

যে বছর হরিহর জন্মেছিলেন সেই বছর নাকি দেশে খুব দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। হরিহরের পিতাঠাকুর স্বপ্নে আদেশ পেয়েছিলেন, গ্রামে মায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সেই মায়ের চেহারা লজ্জাবতী নয়। তিনি হবেন ভীষণা। চার হাত নয়—অষ্টহাতের ভয়ংকরী মূর্তি। ঘুম ভাঙার পর পাঁচজনকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তিনি এমন মূর্তির কথা। কেউ বলতে পারেনি। স্বপ্নে দেখেছিলেন মায়ের পায়ের তলায় শিব নেই এবং তিনি জিভ বের করে লজ্জাপ্রকাশও করেননি। অথচ মা স্বপ্নে আদেশ দিয়েছেন এবং সেই আদেশ পালন করা হচ্ছে না—এমন যন্ত্রণায় পড়েছিলেন মানুষটি। শেষ পর্যন্ত ঠিক করলেন বিভিন্ন পীঠে গিয়ে জানতে চাইবেন এমন মূর্তির কথা। সেখানে বড় বড় সাধক আছেন, তান্ত্রিক আছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই হদিস দিতে পারবেন। যেদিন যাত্রা করবেন সেদিন সকালে শুনলেন নদীর পারে এক পাগল এসে বসে আছে। বয়স অল্প কিন্তু সে শুধু মাকে ডাকাডাকি করছে, কাউকে কাছে ঘেঁষতে দিচ্ছে না। কৌতূহল হল হরিহরের পিতাঠাকুরের। তিনি দলবল নিয়ে চললেন নদীর কাছে। দূর থেকেই একমুখ দাড়িগোঁফের মানুষটিকে দেখতে পেলেন। দু'হাত আকাশের দিকে তুলে নাচছে। আরও একটু এগোতেই পাগল জমি থেকে ঢ্যালা তুলে ছুঁড়তে লাগল। সঙ্গীরা ভয় পেল। কিন্তু হরিহরের পিতাঠাকুর আঘাত সহ্য করতে করতে এগিয়ে চললেন। একেবারে সামনে গিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কে? কি করতে পারি আপনার জন্যে?'

জবাবে তাঁর মুখে আবার ঢ্যালা ছুঁড়ল পাগল, সরাসরি। প্রচণ্ড আঘাত লাগল। দূরে দাঁড়িয়ে সঙ্গীরা তাঁকে ডাকছে ফিরে যাওয়ার জন্যে। ঠোঁট কেটে রক্ত বের হতেই তিনি রেগে গেলেন খুব। আর তখনই পাগল চিৎকার করে উঠল, 'মা মাগো, কালী করালী ভয়ঙ্করী, তোকে আমি না খাইয়ে ছাড়ব না।'

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হল। মন থেকে ক্রোধ হয়ে গেল উধাও। তিনি হাতজোড় করে বললেন, 'মাকে খাওয়াবেন আপনি? কিন্তু তাঁর তো একটা মূর্তি চাই। বলুন আমাকে কি ধরনের মূর্তি হবে!'

সঙ্গে সঙ্গে থম মেরে গেল উন্মাদ। তারপর হাসল। হেসে বলল, 'খুব দেমাক, না? মায়ের মূর্তি করবেন! তুই করার কে রে? তুই বড়, না মা বড়? ছেলে মাকে তৈরি করে, না মা ছেলেকে? পালা এখান থেকে—নইলে মেরে মুখ ভেঙে দেব।'

তাতেও ভীত হননি হরিহরের পিতাঠাকুর, 'মা আদেশ দিলে ছেলে জগৎ তৈরি করতে পারে।'

চোখ কপালে তুলল, 'ওরে বাব্বা! এর দেখি খুব জ্ঞানগম্যি! মা তোকে আদেশ দেবে? তাঁর খেয়েদেয়ে কোন কাজ নেই? তিনভুবনে আর কোন লোক পেলেন না তিনি? হুঁ!'

তবু মাথা নাড়েন পিতাঠাকুর, 'আজ্ঞে দিয়েছেন তিনি আদেশ।'

চোখ ছোট করল পাগল, 'অ। তা মূর্তির চেহারা কি রকম হবে?'

'ভয়ঙ্করী! ভীষণা! পায়ের তলায় মহাদেব থাকবেন না। চার হাতের বদলে আট হাত হবে।'

শোনামাত্র পাগল হাত তুলে নাচতে লাগল। তার নাচ যেন থামতে চায় না। শেষতক স্থির হয়ে আঙুল দিয়ে নদীর পারের জমি দেখাল, 'ওইখানে, ওইখানে মন্দির কর। মাকে তো আর খোলা আকাশের নিচে দাঁড় করিয়ে রাখবি না। জ্বর হবে বৃষ্টি রোদে। ওইখানে।'

পুলকিত হলেন পিতাঠাকুর, 'কিন্তু মায়ের ওই মূর্তির কথা কেউ জানে না। আমি বুঝতে পারছি না, কি রকম হবে মায়ের চেহারা! যে ব. বে তাকে ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হবে তো?'

পাগল হা-হা করে হাসল, 'টুকলি করছিস? টুকলি করে পাস করা? হা হা হা! একে ওকে জিজ্ঞাসা করার কি দরকার, যেমন দেখেছিস তেমনি বানা। আট হাত, পায়ের তলায় তিনি নেই। মা আমার একা, আট হাতে সব ধ্বংস করে দিতে ছুটে চলেছেন।'

এই 'ছুটে চলা' শব্দটি কানে আসামাত্র পিতাঠাকুর ছবিটি দেখতে পেয়েছিলেন। মূর্তি তৈরি হতে যত সময় লেগেছিল তার অনেক আগেই মন্দির শেষ হয়েছিল। পিতাঠাকুর তখন রোজ আসতেন এখানে। পাগলের সঙ্গে ক্রমশ তাঁর একধরনের বোঝাপড়া হয়েছিল। লোকে জানল পাগলের নাম জগা। কোথায় দেশ, কি জাতের মানুষ তা কেউ জানতে পারেনি আজ পর্যন্ত। কিন্তু পিতাঠাকুর বলতেন, মায়ের আশীর্বাদ পেয়েছেন জগা পাগলা। ফলে এ-গ্রাম ও-গ্রামের সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা বাড়ল। সবাই এসে জগা পাগলার কৃপা চায়। কারও অসুখ, কারও

অভাব, এই চাই ওই চাই, প্রার্থনাগুলো যত আছড়ে পড়তে লাগল তত জগা পাগলা ক্ষিপ্ত হল। শেষে কারো কোন চাওয়া যখন সে পূর্ণ করল না তখন মানুষের মনে হতাশা এল। ক্রমশ ধারণা তৈরি হল, জগা পাগলা নিছকই পাগলা। কোন কিছু অলৌকিক করার সামান্য ক্ষমতাও নেই। আজ পর্যন্ত সে সেরকম কিছু করেছে বলেও শোনা যায়নি। ফলে আসা-যাওয়া বন্ধ হল। তবু কেউ কেউ যখন আসে তখন ক্ষেপে যায় পাগল। পিতাঠাকুর নিয়ম করে গিয়েছিলেন, রোজ সকালে মায়ের মন্দিরে পুজোর জন্যে প্রসাদ ফুল পাঠাতে হবে। জগা পাগলা সেইসব খেয়ে বেঁচে আছে। পিতাঠাকুরই ঘুরিয়ে তাঁকে খাওয়ানোর এই ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন।

পিতাঠাকুর যখন দেহ রাখলেন তখন হরিহরের বয়স বাইশ। সদ্য বিবাহিত এবং সেই কারণে যথেষ্ট মনঃকষ্টে ছিলেন তখন। এই সময় একদিন সকালে বাগানে ঘুরতে ঘুরতে সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকে চলে গেলেন পিতাঠাকুর। কান্নাকাটি, শোক, সমস্ত গ্রামের মানুষ মাথায় করে নিয়ে এল তাঁকে শ্মশানে। শেষ কাজের আয়োজন চলছিল। এমন সময় কেউ একজন এসে খবর দিল, জগা পাগলা মন্দিরে নেই। পিতাঠাকুরের ইচ্ছে ছিল, জীবিত অবস্থায় অনেককেই বলেছেন, মারা গেলে যেন শ্মশানে নিয়ে গিয়ে মায়ের চরণামৃত তাঁকে খাওয়ানো হয়। কিন্তু জগা পাগলা না থাকলে মায়ের পা ছোঁবে কে ?

অপেক্ষা করা হল। দিন গড়িয়ে যাচ্ছে অথচ জগা পাগলার দেখা নেই। শেষ পর্যন্ত বয়স্করা বললেন, 'আর দেরি করা উচিত নয়। পাগলদের ব্যাপার। হয়তো এ জায়গার কথা ভুলেই গিয়েছে। ও হরিহর, এক কাজ কর, তুমিই গিয়ে মায়ের চরণ স্পর্শ করিয়ে জল নিয়ে এসো। পিতাঠাকুর যে মায়ের স্বপ্ন দেখেছিলেন তাঁর পা ছোঁয়ার অধিকার নিশ্চয়ই তোমার আছে। যাও হে।'

সবাই একমত হল। পিতৃশোকে ভারাক্রান্ত হরিহরের তখন চিন্তাশক্তি অসাড়। তিনি উঠলেন। মন্দিরের দরজা ভেজানো। ধীরে ধীরে পাল্লা খুলে হাত জোড় করে ভেতরে ঢুকলেন তিনি। কেবল অন্ধকার অন্ধকার। মায়ের মন্দিরে কোন জানালা নেই। রোজ সামনে একটা পেতলের প্রদীপ জ্বলে, আজ সেটি জ্বালানো নেই। হরিহর হাঁটু গেড়ে বসে কোষাকুষির দিকে হাত বাড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে চাপা গলায় ধমক এল, 'দাঁড়া! চুপ করে বসে থাক! মায়ের শরীরে হাত দেওয়া হচ্ছে! হাত ভেঙে দেব!'

বন্ধ ঘরে গমগমিয়ে উঠল গলা। তাঁকে একাই চরণামৃত আনতে পাঠানো হয়েছিল। হরিহর ভয় পেয়ে গেলেন খুব। তারপরেই মায়ের বিগ্রহের পেছন থেকে বেরিয়ে এল জগা পাগলা। হাতে একটা তামার ছোট ঘটি। এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকলেন হরিহরের দিকে। তারপর বললেন, 'যে গেল সে মায়ের ছেলে। নিজের ছেলেকে কি মা পা-ধোওয়া জল খাওয়াতে পারে? কি রে হাঁদা গঙ্গারাম, জবাব দে?'

'আজ্ঞে, আপনি ছিলেন না বলে, আসলে পিতাঠাকুরের সেই রকম ইচ্ছেই ছিল—!'

'ইচ্ছে ছিল? ইচ্ছের তুই কি জানিস? নে, ধর, এটা নিয়ে যা। নিজের

হাতে কিছুটা তার মুখে ঢালবি, বাকিটা সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে দিয়ে পাত্র নদীতে ভাসিয়ে দিবি। অন্যথা যেন না হয়। যা, পালা।'

তামার বাটি হাতে নিয়ে মন্দির থেকে বেরিয়ে আসামাত্র দরজা বন্ধ হয়েছিল। জগা পাগলা যে বিগ্রহের পেছনে বসেছিল তা তিনি কাউকে বলতে পারেননি। চিতার কাছে এসে পিতাঠাকুরের খোলা মুখে পাত্র থেকে খানিকটা তরল পদার্থ ঢেলে দিলেন সন্তর্পণে। তারপর কেউ কিছু বোঝার আগেই বাকিটা সমস্ত শরীরে ছিটিয়ে দিলেন যত্ন করে। তাই দেখে বয়স্করা আপত্তি করলেন। চরণামৃত জিভে ধারণ করতে হয়, শরীরে স্পর্শ করাতে নেই। হরিহর তখন নদীতে নেমে গিয়ে তামার পাত্র জলে ভাসিয়ে দিয়েছেন।

মুখাগ্নি হল। সেই সঙ্গে আগুনের ছোঁয়া লাগল চিতার কাঠে। হরিধ্বনি উঠছে ঘন ঘন। কাঠের আগুন শরীরে পৌঁছানো মাত্র মনে হল, লক্ষ লক্ষ চাঁপা ফুল ফুটেছে চারপাশে। তাদের গন্ধে পৃথিবী ম-ম করছে। সবাই অবাক। একদম সাধারণ কাঠের চিতা। দাহের সময় মাংসপোড়ার কদাকার গন্ধ বের হয়। তার বদলে চাঁপা ফুলের মধুর সুবাস? কেউ কথা বলল না। কিন্তু হরিধ্বনির বদলে সবাই মাকে ডাকতে লাগল। মা—মাগো! সেই দৃশ্য এখনও পরিষ্কার দেখতে পা[illegible] হরিহর। নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই কাজ শেষ হয়ে গেল। জলে ডুব দিয়ে যখন তাঁরা ফিরছেন তখনও শরীরে চাঁপার গন্ধ। বয়স্করা পরে বলেছিলেন, প্রকৃত ভক্তকে ভগবান এমনভাবে স্বর্গে নিয়ে যান। হরিহরের মনে সন্দেহ এসেছিল। তাহলে কি জগা পাগলা কোন গন্ধবস্তু মেশানো জল পাত্রে করে তাঁর হাতে দিয়েছিলো? তাই বা হবে কি করে? সেক্ষেত্রে তো পাত্রটি বহন করে নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি গন্ধ পেতেন। ছড়িয়ে দেবার সময় সবার নাকে গন্ধ আসতো। এই ঘটনার কথা তিনি যখন সবাইকে বললেন তখন জগা পাগলার অলৌকিক কান্ড হিসেবে চিহ্নিত হল ব্যাপারটা। মুখে মুখে রটতে লাগল যত্রতত্র, ভিড় জমতে লাগল মন্দিরে। কিন্তু জগা পাগলা মারধোর করে, গালাগালির তুবড়ি ছুটিয়ে সমস্ত ভিড় হটিয়ে দিতে একটুও দেরি করেনি। এর পরে কত বছর কেটে গেছে, আর কোন ঢেউ ওঠেনি এই মন্দির অথবা জগা পাগলাকে ঘিরে। ক্রমশ একজন পাগল সাধক হিসেবেই তাকে মেনে নিল গ্রামের মানুষ। এখন আশি পেরিয়েছে বয়স অথচ শরীর রয়েছে টান-টান।

কিন্তু ঘণ্টাটা থেমে গেল কেন? মন্দিরের বাইরে তো কোন লোক নেই। হরিহর সেদিকে তাকিয়ে ভাবলো একবার মাকে প্রণাম করে আসবেন। মনে কু জমেছে খুব। শিবরামের বউকে স্নান করতে দেখার পর থেকে শুধু উথাল-পাথাল হচ্ছে। পোস্টমাস্টারটা আবার তার ওপরে ইন্ধন যুগিয়ে দিল। সব কথা মাকে নিবেদন করে মন ধুতে হবে। বলবেন, মা, বাকি জীবনটা স্বস্তিতে কাটিয়ে দিতে দাও। পাঁচজনে যে সম্মান করে তাই বজায় থাকে যেন মৃত্যু পর্যন্ত।

রবারের চটি মাটিতে খুলে রেখে তিনি মন্দিরের সিঁড়িতে পা দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে সেই ভাবনাটা ফিরে এল। তিনি চলে গেলে এই

বিষয়সম্পত্তির ভার কে বইবে ? মাকে রোজ সকালে ফুল প্রসাদ পাঠানো থেকে কাদুবুড়ির খাবার যোগাড় করবে কে ? পাঁচভূতে লুটেপুটে কেন খাবে তাঁর সম্পত্তি ! এই প্রশ্নটাই যদি মাকে জিজ্ঞাসা করেন তাহলে কি তিনি উত্তর পাবেন ?

চাতালে উঠতেই জগা পাগলাকে দেখতে পেলেন। মায়ের বিগ্রহ আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি হাতজোড় করে জানতে চাইলেন, 'আপনি ভাল আছেন ?'

'কি দরকার এখানে ? কাজকর্ম নেই ? এখানে সময় নষ্ট করা কেন ?' খেঁকিয়ে উঠল জগা পাগলা।

'মাকে দেখতে এসেছি।'

'ওঃ, দেখতে এসেছ! মা কৃতার্থ হয়েছেন। যেন তুমি দেখতে চাইলেই তিনি দেখা দেবেন তাঁর সময় অসময় নেই ? তোমার ইচ্ছের ওপর তাঁকে চলতে হবে ভেবেছ ?'

'আজ্ঞে তা নয়। মায়ের মন্দিরে এলে তো দর্শন পাওয়া যায়—!'

'তোমার বাড়িতে গেলেই তোমার দেখা পাওয়া যায় ?'

'আজ্ঞে, কেউ এলে আমি সঙ্গে সঙ্গে দেখা করি।'

'মিথ্যে কথা।'

'অপরাধ নেবেন না, মিথ্যে কথা নয়।'

'ধর, তোমার খুব বাহ্যি পেয়েছে। গাড়ু হাতে বাহ্যি করতে ঢুকেছ এমন সময় কেউ এল দেখা করতে। কি করবে তুমি ? বাহ্যি বন্ধ রেখে তৎক্ষণাৎ চলে আসবে দেখা করার জন্যে ?'

'আজ্ঞে না। তেমন হলে, ওটা করেই আসব।'

'অ। ততক্ষণ সেই লোকটা বসে থাকবে তোমার জন্যে, তাই তো ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। উপায় নেই তাই—।'

'তাহলে মিথ্যে কথা বলছিলে এতক্ষণ ? আমার মায়ের এখন বাহ্যি পেয়েছে, তিনি তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না। কথাটা তোমার মগজে ঢুকেছে ?'

'হ্যাঁ। তাহলে আমি অপেক্ষা করি ?'

'অপেক্ষা ? তা করো। তবে মেয়েমানুষের সময় ব্যাটাছেলের থেকে বেশি লাগে।'

'আমি সারাদিন অপেক্ষা করব।'

সিঁড়িতে ফিরে গিয়ে বসলেন হরিহর। তাঁর রাগ হচ্ছিল খুব কিন্তু সামলে নিলেন।

মিনিট দুয়েক বাদে জগা পাগলা আবার বেরিয়ে এল, 'তুমি মরলে মায়ের সেবার কি ব্যবস্থা হবে ঠিক করেছ ?'

॥ ২ ॥

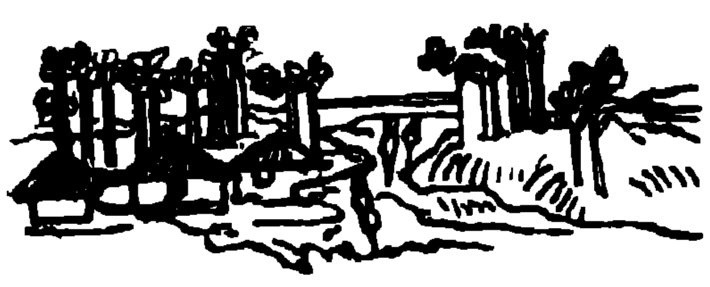

হরিহরের বুকের ভেতরটা ধক্ করে উঠল। তাঁর মনের কথা জগা পাগলা জেনে ফেলেছে। লোকটা যে অন্তর্যামী এটা তার হাতে হাতে প্রমাণ। পিতাঠাকুরের মানুষ চিনতে ভুল হয়নি। হরিহর শিহরিত হয়ে মাথা নামালেন মন্দিরের চাতালে, 'আপনি সব জানেন, আমাকে পথ বলে দিন।'

'এ আবার কি কাণ্ড! মায়ের মন্দিরে এসে আমাকে সবজান্তা বলছ? আস্পদ্দা তো কম নয়! সরল মনে প্রশ্ন করলাম একটা, তার বদলে পাপ তুলে দিচ্ছ ঘাড়ে?'

'পাপ? না—না!'

'না-না আবার কি? মায়ের মন্দিরে মা ছাড়া আর কেউ কিছু জানতে পারে না। বিষয়-গর্বে একেবারে অন্ধ হয়ে গেছ দেখছি!' জগা পাগলা মাটিতে নেমে এসে থুতু ফেলল।

হরিহর উঠে দাঁড়ালেন, 'আমার তো স্ত্রী পুত্র কন্যা নেই। যদ্দিন আছি সব কিছু করব। কিন্তু তারপরে কি হবে ভাবতে পারছি না।'

'ভাবো সংসারে আছ অথচ পুত্র-কন্যা নেই। কি গর্বের কথা। নিজের না থাক পরেরটাকে নিয়ে মানুষ করতেও তো পারো! আর কিছু না হোক পাঁচজনকে ডেকে পরামর্শ কর। মা তো সব পোঁটলা বেঁধে তোমাকে যমের বাড়ি যেতে সাহায্য করবেন না!' জগা পাগলা হাত নাড়ল, 'যাও তাঁর সঙ্গে দেখা করে এসো। বাহ্যি হয়ে গিয়েছে।'

হরিহর হাঁটতে গিয়ে বুঝলো পায়ে কাঁপুনি এসেছে। ঠিকঠাক পা পড়ছে না। দরজা তো খোলাই ছিল। প্রথমেই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন তিনি, মাটিতে মুখ ঠেকিয়ে বললেন, 'মা, দয়া কর। মন পবিত্র রাখতে দাও। মা, মা, মা।'

শব্দবিহীন এই প্রার্থনা শেষ করে ধীরে ধীরে চোখ তুলতেই মায়ের প্রশান্ত মুখ দর্শন হল। এই মুখ সব কিছু ক্ষমা করে দিতে পারে। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকল হরিহর। ধীরে ধীরে মায়ের মুখ থেকে এক ধরনের অপূর্ব আলো বেরিয়ে এসে তাঁকে ঢেকে দিল। হরিহর দেখলেন মা নেই, তাঁর জায়গায় একটি মানুষীর মুখ। টানা চোখ, ফোলা ঠোঁট, লজ্জিত ভঙ্গী। হরিহর চোখ বন্ধ করতেই পেছন থেকে জগা পাগলার গলা ভেসে এল, 'অনেক ধ্যাষ্টামো হয়েছে, এবার কাটো তো এখান থেকে!'

হরিহর চোখ খুললেন। মা তাঁর স্বচেহারায় তাকিয়ে আছেন। এ কি দর্শন হল আজ! মা কেন মানুষীর মুখ নিয়ে সামনে এলেন! হরিহর মন্দিরের বাইরে এসেও স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। মা দেবী—তিনি কেন মানুষ হবেন? অথচ চোখের ওপর স্পষ্ট মানুষের মুখ ভাসছে! মা কি তাঁকে তাঁর দেবীরূপ দেখাতে চান না? দেবীকে দেখার যোগ্যতা কি এখনও হরিহরের হয়নি? তাঁকে

মানুষীর মুখ দেখালেন কেন মা ? মা কি চাইছেন তিনি মানুষীর মধ্যে শান্তি খুঁজে পান ! হাঁটতে হাঁটতে ফাঁকা মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়লেন হরিহর। তার মনে হল ওই মুখ তিনি দেখেছেন এর আগে। কার সঙ্গে যেন খুব মিল আছে। কার সঙ্গে সেটাই মনে আসছিল না। ওই চোখ, নাক, ঠোঁট যে এর আগে তিনি দেখেছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। আকাশপাতাল হাতড়েও হরিহর কোন হদিস করতে পারছিলেন না। পোস্টমাস্টারকে এই দর্শনের কথা বলতে হবে। লোকটা অনেক জানে।

মাঠ ভেঙে হরিপুরে যেতে খুব বেশি সময় লাগে না। এখন অবশ্য হাঁটা যাচ্ছে বলেই পথ কম। বর্ষায় কার সাধ্য এগোয়। হরিহর পোস্টঅফিসে পেঁছালেন বেশ ক্লান্ত হয়ে। পোস্টমাস্টার তার চেয়ারেই ছিলেন। চোখ তুলে বললেন, 'আসুন আসুন, দেখে মনে হচ্ছে ভূতে তাড়া করেছে !'

'ভূত ?' হরিহর নিজের জায়গায় ফিরে এলেন এতক্ষণ, 'সেটা করলে তো মন্দ হত না !'

'বসুন, বসুন। তা ব্যাপারটা কি ? চেহারা এমন উস্কোখুস্কো ?'

'আর চেহারা ! বয়স হচ্ছে, মরার সময় হল !'

'এটাই তো আপনার মুশকিল। ইউরোপ আমেরিকায় আপনার বয়সী মানুষ প্রেম করে। তাদের নামে মামলা হয় অন্যের বউ ভাঙিয়েছে বলে, তা জানেন ?'

'চরিত্রহীন মানুষ সব।'

'চরিত্রহীন ? তাহলে আমাদের ইন্দ্র এক নম্বরের লম্পট !'

'কোন্ ইন্দ্র ?' চোখ ছোট হল হরিহরের। গল্পের গন্ধ পেলেন।

'আবার কোন্ ইন্দ্র ! দেবরাজ ! দেবতারা যাঁকে রাজা বানিয়েছেন, তিনি মুনিদের সুন্দরী বউ দেখলেই ছদ্মবেশ নিয়ে শুতে যেতেন। উর্বশী রম্ভা মেনকাতেও মন ভরত না তাঁর !'

দেবতাদের চরিত্রহীন বলা পছন্দ হল না হরিহরের। তিনি সদ্য মায়ের মন্দির থেকে আসছেন। কিন্তু পোস্টমাস্টারকে তখন বেশ গল্পে পেয়েছে, 'কে নয় বলুন ? শিবঠাকুর নিজের মেয়ে মনসাকে না চিনতে পেরে কামার্ত হয়ে তাড়া করেছিলেন। ব্রহ্মার প্রেম ছিল অনেকগুলো মুখ নিয়ে। নারায়ণ তো একাই হাউসফুল করে দিয়েছেন। তা এঁদের বয়স নিশ্চয়ই আপনার থেকে ঢের বেশি, তাই না ?'

'ওঁরা দেবতা। আমি মানুষ। কার সঙ্গে কার তুলনা !' হরিহর প্রতিবাদ করলেন, 'তাছাড়া এসব গপ্পো দেবতাদের সম্পর্কেই শোনা যায়, দেবীদের সম্পর্কে নয় কিন্তু।'

পোস্টমাস্টার চোখ বন্ধ করে একটু ভাবলেন, 'ভাল পয়েন্ট বলেছেন। সতী-উমা-দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, মনসা—নাঃ, কারো সম্পর্কে তো কোথাও কিছু পড়িনি !'

'মা কালী ?' হরিহর ধরিয়ে দিলেন।

'ওরে ব্বাবা ! তিনি তো সব কিছুর ঊর্ধ্বে। এমন কি নিজের স্বামীর দায়িত্ব সতীনের ওপর ছেড়ে দিয়ে দূরে রইলেন। ঠিক বলেছেন। দেবীরা

দেবতাদের থেকে অনেক অনেস্ট। তাই দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধে দেবতারা হেরে পালাতো আর দেবীরা বারংবার তাঁদের বাঁচাতেন।'

মন প্রফুল্ল হল পোস্টমাস্টারের গলায় দেবীস্তুতি শুনে। হরিহর চোখ বন্ধ করে একটু আগে দেখা মায়ের মুখ মনে করার চেষ্টা করলেন। আশ্চর্য, মায়ের চেনা মুখের বদলে তাঁর দেখানো সেই রক্তমাংসের মানুষীর মুখ ভেসে উঠছে! তিনি কিন্তু-কিন্তু করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা কাউকে দেখতে গিয়ে তাঁর চেহারার বদলে অন্যের চেহারা মনে আসে, তাহলে কি বুঝতে হবে?'

'অনেক কিছু। আপনি সুধীর সরকারের স্বপ্নফলকল্পদ্রুম বইটা পড়েছেন?'

হরিহর মাথা নেড়ে না বললেন। পোস্টমাস্টার এবার আরাম করে নস্যি নিলেন, 'বড় ভাল বই। আপনি যে স্বপ্ন দেখেছেন তা কেন দেখেছেন, কি ফল হতে পারে এসবের, বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে বইটিতে। তিনবার পড়েছি মশাই।'

হরিহর উৎসাহিত হলেন। এ তো নিজের কথা নয়, বই পড়ে জ্ঞান অর্জন। ব্যাখ্যাটা নিশ্চয়ই সঠিক পাওয়া যাবে। তিনবার পড়লে পোস্টমাস্টারের ভুলে যাওয়ার কথা নয়। তিনি বেশ আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তাহলে আমারটার কি ব্যাখ্যা হবে?'

'জেগে দেখেছেন, না ঘুমে? স্বপ্ন দু'রকমের হয়। তার উপ-রকমও আছে। প্রথম রাত্রের স্বপ্ন, মধ্যরাত্রের স্বপ্ন আর ভোররাত্রের স্বপ্ন। লোকে বলে ভোরের স্বপ্ন সত্যি হয়। বাজে কথা। তখন পেটে একরাশ জল, প্রস্রাবের চাপে ঘুম ভেঙে যায়, স্বপ্নের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। আপনি কখন দেখেছেন?'

'এই একটু আগে। জেগে-জেগেই। তবে ঠিক জাগরণে ছিলাম না, মানে সত্যি বলছি, আমার হুঁস ছিল না। কয়েক মুহূর্ত নিজের মধ্যে ছিলাম না।'

'হুম্। একেই বলে ধ্যান। যা নিজেকে অতিক্রম করে অন্য কিছু সন্ধান করায়। স্বপ্ন দেখার চেয়ে এটি আরও জোরালো। কাকে দেখতে গিয়ে কি দেখেছেন?'

হঠাৎ এই বুড়ো বয়সেও লজ্জা পেলেন হরিহর। যে উত্তেজনাটি এতক্ষণ বুক জুড়ে ছিল তা মুখে বলতে সঙ্কোচ এল। তিনি আশেপাশে তাকালেন। তারপর একটু কিন্তু-কিন্তু করলেন, 'ইয়ে, মানে, মায়ের মন্দিরে গিয়েছিলাম। মন খুব উদাস ছিল। আমি মরে গেলে এইসব বিষয়সম্পত্তির কি হবে, মায়ের পুজোর কি ব্যবস্থা থাকবে এই নিয়ে ভাবনা হচ্ছিল। মায়ের মুখ দেখতে দেখতে হঠাৎ হুঁস হারিয়ে গেল। দেখলাম মা নয়, একটি নারী দাঁড়িয়ে আছে সামনে। টানা চোখ, ফোলা ঠোঁট, লজ্জা-লজ্জা করে তাকাচ্ছে। এক মুহূর্ত। এইসময় জগা পাগলা চেঁচিয়ে উঠতে সব মিলিয়ে গেল।'

পোস্টমাস্টার খুব উত্তেজিত হয়ে হরিহরের হাত জড়িয়ে ধরলেন, 'আপনি ঠিক বলছেন?'

হরিহর হতভম্ব, 'আমি মিথ্যে বলব কেন?'

পোস্টমাস্টার এবার হাত ছেড়ে টেবিল বাজালেন, 'ব্যস, আর কোন চিন্তা নেই! স্বয়ং মা আপনাকে আদেশ দিয়েছেন। আর তো ইতস্তত করার কোন

কারণ নেই।'

'কি আদেশ?'

'আরে মশাই, মা আপনাকে বিবাহ করতে বলছেন। তবে যে-সে মেয়ে হলে চলবে না। ওই যে বর্ণনা দিলেন, এমন পাত্রী চাই। তাকে বিয়ে করলেই আপনার সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আর যদি বলেন মায়ের আদেশ নয়, তাহলে বলব আপনার অবচেতন মনে এমন একটি মেয়ের জন্যে কামনা ছিল। এখনও আছে। কোথায় থাকে বলুন, আমিই যাচ্ছি প্রস্তাব নিয়ে। আমি অবশ্য যার কথা বলেছিলাম তাকেও একইরকম দেখতে।'

পোস্টমাস্টার চিন্তিত হতেই হরিহর উঠে দাঁড়ালেন, 'যত্ত সব বাজে কথা! আমি চলি। কদিন বাদে আবার আসব।' দরজার দিকে পা বাড়ালেন হরিহর।

পোস্টমাস্টার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এলেন তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে, 'বাজে কথা নয় হরিহরবাবু। আপনি যদি দীর্ঘজীবন কামনা করেন তাহলে এখনই অল্পবয়সী কোন মেয়েকে বিয়ে করা উচিত। তার যৌবন আপনার জীবনের আয়ু বাড়িয়ে দেবে। আমার মনে পড়ছে এমন মেয়ের কথা। অবিকল আপনার কল্পনা—চলুন একদিন গিয়ে দেখে আসবেন।'

রাস্তায় দাঁড়িয়ে হরিহর বললেন, 'ঠিক আছে, আগে মনস্থির করি। আসি।'

কথাগুলো বললেন বটে, কিন্তু গাঁয়ে ফেরার পথে হরিহরের হৃৎপিণ্ড লাফাতে লাগল। এ কি ঘটনা! এই বয়সে বিয়ে করলে সবাই কি ভাববে? তার ওপর কচি মেয়ে? সে তো দুদিনেই বুড়ো বরের কাছ থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেবে। টানা চোখ ফোলা ঠোঁট। মেঠোপথ দিয়ে হনহনিয়ে হাঁটতে হাঁটতে থমকে দাঁড়ালেন তিনি। স্নান সেরে উঠে দাঁড়ানো ছবিরাণীর মুখ মনে পড়ল। আরে, তিনি তো মায়ের মন্দিরে ছবিরাণীর মুখ দেখেছেন! সমস্ত শরীরে রোমাঞ্চ জাগল। পোস্টমাস্টারের কথা যদি ঠিক হয়, তাহলে এটাই কি মায়ের ইচ্ছা? শিবরামের স্ত্রী সম্পর্কে এই চিন্তাকে কি লোকে কু বলে ভাববে না? নিজেকে শাসন করলেন হরিহর। না, যে কদিন আছেন সম্ভ্রম বজায় রেখেই থাকবেন। মনে যাই হোক, তাঁর আচরণ দেখে কেউ তা বুঝতে পারবে না। আজই তো তিনি শিবরামের মাকে সান্ত্বনা দিয়ে এসেছেন। সেই বুড়ীর চোখে তিনি ছোট হতে পারবেন না। ওই পোস্টমাস্টারটাই হল সবনষ্টের গোড়া। হরিহর স্থির করলেন পারতপক্ষে পোস্টঅফিসে যাবেন না।

সাইকেলে চেপে নগেন আসছিল হরিপুর থেকে। হরিপুরের সনাতনদা আজ কথা রেখেছে। বেশ কিছুদিন থেকেই সে বলে আসছিল, আলিপুরদুয়ার থেকে নাটকের বই আনিয়ে দিতে। যে বাস যায় রোজ—তার কণ্ডাক্টরের সঙ্গে ভাল খাতির আছে সনাতনদার। সনাতনদা বলেছিলেন, 'কেষ্ট বলছে, আলিপুরদুয়ারে নাটকের কোন বই নেই। ওখানকার দোকানে অর্ডার দিয়ে এসেছে, ওরা জলপাইগুড়ি থেকে আনিয়ে দেবে বলেছে।' নিত্য তাগাদা চলছিল। রোজ শ্রীনিবাস তাকে মনে করিয়ে দেয় আর সে তাগাদা দেয়। সাইকেলটা থাকায় এখন তার পক্ষে হরিপুরে

যেতে আসতে কোন অসুবিধে নেই। বর্ষা নামলে অবশ্য এটাকে কাপড়ে মুড়ে তুলে রাখতে হবে তেল মাখিয়ে। আজ সনাতনদা বইখানা দিল। নগদ চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা দিতে হয়েছে। টাকাটা আদায় করতে হবে শ্রীনিবাসের কাছ থেকে। ভাল নাটক—'ছদ্মবেশী ভগবান'। স্ত্রীভূমিকা-বর্জিত নাটক চেয়েছিল শ্রীনিবাস। পাওয়া যায়নি। দুটি নারীচরিত্র আছে। একজন প্রৌঢ়া, অন্যজন যুবতী। মেয়ে-মেয়ে স্বভাবের যে কজন গ্রামে আছে তাদের থেকেই বাছতে হবে।

একটু উত্তেজিত হয়েই সাইকেল চালাচ্ছিল নগেন, এমন সময় হরিহরকে দেখতে পেল। পথের ধারে ঝোপের পাশে দাঁড়িয়ে জলত্যাগ করছেন। এখানে পথটা সামান্য জঙ্গুলে। নগেন ব্রেক কষতেই হরিহর ফিরে তাকালেন। তারপর কর্ম শেষ করে হরিহর হাসি-হাসি মুখে এগিয়ে এলেন, 'হরিপুর থেকে আসছ বুঝি ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। উঠে পড়ুন পেছনে, হাঁটতে হবে না।'

নগেন বেশ মেজাজী গলায় তার সাইকেলের ক্যারিয়ার দেখিয়ে দিল। হরিহর মাথা নাড়লেন, 'না বাবা, বুড়ো বয়সে পড়ে গিয়ে হাড়গোড় ভাঙলে আর দেখতে হবে না'।

'কি যে বলেন ? আপনাকে বুড়ো কে বলবে ?'

শোনামাত্র আবার বুকের ভেতর শিহরণ এল। নগেনের মত যুবক তাঁকে বুড়ো বলে স্বীকার করছে না ! তাহলে ? তিনি মাথা নাড়লেন, 'না না, তা হয় না।'

'আপনি সংকোচ করবেন না খুড়ো, উঠে পড়ুন।'

'না বাবা। অশুচি হয়ে আছি, জলে হাত না ধোওয়া পর্যন্ত তোমার সাইকেল স্পর্শ করতে পারব না। ওটাকে কিনে এনে পুজো দিয়েছিলে, মনে আছে ?'

অনেক কষ্টে হাসি চাপল নগেন। রাস্তাঘাটে জলত্যাগ করে গ্রামের অনেকেই এমন ফাঁপরে পড়ে। হাতে কিছু লাগুক বা না লাগুক। সে বলল, 'এই যে সাইকেলটা চলছে পথেঘাটে, কত ময়লা মাড়াচ্ছে প্রতিদিন, তাতে কোন দোষ হয় না যখন, তখন আপনি ধরে বসলেও কিছু হবে না। আসুন !'

ইচ্ছে হচ্ছিল না, কিন্তু সেটা জানালে নগেন তাঁকে সত্যি সত্যি বুড়ো বলে ভাবতে পারে। হরিহর সাইকেলের পেছনে এগিয়ে এসে বললেন, 'এটি কি ?'

'ওঃ, বই ! আপনি ওটাকে ধরে বসতে পারবেন ?'

তাই বসলেন হরিহর। মিনিটখানেক ভয়-ভয় করছিল, তারপর ঠিক হয়ে গেল। তিনি মন অন্যদিকে নিয়ে যেতে প্রশ্ন করলেন, 'কি বই এটা ?'

'আজ্ঞে নাটকের। 'ছদ্মবেশী ভগবান'। দারুণ জমাটি বই। শ্রীনিবাসের খুব ইচ্ছে এবার গ্রামের লোকদের নিয়েই নাটক করে।' সাইকেল চালাচ্ছিল নগেন।

'উত্তম ইচ্ছা। গাঁয়ের ছেলেরা যে কিছু করতে পারে তা প্রমাণ কর।'

'অনেকে অবশ্য পছন্দ করছে না ব্যাপারটা। নাটক করলে খারাপ হয়ে যাবো আমরা !'

'কারা বলছে ?' সতেজ হলেন হরিহর, 'আমার সঙ্গে দেখা করতে বলো, আমি বুঝিয়ে বলব তাদের। তুমি—তোমরা আরম্ভ করে দাও, খরচের কথা ভেবো না।'

এবার উৎফুল্ল হল নগেন। সনাতনদার কাছে শুনে এসেছে মেয়েদের সাজপোশাক আনাতে হবে জলপাইগুড়ি থেকে ভাড়া করে। ভাল পয়সা খরচ হবে তার জন্যে। হরিহর খুড়ো যদি পাশে থাকে, তাহলে কোন চিন্তা নেই। বুড়োর পয়সায় ছাতা পড়ছে, অথচ খাওয়ার লোক নেই। নগেন বলল, 'খাট স্টেজ বেঁধে করব, বুঝলেন খুড়ো! কিন্তু সমস্যা হবে নারীচরিত্র থাকায়—খরচ কমানো যাবে না।'

'কেন? নারীচরিত্রের জন্যে খরচ কেন?'

'বাঃ, মাথার চুল থেকে আর সবকিছু শহর থেকে আনতে হবে না! ব্যাটাছেলেকে মেয়েছেলে সাজাতে তো অনেক ঝামেলা করতে হবে!'

'অ।' হরিহর চুপ করে গেলেন। হরিপুরেও নাটক হয়। সেখানে ব্যাটা-ছেলেরাই গোঁফ কামিয়ে মেয়ে সাজে। যাত্রাপার্টিতেও তাই। একমাত্র সিনেমা আর কলকাতার নাটকে মেয়েরা অভিনয় করে। হরিহর শুনেছেন জলপাইগুড়ি শহরেও মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে নাটক করে। এই গ্রামে তেমন মেয়ে কোথায়? আর থাকলেও সমস্ত গ্রাম ছি-ছি করবে! আচ্ছা, তা করবে কেন? গ্রামের ভাই দাদা খুড়োদের সঙ্গে আর পাঁচটা ব্যাপারে কথা বলতে পারে, নাটক করলে দোষ হবে কেন? সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে ছবিরাণীর মুখ ভেসে উঠল। মহারাণীর পোশাক পরলে ছবিরাণীকে দারুণ লাগবে। আহা, রূপ একেবারে ঠিকরে পড়বে। আর ছবিরাণী তো একদিনে নাটক করতে পারবে না, তাকে রিহার্সালে আসতে হবে রোজ। সেসময় কোন কাজ না থাকলে তিনি হাজির থাকতে পারবেন।

হরিহর গলাখাঁকারি দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তা ছদ্মবেশী ভগবানে কোন মহারাণী আছে নাকি? রাজারাজড়ার ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে!'

'না, না। ভূমিকালিপিতে দেখলাম মা আর মেয়ের চরিত্র আছে।'

'অ।' হরিহর সামলে নিলেন। ঝপ করে ছবিরাণীর কথা বলা ঠিক হবে না।

'তা আপনি অভয় দিচ্ছেন তো খুড়োমশাই?'

'একশবার। আমি বলছি, আরম্ভ করে দাও। খরচ বাঁচাবার চেষ্টাও করতে হবে!'

'তা তো করবই। নিজের হাতে আমরা স্টেজ বাঁধবো। পাউডার-ফাউডার মাখবো। সাজপোশাক বেশি থাকবে না, শুধু ভগবানের দৃশ্য ছাড়া। আর ওই নারীচরিত্র।'

'হুম্। ওই খরচ যদি কমানো যায়! ভেবে দেখি আমি।'

নগেন বুঝতে পারল না কিভাবে ওই খরচ কমাবেন হরিহর। কিন্তু সে পুলকিত হয়ে জোরে প্যাডেল ঘোরাতে লাগল। একেবারে গ্রামে না ঢোকা পর্যন্ত সে গতি কমাল না। গ্রামের মধ্যে সাইকেল ঢোকামাত্র হরিহর সচকিত হলেন, 'এই, এই, এবার থামাও!'

'এখানেই নামবেন? বাড়িতে পৌঁছে দিচ্ছিলাম—!'

'না না, এখানে কাজ আছে।' সাইকেল থামামাত্র নেমে পড়লেন মাটিতে হরিহর। ক্যারিয়ারের চাপায় বইটা গুঁজে দিয়ে বললেন, 'যাও হে।'

নগেন বেরিয়ে গেলে সোজা হয়ে পা ফেলতে গিয়ে তিনি টের পেলেন, এর মধ্যে সর্বাঙ্গে ব্যথা হয়ে গিয়েছে। কোমর টনটন করছে। পা অসাড়। সাইকেলের ঝাঁকুনিতে এইসব ঘটে গিয়েছে। এইসময় তিনি গলা শুনলেন, 'হরিহর না ?'

মুখ ফিরিয়ে দেখলেন অনন্ত আসছে। বাল্যকালে একসঙ্গে খেলাধুলো করেছেন। মদ খেয়ে শরীর আর সংসারের সর্বনাশ করেছে লোকটা। অনন্ত কাছে এসে বললেন, 'নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না! হরিহর সাইকেলের পেছনে বসেছে! বলি তোমার হল কি? বুড়ো বয়সে এইসব করছ, শরীরটা কার—তোমার না অন্যের ?'

শুনে পিত্তি জ্বলে গেল হরিহরের। অনন্তর চোখ গর্তে ঢোকা, গালের হনুদুটো উঁচিয়ে রয়েছে, মুখ তোবড়ানো, বেশকিছু দাঁত পড়ে গেছে। এই তাঁর বাল্যবন্ধু। একে দেখলে লোকে তাঁকে তো আরও বুড়ো ভাববে! তিনি খিঁচিয়ে উঠলেন, 'অনন্ত, নিজের চরকায় তেল দিতে কোনদিন শিখতে পারলে না বলে তোমার এই দুর্দশা। মদ গিলে গিলে শরীরটার কি হাল করেছ তা আয়নায় দেখেছ কখনও ? আবার আমাকে জ্ঞান দিতে এসেছ ?'

'মদ খাবার জিনিস—খেয়েছি। ফুর্তিতে কাটিয়েছি যৌবন। তুমি কি করেছ ? শুকিয়ে শুকিয়ে বুড়ো হয়ে গেলে! পিটপিটানি স্বভাব তোমার গেল না!'

'চুপ করো।' গর্জে উঠলেন হরিহর, 'খবরদার বুড়ো বুড়ো করবে না! আমি যা পরিশ্রম করি তুমি তা করতে পারবে ? আমার সঙ্গে গায়ের জোরে—। হুঁ, বুড়ো বলছো! বুঝতে পারি না ভেবেছ ? ঈর্ষা—ঈর্ষায় বুক জ্বলে যাচ্ছে তোমাদের!'

'যা বাব্বা! কি এমন বললাম যে এমন তেলেবেগুনে হয়ে গেলে ? তা আমাদের বয়সে বুড়ো হব না তো কি ? তোমার বউই তো মরেছে কুড়ি-একুশ বছর আগে!' বলেই স্বর পাল্টালেন হরিহরের চোখে চোখ পড়ায়, 'ঠিক আছে, তুমি আপত্তি করছ যখন তখন আর বুড়ো বলব না। নিজে বুড়ো হয়েছি বলে সবাইকে বুড়ো ভাবি। চব্বিশ ঘণ্টা ঘরের লোক টিকটিক করে বুড়ো বলে। তুমি ভাগ্যবান, ঘরে বউ নেই, তাই বলার কেউ নেই। এবার শান্তি তো ? দাও—দুটো টাকা দাও, বড় দরকার।'

'আমি টাকা ট্যাঁকে নিয়ে ঘুরে বেড়াই, না ? আর এখন তো হবেই না, তুমি আমার মেজাজ ভীষণ খারাপ করে দিয়েছ!' হরিহর হাঁটতে শুরু করলেন।

পেছন থেকে অনন্ত চেঁচালো, 'সন্ধ্যের পরে যাব। ততক্ষণে নিশ্চয়ই মেজাজ ঠিক হবে!' হরিহর জবাব দিলেন না। তিনি বাড়ির পথ ধরেছেন :

একটা কথা তাঁর মাথায় আটকে গেছে। একুশ বছর বউ নেই ঘরে, তাই তিনি কি ভাগ্যবান ? বউ থাকলে কি সারাক্ষণ টিকটিক করে তাঁকে সত্যিকারের বুড়ো বানিয়ে দিত ? বউরা তাই করে ? তাহলে পোস্টমাস্টারের কথা শুনলে এই বয়সে আরও বিপদে পড়তে হবে। অবশ্য লোকটা বলল, নবযৌবন পাওয়া যাবে। দুটো একদম বিপরীত কথা। কোনটে সত্যি ? এই গ্রামে এমন কেউ নেই যে এ বিষয়ে আলোচনা করা যায়।

হরিহরের মনে পড়ল তাঁর একটি জন্মপত্র আছে। পিতাঠাকুর হরিপুরের এক

পণ্ডিতকে দিয়ে যত্ন করে বানিয়েছেন। সেই পণ্ডিত মারা গিয়েছেন অনেকদিন। তিনি নিজেও সেটাকে বাক্স থেকে বের করেননি বউ মারা যাওয়ার পর। আজ ওটাকে দেখতে হবে। বউ মারা যাওয়ার পর তিনি দেখেছিলেন ওই বয়[illegible]ীর পীড়া লেখা ছিল। হরিহর হনহন করে হেঁটে বাড়ির কাছে পেঁছে গেলেন। এখন সন্ধ্যে হয়ে আসছে। তিনি যে সারাদিন অভুক্ত তাও খেয়াল নেই। এই মরে আসা আলোয় তাঁর সামনে নারায়ণপুর গ্রামটি ছবির মত দাঁড়িয়ে। তাঁর মনে হল এই গ্রাম তাঁর। সবাই তাঁকে মান্য করে। এই গ্রামের মানুষের জন্যে তাঁর অনেকদিন বেঁচে থাকা দরকার।

নাটকটি পড়া হচ্ছিল। পড়ছিল নগেন। শ্রীনিবাসের বাড়ির বাইরের ঘরে বসে। হ্যারিকেনের আলোয় সে বেশ কাঁপাগলায় পড়ে যাচ্ছিল। উচ্চারণ অশুদ্ধ, গলার স্বরও জড়িয়ে যাচ্ছিল। যে আটজন শুনছিল তারা কিন্তু রোমাঞ্চিত হচ্ছিল। তাদের সামনে ছিল শ্রীনিবাস। মাঝে মাঝে সে নগেনের উচ্চারণ ঠিক করে দিচ্ছিল। এতে বিরক্ত হচ্ছিল নগেন। শুধরালেই বলছিল, ঠিক আছে, ফাস্ট টাইম অমন হয়।' গল্পটি ওদের খুব মনে ধরল। মানুষ কত অন্যায় করে। ধর্মের নামে ব্রাহ্মণেরা কত অবিচার করে। নিজেদের মত ধর্ম বলে চালায়। এক অব্রাহ্মণের কন্যার প্রেমে পড়েছিল ব্রাহ্মণসন্তান। সেই বিয়ে দিতে দেবে না তারা। মেয়েটির পরিবার এবং ছেলেটিকে হেনস্থা করতে লাগল সবাই। মেয়েটি শিবের পুজো করত। তিনি ছদ্মবেশে এসে প্রত্যেকের মুখোশ খুলে দিয়ে ওদের বিবাহের ব্যবস্থা করে দিয়ে গেলেন।

শ্রীনিবাস বলল, 'চমৎকার! এই গল্পে সমাজসংস্কারের ব্যাপার আছে।'

নগেন বলল, 'এই নাটক.করলে সবার চোখ খুলে যাবে।'

ধীরেন বলল, 'আমি কিন্তু ওই প্রভাতের চরিত্রে অভিনয় করব।'

সতীশ খেঁকিয়ে উঠল, 'ইস! তুই প্রভাত? তোকে ব্রাহ্মণের ছেলে বলে মনেই হবে না। ব্রাহ্মণেরা অমন কালো হয় না।'

ধীরেন মাথা নাড়ল, 'কালো ব্রাহ্মণ তুই দেখতে চাস? কটা দেখবি?'

সতীশ বলল, 'একদম না। প্রেম-ট্রেমের ডায়ালগ আছে, ওটা আমিই করব।'

জনার্দন খুবই ফর্সা, একটু ক্যাবলা ধরনের, সে বলল, 'আমার ওই চরিত্র দরকার নেই, বাপ পেঁদিয়ে বৃন্দাবন দেখিয়ে দেবে। আমি ছদ্মবেশী ভগবানের চরিত্র করব।'

নগেন আর পারল না, 'আহা রে! আমি কষ্ট করে বই আনলাম আর তোমরা মধু খাবে, না? ওসব চলবে না।'

রোল করা নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। সবাই ওই দুটো চরিত্রেই করতে চায়। শেষ পর্যন্ত ধীরেন বলল, 'ঠিক আছে, ঝগড়া করে লাভ নেই। যে এই নাটক পরিচালনা করবে সে যাকে যা করতে বলবে তাই হবে।'

শ্রীনিবাস চুপচাপ শুনছিল এতক্ষণ। এবার মুখ খুলল, 'এইটে ঠিক কথা। কাল সন্ধ্যেবেলায় সবাই এসো। প্রত্যেককে দিয়ে সংলাপ বলাবো, যারটা ভাল

হবে তাকে সেই চরিত্র দেব।'

সতীশ জিজ্ঞাসা করল, 'তাহলে তুই ডিরেক্টার হবি ?

'আমার মাথায় যখন প্রথম ভাবনা এসেছিল তখন আমিই হব। আজ রাত্রে ভাল করে পড়ে দেখি নাটকটা।'

'তুই নাটকের কি জানিস যে পরিচালনা করবি ?' নগেন জিজ্ঞাসা করল।

'আমাদের গ্রামে কে জানে ?' শ্রীনিবাস পাল্টা প্রশ্ন করল।

'আমি ভেবেছিলাম সনাতনদাকে বলব পরিচালনা করতে।'

শ্রীনিবাস নামটা শুনে থতিয়ে গেল। সনাতনদা ভালমন্দ যাই হোক না কেন, এতদূরে এসে সন্ধ্যের সময় রিহার্সাল দেওয়াবেন কেন ? সতীশ বলল, 'আমাদের গ্রামের ব্যাপার, বাইরের লোক আসবে কেন পরিচালনা করতে ?'

নগেন গম্ভীর গলায় বলল, 'তাতে নাটক ভাল হবে, লোকে প্রশংসা করবে।'

জনার্দন বলে উঠল, 'তাহলে বাইরে থেকে অভিনেতা আনা হোক, নাটক আরও ভাল হবে, সবাই আরও ভাল বলবে।'

নগেন ধমকে উঠল, 'দ্যাখ জগা, যা বুঝিস না তা নিয়ে কথা বলবি না।'

সতীশ মাথা নাড়ল, 'না বুঝেও ও ঠিক বলেছে। আমাদের ব্যাপার, ভালমন্দ যাই হোক আমরাই করব। তাছাড়া প্ল্যান ছিল শ্রীনিবাসের, তাই ওকেই পরিচালনা করতে দেওয়া হোক।'

শ্রীনিবাস চুপচাপ শুনছিল, 'ঠিক আছে। আমরা আরম্ভ করি, তারপর প্রয়োজন হলে সনাতনদাকে মাঝে মাঝে ডেকে এনে দেখাতে পারি। কি নগেন ?'

নগেন বলল, 'তাহলে আমি ছদ্মবেশী ভগবান করব।'

মেনে নিতে অনেকের ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু দেখা গেল, সমস্যা সমাধানের পথে যাচ্ছে বলে কেউ মুখে কিছু বলল না। শুধু জনার্দন বলল, 'আমি কি করব ?'

নগেন বলল, 'তুই ফর্সা আছিস। মেকআপ নিলে খুব মানাবে। তুই মেয়েটার রোল কর। কি বলিস শ্রীনিবাস ?'

শ্রীনিবাস বলল, 'মন্দ হয় না। তবে আগে সংলাপ পড়াতে হবে।'

সবাই মিলে হইহই করে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে লজ্জায় লাল হয়ে গেল জনার্দন। তার বুদ্ধি কম এটা সবাই বলে। সেই সঙ্গে ছেলেদের থেকে মেয়েদের কাছে তার খাতির বেশী। দিনের অনেকটা সময় মেয়েদের সঙ্গে কাটে বলে ভাবভঙ্গীতে মেয়েলি স্বভাব প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। সতীশ তো ওর সঙ্গে সবার সামনেই প্রেম-প্রেম খেলা করে।

জনার্দন মুখ নামিয়ে বলল, 'সবাই আমাকে খ্যাপাবে।'

সতীশ বলল, 'খ্যাপাবে কেন ? আমরা তো প্রত্যেকেই যা নই সেই ভূমিকায় অভিনয় করব। তুইও তাই। এবার দিদি বউদিদের ভাল করে নকল কর।'

'কিন্তু আমার চুল, বুক, এসব কি করে হবে ?'

নগেন বলল, 'কোন চিন্তা নেই। হরিহর খুড়ো বলেছেন পয়সা দেবেন, আমরা বেস্ট জিনিস জলপাইগুড়ি থেকে আনিয়ে দেব।'

ধীরেন এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। এবার ফিচেল হাসি হাসল, 'বেস্ট জিনিস মানে ?'

'একঢাল কালো চুল যা ওর নিতম্ব ঢেকে রাখবে, শঙ্খের মত বুক যা উন্ধত হয়ে দর্শকদের হৃদয় বিদ্ধ করবে।' সতীশ কাব্য করার ভঙ্গী করল।

'যাঃ, অসভ্য !'

লজ্জায় বেঁকে গেল জনার্দন। আর সতীশ তাকে জড়িয়ে ধরল।

খবরটা পরের সকালেই পাঁচকান হয়ে গেল। গ্রামের ছেলেরা এবার নিজেরাই নাটক করবে। একটু বেলায় ঘুম থেকে উঠে শ্রীনিবাস যখন আবার নাটকের বই নিয়ে বসেছে তখন মেয়েলি গলা কানে এল। মায়ের সঙ্গে কেউ কথা বলছে। গতরাত্রে সে এই বইটা একবার পড়েছে। শুতে দেরি হয়েছিল তাই। সকালে মা এই নিয়ে চেঁচিয়েছে খুব। অত রাত পর্যন্ত কেরোসিন জ্বালানো চলবে না। কথাটা কাল রাত্রে মাথায় ছিল না বলে খুব খারাপ লাগছিল। সংসারে সে কিছুই দিতে পারে না। জমিটা বাপ রেখে গিয়েছিল বলেই দুবেলা পেট ভরে। তাও হরিহরকাকা সাহায্য না করলে যে কি হত ! বাড়িতে সে আর তার মা, তাতেই এই অবস্থা। নগেন একসময় রিক্সা চালাবার কথা ভাবত আলিপুরদুয়ারে গিয়ে। এখন মুখে কিছু বলে না। পেটে এমন কিছু বিদ্যে নেই যে কেউ চাইলেই চাকরি দেবে। এইসব ভাবলে তার মন খুব খারাপ হয়ে যায়।

'কোথায় ? তিনি কোথায় ? ও খুড়িমা, আপনার ছেলেকে ডাকুন !'

কণ্ঠস্বরে অস্পষ্ট রইল না কে এসেছে। শ্রীনিবাস সংকুচিত হল। এইসময় ছবি বউদি এখানে কেন ? মা ওকে পছন্দ করে না সে জানে। মায়ের গলা পেল সে, 'ছিল তো এখানেই। গেল কোথায় কে জানে ! তা কি ব্যাপার ?'

'না, আপনাকে বলব না। এটা আপনার ছেলের ব্যাপার।'

'আঃ, তুমি আর জ্বালিও না তো !' মায়ের গলায় বিরক্তি স্পষ্ট।

'জ্বালাবো কি ! আপনাকে আরামে রাখার ব্যবস্থা করছি।'

'কি রকম ?'

'ছেলের বিয়ে দিন। বউ আসুক। আপনি আমার শাশুড়ীর মত পায়ের ওপর পা তুলে বসে থাকুন। তবে ওঁর মত ঝগড়া করবেন না।'

'তোমার মুখ কিন্তু খুব খারাপ।'

'সত্যি কথা বলি খুড়িমা। কি, ছেলের বিয়ে দেবেন ?'

'তা দিতে তো আপত্তি নেই। আমি চলে গেলে ওকে দেখার জন্যে একজনকে দরকার। দিনকালের যা অবস্থা—। মেয়ে সন্ধানে আছে ?'

'আছে। আমার মাসতুতো বোন। কাল এসেছে আমাদের বাড়িতে।'

'দেখতে কেমন ?'

'খুব শান্ত, সাত চড়ে রা কাড়ে না। দেখেই মনে হয় খাটবার জন্যে জন্মেছে। গায়ের রং ফর্সা, মুখচোখ ভাল।'

'স্বাস্থ্য ?'

'এই আমারই মতন।'

'ঠিক আছে, খোকা যখন থাকবে না তখন আমি গিয়ে দেখে আসব।'

'আরে, যে বিয়ে করবে সে আগে দেখুক!'

'সে কি দেখবে? যা দেব তাই নেবে। তুমি এখন যাও বাপু, এসব কথা ওর কানে যাক আমি চাই না।'

'ঠিক আছে। আপনার ছেলে আপনি বুঝবেন কিসে ভাল হয়।'

কান খাড়া করে সংলাপগুলো শুনল শ্রীনিবাস। ছবি বউদি করছেটা কি! আর মায়েরও কি মাথা খারাপ হল! এই তো সংসারের অবস্থা, আর একজন লোক এলে খাবে কি? সে চট করে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই ছবি বউদিকে চলে যেতে দেখল। হাঁটার তালে ছবি বউদির শরীর কিরকম নাচছে! দৃশ্যটা দেখতে দেখতে রোমাঞ্চিত হল শ্রীনিবাস। ছবি বউদির মাসতুতো বোনের স্বাস্থ্য নাকি ছবি বউদিরই মত! তাহলে হাঁটার সময় কি একই ভঙ্গীতে শরীর নাচে?

সে ভেতরের বারান্দায় এল। মা চাল নিয়ে বসেছে। মুখ তুলে দেখে গম্ভীর হয়ে গেল। সে কিন্তু-কিন্তু করে বলল, 'ছবি বউদির সঙ্গে ওসব বলার কি দরকার ছিল?'

'দরকার আছে তাই বলেছি।'

'বিয়ে করলে খাওয়াবো কি?'

'তোর বাপ বিয়ে করে আমায় যা খাইয়েছে তাই খাওয়াবি।'

'আশ্চর্য! আমি বিয়েফিয়ে করতে পারব না।'

কুলো রেখে তাকাল মা, 'আলবৎ পারবি। বাড়ির চাল খসে পড়ছে। বর্ষার আগে ছাউনি দরকার। একটা বলদের পায়ে ঘা হয়েছে, বিক্রি করে আর একটা কিনতে হবে, সংসারে অভাব হাঁ করে, এসব দূর করতে তোকে বিয়ে করতে হবে।'

'মানে?' বুঝতে পারল না শ্রীনিবাস।

'বরপণ পাব, তাই দিয়ে এসব হবে।'

'বরপণ দেবে কেন? আমার কি আছে?'

'সেটা মেয়ের বাপ বুঝবে।'

শ্রীনিবাস সরে এল। কাল রাত্রে নাটকটিতে এইরকম দৃশ্য পড়েছিল সে। পাত্রপক্ষ পণ চেয়েছে, দিতে পারছে না মেয়ের বাবা। বিয়ে ভেঙে যাওয়ার উপক্রম, মেয়ে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল। এইসময় ছদ্মবেশী ভগবান এসে সমস্যার সমাধান করে। বর তার বাবার মুখের ওপর বলে, আমি আপনাকে পণ নিতে দেব না। পড়তে পড়তে সে খুব খুশি হয়েছিল। এখন তার এই কথাটাই মাকে বলতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু ঠিক কি ভাবে বলবে বুঝতে পারছিল না।

রাস্তায় নেমে তার মনে হল ছবি বউদিকে একবার বলে যে কখনই যেন পণ দিতে রাজী না হয়। কিন্তু তারপরেই সে থতিয়ে গেল। ছবি বউদির বাড়িতে তার মাসতুতো বোন এসেছে। গেলে তার সঙ্গে দেখা করতে হবে। ছবি বউদির যা মুখ তাতে রসিকতার বন্যা বয়ে যাবে। বাড়ির বাইরে একা পেলে সে কথাটা বলতে পারে। তবে তার জন্যে কাল ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। অথচ

আজই মা গিয়ে এই নিয়ে কথা বলতে পারে। সে ভেবে পাচ্ছিল না কি করা উচিত। অন্য কাউকে দিয়ে কথাটা বলে পাঠানো উচিত হবে কিনা তাও ঠাওর করতে পারছিল না।

এইসময় সে নগেনকে দেখতে পেল। সাইকেল চালিয়ে আসছে। পাশে এসে বলল, 'কি রে, হরিপুর যাবি ?'

'এখন ? এই সকালে ?'

'কেন ? এখন তোর কোন্ রাজকাজ আছে ?'

অতএব সাইকেলের পেছনে উঠে বসল শ্রীনিবাস। নগেনের হাত এর মধ্যে যথেষ্ট ভাল হয়ে গিয়েছে। পাঁইপাঁই করে গ্রামের মধ্যে দিয়ে সাইকেল চালালো সে। গ্রামের বাইরে এসে সে বলল, 'একটু অবিনাশ কবিরাজের কাছে যেতে হবে।'

'কেন ? কার অসুখ ?'

'অসুখ কেন হবে, তবে অসুখও বলতে পারিস।'

আজকাল নগেন প্রায়ই এমন হেঁয়ালি করে। তার ফলে শ্রীনিবাসের মনের সঙ্গে ওর দূরত্ব একটু একটু করে বাড়ছে। সে কোন জবাব দিল না। সাইকেল উঁচু-নিচু জায়গায় পড়লে পাছায় খুব লাগছে। নগেন বলল, 'আমার বউয়ের এ মাসে হয়নি।'

কি হয়নি বুঝতে পারল না শ্রীনিবাস। কিন্তু আর একটা হেঁয়ালির মধ্যে যেতে চাইল না সে। নগেন বলল, 'বউ চাইছে বাচ্চা হোক, আমি চাই না। তাই অবিনাশ কবিরাজকে বলব ওষুধ দিতে। ধন্বন্তরি মাইরি। এই করে বড়লোক হয়ে গেল।'

শ্রীনিবাস আঁতকে উঠল, 'তুই ওই বুড়ো লোকটার সঙ্গে এসব কথা বলবি ?'

'ডাক্তার আবার বুড়ো খোকা কি ? ডাক্তার ডাক্তার।'

'উনি তো ডাক্তার নন। কবিরাজ।'

'একই হল। তারপর ওষুধ নিয়ে যাব সনাতনদার কাছে। নাটক নিয়ে কথা বলতে হবে। তাই তো তোকে নিয়ে এলাম সঙ্গে। ও হ্যাঁ, শোন, কাল রাত্রে বউ বলছিল যদি আমাদের নাটক এখানে ভাল হয় তাহলে ওদের গাঁয়ে গিয়ে আমরা অভিনয় করতে পারি। চাইলে কিছু টাকাও পাওয়া যেতে পারে। এমনিতেই ওরা পয়সা খরচ করে পালা আনায়।'

'খুব ভাল।' একটু উৎসাহিত হল শ্রীনিবাস।

'ধর বাসু, এই করে অন্য সমস্ত গ্রাম থেকে আমাদের টাকা রোজগার হতে পারে। উঃ, আমি ভাবতেই পারছি না! কি, চুপ করে আছিস কেন ?'

শ্রীনিবাস বলল, 'তুই বড্ড ভাবিস।'

হরিপুরে ঢুকে নগেন সোজা চলে এল অবিনাশ কবিরাজের ডাক্তারখানায়। একটা বড় কাঠের আলমারিতে নানান ধরনের শিশি, ওষুধপত্রের প্রাথমিক উপাদান সাজিয়ে কাঠের চেয়ারে বসে আছেন কবিরাজ মশাই। তাঁর টেবিলের উল্টোদিকে এক বৃদ্ধ। কবিরাজ তাঁর নাড়ি দেখছেন। নগেনের সঙ্গে শ্রীনিবাস ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে শুনল, 'একটু বায়ু কুপিত হয়েছে। কোপন স্বভাবের আহার একদম বর্জন

করবেন। একটি টাকা দিন, আমি ওষুধ দিচ্ছি। কোন চিন্তা নেই।'

'কোপন স্বভাব মানে?' বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন।

'এই পেঁয়াজ রসুন গরমমশলা। লাউ খাবেন, পেট ঠাণ্ডা হবে।'

'বেশ, এখন লাউটাউ খাই কদিন। না সারলে এসে ওষুধ নিয়ে যাব।' বৃদ্ধ উঠলেন।

'টাকাটা?'

'এ কি কথা? ওষুধ নিলাম না, টাকা দেব কেন?' বৃদ্ধ হাসলেন, 'যম আর তোমার হাত থেকে তো নিস্তার নেই। ঠিক পেয়ে যাবে একসময়।'

বৃদ্ধ বেরিয়ে গেলেন।

অবিনাশ কবিরাজের মুখ থমথম করছিল। প্রকাশ্যেই বলতে লাগলেন, 'শালা ছুঁচো, এক পয়সা খসাবে না। চামার। দিনটাই নষ্ট হবে দেখছি। কি চাই?'

নগেন বলল, 'আজ্ঞে ওষুধ।'

'কি হয়েছে তোমার?'

'আজ্ঞে আমার নয়—পরিবারের।'

'বসো। টাকা সঙ্গে আছে তো? ওষুধ বুঝে এক থেকে পাঁচ টাকা দাম।'

নগেন ঘাড় নেড়ে চেয়ার টেনে বসে পড়ল। একটাই চেয়ার। অদূরের বেঞ্চিতে গিয়ে বসল শ্রীনিবাস। অবিনাশ কবিরাজ ক্রমশ স্বাভাবিক হচ্ছিলেন, 'কি হয়েছে?'

'আজ্ঞে বাচ্চা হবে।'

'কবে?'

'না না, সবে ধরা পড়েছে।'

'কি করে ধরা পড়ল?' প্রৌঢ়ের মুখ ছুঁচোলো হল।

'এ মাসে হয়নি।'

'তার মানে বাচ্চা হবে। যত্ত সব। তা হবে হোক। আগের বাচ্চা কত বড়?'

'আজ্ঞে এই প্রথম।'

'তাহলে চিন্তা কি?'

'মানে এখনই চাই না।'

'অ। এটা আগে খেয়াল করোনি কেন?'

নগেন জবাব না দিয়ে আড়চোখে শ্রীনিবাসকে দেখল। অবিনাশ কবিরাজ মাথা নাড়ল, 'ওষুধ দিতে পারি কিন্তু বউকে এখানে আনতে হবে।'

'কেন? তাকে কেন?'

'তুমি সত্যি বলছ তার প্রমাণ কি? ছেলেছোকরা, কোথায় কাকে ফাঁসিয়ে দিয়েছ, ওষুধ দিয়ে বিপদে পড়ি আর কি!'

'মাইরি বলছি, ওকে জিজ্ঞাসা করুন।'

'সাক্ষী দেখিও না। কোন্ গ্রামে থাক?'

'আজ্ঞে নারায়ণপুর।'

'কি নাম বল, হরিহরবাবুকে জিজ্ঞাসা করব। তিনি প্রায়ই আমার কাছে ওষুধ নেন।' কবিরাজ বিড়ি ধরালেন।

নগেনের অবস্থা তখন সঙ্গীন। সে বিমর্ষমুখে বলল, 'পাঁচকান হোক চাই না। গ্রামের সবাই খারাপ বলবে—বুঝতেই পারছেন!'

'পাঁচ টাকা লাগবে।'

'আজ্ঞে তিন টাকা নিয়ে এসেছিলাম।'

অবিনাশ কবিরাজ ভূত দেখার মত তাকিয়ে রইলেন। তারপর ফ্যাসফ্যাসে গলায় বললেন, 'সকাল থেকেই বুঝতে পারছি, চোটের পালা শুরু হয়েছে।' তিনি উঠে আলমারি খুলে দুটো শিশি নিয়ে পেছনে চলে গেলেন।

শ্রীনিবাসের মনে হল, নগেন যথেষ্ট বড় হয়ে গিয়েছে। সে হলে কিছুতেই ওই প্রৌঢ়ের সামনে বসে এসব কথা বলতে পারত না। বিয়ে হলে মেয়েছেলের মত পুরুষরাও পাল্টে যায়। তখন লজ্জাটজ্জাগুলো কমে আসে।

ওষুধ দিয়ে অবিনাশ বললেন, 'অব্যর্থ ওষুধ দিলাম। আজ রাত্রে শোওয়ার আগে একটা পুরিয়া খাইয়ে দেবে। কালকের দিনটা দেখবে, কাজ না হলে পরশু রাত্রে আর একটা। তোমাদের ইচ্ছা পূর্ণ হবে। টাকা দাও।'

টাকাটা টেবিলে রাখতেই ছোঁ মেরে তুলে নিলেন কবিরাজ, 'দিয়ে দিলাম। বউয়ের বদলে যদি কোন কুমারীর সর্বনাশ করে থাকো তাহলে সে রক্ষা পেয়ে যাবে। পাপ করছি অহরহ, একটু পুণ্যি হল। এ কে?'

'আজ্ঞে বন্ধু।'

'কি নাম?'

এবার শ্রীনিবাস নিজের নাম বলল। অবিনাশ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমিও হরিপুরেই থাকো? অ। কি করো?'

'আজ্ঞে চাষের সময় চাষবাস।'

'অন্য সময়?'

'কিছু না।'

'হরিহরবাবু তোমাকে চেনেন?'

'হ্যাঁ। আমাকে খুব ভালবাসেন।'

'বেশ বেশ। কবিরাজী শেখার ইচ্ছে আছে?'

'কবিরাজী?'

'হ্যাঁ, ভেবে দ্যাখ। এতে মানুষের যেমন উপকার হবে, তেমনি—। তবে হ্যাঁ, অনেক খাটতে হবে। মনে রাখতে হবে সব কিছু। পড়তে হবে বিস্তর। তার ওপর চাই চেনার ক্ষমতা। উপসর্গ। আমাকে আট বছর ধরে শিখিয়েছিলেন আমার গুরুদেব। তোমার চোখ দেখে মনে হল যোগ্যপাত্র তুমি। ভেবে দ্যাখো, যাও।'

বাইরে বেরিয়ে এসে নগেন বলল, 'যাঃ শালা, একেই বলে যোগাযোগ!'

॥ ৩ ॥

হরিপুরের জমজমাট জায়গা বলতে ওই বাস স্ট্যান্ড। দোকানপাট যে কটি আছে তা এখানেই। সেগুলোর চেহারায় একটুও ঝকঝকে ভাব নেই। মানুষগুলো বসে থাকে আলস্য নিয়ে। কোন কিছুই যেখানে ঘটে না, ঘটার সুযোগও সচরাচর হয় না, সেখানে সময় কাটতে চায় না কারো। বিকিকিনিও নামমাত্র। একমাত্র পরনিন্দা পরচর্চা ছাড়া আর কিছু করার নেই। শহর থেকে যখন বাস ফেরে তখন খবরের কাগজ আসে। গোনাগুনতি। পয়সা খরচ করে কাগজ কেনার লোক এই তল্লাটে বেশি নেই। চায়ের দোকানদারকে দিয়ে জোর করে একটা কাগজ কেনানো হয়। তাই নিয়ে তখন জমে যায় আড্ডাবাজরা। ভারতবর্ষের কোথায় কি হচ্ছে কেন হচ্ছে তাই আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। বাস থেকে নতুন লোক নামলে তবু জিভের স্বাদ বদলায়। সেটাও একটা খবর বলে মনে হয় এদের কাছে।

বাস স্ট্যান্ডের গায়েই দুটো পার্টির অফিস। কংগ্রেসের অফিসের উল্টোদিকে কম্যুনিস্টদের। কংগ্রেসের অফিস যাকে বলা হয় সেটা আসলে অধীর রায়ের বাড়ি। যে বাস হরিপুরকে বাঁচিয়ে রেখেছে তার মালিক অধীর রায়। বছরের তিনশো পয়ষট্টি দিনই খাঁ খাঁ করে অধীর রায়ের বাইরের ঘরটা। শুধু নির্বাচনের আগে সকাল বিকেল জমজমাট। আজ অবধি হরিপুরে কোন মিটিং বা মিছিল হয়নি। নির্বাচনের আগে রিক্সায় মাইক ঝুলিয়ে এই এলাকার মানুষদের কংগ্রেসকে ভোট দিতে বলা হয়। স্বাধীনতার পর প্রতিটি নির্বাচনেই কংগ্রেস প্রার্থী জিতেছেন ভাল ব্যবধানে। যদিও তিনি কখনও ভুলেও এখানে পা দেননি। এলাকার মানুষ কংগ্রেস বলতে অধীর রায়কেই চেনে। অধীর অবশ্য দাবী করেন তিনি নির্বাচিত এম. এল. এর দারুণ কাছের মানুষ।

কম্যুনিস্ট পার্টির কোন অফিস এর আগে ছিল না। গত নির্বাচনের পর যখন প্রফুল্ল সেনের সরকার চলে গেল এবং অজয় মুখার্জীর সরকার এল, তখন তিন-চারজনে পার্টি অফিস খুলল। বাড়িটা ছিল সূর্য রায়ের বিধবা বউয়ের। তিনি অপুত্রক বলে ভাইয়ের ছেলেকে দত্তক নিয়েছিলেন। তাঁর উদ্যোগেই ওই বাড়ির বাইরের ঘরে অফিস বসল। যদিও দেশে কংগ্রেস সরকার নেই কিন্তু এখানকার এম. এল. এ. কংগ্রেসী। চীন-ভারত যুদ্ধের পর এখানকার মানুষ জানত কম্যুনিস্টরা বিদেশী। সূর্য রায়ের বিধবা বউয়ের ভাইপো পাজামা-পাঞ্জাবি পরে থাকে এবং সেগুলো বেশ ময়লা। দাড়ি কামায় না, দেখলে বিদেশী বলে ভাবার কারণ নেই। ছেলেটার নাম যতীন। সে যাদের সঙ্গে জুটিয়েছে তাদের বয়সও বেশি নয়। হরিপুরের মানুষ জন্মাতে দেখেছে তাদের। পার্টি করা মানে

উচ্ছন্নে যাওয়া—এমন ধারণা থাকায় কেউ কেউ ওই সব ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত হয়েছে। কিন্তু এরা শুধু ঘরে বসে গুলতানি করে যায় আবিষ্কার করে সেই চিন্তা বন্ধ হয়েছে। কম্যুনিস্ট পার্টির অফিস থেকে কোন মিছিল এখন পর্যন্ত বের হয় না। তবে যতীন প্রায়ই বাসে চেপে শহরে যায়।

নগেনের সঙ্গে হাঁটছিল শ্রীনিবাস। হরিপুরে এলেই তার ভাল লাগে। তার ওপর অবিনাশ কবিরাজ আজ যে প্রস্তাব দিয়েছে তাতে অত্যন্ত পুলকিত সে। শিখেটিখে একটা ভাল জায়গা দেখে ডাক্তার হতে পারলে পাঁচজনে সম্মান করবে। তবে ডাক্তারখানা করতে হবে নারাণপুরেই। গ্রামের লোকদের উপকার হবে তাতে, এতদূরে অসুখ হলে আসতে হবে না কাউকে। শ্রীনিবাস প্রায় স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করল। তার বাড়িতেই ডাক্তারখানা। সে টেবিলের পেছনে বসে আছে। আর অজস্র রুগীতে ভরে গিয়েছে সামনেটা। সে নাড়ি টিপে রোগ বুঝে ওষুধ দিচ্ছে। লোকে যেমন তার জয়গান করছে তেমনি তার পকেট ভরে উঠছে। আঃ, কি আনন্দ!

'এই শালা, সামনে রিকশা, সাবধান!'

নগেন চিৎকার করে উঠতেই সম্বিৎ ফিরল শ্রীনিবাসের। রিকশাওয়ালা খ্যাক খ্যাক করে হেসে বলল, 'নতুন রিকশা দেখছে তো, সময় লাগবে অভ্যেস হতে।' বলে চলে গেল।

শ্রীনিবাস একটু সহজ হয়ে বলল, 'হ্যাঁরে নগেন, অবিনাশ কবিরাজ মিথ্যে বলেনি তো?'

'ওরে বাপ! তুই এখনও অবিনাশ কবিরাজের কথায় আছিস?' নগেন মাথা নেড়ে হাসল, 'না, মিথ্যে বলবে কেন? তোকে জামাই করে ডাক্তার বানাবে।'

'যাঃ, তোর সব সময় ইয়ার্কি!'

নগেন কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু দূরে কাউকে দেখে কথা পাল্টালো, 'ওই যে সনাতনদা, কোথায় যাচ্ছে যেন!' সে গলা তুলল, 'সনাতনদা, ও সনাতনদা!'

শ্রীনিবাস দেখল রোগা পাকাটে চেহারার লোকটা পেছন ফিরে তাকাল। তারা যতক্ষণ সেখানে না পৌঁছাল ততক্ষণ নড়ল না। তারপর বিরক্ত হয়ে বলল, 'দিলে পিছু ডেকে যাত্রা নষ্ট করে! বলি প্রয়োজনটা কি?'

নগেন একটু অপ্রস্তুত গলায় বলল, 'না, মানে, একটু কথা বলতাম।'

'কি কথা?' সনাতন স্পষ্টতই বিরক্ত।

'ওই নাটক নিয়ে। কাল সন্ধ্যেবেলায় এই নিয়ে আমরা মিটিং করেছি।'

'মিটিং?' হাত নাড়ল সনাতন, 'নাটক নিয়ে মিটিং হয় নাকি? এ কি কোন আন্দোলন? নাটক হল শিল্প, আর্ট। মিটিং করার বিষয় নয়।' পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে ধরিয়ে সনাতন বলল, 'তিরিশ বছর আগে আমি কলকাতায় গিয়েছিলাম। তখন স্টেজে শিশিরবাবু অহীনবাবু রাজত্ব করছেন। এ বলে আমায় দ্যাখ ও বলে আমায়। কই, তাঁরা তো কখনও নাটক নিয়ে মিটিং করেননি! তোমরা কি তাঁদের ঠাকুর্দা যে মিটিং করছ?'

নগেন ততক্ষণে প্রায় বসে গিয়েছে, কোনমতে বলল, 'আমি ঠিক বোঝাতে

পারিনি, আমরা নাটক করব তাই বসে ঠিক করেছি।'

'ও, তাই বল। কথাগুলো গুছিয়ে বলা শিখতে হয়। ওই তখনই বাগবাজারে গিয়েছিলাম। তেলেভাজার দোকানে—বাগবাজার জানো তো কোথায়? কলকাতায়। তা তেলেভাজার দোকানে সুলালদার সঙ্গে দেখা। খুব খেতে ভালবাসতেন তো! বললেন, "সনা, কথা বলা শেখ, তুই কি ভাবে বলছিস তার ওপর নির্ভর করছে মানেটা। দর্শককে যা বোঝাবি তখন তাই বুঝবে। যখন রাজা সাজবি তখন চাকরের গলায় কথা বললে দর্শক তোকে মানবে কেন?" খাঁটি কথা। কত বড় অভিনেতা তিনি!'

'সুলাল? সুলাল কে সনাতনদা?' শ্রীনিবাস প্রশ্ন না করে পারেনি।

'জহর গঙ্গোপাধ্যায়, গাঙ্গুলি। তোমরা দেখবে কি করে? দেখেছ তো মাঠে টাঙানো পর্দায় বায়োস্কোপ। স্টেজে যদি দেখতে বুঝতে পারতে। তা কি বলতে চাও বল!'

নগেন বিগলিত গলায় বলল, 'আমরা চাই আপনি পরিচালক হন।'

কথাটা কানে যাওয়ামাত্র শ্রীনিবাস রেগে গেল, মোটেই এরকম চাওয়া হয়নি। মাঝে-মধ্যে উপদেশ চাওয়া মানে একেবারে পরিচালক হতে বলা নয়। সনাতন ততক্ষণে বিড়িতে লম্বা লম্বা টান দিয়ে টুসকি মারছে একটা বিড়ির নিচে। তারপর বলল, 'বলছ যখন এত করে তখন আর আপত্তি করব না। এসব অঞ্চলে শিল্প আর্ট বলে তো কিছু নেই, এই করে যদি ওসব চালু হয় তবে মঙ্গল। ঠিক আছে, কিন্তু ক'টা কথাও আছে।'

'বলুন।' নগেন ঘনিষ্ঠ হল।

'বলব। তবে এখানে নয়। আজ আমি দোকান থেকে ছুটি নিয়েছি। হরিপুরের মতীশ রায়ের বাড়িতে নেমন্তন্ন। চেনো মতীশকে?'

'মাতাল মতীশ?' নগেন আলটপকা প্রশ্ন করল।

'আঃ, ওই তো তোমাদের দোষ! তুমি ভাত খাও?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, ভাত তো রোজ খাই। দু'বেলা।'

'দু'বেলা পেটপুরে ভাত খাও কিন্তু কেউ তোমাকে ভাতাল বলে?'

'আজ্ঞে না।'

'তাহলে মাঝে-মধ্যে একবার মদ খেলে মাতাল বলবে কেন?'

'আজ্ঞে মদ খেয়ে বেসামাল হয় বলেই লোকে মাতাল বলে।'

'যাক, চল আমার সঙ্গে, সেখানে বসেই কথা বলব। আরে লজ্জা করার কিছু নেই। মতীশ লোক ভাল, নইলে আমি যাই? চল।' হনহনিয়ে হাঁটা শুরু করল সনাতন, আর তার পিছু নিল ওরা। শ্রীনিবাসের একদম ইচ্ছে ছিল না কিন্তু এখন বেঁকে বসতে খারাপও লাগল। মতীশ রায় জমিজমা নিয়ে থাকে। বউ মরেছে অনেকদিন। ছেলে নেই, মেয়ে ছিল তিনটে, বিয়ে দিয়েছে ঠিক সময়। বয়স পঞ্চান্ন। বাড়িতে দুটো ঝি আছে। দুই বোন। এই নিয়ে পাঁচজনে পাঁচকথা বলে আড়ালে-আবডালে। মতীশ কাউকে বাড়িতে ঘেঁষতে দেয় না। পাঁচজনকে দেখিয়ে মদ কিনে নিয়ে বাড়িতে বসে খায়। সেই মতীশ সনাতনকে

ডেকেছে নেমন্তন্ন খেতে। এটা একটা খবর বটে।

তবে নারাণপুর হলে যা এক মানে হত হরিপুরে তা ধরলে চলে না। দূরত্ব বেশি নয়, নারাণপুরে কেউ মাতলামি করলে ঘরের বাইরে মাতলামি করতে হবে। তাহলে কেউ কিছু বলবে না। ছি ছি করতে করতে একসময় চুপ করে যাবে। আর কাজের জন্যে ঝি? নারাণপুরে পাওয়াই যায় না। হরিহর পেয়েছেন অনেক কপালগুণে।

বাখারির বেড়া ঘেরা জমির মধ্যে মতীশ রায়ের বাড়ি। তার গেটের সামনে দাঁড়িয়ে সনাতন হাঁকল, 'মতীশবাবু, ও মতীশবাবু, আমি সনাতন।'

কয়েকবার হাঁকডাকের পর বারান্দায় এক মহিলাকে দেখা গেল এক হাতে ঘোমটা আঁকড়ে এসে দাঁড়াতে। 'তিনি বাহ্যি করতে গিয়েছেন। আপনাকে ভেতরে আইসতে বললেন। আসুন।'

সনাতন উৎফুল্ল হয়ে ডাকল, 'এসো হে। আমার চেনা জায়গা। গত হপ্তায় একদিন মদ্যপান করে গিয়েছি। আমি ছাড়া মতীশ আর কাউকে বাড়িতে ডেকে মদ খাওয়ায় না।' গেট খুলে ভেতরে ঢুকতেই মহিলা অন্তর্হিত হল। শ্রীনিবাস বুঝল এটি ওই কাজের মেয়ে দুজনের একজন। গলা শুনে মনে হল বয়স ঢের হয়েছে।

বাইরের ঘরের দরজা ঠেলে সনাতনের পেছনে পা বাড়াতে একটা তক্তাপোষ নজরে এল। তক্তাপোষের পাশ ঘেঁষে দেওয়াল। দেওয়ালের খাঁজে সার দেওয়া বোতল। বেশির ভাগই খালি, দুটো ভর্তি। তক্তাপোষের ওপর একটা বিড়ের ওপর কুঁজো বসানো। দেখা গেল গ্লাসে কিছু মদ ঢালাই রয়েছে। মতীশ বোধ হয় খেতে খেতে প্রকৃতির ডাক পেয়েছে।

সনাতন বলল, 'বসো তোমরা। তক্তাপোষে নয়, ওই বেঞ্চিতে। বাঃ, সার্থক লোক, দিনদুপুরেই সেবন শুরু করে দিয়েছে। আসুক ও, ততক্ষণ কথা সেরে নেই। শোন ভাই, পরিচালনা করতে আপত্তি নেই আমার। শিশিরবাবু, অহীনবাবু, সুলালদাদের স্নেহ পেয়েছি। তোমরা তা কল্পনাও করতে পারবে না। কিন্তু কয়েকটা কথা আছে।'

'বলুন।' নগেন সোজা হয়ে বসল।

'হরিপুর থেকে তোমাদের গাঁয়ের যা দূরত্ব তা অনেক। তোমরা মহলা দেবে কখন? রাত্তিরে তো? তা অত রাত্তিরে আমি হরিপুরে ফিরব কি করে?'

নগেন বলল, 'আমি আপনাকে সাইকেলে পেঁৗছে দিয়ে যাব।'

'তোমার সাইকেল কোথায়?'

'একটা জায়গায় জমা দিয়ে এসেছি। ঘুরতে হবে তো, তাই সঙ্গে রাখিনি।'

'তোমার সাইকেলে চেপে অত রাত্রে পথ পাড়ি দেব? আরে শরীরটা তো আমার হে। গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করার খাটুনি খেটে আবার সাইকেলের রডে কেউ চাপে? আমার দ্বারা সম্ভব নয়। থাকার জায়গার ব্যবস্থা করতে হবে।'

নগেন শ্রীনিবাসের দিকে তাকাল। শ্রীনিবাস মুখ নিচু করল। নগেন বলল, 'হ্যাঁরে, হরিকাকাকে বললে ওঁর ওখানে জায়গা পাওয়া যাবে না?'

'জিজ্ঞাসা করতে হবে।' শ্রীনিবাস জবাব দিল।

'বেশ, তাই করো। দ্বিতীয়ত, ওই নাটকে স্ত্রীভূমিকায় নামবে কে?'

নগেন জবাব দিল, 'আমাদের ওখানে দুটো ছেলে আছে—'

'চুপ করো!' তাকে থামিয়ে দিল সনাতন, 'গোঁফ কামিয়ে ধর্মের ষাঁড় মেয়ে সাজবে? অসম্ভব। এসব পঞ্চাশ বছর আগে হত। স্ত্রী-ভূমিকায় স্ত্রীলোককেই অভিনয় করতে হবে। শেখানোর দায়িত্ব আমার। নইলে আমাকে বাদ দাও।'

'কিন্তু তাদের পাব কোথায়?' প্রায় ককিয়ে উঠল নগেন।

'যোগাড় কর। গাঁয়ের মেয়েদের বোঝাও। আরে তোমরা তো গাঁয়েরই ছেলে। সবাইকে জন্মাতে বড় হতে দেখেছে সবাই। একসঙ্গে প্লে করতে আপত্তি হবে কেন?'

এই সময় সেই স্ত্রীলোকটি একথালা ছোলাসেদ্ধ তক্তাপোষের ওপর রেখে চুপচাপ চলে গেল। সনাতন সেদিকে তাকিয়ে বলল, 'যাচ্চলে! ভরদিনে পান করতে হবে! গৃহকর্তার যা ইচ্ছে। তাহলে তোমরা এখন ওঠ। কি ঠিক করলে জানিয়ে দিও।'

অগত্যা উঠে এল নগেন এবং শ্রীনিবাস। মতীশ রায় তখনও বাইরের ঘরে আসেনি। গেট পেরিয়ে শ্রীনিবাস বলল, 'লোকটা ভাল নয়।'

'কি করে বুঝলি?' খেঁকিয়ে উঠল নগেন, 'কত নামকরা লোকের সঙ্গে মিশেছে, কত জানে তার তুই ফট করে বললি খারাপ?'

'ও জেনেশুনে মদ খেতে এসেছে।'

'তাতে কি? আমাকে এর আগের দিন বলেছে শিল্পীদের একটু-আধটু নেশা করতে হয়।'

'তাহলে সনাতনদাকে দিয়ে নাটক করাবি?'

'আঃ, প্রথমবার তো, একটু অভিজ্ঞ লোক করলে ক্ষতি কি? কিন্তু থাকার জায়গার ব্যবস্থা যদিবা হয়, অভিনেত্রী পাই কোথায়? গাঁয়ের কোন মেয়ে রাজী হবে? মেয়ে রাজী হলেও তার বাড়ির লোক মানবে?'

'একদম না।' শ্রীনিবাস মাথা নাড়ল। তার আশা হল এই কারণেই সনাতনদা রাজী হবে না এবং সে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিতে পারবে। এই অসময়ে নগেন বটতলার চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে গেল। শ্রীনিবাস রাজী হল না। এই সময় চা খেলে তার শরীর খারাপ হয়।

নারাণপুর গ্রামে খবরটা কানাকানি হয়ে গেল। হরিপুরের অবিনাশ কবিরাজ শ্রীনিবাসকে তাঁর সমস্ত বিদ্যে দিতে চেয়েছে। কানে যাওয়ামাত্র অল্পবয়সীরা ঈর্ষায় জ্বলতে লাগল। বয়স্করা বলতে লাগলেন, 'ওসব ছেলেছোকরার কম্ম নয়। হোমিওপ্যাথি কবিরাজী হল শাস্ত্র। সেই শাস্ত্র প্রয়োগ করতে হলে চুল পাকাতে হয়।'

সকালবেলায় হরিহর চলে এলেন শ্রীনিবাসের বাড়ি। দুবার ডাকতেই তার মা দরজায় এলো ঘোমটা টানতে টানতে। হরিহর বললেন, 'খুব ভাল খবর। তা আমাদের শ্রীমান কোথায়? ওর সঙ্গে একটু কথা আছে।'

'সেই ভোরে বেরিয়ে গেছে দাঁতন করতে করতে।'

'ভোর তো কবেই চুকে গিয়েছে। গেল কোথায়?'

হরিহর ফেরার উদ্যোগ করতেই শ্রীনিবাসের মা বললেন, 'আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে।'

'নিশ্চয়ই। কি কথা?'

'ভাবছিলাম ছেলের বিয়ে দেব। ঘর একদম খালি লাগে। দুটো পেট যখন কোনমতে ভরছে তখন তিনটেও ভরে যাবে।'

'বিয়ে? চাষটাষ করে বটে কিন্তু সারাবছর একটা যাহোক রোজগার না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে দেওয়া কি ঠিক হবে? এই যে অবিনাশ কবিরাজ যা বলেছে তা হোক আগে, তারপর না হয়—।'

'সেটা হতে হতে তো চুল পেকে যাবে। আমাদের ছবি এসেছিল। ওর কোন বোন নাকি এসেছে। তার সঙ্গে সম্বন্ধ করতে চেয়েছিল। আমি মেয়েকে দেখেছি কিন্তু কথা পাড়িনি। দেখতে তো মন্দ লাগল না। আপনি যদি একটু কথা বলেন। পছন্দ হলে দেওয়া-থোওয়ার ব্যাপারটাও ঠিক করে দেবেন।'

'আমার পছন্দের ওপর কি শ্রীনিবাস বিয়ে করবে?'

'নিশ্চয়ই করবে। আমি তার মা। আমার পা ধরে বলেছে, যা আদেশ করব তাই মাথা পেতে নেবে। এ বিষয়ে কোন চিন্তা নেই।'

'একথা আবার কবে বলল?'

'ওর বাপের শ্রাদ্ধের দিন।'

'ও। ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি। তা এ পক্ষের চাহিদা কি?'

'জোর-জবরদস্তি কিছু না। একটা সাইকেল, ঘড়ি, সোনার বোতাম, রেডিও আর হাজার পাঁচেক নগদ টাকা। মানে ঘরের চাল নতুন করে ছাইতে হবে। গাঁসুদ্ধ লোককে খাওয়ানোর খরচও তো কম নয়।'

হরিহর মাথা নাড়লেন। তারপর 'যাই' বলে রওনা হলেন। তাঁর হৃৎপিণ্ডে কাঁপুনি এসে গেল। ছবির বোন যখন, তখন তার শাশুড়ীর সঙ্গে কথা বলে কোন লাভ নেই। কথা বলতে হবে ছবির সঙ্গে। তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে গেল পুকুরধারের দৃশ্যটি। অনেক কষ্টে আত্মসংবরণ করলেন হরিহর। সংযত হও হে হরিহর। এসব তোমাকে আর মানায় না। দাঁত থাকতে যখন ডাঁটা চিবোওনি, তখন শুধু মাড়ি দিয়ে মাংসের হাড় ভাঙার চেষ্টা করা বোকামি। পাঁচজনে তোমাকে মান্য করে, ভরসা করে, সেটুকুর মান বজায় রেখে পৃথিবী থেকে চলে যেতে পারলেই হল। বুকটা কেমন ফাঁকা হয়ে গেল এবার। হরিহর হাঁটতে লাগলেন।

কিছুদূরে যাওয়ার পর তিনি দেখলেন নগেন উদাস হয়ে একটা আমগাছের দিকে তাকিয়ে আছে। তিনি আমগাছে কোন বিশেষ কিছুর অস্তিত্ব দেখতে পেলেন না। তাঁকে দেখতে পেয়ে নগেন হাসল, 'ভাল আছেন?'

'আমি তো কখনও মন্দ থাকি না। তা দেখছটা কি?'

'অ্যাঁ, না কিছু না।'

'অ। তোমার বন্ধুটি কোথায়? শ্রীনিবাস?'

'জানি না তো। বাড়িতেই আছে বোধ হয়।'

'না, নেই।'

'কি জানি। সনাতনদাকে দিয়ে নাটক পরিচালনা করাব বলেছি বলে ওর মন খারাপ।'

হরিহর প্রশ্ন করে পুরো ব্যাপারটা জেনে নিলেন। তারপর বললেন, 'কি দরকার বাইরে থেকে লোক আনার! ভাল হোক মন্দ হোক গাঁয়ের ছেলেরাই করুক না। তবে নেহাতই যদি আনো তাহলে রাত্রে থাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে, কিন্তু কোন্ মেয়ে রাজী হবে বল?'

'সেটাই হয়েছে সমস্যা। আপনি যদি সবাইকে একবার বলেন তাহলে কেউ কেউ রাজী হয়ে যেতে পারে। আমাদের কথায় কেউ কান দেবে না।'

'দেখি বলে দেখব।' হরিহর হাঁটতে শুরু করলেন।

শিবরামের বাড়ির সামনে পৌঁছে তিনি দেখতে পেলেন প্রচণ্ড চেঁচামেচি ভেসে আসছে বাড়ির ভেতর থেকে। কিছু বোঝার আগেই ছবি বেরিয়ে এল খোলাচুলে। পাশের কাঁঠালগাছের তলায় এসে ওপরের দিকে মুখ তুলে চিৎকার করল, 'নেমে আয়, নেমে আয় বলছি! বার বার বলেছি না, এই গাছে পা দিয়ে উঠবি না!'

'পা না দিয়ে কিভাবে উঠব?' ওপর থেকে হাসি ভেসে এল।

'আবার তর্ক? তুই আজই তোর বাড়িতে ফিরে যা।'

সঙ্গে সঙ্গে ওপর থেকে যে মাটিতে চার হাত পায়ে পড়ল তার পরনে ডোরা শাড়ি, গায়ে লাল ব্লাউজ। মাথার চুল তেল-চপচপে। পড়েই সে হরিহরকে দেখতে পেয়ে বলে উঠল, 'এ্যাই দিদি, দ্যাখ কে এসেছে!'

ঘাড় ঘুরিয়ে শিবরামের বউ ছবি হরিহরকে দেখতে পেয়েই ঘোমটা টানল মাথায়। হরিহর হাসবার চেষ্টা করলেন, 'এ গাছে পা দেওয়া নিষেধ বুঝি?'

ছবি মাথা নাড়ল, 'হুঁ। উনি ছেলে পেটে এলে বিচি পুঁতেছিলেন।'

'অ। তা কেমন আছ সব, ভাল তো?' হরিহর ভেতর থেকে ভেসে আসা চিৎকার শুনলেন, বললেন, 'তুমি মা যাও না, ভেতরে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে নাও। বলো আর কখনও এমন ভুল হবে না, দেখবে শান্ত হয়ে যাবে।'

বলামাত্র মেয়েটি ভেতরের দিকে ছুটল। হরিহর সেদিকে তাকিয়ে বললেন, 'খুব চঞ্চলা মনে হচ্ছে! তা ভাল। এই বয়সে অমন হওয়া মন্দ নয়। তোমার বোন?'

'হ্যাঁ। সম্পর্কের।'

'বিয়ে-থা দেবে ওর বাপ-মা?'

'সেই উদ্দেশ্যেই তো আনা।'

'খুব ভাল। তা শ্রীনিবাসকে পাত্র হিসেবে মনে ধরেছে?'

'ওমা, কার?' বলে চোখ বড় করল ছবি।

'আমি তোমার বোনের কথা বলছি!' এই রসিকতায় মজা পেলেন হরিহর।

'তাই বলুন। সে তো নিশ্চয়ই, আমি নিজে গিয়ে বলেছি।' ছবি জানাল।

'শ্রীনিবাসের মায়েরও পছন্দ হয়েছে তোমার বোনকে। এখন চার হাত এক করে দিলেই হয়। সেই ব্যাপারেই কথা বলতে এসেছি।'

'তাই? তাহলে তো ঘরে বসে কথা বলতে হয়, এখন আপনি ঘটক বলে কথা।'

আর একটু ঘোমটা সামনের দিকে টেনে বাড়ির দিকে এগিয়ে যেতেই শিবরামের মা বেরিয়ে এল বারান্দায়, 'ও আপনি! ভেতর থেকে গলা শুনলাম ব্যাটাছেলের, গলায় কাঁটা বিঁধে আছে তো, সদা সতর্ক থাকতে হয়।'

ছবি ভেতরে যাওয়ার সময় বলে গেল, 'মরণ!'

'শুনলেন, শুনলেন ওই মেয়েছেলের কথা! পাঁচজনে বলে, দুগ্গা মাসী, তোমার ছেলের বউয়ের মত বউ হয় না। আমি শুধু জানি কি জিনিস!'

'আপনি উত্তেজিত হচ্ছেন বউঠান। তা আবার লাউশাক লাগবে নাকি?'

'লাউ? না, চালকুমড়ো ফলেছে শুনলাম আপনার বাগানে?'

'দিয়ে যাব। তা বসতে বলবেন তো? আপনার বউমার সঙ্গে কথা আছে।'

চোখ ছোট হল শিবরামের মায়ের, 'কি কথা?'

'আমি এখন ঘটক। আপনার বউমার বোনের বিয়ের ব্যাপারে এসেছি।'

'অ। সেই মতলবে এখানে নিয়ে এসেছে তা আগেই বুঝেছিলাম। পাত্রটি কে?'

'আমাদের মহাদেবের ছেলে শ্রীনিবাস। বাপ মরার পর বউঠান ওকে বুকে আগলে আছেন, আর কতকাল থাকবেন বলুন!'

হঠাৎ এগিয়ে এলেন শিবরামের মা, 'সব্বোনাশ হয়ে যাবে। একেবারে গেছো মেয়ে। শ্রীনিবাসকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবে। সাবধান করে দিচ্ছি।' গলার স্বর এত ফিসফিসে যে হরিহরই ভাল করে বুঝতে পারছিলেন না।

এই সময় ছবি বেরিয়ে এল, 'কই, আসুন! মা, ওঁকে নিয়ে আসুন।'

'চলুন।' শিবরামের মা ঠোঁট ওল্টালেন।

ঘরে বসামাত্র ছবি জিজ্ঞাসা করল, 'কি রকম দিতে হবে?'

সঙ্গে সঙ্গে শিবরামের মা বলে উঠলেন, 'তা আমাদের শ্রীনিবাস তো ছেলে হিসেবে খারাপ নয়। কেউ দুটো মন্দ কথা বলতে পারবে না ওর সম্পর্কে। তারপর মরা বাপের এক ছেলে—।'

'আঃ!' আপনাকে কে কথা বলতে বলেছে?' ছবি ধমকে উঠল।

হরিহর ছবির মুখ দেখে নিলেন। ঘোমটা খসে পড়েছে, নাক চোখ চিবুক যেন সাক্ষাৎ দেবীর মত। গলাখাঁকারি দিয়ে বললেন, 'আমাকে যা বলতে বলেছেন বউঠান তাই বলছি। একটা সাইকেল, সোনার বোতাম, রেডিও, ঘড়ি আর হাজার পাঁচেক নগদ।'

ছবির চোখ কপালে উঠল, 'আপনি এই প্রস্তাব নিয়ে আসতে পারলেন?'

শিবরামের মা বললেন, 'ওমা, আসতে পারবেন না কেন?'

'আঃ মা, আপনাকে কথা বলতে কে বলেছে? আপনি ভেতরে যান তো, আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলছি। ওঁর সঙ্গে কথা বললে তো চরিত্র নষ্ট হবে না!'

অগত্যা উঠে গেলেন শিবরামের মা। যাওয়ার ভঙ্গীতে অনিচ্ছা ফুটে উঠল।

হরিহর বললেন, 'দ্যাখো, গাঁয়ের পাঁচজন আমাকে ভালবাসে। যা করতে বলে আমি করি। টাকাটা ছাড়া বাকি সব তো সব বিয়েতেই দেওয়াথোওয়া হয়।'

ছবি মাথা নাড়ল, 'আমি পারব না।'

'তুমি কেন? ওর বাপ-মা নেই?'

'বললাম তো, বাড়ির যা অবস্থা তাতে শুধু মেয়েকে দেখে কেউ যদি নেয় তবেই বিয়ে হবে, নইলে নয়। শাঁখা-সিঁদুর ছাড়া কিছুই দিতে পারব না।'

'শ্রীনিবাসের মা মনে হয় রাজী হবেন না।' হরিহর মাথা নাড়লেন।

'কি করব বলুন! আপনি তো মেয়েকে দেখলেন!'

'দেখলাম। প্রকৃত সুন্দরী, তবে দিদির মত নয়।' একটু সাহসী হলেন হরিহর।

সেটা যেন কানেই নিল না ছবি, 'ভেবেছিলাম শ্রীনিবাস আলাদা ধরনের ছেলে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে—পুকুরের ধারে আজও দেখা হল, বুঝতেই পারিনি ভেতরে এত আছে!'

'পুকুরের ধারে বুঝি দেখা হয়?'

'না, মানে, ও বেড়াতে বের হয় তো তখন!'

'ছেলেটা ভাল। মায়ের চাহিদা আছে। বিয়েতে তো লোক খাওয়াতে হবে। তা তুমি বলছ মেয়ের বাড়ির লোকদের ক্ষমতা নেই?'

'বিশ্বাস করুন, সত্যি বলছি। এক দোজবরে চল্লিশ বছরের মুদির সঙ্গে বিয়ে ঠিক হচ্ছিল। জানতে পেরে নিয়ে এসেছিলাম। এখন মনে হচ্ছে—'

দোজবরে কথাটায় খারাপ লাগল হরিহরের। তিনি বললেন, 'ঠিক আছে। আমি দেখি কি করতে পারি। মেয়েটিকে আমার ভারি পছন্দ হয়েছে। তুমিও তো চাও সে শ্রীনিবাসের বউ হোক, তাই তো?'

'হ্যাঁ, চাই।'

'তাহলে আর এ নিয়ে ভেবো না।'

'কিন্তু আমি কি করে ওসব দেবো?'

'বললাম তো, চেষ্টা করতে হবে। বউঠান কতটা কমাবে আগে দেখি।'

'কমালেও যা দিতে হবে তা অনেকখানি।'

হরিহর হাসলেন। কোন কথা না বলে উঠে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'পাঁচজনকে কিছু বলার দরকার নেই। সম্বন্ধ হচ্ছে একথা তোমার শাশুড়ীর মুখে শুনবে সবাই. শুনুক, কিছু দিতে পারবে না তা আর চেঁচিয়ে কাউকে বলার দরকার নেই।'

'কিন্তু—'

'আবার কিন্তু! কাঠবিড়ালির ওপর ভরসা রেখেছিলেন রামচন্দ্র, তাই না!' বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এলেন তিনি। নিচে নামার আগে বললেন, 'তোমার শাশুড়ীকে বলে দিও আমি যাচ্ছি। হ্যাঁ, আর একটা কথা। খোলা পুকুরে কেন যাও, তোমার মত ঘরের বউরা তো আমার ঘেরা পুকুরেই যায়, সেখানে তো বাইরের মানুষজন নেই, নিজের মত ব্যবহার করতে পারবে।' কথাটা বলে হরিহর আর দাঁড়ালেন না। ছবি বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাঁর যাওয়া দেখল। হঠাৎ তার ঠোঁটে হাসি মুচড়ে উঠল। এ গ্রামে আসার পর থেকেই সে শুনছে হরিহরের মত মানুষ হয় না। জোত-জমির মালিক হয়েও নাকি বিপদে-আপদে সবসময় গ্রামের মানুষদের পাশে দাঁড়ায়। ছবির বাপের বাড়ির গ্রামের জোতদাররা কিন্তু হাড়ে হাড়ে শয়তান। তাই

এখানে কথাটা শুনেও বিশ্বাস করতে মন চায়নি। বউ মরেছে অনেকদিন, ছেলেপুলে নেই, বিষয়সম্পত্তি অনেক—অথচ চরিত্রদোষ নেই, এ যেন সোনার পাথরবাটি! কিন্তু বিয়ের পর অনেকদিন হয়ে গেল, হরিহরের নামে কোন কুকথা এখনও তার কানে আসেনি। তবে এক ভোরে ওঁর পুকুরে স্নান করে ভেজা কাপড়ে ওঠার সময় মনে হয়েছিল, কেউ একজন আড়ালে-আবডালে দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে। গায়ে কাঁটা ফুটেছিল। তারপর থেকে ওই তল্লাটে পা বাড়ায়নি। এখন যদিও সে বারোয়ারি পুকুরে নামে এবং লোকে দেখতেই পারে কিন্তু তাতে মনে কোন ভয় আসে না। আজ হরিহর যত ভাল মুখে কথা বলুক, ছবির মনে কিছু একটু টুংটাং বাজছিল। লোকটা তার দিকে চোখ তুলে কথা বলতে পারছিল না কেন?

বিকেলবেলায় হরিহর গাঁয়ের সব বাড়ির কর্তাদের ডেকেছিলেন। চা আর বিড়ির ব্যবস্থা ছিল। কাজকর্ম না থাকলে হরিহরের ডাকে সাড়া না দেওয়ার কোন কারণ থাকে না। সবাই এসে জমিয়ে বসেছিল। সবাই বলতে জনা তিরিশেক। বাকিরা হয় শরীর খারাপ নয় অন্য কোন অজুহাত দেখিয়েছে। হরিহর বললেন, 'দুটো ব্যাপারে একটু কথা বলা দরকার। আমাদের নারাণপুর তো আর পাঁচটা গ্রামের মত নয়। এখানে আমরা একটা পরিবারের মত, সবাই সবাইকে ভালবাসি, বিপদে-আপদে পাশে গিয়ে দাঁড়াই। তাই গ্রামের কোন ভালমন্দ ব্যাপারে সবাইকে না জানালে কি চলে! হ্যাঁ, প্রথম কথাটা হচ্ছে নদীর ধারে মায়ের মন্দির সম্পর্কে। জগা পাগলা আছে। আমার পিতাঠাকুর তাকে দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছেন, এ ব্যাপারে আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু মুশকিল হল, জগাঠাকুর বিয়ে-থা করেনি আর আমারও ছেলেপুলে নেই। আমরা চলে গেলে মায়ের পুজো কে করবে আর মায়ের মন্দিরের খরচই বা কে দেবে?'

খগেন ঘোষ বয়স্ক মানুষ। কথা বলেন চিবিয়ে চিবিয়ে। সেই ভঙ্গীতেই বললেন, 'হঠাৎ তোমার মনে মৃত্যুভাবনা ঢুকল কেন হরিহর?'

হরিহর বললেন, 'কিছুই তো বলা যায় না!'

'তাহলে বলব তোমার বসতবাড়ি জমিজমার যে ব্যবস্থা হবে মন্দিরের তাই হবে। পৃথিবীতে কোন জিনিস কারো জন্যে আটকে থাকে না। নদীর মত ঠিক পথ খুঁজে নেয়। আর জগা পাগলাও সহজে দেহ রাখবে বলে মনে হয় না।'

খগেন ঘোষের এই বক্তব্যের সঙ্গে সবাই একমত হল। সবাই একই সঙ্গে হরিহরকে অনুরোধ করল এ নিয়ে না ভাবতে। হরিহর না থাকলে নারায়ণপুর যে ভেসে যাবে তাতে সন্দেহ নেই। হরিহর হাসলেন, 'তিনি চলে গেলেন, গিয়ে বাঁচলেন। কিন্তু যাওয়ার আগে একটি সন্তানও যদি রেখে যেতেন তাহলে আমাকে আজ এসব কথা ভাবতে হত না।'

হরিহর কার কথা বলছেন তা বুঝতে কারো অসুবিধে হল না। অনন্ত এতক্ষণ চুপচাপ বসেছিল এককোণে। হরিহরের বাল্যকালের বন্ধু। ইদানীং দূরত্ব বেড়েছে মদের কারণে। সে এবার বলে উঠল, 'তা তিনি চলে যাওয়ার পর বলেছিলাম, হরিহর বিয়ে কর, শুনলে এখন পস্তাতে হত না। ভাগ্যবানের শালা বউ মরে।'

খগেন বললেন, 'তখন করা হয়নি বলে এখনও করা যায়•না নাকি ?'

হরিহরের প্রতিবাদ চাপা পড়ে গেল অনন্তর চিৎকারে, 'কি বলছ দাদা ? হরিহর এই বয়সে বিয়ে করবে ? কত বয়স হল আমাদের বল তো ?'

খগেন তাকে ধমকালেন, 'চুপ কর। আমাদের আমাদের বলিস না। মদ খেয়ে খেয়ে মদই শেষ পর্যন্ত তোকে এমন খেয়ে নিয়েছে যে তোর আর কি থাকবে ? বিয়ের জন্যে চাই মন শরীর অর্থ। তা আমাদের হরিহরের এই তিনটেই আছে। কি বল সবাই ? আমি কি ভুল বলছি ?'

দু-একজন সায় দিতেই বেশীর ভাগই চুপ করে রইল। অনন্ত খিলখিল করে হেসে বলল, 'হরি যদি এই বয়সে বিয়ে করতে যায় তাহলে আমি নিতবর হব !'

হরিহর লজ্জিত হচ্ছিলেন। কোনমতে বললেন, 'তোমরা আরম্ভ করলে কি বল তো ? হ্যাঁ, মানলাম শরীর স্বাস্থ্য সব ঠিক আছে, কিন্তু এই বয়সে নাতনীকে বিয়ে করতে যাব নাকি ?'

খগেন বললেন, 'নাতনী কেন ? বছর পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের মেয়ে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।'

হরিহর শিউরে উঠলেন, তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'আমার কথা থাক। আমি বলি কি, মন্দিরের এধারে যে জমি আছে, তার ফসল দিয়ে মায়ের সেবা হোক। তোমাদের মধ্যে থেকে তিনজন দায়িত্ব নাও ওই ফসল বিক্রী করে সেবার ব্যবস্থা করার। কে কে নেবে ?'

খগেন বললেন 'মন্দ বলোনি। আমার তো বয়স হয়ে গিয়েছে—কখন টুপ করে ঝরে পড়ব। আমি বলি কি, যারা অনেকদিন বাঁচবে, এই ছেলেছোকরাদের মধ্যে থেকে দেখেশুনে তিনজনকে ডেকে ভার দাও কাগজে-কলমে লেখাপড়া করে।'

একজন প্রতিবাদ করল, 'দূর ! ওরা মায়ের ওখানে পা বাড়ায় না, ওরা কি ভার নেবে ?'

হরিহর মাথা নাড়লেন, 'না—না। দায়িত্ব দিলে ঠিক সেটা পালন করবে। খুব ভাল প্রস্তাব। দেখি ওদের সঙ্গে কথা বলে। এবার দ্বিতীয় ব্যাপারটা নিয়ে কথা বল। ছেলেরা এবার ঠিক করেছে নাটক করবে। সব গাঁয়ের মানুষ নিয়ে। আমি বলেছি খুব ভাল কথা। কিন্তু মুশকিল হয়েছে মেয়েদের চরিত্র নিয়ে। ওগুলো কারা করবে ?'

খগেন বললললেন, 'কেন ? মেয়েলি ছেলের অভাব নাকি ? গোঁফ কামাক সব।'

'এখন নাকি পৃথিবীর কোথাও ছেলেরা মেয়ে সাজে না। যিনি পরিচালনা করবেন তিনি ওইভাবে নাটক করাতে রাজী নন।' হরিহর জানালেন।

'কে বাবা তিনি ?' অনন্ত জিজ্ঞাসা করল।

'ওই যে, হরিপুরের সনাতন।'

'সনা ? সনা পরিচালনা করবে ?' আঁতকে উঠল অনন্ত, 'ও তো আমার চেয়েও বড় মাতাল। শালা এমন কোন নেশা নেই যা করেনি।'

'গাঁয়ে এসে নেশা না করলেই হল। আমরা তো আছি।'

খগেন বললেন, 'ব্যাপারটা ভাল লাগছে না। শহর থেকে মেয়েছেলে আনা হবে নাকি? না, না, এতে গাঁয়ের ইজ্জত যাবে। কক্ষনো নয়।'

হরিহর বললেন, 'আপনার সঙ্গে আমিও একমত। তবে আমি চাই নাটকটা হোক। খরচ যা হবে আমি দেব। চাঁদাফাঁদা তুলতে হবে না। ভাবছিলাম আমাদের গাঁয়ের মেয়েদের বললে কেমন হয় স্ত্রী-চরিত্রে অভিনয় করতে?'

'কি সর্বনাশ!' চিৎকার করে উঠলেন খগেন, 'তুমি গাঁয়ের মেয়েদের মুখে রঙ মাখিয়ে পাঁচজনের সামনে নাচাতে চাও? নাঃ, তোমার মাথা দেখছি খারাপ হয়েই গেছে!'

অনন্ত বলে উঠল, 'হরি অবশ্য মন্দ বলেনি। রাস্তাঘাটে পুকুরপাড়ে যখন দেখতে আপত্তি নেই, তখন নাটকে দেখলে দোষ কি?'

'চুপ করো। তুমি মাতাল লম্পট, এসব কথায় মজা তো পাবেই। কিন্তু হরিহর, তুমি বললে কি করে? একবারও ভাবলে না? তোমার বউ-মেয়ে থাকলে তারা যদি নাটক করতে চাইত তাহলে তুমি রাজী হতে?'

হরিহর মাথা নিচু করলেন। এরকম প্রশ্ন তাঁকে শুনতে হবে তা আন্দাজে ছিল। গম্ভীর মুখে বললেন, 'ঠিক আছে, তোমাদের যখন আপত্তি আছে তখন ওদের বারণ করে দেব। তারপরেও যদি ওরা কিছু করে তাহলে আমাকে দোষ দিও না।'

'আহা, ওদের বলো এমন নাটক করতে যাতে মেয়ে নেই!'

'তাও বলব।'

এরপর আর কথা এগোল না। দু-তিনজন ছাড়া সবাই উঠে গেলে হরিহর জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হে অনন্ত, আবার কি মতলব?'

'দুটো টাকা। মাইরি বলছি, ফসল উঠলেই ফেরত দেব।'

'অসম্ভব। তোমাকে টাকা দেব না।'

'এমন করে বলো না। আমি তোমার বাল্যবন্ধু। একটু আগে তোমার হয়ে কথা বললাম। দুটো টাকা তোমার কাছে কিস্যু নয়। হাতের ময়লা।'

'সেই ময়লা তোমার পেটে যাক আমি চাই না।' মাথা নাড়লেন হরিহর, 'তুমি পাঁচ সের চাল চাইলে দিতে পারি, নগদ টাকা নয়।'

'তাই দাও। টাকা দিয়ে চাল কিনতাম, চাইতে লজ্জা লাগছিল।'

হরিহর নির্দেশ দিতেই একজন কাজের লোক ধামায় করে চাল নিয়ে এল। হরিহর তাকে বললেন, 'সোজা অনন্তর বাড়িতে পৌঁছে দেবে, যাও।'

অনন্তও উঠল। শেয়ালের মত চলল পিছু পিছু। বাকি দুজন সেটা দেখল। একজনের নাম পীতাম্বর, অন্যজন নীলাম্বর। দুই ভাই। এমনিতে কথা বন্ধ। এখন বসে আছে দুই প্রান্তে। হরিহর জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিছু বলবে?'

পীতাম্বর বলল, 'শ'চারেক টাকা যদি পাই বড় উপকার হয়।'

'কেন?'

'চাল ছাইতে হবে। এই বর্ষায় আর থাকা যাবে না। ফসল উঠলেই শোধ করে দেব। আপনি দয়া না করলে কার কাছে যাব বলুন?' পীতাম্বর হাতজোড় করল।

হরিহর দ্বিতীয়জনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার কি ?'

নীলাম্বর মাথা নাড়ল, 'চাল তো আমারও খসেছে। শুধু চাল নয়, দেওয়ালও। জল পড়া আরম্ভ হলেই সবসুদ্ধ চাপা পড়ব।'

'আমার নাম হরিহর, গৌরী সেন নয় হে! গত তিন বছরে তোমরা দুই ভাই যে টাকা নিয়েছ তা শোধ করোনি। তিন বছরে ফসলও তো উঠেছে অনেক।'

নীলাম্বর বলল, 'অনেক? তাতেই বছরের পেট ভরে না!'

'তাহলে পেট ভরে এমন কাজ করো। যখন মাঠের কাজ থাকে না তখন হরিপুর আলিপুরদুয়ারে গিয়ে জিনিসপত্র বিক্রী কর, কুলিগিরি কর। শুধু জমির ওপর ভরসা করে পায়ের ওপর পা তুলে বসে থাকলে তো এই অবস্থা হবেই। যাও তোমরা, আমি কিছু দিতে পারব না। জ্বালাতন!'

পীতাম্বর বলল, 'আপনি না বললে—আমরা কোথায় যাব?'

'আমরা মানে? তোমাদের তো সাপে-নেউলে সম্পর্ক?'

সঙ্গে সঙ্গে পীতাম্বর ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে খেঁকিয়ে উঠল, 'শুনলি? শুনলি? পাঁচজনে কি ভাবে আমাদের? তুই সাপ, বুঝলি?'

নীলাম্বর মাথা নাড়ল, 'না, তোমাকেই সাপ ভাবে, আমি নেউল।'

'নেউল? নেউল হচ্ছেন উনি! দাদাকে তো সাপ বলবিই!'

'দাদা যদি নিজের সম্মান না রাখতে পারে তাহলে তো এসব শুনতেই হবে।'

হঠাৎ পীতাম্বর চেঁচিয়ে উঠল, 'চলে যাব, তোর মুখদর্শন করব না। যা জমিজমা আছে, বিক্রি করে দূরে কোথাও চলে যাব।'

'জমিজমা তোমার নাকি যে বিক্রি করবে? সব তো বুড়ো কর্তার কাছে বাঁধা রেখে গিয়েছিল বাবা!' নীলাম্বর মুখ ঘুরিয়ে নিল।

হরিহর কি করবেন বুঝতে পারছিলেন না। বুড়ো কর্তা হলেন তাঁর পিতৃদেব। সেই সূত্রে তিনি পেয়েছেন সব কিছু। অর্থাৎ ওদের জমির মালিকানা তাঁরই। আর সেই সময়ে ধার নেওয়া টাকা শোধ করে যদি জমি ছাড়িয়ে নিয়ে যায়—, না, তারও সময় পেরিয়ে গিয়েছে। আইনমত কিছুই করতে পারে না ওরা। অবশ্য তিনি আটকে রাখবেন না জমি। সুদও নেবেন না। কিন্তু এদের দ্বারা এ জীবনে টাকা শোধ করা সম্ভব হবে বলে বিশ্বাস করেন না তিনি। আর আইন? সেটার আশ্রয় কে নেবে? কার ক্ষমতা আছে কোর্টকাছারি করার? সেটা করতে হলে শহরে যেতে হবে, উকিল ধরতে হবে, দিনের পর দিন ছোটাছুটির সঙ্গে পকেট থেকে পয়সা ঢালতে হবে। বাইরের কেউ যদি এসে বলে এ গাঁয়ের এত বিঘে জমি তার এবং সেইটে আদায় করতে কেস করে, তাহলে আদালতে হেরে মরবে এরা। এ দেশে অধিকার আদায় করতে পয়সা খরচ করতে হয়। পকেটে পয়সা নেই অথচ এ গাঁয়ের মানুষদের কথাবার্তা হাবভাব দেখলে মনে হয় নবাব বাদশা।

হরিহর উঠে দাঁড়ালেন, 'এবার তোমরা বিদায় হও। অনেক কথা হয়েছে!'

'তাহলে?' প্রশ্নটা একই সঙ্গে দুটো মুখ থেকে বেরিয়ে এল।

'তোমাদের মুখ দেখে আমি টাকা দিতে পারব না। এ জীবনে যা শোধ করতে পারবে না তা দিতে যাব কেন? তোমাদের দিলে গ্রামের সমস্ত মানুষ এসে

বলবে আমার এটা নষ্ট হচ্ছে টাকা দাও, ওটা করতে হবে টাকা দাও।'

পীতাম্বর বলল, 'কাউকে বলব না। অন্তত আমি বলব না।'

'ও!' নীলাম্বর চেঁচিয়ে উঠল, 'ঠেস দিয়ে কথা হচ্ছে? যেন আমি বলে বেড়াবো?'

শূন্যে হাত চালালেন হরিহর, 'কিস্যু পাবে না, এই বলে দিলাম।'

দুই ভাই তবু বসে থাকল। এই দুই আধখাওয়া শীর্ণ মানুষের চোখের দৃষ্টি সহ্য করতে পারছিলেন না হরিহর। গ্রামের যে কোন ভাল কাজের প্রস্তাবে বাপ-পিতামহের নাম করে এরা বাধা দেবে অথচ আড়াল-আবডাল পেলেই হাত পাতবে। হরিহর সোজা ভেতরে চলে গেলেন। থাক বসে দুই হাভাতে।

সন্ধ্যে হচ্ছে। শাঁখ বাজছে ঘরে ঘরে। হরিহরের তুলসীতলায় কাজের লোক প্রদীপ জ্বালছে। দেখে মন আবার খারাপ হয়ে গেল। শিবরামটা যদি মরে যেত, তাহলে না হয় ওর বউকে বিয়ে করার কথা বলতে পারতেন তিনি। নিজে না পারেন আর কাউকে দিয়ে বলাতেন। শিবরাম সন্ন্যাসী হয়ে যাক অথবা নিরুদ্দেশে থাকুক—তার মৃত্যুসংবাদ তো পাওয়া যায়নি। অন্য কোন মেয়েছেলের কথা তাঁর মনে পড়ছে না। আজ যারা বিবাহের যুগ্যি তারা তাঁর নাতনীর বয়সী। প্রস্তাব করাও যায় না। কিন্তু এটাও ঠিক, এখনই এ বাড়িতে একজনকে আনা দরকার। এতকাল কেন যে এমন করে মনে পড়েনি তাঁর সেটাই বিস্ময়ের। একজন ঘটককে ধরতে হবে। ভাল ঘটক।

এই সময় বাইরের বারান্দা থেকে হাঁক ভেসে এল, 'হরিহরবাবু আছেন নাকি?' গলাটা এই গ্রামের কারো নয়। হরিহর পা চালালেন। কাজের লোক হ্যারিকেন জেবলে দিয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যে। দুই ভাই সেই আলোয় উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে আছে। তাঁকে দেখামাত্র নীলাম্বর বলল, 'বাইরের লোক এসে গেছে। তাড়াতাড়ি ঠিক করে নিই, কবে আসব? কাল সকালে আসি?'

'আমি তো বলে দিয়েছি এক পয়সা দেব না। ফোকটের জিনিস না?' হাত নাড়লেন হরিহর, 'বিদায় হও তো এখন। ভেবে দেখি কি করতে পারি।'

নীলাম্বর লাফ দিয়ে উঠে পড়ল। তার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল যুদ্ধে জিতে গিয়েছে। পীতাম্বর একটু কিন্তু-কিন্তু করছিল, হরিহরের কঠোর মুখের দিকে তাকিয়ে আর দাঁড়াল না।

বাইরে বেরিয়ে এসে হরিহর অবাক। স্বয়ং কবিরাজ মশাই এসেছেন তাঁর কাছে। হাতজোড় করে আপ্যায়ন করলেন, 'আহা কি সৌভাগ্য, আসুন আসুন।'

অবিনাশ একটু লজ্জিত হাসি হাসলেন, 'চলে এলাম। কাজকর্মে ব্যস্ত নন তো? কারা যেন বেরিয়ে গেল দেখলাম!'

'ও তো আসছে যাচ্ছে। দানছত্র খুলে বসেছি যেন। আসুন, ভেতরে এসে বসুন।' অবিনাশ কবিরাজকে নিয়ে বাইরের ঘরে এলেন তিনি। তারপর গলা তুলে হাঁকলেন, 'ওরে কে আছিস, কবিরাজ মশাইয়ের জন্য এক কাপ চা করে আন। সঙ্গে বিস্কুট দিস।'

'আহা, ব্যস্ত কেন?'

'আর ব্যস্ত! তিনবার বললে একবার করে এরা। গৃহিণী গত হবার পর থেকেই তো এই দশা।' হরিহর একটু থামলেন। তিনি আশা করেছিলেন অবিনাশ কবিরাজ এই প্রসঙ্গে কিছু বলবেন। কিন্তু ভদ্রলোক চুপ করে রইলেন দেখে তাঁর বেশ খারাপ লাগল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তা ব্যাপার কি বলুন ?'

অবিনাশ কবিরাজ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার গাঁয়ের শ্রীনিবাস ছেলেটির স্বভাব কেমন ?'

॥ ৪ ॥

॥ প্রাক-কথা ॥

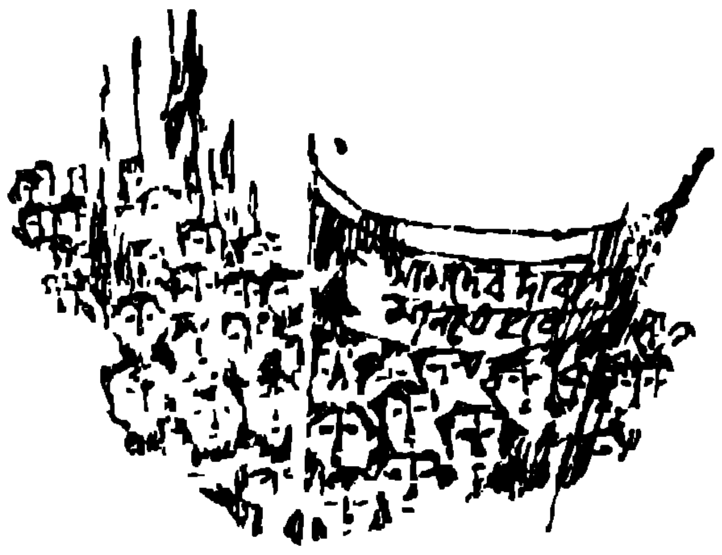

জীবনের গতিপ্রকৃতি এবং তাহার নিয়মাবলী সম্পর্কে বিজ্ঞজনেরা এখনও পর্যন্ত আমাদের কোন স্থির বাক্য শোনাইতে পারেন নাই। আগামীকাল কি ঘটিবে তাহা সম্ভবত বিধাতাপুরুষও অবগত নহেন। আমরা শুধু জানি জন্মমাত্র প্রাণ মৃত্যুর দিকে ছুটিয়া যায়। এবং প্রতিটি প্রাণের মৃত্যুর মুহূর্তে বিধাতাপুরুষকেও একবার মরিতে হয়। কারণ তাঁহার জীবনকাল ওই প্রাণের মধ্যেই নিহিত ছিল।

নারায়ণপুর গ্রামের মানুষজনের মৃত্যুর কথা এই মুহূর্তে আমরা আলোচনা করিতে পারি না। কি ভাবে তাহাদের জীবনযাত্রা অতিবাহিত হইবে তাহাও অজানা। কিন্তু ঈশ্বর যাহা করিতে পারেন না আমরা তাহা পারি। ঈশ্বর কোন মানুষকে তাহার উজানজীবনে লইয়া যাইতে পারেন না, আমরা পারি। আপাতত, তাই, হরিহর শ্রীনিবাস অথবা হরিপুরের অবিনাশ কবিরাজের প্রসঙ্গ ছাড়িয়া আমরা একটু অতীতভ্রমণ করিয়া আসি। জীবনই যখন স্থির নিয়মে চলে না তখন উপন্যাসে না হয় কিছুটা বেনিয়ম হইল।

পাঠক নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার শহর দুটির নাম পাঠ করিয়া অনুমান করিয়াছেন যে নারায়ণপুর অথবা নারাণপুর উত্তরবঙ্গে অবস্থিত। কিন্তু এই গ্রামের অধিবাসীদের ইতিহাস সম্পর্কে কিঞ্চিৎ বিতর্ক আছে। একমাত্র হরিহর কিছুটা তাঁহার পিতাঠাকুরের কাছে জ্ঞাত হইয়াছিলেন। আমরা একটু বিশদে তাহা প্রকাশ করি।

চব্বিশ পরগণার বাদা অঞ্চলে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে যজ্ঞেশ্বর রায় নামক এক ক্ষমতাবান মানুষের বাস ছিল। তখন ক্ষমতার সঙ্গে বিত্তের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক ছিল। এই বিত্ত তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন বাহুবলে। নিয়মিতভাবে লুঠতরাজ ইত্যাদির জন্য তাঁহার বাহিনী ছিল। প্রকাশ, একমাত্র নারীর শরীরে তিনি তাঁহার অত্যাচারী হাত স্পর্শ করেন নাই। যজ্ঞেশ্বরের পুত্রকন্যা ছিল না। তাঁহার দুই বিবাহ। প্রথমা স্ত্রীকে ধর্মমতে বিবাহ করিয়াছিলেন তরুণ বয়সে। দ্বিতীয়াকে সংগ্রহ করিয়াছিলেন রূপে মোহিত হইয়া। তবে তৎক্ষণাৎ পুরোহিত ডাকিয়া মন্ত্রপাঠ করিতে দ্বিধা করেন নাই। দুই স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও যজ্ঞেশ্বর সন্তান লাভে ব্যর্থ হইলেন। এই ব্যর্থতায় তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইত। কিন্তু ক্ষমতার শিখরে যে একবার আসীন তাহাকে কখনই প্রকাশ্যে দুর্বল হইতে দেখা যায় না। মানুষের কাছে তাহাতে দাপট কমিয়া যায়। প্রথমা স্ত্রী কিছুটা নির্জীব প্রকৃতির ছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয়া মিলিত হওয়ামাত্র সন্তানের দাবি জানাইতেন। সেই

সময়ে তাঁহার যৌনক্ষমতাও হ্রাস পাইতেছিল। ফকির বৈদ্য দরবেশ হার মানিতে লাগিল। এবং এই সব কাণ্ড যখন চলিতেছিল তখন দ্বিতীয়া আরও ভয়ংকরী হইয়া উঠিয়াছিলেন।

যজ্ঞেশ্বরের কুকর্মের নিত্য সঙ্গী ছিল চোরা হরি। তখন তাহার বয়স তিরিশ। চোরা হরির অতীত কেহ জানে না। বিদ্যেধরীতে ডাকাতির সময় সে যজ্ঞেশ্বরকে প্রচুর সাহায্য করিয়া যে বিশ্বাস অর্জন করিয়াছিল তাহাতেই ওই গৃহে তাহার স্থান হইয়াছিল।

চোরা হরি নামটি সে নিজমুখে উচ্চারণ করিয়াছিল। এই নামের পশ্চাতে অনেকেই অনেক কাহিনী ব্যক্ত করে। শুধু নামটি যাহার সে মৃদু মৃদু হাসে। যজ্ঞেশ্বর অবশ্য প্রকৃত তথ্য জানেন। প্রকৃত তথ্য বলিতে চোরা হরির মুখনিঃসৃত বাক্যাবলী। বাল্যকালে পিতৃমাতৃহীন চোরা হরি মুর্শিদাবাদে গিয়াছিল ভাগ্যান্বেষণে। কিন্তু ভাগ্যদেবী তাহার প্রতি সদয় হন নাই। সেখানে একদল তস্করের সহিত তাহার আলাপ হয়। তাহারা পথচারীর সামান্য সম্পত্তি অপহরণ করিয়া জীবিকানির্বাহ করিত। বালক বলিয়াই তস্করেরা তাহাকে আশ্রয় দিয়াছিল। লুণ্ঠিত দ্রব্য তাহার নিকট গচ্ছিত রাখিয়া তাহারা কর্ম সম্পাদন করিত। শুধু চোরা হরির ওপর নির্দেশ ছিল কোন কারণেই সে স্থানত্যাগ করিতে পারিবে না।

কিন্তু ভাগ্যান্বেষণে যে যায় সে আর যাহা হউক শিশু নহে। কিছুদিনের মধ্যেই চোরা হরি বাটপাড়ি শিখিল। গচ্ছিত সম্পত্তি হইতে সে কিছু পরিমাণ সরাইতে লাগিল। তস্করেরা আপন কৃতিত্বে এতখানি উল্লসিত যে এই বাটপাড়ি বুঝিবার ক্ষমতাই ছিল না। একদা মধ্যরাত্রে সবাই যখন নিদ্রিত তখন সংগৃহীত সম্পত্তির মোট লইয়া চোরা হরি পথে বাহির হইল। কিছুদূর যাওয়ার পরে বালকের ক্লান্তি বোধ হওয়ায় একটি বৃক্ষের নিচে বিশ্রামের জন্যে বসিল। আর বসামাত্রই নিদ্রাদেবীর আগমন হইল। সূর্যদেব পূর্বগগনে যখন প্রজ্বলিত তখন বালকের নিদ্রাভঙ্গ হয়। সে যখন ত্বরায় চলিতে চেষ্টা করিতেছে তখন একদল অপরিচিত তস্কর তাহাকে দেখিতে পায়। উল্লসিত তস্করেরা যখন সম্পত্তি বাহির করিয়া পরখ করিতেছে তখন চোরা হরির পরিচিত তস্করেরা সেই স্থানে আসিয়া পৌঁছায়। প্রভাত হইবা-মাত্র বালককে না দেখিয়া তাহারা সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। নব্য তস্করদের কাছে সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করার পর তাহারা দাবি করিল ওই সম্পত্তির অধিকার একমাত্র তাহাদেরই, কারণ বালক তাহা বাটপাড়ি করিয়াছে। নব্য তস্করেরা দাবি ছাড়িবার পাত্র নহে। অতএব প্রথমে কলহ, পরে দ্বন্দ্বযুদ্ধের পর্যায়ে দুদলই পৌঁছাইয়া গেল। এই সময় কয়েকজন রাজপুরুষ ওই পথে ফিরিতেছিল। তাহারা তস্করদের শাসন করিল। সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করিয়া তাহারা লুণ্ঠিত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করিল এবং তপ্ত শলাকা দ্বারা বালকের নিতম্বে চোরা হরি শব্দ দুটি খোদিত করিয়া দিল। বালক অনেক অনুনয় করিয়াছিল কিন্তু পাষাণ গলে নাই। পরবর্তীকালে চোরা হরি এই ভাবিয়া সান্ত্বনা পাইত যে নিতম্বে লিখিত থাকায় কেহ দেখিতে পায় না। শয্যায় কোন নারীর সহিত মিলনকালেও এই একই কারণে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা নাই। এই সকল কাহিনী শ্রবণ করিয়া যজ্ঞেশ্বর প্রমাণ

দেখিতে চাহিয়াছিলেন। পূর্ণ যুবক চোরা হরিকে বস্ত্র উন্মোচন করিয়া তাঁহার সামনে দাঁড়াইতে হইয়াছিল। যজ্ঞেশ্বর যুগপৎ সন্তুষ্ট এবং ঈর্ষিত হইয়াছিলেন। চোরা হরি সত্যই বলিয়াছে। খুশি সেই কারণে কিন্তু তাহার স্বাস্থ্য এবং গঠন দর্শনমাত্র হৃদয় ঈর্ষিত হইল। কারণ এত পাইয়াও সব পাওয়া হয় নাই। চোরা হরি সম্পর্কিত কাহিনী এইটুকুই। ধান ভানিতে শিবের গাজন নহে, কারণ ভবিষ্যতে কি ঘটিবে তখন কেহ না বলিতে পারিলেও আজ আমরা সেই অতীতের চিত্র দেখিয়া চোরা হরির কথা স্মরণ করিতেই পারি। পাঠক, আজ যাহা ভবিষ্যৎ, একদা তো তাহাই অতীত হইয়া যায়। তবে যজ্ঞেশ্বরের তুলনায় চোরা হরি এখনও মৃত অতীত নহে।

যজ্ঞেশ্বরের দ্বিতীয়া স্ত্রী কিন্তু আপন বাসনা চরিতার্থ করিতে চোরা হরিকে নির্বাচন করিলেন। এই ব্যাপারে দুই পক্ষই কোন গ্লানিবোধে আক্রান্ত হয় নাই। যজ্ঞেশ্বরের দ্বিতীয়া স্ত্রী ভাবিলেন যে তাঁহার স্বামীর সক্ষমতার অভাবই তাঁহাকে এই কাজে মত্ত হইতে সাহায্য করিয়াছে। ইহাতে কোন অপরাধ নাই। ঈশ্বরের সৃষ্ট শরীরকে নিরানন্দে রাখিবার কোন অধিকার তাঁহার নাই। আর চোরা হরি আনন্দিত এই কারণে যে, যাহার নামের আগে চোর শব্দটি খোদাই হইয়াছে তাহার পক্ষে আর একটি চুরিতে কোন বাড়তি অপরাধ ঘটিবে না।

যজ্ঞেশ্বরের গৃহ যতই বৃহৎ হউক না কেন, নারী ও পুরুষের গোপন সম্পর্ক আড়াল করিবার মত যথেষ্ট নহে। বিশেষত নারী যদি সুন্দরী গৃহিণী হয় এবং পুরুষ সম্পর্কে কিছু ঈর্ষাকাতর মানুষ থাকে তবে তো অসম্ভব। অতএব একদিন এই মতবাদ যজ্ঞেশ্বরের কানে পৌঁছাইল। যজ্ঞেশ্বর কুপিত হইলেন। প্রথমে স্থির করিয়াছিলেন চোরা হরিকে বিদ্যেধরীর কুমিরের মুখে তুলিয়া দিবেন। তারপরেই খেয়ালে আসিল, চোরা হরি একা নহে, সুন্দরী দ্বিতীয়া স্ত্রীকেও একই শাস্তি দিতে হয়। এক চোরা হরি মৃত হইলে দ্বিতীয় একজন যে আসিবে না তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। কিন্তু এই শাস্তিদানের সময় রাত্রি নয়, প্রভাতের জন্যে অপেক্ষা করিবেন! ওই রাত্রি তিনি দীর্ঘকাল পরে প্রথমা স্ত্রীর কক্ষে অতিবাহিত করিলেন। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরকম ছিল। তিনি স্বপ্নে যজ্ঞেশ্বরের নিকট আসিলেন। যজ্ঞেশ্বর স্বপ্ন দেখিলেন। অনেক দূরে, কোন এক পর্বত এবং অরণ্যঘেরা এক অঞ্চলে অখণ্ড শিবলিঙ্গ মাটিতে প্রোথিত হইয়া আছেন। তিনি পৃথিবীর আলোকে আসিতে চান। স্বপ্নে যজ্ঞেশ্বরকে বলিলেন উদ্ধারকার্য সম্পাদন করিতে। ওই স্থানের কিঞ্চিৎ বর্ণনাও তিনি দয়াপরবশত বুঝাইয়া দিলেন। আর যদি যজ্ঞেশ্বর এই কার্যে সফল হয়, তাহা হইলে তাঁর বরে যজ্ঞেশ্বরের দ্বিতীয়া স্ত্রী পুত্রবতী হইবে।

স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। যজ্ঞেশ্বর শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। এ কি স্বপ্ন বিধাতা তাঁহাকে দেখাইলেন? যাহাকে আগামীকাল কুমিরের মুখে পাঠাইবেন বলিয়া স্থির, সে তাঁহার সন্তানের জননী হইবে? কিন্তু দেবাদিদেব যে মাটির নিচে বন্দী আছেন। তাঁহাকে মুক্ত না করিলে যে সর্বনাশের সীমা থাকিবে না তাহাও বুঝিতে বিলম্ব হইল না।

স্বপ্নাদেশ মান্য করিলে ঈশ্বর তাঁহার প্রতি সদয় হইবেন। অকস্মাৎ

যজ্ঞেশ্বরের হৃদয় পুলকিত হইল। তিনি শয্যাপ্রান্তে শায়িতা তাঁহার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। এবং স্থান কাল ভুলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন, 'জয় বাবা ভোলানাথ!'

প্রথমা স্ত্রীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। উত্তেজিত উল্লসিত যজ্ঞেশ্বরের নিকট হইতে স্বপ্নের পূর্ণ বিবরণ সংগ্রহ করিতে কিঞ্চিৎ সময় লাগিল। সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করামাত্র তিনি ঠাকুরঘরে চলিয়া গেলেন। ক্রমশ সেই রাত্রেই বাড়ির লোকেরা স্বপ্নের কথা জানিয়া গেল। পরদিন প্রভাতে গ্রামের কাহারই জানিতে বাকি রহিল না।

প্রভাতে যজ্ঞেশ্বরের স্মরণ হইল চোরা হরির কথা। সন্তানের আশায় যদি দ্বিতীয়া স্ত্রীকে শাস্তিদান সম্ভব না হয় তাহা হইলে চোরা হরিকে কাজে লাগাইতে হয়। তিনি যে সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়াছেন তাহা উহাদের জানান নাই। যজ্ঞেশ্বর বুদ্ধিমান মানুষ। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন, স্বপ্নে যে ভূখণ্ডের কথা তিনি জানিয়াছেন তাহা তাঁহার অভিজ্ঞতার বাহিরে। এই বাদা অঞ্চলের বাহিরে তাঁহার বড় একটা যাওয়া হয় নাই। অথচ চোরা হরি প্রায় সমস্ত বঙ্গদেশ ভ্রমণ করিয়াছে জঠরের তাগিদে। অতএব উহার পক্ষে ওই স্থান খুঁজিয়া পাওয়া অসম্ভব নহে। তিনি চোরা হরিকে তলব করিলেন।

গতরাত্রে চোরা হরির মনে সন্দেহ প্রবেশ করিয়াছিল। প্রায় প্রতিটি রাত্রের তৃতীয় প্রহরে দ্বিতীয়া স্ত্রীর নিজস্ব দাসী তাহাকে অন্তঃপুরে লইয়া যায়। গতরাত্রে সে আসে নাই। নারীর মন আগাম বিপদ বুঝিতে পারে। যাহারা পতঙ্গের ন্যায় ধায় তাহারা বিপদ বুঝিয়াও অগ্রাহ্য করে। দ্বিতীয়া স্ত্রী সেই দলে নহে। তিনি দেখিয়াছিলেন, যজ্ঞেশ্বর প্রথমা স্ত্রীর কক্ষে প্রবেশ করিয়াছেন। ইহা সুলক্ষণ নহে। গৃহে থাকিলে তিনি অবশ্যই তাঁহার কক্ষে আসিবেন ইহাই প্রচলিত নিয়ম। রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর শেষ হইবার আগেই মদ্যপানে যজ্ঞেশ্বরের চৈতন্য লোপ পাইত। তখন দাসীর ঘরে দ্বিতীয়া স্ত্রী লীলায় মত্ত হইতেন। যজ্ঞেশ্বর প্রথমা স্ত্রীর কক্ষে প্রবেশ করায় তিনি সতর্ক হইলেন। দাসীকে নিজ কক্ষে আনিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। আর চোরা হরি চতুর্থ প্রহর পর্যন্ত চাতকের মত অপেক্ষা করিয়া বুঝিল অজান্তে কোন ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। সন্দেহ জাগ্রত হওয়ার সময় প্রভাত আসিয়া গিয়াছে। এই সময়ে যজ্ঞেশ্বরের এলাকা হইতে পলায়নের কথা চিন্তা করিবার মত মূর্খ চোরা হরি নহে। তাই কম্পিত হৃদয়ে সে যজ্ঞেশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

মনের ভাব গোপন না করিতে পারিলে বরলক্ষ্মীর প্রসাদ পাওয়া যায় না। যজ্ঞেশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ওহে চোরা হরি, আমার স্বপ্নের কথা শুনেছ তো?'

চোরা হরি শুনিয়াছিল। সে মাথা নাড়িল, 'এর চেয়ে সুসংবাদ আর কি আছে?'

যজ্ঞেশ্বর অনেক কষ্টে ক্রোধ সংবরণ করিলেন। তিনি বলিলেন, 'তুমি তো শুনেছি অনেক জায়গা ঘুরেছ, এই জায়গাটি কোথায় বল তো?'

চোরা হরি বলিল, 'এ মুখের কথা ও মুখে শুনলে সঠিক শোনা হয় না।

আপনি যদি অনুগ্রহ করে আর একবার বলেন ঠিক কি কি বর্ণনা শুনেছেন তাহলে উপকৃত হই।'

যজ্ঞেশ্বর স্বপ্নাদেশে প্রাপ্ত স্থানের বর্ণনা শোনাইলেন। চোরা হরি বেশ কিছুক্ষণ ভাবিল। তাহার ললাটে কুঞ্চন সৃষ্টি হইল। হঠাৎ সেই মুখে প্রশান্তি নামিয়া আসিতে যজ্ঞেশ্বর ব্যগ্র হইলেন, 'বুঝতে পেরেছ ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। ওই স্থান অনেক দূরের পথ। বিশাল নদী, অনেক প্রান্তর, দীর্ঘ অরণ্য অতিক্রম করে তবে সেখানে পৌঁছতে হবে। আপনি যে বর্ণনা দিলেন সেখানে ওই রকম স্থানের অভাব নেই। অনেক সন্ধান করলে হয়তো দেবাদিদেবকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হতে পারে।'

'হতে পারে না হে, হওয়াতেই হবে।' যজ্ঞেশ্বর বলিলেন, 'তার মানে যাওয়ামাত্র অখণ্ড শিবলিঙ্গকে পাওয়া যাবে না ? সময় লাগবে ?'

চোরা হরি মাথা নাড়িতে লাগিল। তাহা দেখিয়া যজ্ঞেশ্বর বলিলেন, 'বেশ। তুমি এখনই কিছু লোককে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়। যেই অখণ্ড লিঙ্গের সন্ধান পাবে অমনি কাউকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। আমি তখনই রওনা হব।'

চোরা হরি পুলকিত হইল। এই সুযোগে যদি বাদা অঞ্চল হইতে নির্গত হওয়া যায় তাহা হইলে আপন প্রাণ বাঁচিবে। যজ্ঞেশ্বর তাহার সহিত যাওয়ার জন্য সাতজন ষণ্ডামার্কা মানুষ, প্রচুর খাদ্য এবং অস্ত্রশস্ত্র দান করিলেন। যাওয়ার আগে চোরা হরির বাসনা হইতেছিল একবার দ্বিতীয়া স্ত্রীর সাক্ষাৎ পায়। কিন্তু তাহার আশা পূর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না।

সাতজন সঙ্গীকে লইয়া চোরা হরি যাত্রা করিয়াছিল। অনেক পথ, প্রান্তর, নদী, অরণ্য অতিক্রম করিতে সেইসব সঙ্গীদের চারজন প্রাণত্যাগ করিল। পথে তস্কর দস্যুদলের সহিত সংঘর্ষ হইয়াছিল অনেকবার। শেষ পর্যন্ত বঙ্গদেশের উত্তর প্রান্তে পৌঁছাইয়া তাহার মাথায় এক নূতন বুদ্ধির উদয় হইল। এই যাত্রাকালে যজ্ঞেশ্বরের দ্বিতীয়া স্ত্রীর কথা সে ভুলিতে পারিতেছিল না। তাহাকে পাইবার কামনায় মাত্র একজন সঙ্গীকে নিকটে রাখিয়া বাকি দুইজনকে যজ্ঞেশ্বরের নিকট প্রেরণ করিল। লোক দুইটি জানাইবে যে নির্দিষ্ট স্থানটির সন্ধান চোরা হরি পাইয়াছে।

লোক দুইটি ফিরিয়া গেলে চোরা হরির মনে হইল অখণ্ড লিঙ্গটিকে খুঁজিয়া বাহির করিলে তাহার নিজেরও উপকার হইবে। কিন্তু উত্তরবঙ্গের কোন্ প্রান্তে তিনি লুক্কায়িত আছেন সেই সন্ধান পাওয়া প্রায় অসাধ্য। স্বপ্নের বর্ণনা সব সময় মেলে না। চোরা হরির মনে হইল, স্বপ্নাদেশ যে সত্য হইবে এমন ভাবিবার যথেষ্ট কারণ নাই। চোরা হরি একটি গ্রামে আশ্রয় লইয়াছিল। এই গ্রামের মানুষ মূলত কৃষিজীবী। দিনের পর দিন, মাস পর মাস প্রতীক্ষা করিয়াও যখন যজ্ঞেশ্বরের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না তখন সে বুঝিল তাহাকে এখন একাই থাকিতে হইবে। যজ্ঞেশ্বর যে অর্থ তাহাকে যাত্রাসময়ে পথখরচা হিসাবে দিয়াছিল তাহার সামান্যই অবশিষ্ট রহিয়াছে। গ্রামের মানুষেরা তাহাকে বিদেশী ভাবিয়া আশ্রয় দিয়াছে বটে কিন্তু মোটামুটি দূরত্ব বজায় রাখিয়া চলে। ইহাদের ভাষা,

আচার অনুষ্ঠান দক্ষিণবঙ্গের মত নহে। কথা বুঝিতে অসুবিধা হয় না কিন্তু ভাষার জাত যে আলাদা তাহা অত্যন্ত স্পষ্ট। চোরা হরি স্থির করিল এই গরীব মানুষদের ত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু কোথায় যাইবে সে? চারিধারে ভয়ঙ্কর জঙ্গল। বহুদূরে পাহাড়ের রেখা দেখা যায়। একা যাত্রা করা নিতান্তই নিবুদ্ধিতা তাহা সে বুঝিতে পারিতেছিল। গ্রামের মানুষদের কাছে যজ্ঞেশ্বর বর্ণিত স্বপ্নে পাওয়া জায়গার বর্ণনা প্রকাশ করিয়াও কোন স্থির হদিস পায় নাই। চোরা হরি এবার অনেক ভাবিয়া স্থির করিল আবার দক্ষিণবঙ্গেই ফিরিয়া যাইবে। যজ্ঞেশ্বর তো স্বপ্নের দোহাই দিয়া তাহাকে গৃহ হইতে বহুদূরে বিতাড়িত করিতে পারেন। হয়তো দ্বিতীয়া স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক আবিষ্কৃত হইয়া গিয়াছে বলিয়াই তিনি এই কৌশল করিয়াছেন। দক্ষিণবঙ্গে একা যজ্ঞেশ্বরের রাজত্ব নাই, আরও অনেককেই পাওয়া যাইবে যেখানে স্থান পাওয়া অসম্ভব নহে।

চোরা হরি কর্তৃক প্রেরিত দুইজন অনুচর দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়া, রোগ তস্কর এবং বন্যজন্তুর সহিত যুঝিয়া কোনমতে গ্রামে ফিরিয়া আসিল। ততদিনে তাহাদের শরীর এমন দুর্বল যে সহজে চিনিতে পারা সম্ভব নয়। আর ক্রমাগত কষ্ট এবং শ্রমে একজনের স্মৃতি প্রায় ভ্রংশ হইবার উপক্রম। তাহারা যখন যজ্ঞেশ্বরের গৃহে পৌঁছাইল তখন তিনি শয্যাশায়ী। মাসাধিককালের ওপর ভয়ংকর পক্ষাঘাতে তাঁহার অর্ধশরীর অবশ হইয়া গিয়াছে। মূলত এই কারণেই অনুচরদের মুখে সমস্ত বর্ণনা শ্রবণ করা সত্ত্বেও তিনি অক্ষমতা প্রকাশ করিলেন। তাঁহার পক্ষে অতদূরের পথ পাড়ি দেওয়া অসম্ভব। দেবাদিদেবের বাসনা যদি এই হয় তবে তিনি তাহাই মান্য করিবেন। সন্তান না আসুক চোরা হরি তো দূর হইয়াছে, ইহাও কম সান্ত্বনার নহে। শূন্য গোয়াল অধিকতর কাম্য।

কিন্তু সংবাদ অন্তঃপুরে পৌঁছাইল। দ্বিতীয়া স্ত্রী পক্ষাঘাতে আক্রান্ত স্বামীর কাছে আসিয়া নিবেদন করিলেন, 'ভগবান যখন আপনাকে স্বপ্ন দিয়েছেন তখন আমাদের সেখানে যাওয়া উচিত।'

যজ্ঞেশ্বর বিষণ্ণ হাসিলেন, 'কি করে যাব? আমি তো নড়তেই পারি না।'

'পাল্কি আছে। আপনি পাল্কিতে যাবেন!'

'অ্যাঃ! পালকিতে এই অবস্থায় উঠলে পাঁচজনে বলবে কি?'

'কে কি বলছে তা কি কোনদিন গ্রাহ্য করেছেন?'

'করিনি। কিন্তু গিয়ে কি হবে? যে জন্যে যাওয়া তাই তো সম্ভব হবে না। এই শরীর নিয়ে আমি বাবা হব কি করে?'

'ভগবানের ইচ্ছে হলে সব সম্ভব। হয়তো তিনি আপনাকে পরীক্ষা করছেন। আপনিই তো বলেছেন—তিনি উদ্ধার পাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

দ্বিতীয় স্ত্রী চলিয়া যাওয়ার পরে যজ্ঞেশ্বর চিন্তায় পড়িলেন। ঈশ্বর কি সত্যিই তাঁহাকে পরীক্ষা করিতেছেন? তাঁহাকে ভূগর্ভ হইতে উদ্ধার করিলে তিনি তো তাঁহার পক্ষাঘাত দূর করিতেও পারেন। আবার নবউদ্যম আসিল। যজ্ঞেশ্বর স্থির করিলেন তিনি যাইবেন দিন স্থির হইল। পাইক-বরকন্দাজ, প্রচুর

আহার্য সঙ্গে চলিল। স্বর্ণ-রৌপ্য মণিমুক্তাদি যজ্ঞেশ্বর তাঁহার পালকির ভিতর রাখিলেন। দ্বিতীয়া স্ত্রী যাত্রাসঙ্গিনী হউক তাহা তাঁহার বাসনায় ছিল না। কিন্তু প্রথমা স্ত্রী সুপারিশ করিলেন। পথে অসুস্থ যজ্ঞেশ্বরকে সেবাযত্ন করিবার জন্যে একজন স্ত্রীলোক প্রয়োজন। পুরুষমানুষের হাতের সেবা যজ্ঞেশ্বরের সহ্য হইবে না। অতএব দ্বিতীয়া স্ত্রীর জন্য দ্বিতীয় পালকির ব্যবস্থা হইল।

প্রায় দেড়পক্ষকাল পথ অতিক্রম করিয়া এক সন্ধ্যায় যজ্ঞেশ্বরের বাহিনী একটি গ্রামের সম্মুখে বিশ্রামের জন্যে শিবির স্থাপন করিল। তাঁহার লোকজনের সংখ্যাই হয়তো তস্কর ইত্যাদিকে দূরে রাখিতে সাহায্য করিয়াছে। প্রত্যহ দোদুল্যমান পালকিতে শায়িত থাকা সত্ত্বেও যজ্ঞেশ্বরের শরীর ক্রমশ কাহিল হইয়া আসিতেছিল। সন্ধ্যায় ভৃত্যরা যখন আহার্য প্রস্তুতে ব্যস্ত তখন দ্বিতীয়া স্ত্রী স্বামীর পরিচর্যা করিতে আসিতেন। যজ্ঞেশ্বরের মনে হইল এই রমণী ক্রমশ আরও সুন্দরী হইয়া উঠিতেছে। ঈর্ষায় তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইল।

সেই একই সন্ধ্যায় চোরা হরি তাহার একমাত্র সঙ্গীকে লইয়া দক্ষিণবঙ্গে ফিরিবার পথে সেই স্থানে উপস্থিত হইল। দিবসকালেই তাহারা পথ চলিত অতি সন্তর্পণে। কখনই কোন দস্যু তস্করের সম্মুখে পড়িত না। দূর হইতে মানুষের কণ্ঠস্বর শুনিয়া চোরা হরি সতর্ক হইল। অনুচরটিকে লইয়া সে জঙ্গলের আড়ালে আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করিবার পর পাইক বরকন্দাজ এবং ভৃত্যদের দেখিয়া তাহার অনুচরটি বলিয়া উঠিল, ‘আরে, এ তো আমাদের লোকজন! নিশ্চয়ই।’

চোরা হরি তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল, ‘চুপ! কার মনে কি আছে কে বলতে পারে? গ্রামের লোক হলেও আজ রাত্রে আমরা কেউ দেখা দেব না। কাল সূর্য উঠলে সব কিছু দেখেশুনে বের হব, বুঝলে?’

গ্রামভাইদের দর্শন পাওয়ায় অনুচরটি পুলকিত হইয়াছিল। কিন্তু চোরা হরি তাহার প্রভু। এবং এক্ষণে তাহার আদেশই সে শিরোধার্য করিতে পারে। আরও কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে চোরা হরির মেরুদণ্ড কম্পিত হইল। শেষ পর্যন্ত সে মরীয়া হইল। একটি বিশেষ পালকি হইতে তাহার প্রেমিকা বাহির হইয়া এদিক-ওদিক দেখিল। তারপর দ্রুতপায়ে জঙ্গলের নিকট প্রাকৃতিক প্রয়োজনে উপস্থিত হইল। চোরা হরি অপেক্ষা করিল। দ্বিতীয়া স্ত্রী দণ্ডায়মান হওয়া মাত্র সে মৃদুস্বরে কহিল, ‘চিৎকার করো না। আমি হরি।’

কোনমতে নিজেকে সংবরণ করিলেন দ্বিতীয়া স্ত্রী। ভয়ে তাঁহার সর্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। এইবার চোরা হরি আত্মপ্রকাশ করিল, ‘প্রিয়ে, আমাকে কি তুমি চিনতে পারছ না? তোমার অদর্শনে আমি উন্মাদ হয়ে গিয়েছি।’

দ্বিতীয়া স্ত্রী তৎক্ষণাৎ পাগলিনীপ্রায় চোরা হরির বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল। দুই বিরহী হৃদয় পরস্পরের সান্নিধ্যে কিছুক্ষণ জগৎ বিস্মৃত রহিল। অকস্মাৎ পিছনের গাছের পাশে দণ্ডায়মান অনুচরকে দেখিয়া দ্বিতীয়া স্ত্রী চমকিয়া উঠিলেন, ‘ও কে? কে ওখানে?’

সেইদিকে দৃষ্টি দিয়া চোরা হরি বলিল, ‘ও কেউ নয়। আমার অনুচর। কিন্তু তুমি কোথায় যাচ্ছ?’

'তোমার খবর পেয়ে উনি অনেক টালবাহানার পর রওনা হয়েছেন। কিন্তু তুমি ওঁর সামনে যেও না। উনি নির্ঘাৎ তোমার আমার সম্পর্ক জেনে ফেলেছেন। আমি তার কিছু কিছু প্রমাণ পেয়েছি।'

'তাহলে? আমি যে তোমাকে ছাড়া আর থাকতে পারব না প্রিয়ে। এতদিন অদর্শনের পরে আর তোমাকে ছেড়ে দেব কি করে?'

রমণীর মুখে লাস্য স্ফুরিত হইল, 'না বাবা, ছেড়ে দিতে হবে না। আমি যদি ওই পালকি ছেড়ে তোমার কাছে চলে আসি তাহলে আমায় রাখতে পারবে?'

'মাথায় করে রাখব। কিন্তু—'

'কিন্তু কি?'

'আমার যে ধনসম্পদ কিছু নেই।'

'আঃ, সেটা তোমাকে কে ভাবতে বলেছে! শোন, আমি যাই। অনেকক্ষণ এদিকে এসেছি। এরপরে আমাকে খুঁজতে লোক বেরুবে। আমি আজ রাত্রেই একটা ব্যবস্থা করব। তুমি সকালের আগে কোথাও যেও না।' রমণী দ্রুত ফিরিয়া গেল।

কিঞ্চিৎ তৃপ্ত চোরা হরি নিজ স্থানে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল সেই অনুচর নাই। লোকটা কোথায় উধাও হইল? পথশ্রমে তাহারও তো ক্লান্ত হইবার কথা। তাহার মনে কুচিন্তা আসিল। দ্রুত একটি উঁচু গাছের উপরে উঠিয়া চারপাশে দৃষ্টিপাত করিল। অনুচরটি কোথাও নাই।

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে একটি ছায়ামূর্তি জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া চুপিচুপি যজ্ঞেশ্বরের পালকির দিকে অগ্রসর হইল। এখন প্রহরীরা আধা ঘুমন্ত। অনেকগুলি অগ্নিকুণ্ড ইতস্তত জ্বলিতেছিল। তাহারা এখন প্রায় নিভন্ত। পাহারাদারের নজর এড়াইতে পারিল না বেচারা। শেষ পর্যন্ত তাহারা তাকে ধরিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে দলের ভিতর সোরগোল পড়িয়া গেল। যজ্ঞেশ্বর জাগ্রত হইয়া চিৎকার করিতে লাগিলেন। দূরে গাছের ডালে বসিয়া চোরা হরি এসবের কোন অর্থ বুঝিতে পারিতেছিল না। প্রহরীরা আগন্তুককে চিনিতে সক্ষম হয় নাই। জঙ্গলে অনাহারে পরিক্রমা করিয়া সে অত্যন্ত শীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এ ভিন্ন সে যজ্ঞেশ্বরের দলে অতি সম্প্রতি যোগ দিয়াছিল।

লোকটিকে যজ্ঞেশ্বরের নিকট লইয়া আনিলে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুই কে? এত রাত্রে কি চুরি করতে এসেছিস?'

লোকটি দুইটি হাত যুক্ত করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, 'আমি চোর নই। আমি আপনার সেবক। আপনি আমাকে শিবলিঙ্গ খুঁজতে হরিবাবুর সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন। আপনি আমার অপরাধ নেবেন না।'

যজ্ঞেশ্বর অবাক। যে দুইজন পথ চিনাইয়া গ্রামে ফিরিয়া গিয়াছিল তাহাদের একজন এবার সঙ্গে আসিতে সক্ষম হইয়াছে। হুকুম পাওয়ামাত্র সে উপস্থিত হইয়া লোকটিকে সনাক্ত করিল। যজ্ঞেশ্বর এবার চোরা হরির অবস্থান জানিতে চাহিলেন।

লোকটি পালকির দরজায় বসিয়া পড়িল, 'আমি আপনাকে সব বলব। কিন্তু আর কেউ সামনে থাকলে বলতে পারব না।'

যজ্ঞেশ্বরের নির্দেশে সবাই দূরে সরিয়া গেলে লোকটি সন্ধ্যায় দেখা দৃশ্যাবলী বিশদে বর্ণনা করিল। শুনিতে শুনিতে যজ্ঞেশ্বরের উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইল। তিনি চিৎকার করিতে গেলেন, 'শয়তানী—!' কিন্তু মধ্যপথেই তাঁহার বাকরুদ্ধ হইল। পালকির দেওয়াল সুস্থ ডান হাতে আঁকড়াইয়া ধরিতে গেলেন। তাঁহার চোখ বিস্ফারিত হইল। এবং নিঃশ্বাসে বাধা আসিল। এই দৃশ্য দেখিয়া লোকটি প্রচণ্ড ভীত হইল। সে কি করিবে বুঝিতে পারিতেছিল না। সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত যজ্ঞেশ্বরের নিষ্প্রাণ শরীর স্থির হইতেই তাহার মনে হইল দলের সবাই ভাবিবে সে-ই হত্যা করিয়াছে। অতএব দ্রুত স্থানত্যাগ করিবার জন্য সে ছুটিতে আরম্ভ করিল। যাহারা দূরে দাঁড়াইয়া ছিল, পালকির ভিতরে কি ঘটিয়াছে তাহাদের অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু ওই লোকটিকে পালাইতে দেখিয়া আবার সোরগোল উঠিল। কেউ কেউ চেষ্টা করিল, কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে প্রাণভয়ে আতঙ্কিত ব্যক্তির সঙ্গে দৌড়ানো অসম্ভব। এবং তখনই মৃত যজ্ঞেশ্বর আবিষ্কৃত হইলেন। সংবাদ পাওয়া মাত্র দ্বিতীয়া স্ত্রী নিজ পালকি হইতে ছুটিয়া আসিল। মুহূর্তেই তাহার বিলাপে নির্জন চরাচর বিদীর্ণ হইল। আঘাতের চিহ্ন নাই, রক্তপাত হয় নাই কিন্তু মুখাবয়ব বিকৃত। দ্বিতীয়া স্ত্রী পালকির ভিতর স্বামীর সহিত আশ্রয় লইলেন।

গাছের ডালে বসিয়া এসবের কোন অর্থই চোরা হরির নিকট স্পষ্ট হইতেছিল না। তাহার কৌতূহল বৃদ্ধি পাইতেছিল কিন্তু নিচে নামিতে সাহস হইতেছিল না। ক্রমশঃ কথাবার্তার যে অংশ শ্রবণে আসিল তাহাতে বুঝিল কেউ একজন নিহত হইয়াছে। একসময় সব শব্দ স্থির হইল। তবু তাহার সাহস হইতেছিল না আত্মপ্রকাশ করার। ক্রমশ অন্ধকার তরল হইল। চোরা হরি গাছ হইতে নামিয়া পিছু হটিল। অনেকখানি পথ পশ্চাতে যাওয়ার পর সূর্যদেব আত্মপ্রকাশ করিলে সে নিরীহ ভঙ্গী করিয়া যাত্রা শুরু করিল। এই সময় দুইজন মানুষ তাহাকে দেখিতে পাইয়া চিৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া আসিল। ইহারা যজ্ঞেশ্বরের যাত্রীসঙ্গী। প্রভাতে জঙ্গলে কাঠ সংগ্রহ করিতে আসিয়াছে। চোরা হরি জানিল গতরাত্রে যজ্ঞেশ্বর প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তিনি তাহার সন্ধানেই আসিতেছিলেন।

চোরা হরিকে পাইয়া যেন সমস্ত দলটি বাঁচিয়া গেল। মনিবের আকস্মিক মৃত্যুতে তাহারা দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছিল। সব শুনিয়া চোরা হরি বলিল, 'ওই লোকটিকে যেন দেখামাত্র মেরে ফেলা হয়। সে আমাকেও হত্যা করার চেষ্টা করে পালিয়ে এসেছে। ওর মস্তিষ্ক বিকৃত।'

যজ্ঞেশ্বরের শবদাহ দ্বিপ্রহরেই হইয়া গেল। শোকগ্রস্তা দ্বিতীয়া স্ত্রীকে সর্বসমক্ষে চোরা হরি প্রশ্ন করিল, 'রায়মশাই নেই, এখন আপনি আমাদের নেত্রী, বলুন কি আদেশ? আমরা ফিরে যাব কি?'

দ্বিতীয়া স্ত্রী বলিলেন, 'তাঁর শেষ ইচ্ছে ছিল মাটির তলা থেকে শিবলিঙ্গ উদ্ধার করা। সেটা না করে আমি ফিরছি না।'

চোরা হরি বলিল, 'আদেশ শিরোধার্য। আমি সেই জায়গার সন্ধান পেয়েছি।'

কিন্তু যজ্ঞেশ্বরের যাত্রাসঙ্গীরা ততক্ষণে মনস্থির করিয়াছে। মনিবের মৃত্যু

তাহাদের গৃহমুখী হইতে সাহায্য করিল। দেখা গেল মাত্র চারজন দ্বিতীয়া স্ত্রীর সঙ্গী হইতেছে। দুই দল দুই দিকে যাত্রা করিল।

পাঠক, দ্বিতীয়া স্ত্রীর নাম নারায়ণী। তিনি চতুরা। মৃত স্বামীর যাবতীয় সম্পদ হস্তগত করিতে দেরি করেন নাই। দীর্ঘপথ তিনি চোরা হরির সঙ্গে দূরত্ব রাখিয়া চলিলেন।

চোরা হরি বিস্মিত। যে নারী দর্শনমাত্র তাহার বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়ে সে এমন মানিবানীর মত ব্যবহার করে কোন্ মানসিকতায়! একসময় তাহারা যে স্থানে উপস্থিত হইল তাহা স্বপ্নের বর্ণনার সহিত ভাল মিলিয়া গেল। শিবির স্থাপিত হইল। স্থানটির নিকটেই একটি ছোট্ট গ্রাম। গ্রামের অধিবাসীদের গাত্রত্বক উজ্জ্বল। নাকে এবং চোখে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে দক্ষিণবঙ্গের মানুষের সহিত। তাহারা এক সুন্দরী যুবতীকে নিজেদের মধ্যে পাইয়া বরণ করিয়া লইল। সঙ্গী চার অনুচর ওই গ্রামের নারীদের মধ্য হইতে সঙ্গিনী সংগ্রহ করিয়া লইল। এইবার নারায়ণী প্রসন্ন হাসি হাসিলেন। চোরা হরির বক্ষলগ্ন হইয়া প্রশ্ন করিলেন, 'এখানে কোথায় শিবলিঙ্গ আছে গো?'

চোরা হরি বিস্মিত, আবেগে তাড়িত হইয়া বলিল, 'জানি না। সমস্ত গ্রাম খুঁড়তে হবে খুঁজতে হলে। আমার ওসব চাই না, তোমাকে চাই।'

নারায়ণী বলিলেন, 'সে পারেনি, তুমি যদি আমাকে মা করতে পার তাহলে আমারও চাই না। কি হবে মাটি খুঁড়ে!'

পাঠক, এই হইল বৃত্তান্ত। বিবাহবন্ধনহীন দুটি নারী-পুরুষের কামনায় সন্তান আসিয়াছিল। আর চোরা হরি প্রেমিকার নামে স্থানটির নাম রাখিল— 'নারায়ণপুর'। মিশ্রণে সংখ্যা বাড়ে। সেই বর্ধিত সংখ্যার গ্রাম নারাণপুরের এই পশ্চাৎপট পরিত্যাগ করিয়া আমরা এবার বর্তমানে ফিরিয়া আসি।

॥ ৫ ॥

অবিনাশ কবিরাজকে ইতিবৃত্ত শোনালেন হরিহর। ভদ্রলোক হাঁ করে শুনছিলেন। শেষ হওয়ামাত্র বলে উঠলেন, 'বলেন কি ? তাহলে তো এই গাঁয়ের লোকের বংশপরিচয় খুবই গোলমেলে। মানে, কিছু মনে করবেন না, জারজ সন্তান বলাও অন্যায় হবে না।'

হরিহর মাথা নাড়লেন, 'জারজ শব্দটিতে আপত্তি আছে। শোনা যায় ওঁরা গন্ধর্বমতে বিবাহ করেছিলেন। তা কবিরাজ মশাই, এসব কাহিনী আমার শোনা কথা। পিতৃদেবও তাঁর পিতার কাছেই শুনেছিলেন। কতটা সত্যি কতটা মিথ্যে তা তাঁরাই জানেন। আর বাঙালীর যা অবস্থা তাতে তামাতুলসী দিয়ে শুদ্ধ রাখা বংশ কজনের আছে খুঁজলে ঠকতে হবে মশাই। এদেশে শুনেছি অনার্যরা বাস করত। আর্যরা এসে তাদের সন্তান দিয়ে জাতে তুলল।'

'তা হোক, তা হোক, কিন্তু—।' অবিনাশ কি করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না।

'মহাভারতের কথাই ধরুন। কুরু বংশটাই তাহলে আপনার মতে জারজ ?'

'হ্যাঁ, মানে, সেদিক দিয়ে ধরতে গেলে তো তাই বটে।'

'রামায়ণে রামচন্দ্র বা সীতার তো সঠিক পিতৃপরিচয় নেই !'

'সীতাকে অবশ্য কৃষিক্ষেত্রে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন জনক রাজা কিন্তু রামচন্দ্রের বেলায় তা হবে কেন ? তিনি জ্যোতির্ময় পুরুষ, যজ্ঞ থেকে উদ্ভূত।'

'মানছি। কিন্তু তাতে তো পিতৃপরিচয় পাওয়া গেল না। দশরথ সেটা ধার দিয়েছিলেন নিজের স্বার্থে। যাহোক, যে গল্প আপনাকে শোনালাম তা কয়েকশ' বছর আগের ঘটনা। আপনি মেয়ের বিয়ে দেবেন যার সঙ্গে তার তিন-চার পুরুষের খোঁজ নিয়ে দেখুন, তাতেই হবে।'

হরিহর অবিনাশ কবিরাজকে চা-বিস্কুট দিয়ে আপ্যায়ন করলেন।

অবিনাশ জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই কাহিনী খুব বেশি লোক জানে না নিশ্চয়ই ?'

'মনে হয় না। অতীতের খবর কেউ তো আজকাল রাখতে চায় না।'

এবার অবিনাশ কবিরাজকে প্রসন্ন দেখাল, 'তা বলুন, ছেলেটি কিরকম ?'

'অতিশয় সজ্জন। বিষয়-আশয়ে মন আছে। জমি চাষ করে ভাল ফসল ফলায়। সংসারে মা ছাড়া তৃতীয় প্রাণী নেই। শুধু নাটক থিয়েটারের প্রতি ঝোঁক আছে।'

'হুম্। যা আয় করে তাতে ভাত-কাপড়ের অভাব হয় না তো ?'

হরিহর মাথা নাড়লেন, 'আমার পক্ষে তো কারো হেঁসেলে উঁকি মেরে দেখা সম্ভব নয়। তবে আরও অনেকের নজর ওর ওপরে পড়েছে।'

'তার মানে ?' অবিনাশ কবিরাজের কপালে ভাঁজ পড়ল।

'আমাদের শিবরামের কথা শুনেছেন ?'

'শিবরাম ? যার উপদংশ হয়েছিল ?'

'হ্যাঁ। সে তো সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছে। তার স্ত্রী আছেন শাশুড়ীর সঙ্গে। তিনি নিজের বোনের বিয়ে দিতে চান শ্রীনিবাসের সঙ্গে। পাত্রী সুন্দরী, গৃহ-কর্মনিপুণা তবে ওরা দিতে পারবে না কিছুই। এইটেই সমস্যা।'

এমন পরিবারের সঙ্গে কেউ ছেলের সম্বন্ধ করে? অত্যন্ত সংক্রামক ব্যাধি, বুঝলেন?'

'সংক্রামক?' চমকে উঠলেন হরিহর।

'হ্যাঁ। কুসংসর্গ থেকে ওই রোগ আহরণ করে লোকটা নিশ্চয়ই তার স্ত্রীকেও দিয়ে গিয়েছে। স্ত্রীলোকের অসুখটা হলে চট করে বোঝা যায় না।'

হরিহরের মাথাটা ঘুরে উঠল। ছবিরাণীর উপদংশ রোগ আছে তিনি ভাবতেও পারছিলেন না। তাছাড়া কবে শিবরাম গৃহত্যাগ করেছে, তেমন হলে কি এতদিন চাপা থাকত? ধোঁওয়া আর রোগ প্রকাশ পাবেই। কিন্তু অবিনাশ কবিরাজ তাঁর মনে ভয় ঢুকিয়ে দিল। এই লোকটি তাঁকে আবার বিবাহ করতে বলত! এ কি কোনমতে জেনে গিয়েছে ছবিরাণী সম্পর্কে তার মনে দুর্বলতা আছে? তিনি কিছুই বুঝতে পারলেন না। অবশেষে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার অনুমান যদি সত্যিও হয়, তাহলে শিবরামের শ্যালিকা কেন অসুস্থ হবে?'

'হবেই যে তা তো বলিনি। হতেও পারে। এসবের ঝামেলায় না গিয়ে আপনি যদি অনুগ্রহ করে প্রস্তাব দেন আমার মেয়েকে বিয়ে করার জন্যে তাহলে বিশেষ বাধিত হই।' অবিনাশ কবিরাজ হাতজোড় করলেন, 'আমার মেয়ে যাকে বলে সুন্দরী তা নিশ্চয়ই নয়, গায়ের রঙও ঘন শ্যামবর্ণা কিন্তু ঘরের কাজ সব জানে। রান্নায় যেন দ্রৌপদী।'

'চেহারা? মানে বলতে হবে তো ওদের?'

'স্ত্রীলোকের চেহারা বিয়ের আগে যাই থাক না কেন, বিয়ের দুতিন বছর বাদে সন্তানাদি হয়ে গেলে ইস্ত্রিহীন আটপৌরে কাপড় হয়ে যায়। নেতানো নেতানো। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে আমার মেয়ে স্বাস্থ্যবতী, একটু মাত্রায়। তাতে সুবিধে হবে, বিয়ের পরে সেই স্বাস্থ্য কমতে কমতে যখন আটপৌরে হবে তখন অনেক বছর কেটে যাবে। ওকে তো সন্তানের মা হতে হবে, তাই না?' অবিনাশ জানালেন।

'ঠিক আছে, আপনি যখন বলতে বলছেন তখন এসবই জানাবু।'

'এছাড়া আমার আর একটি প্রস্তাব আছে।'

'বলুন।'

'আমার তো পুত্র নেই। এতদিন যা শিখেছি তা সবই দিয়ে দিতে চাই ওকে। মায় আমার পসারও। নেই নেই করে আপনাদের শুভেচ্ছায় খারাপ আয় হয় না। এসবই সে পাবে। এতবড় যৌতুক কেউ সহজে দেবে না, কি বলেন?'

'সে তো নিশ্চয়ই। কিন্তু পসার তো আপনি গত হলে তবে পাবে।'

'আহা, বয়স তো হচ্ছে। কবে দুম করে চোখ বুজবো, কেউ বলতে পারে?'

রসিকতা করার লোভ ছাড়তে পারলেন না হরিহর, 'বাঃ কবিরাজ মশাই, আপনি আর মাস্টারমশাই মিলে আমাকে তো এই বয়সেও বিয়ের কথা বলছিলেন!'

'আপনি আর আমি এক কথা হল ? চব্বিশ ঘণ্টা তো গৃহিণীর গঞ্জনা শুনতে হচ্ছে না। তাছাড়া শরীরও ভেঙ্গে পড়েছে আমার। আর আপনি, কে বলবে এত বয়স, এখনও বিয়ে করলে বউ পায়ের তলায় থাকবে।' অবিনাশ কবিরাজ যে রসিকতা করছেন না তা বোঝাতে বার বার মাথা নাড়তে লাগলেন।

মনে পুলক এল হরিহরের। একটু বিমর্ষ গলায় তবু বললেন, 'এই তো আপনি আমার আগে মিটিং করছিলেন পাঁচজনকে নিয়ে। আমি চলে গেলে এই এত বিষয়সম্পত্তি তো এভাবে পড়ে থাকতে পারে না। একটা কিছু বিহিত হওয়া দরকার।'

'আহা, বিয়ে করুন না ?'

'আমাকে কে মেয়ে দেবে বলুন ?' নিচু গলায় বললেন হরিহর।

'দেবে, দেবে। এত বিষয়সম্পত্তি, এত প্রতিপত্তি এই লোভেই দেবে।' কথাগুলো বলে অবিনাশ কবিরাজ একটু ভাবলেন, 'ওই যে মেয়েটির কথা বলছিলেন, শিবরামের শ্যালিকা, দিতে পারবে না কিছুই. তার সঙ্গে সম্বন্ধ করব ?'

হরিহর চমকে উঠলেন, 'ছি ছি ! এ কি বলছেন ? সে তো বালিকার মত !'

অবিনাশ মাথা নাড়লেন, 'এইটেই ভুল করলেন। পনের আর পঁয়তাল্লিশ ছেলেদের ক্ষেত্রে খুব তফাতের হতে পারে কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে নয়। আপনি নির্ভয়ে থাকুন। আমি আপনার বিয়ের সম্বন্ধ ওখানেই করছি। শুধু আমারটা আপনি খেয়ালে রাখবেন। আরে এখন সব শিখে এই গ্রামেই চিকিৎসা করুক, পরে আমি চলে যাওয়ার পর গঞ্জে গিয়ে বসবে। তদ্দিনে হাতও পেকে যাবে।'

হরিহর ভরসা পেলেন না। যদি ছবিরাণী এই প্রস্তাব নাকচ করে দেয় তাহলে খবরটা পাঁচকান হবেই। এখনও গাঁয়ের মানুষ তাঁকে যে শ্রদ্ধা করছে তা তিনি সঙ্গে সঙ্গে হারাবেন। ফলে অবিনাশের ওঠার সময় বললেন, 'না কবিরাজ মশাই, একটা কথা আপনাকে বলাই হয়নি, আমাদের পরিবারে নিয়ম আছে—এই বিবাহাদি ব্যাপার ভিন্ন গ্রামে করতে হবে। অতএব এই প্রস্তাব আপনি দেবেন না।'

অবিনাশ কবিরাজ মাথা নাড়লেন, 'তাহলে আলাদা ব্যাপার। ঠিক আছে আমি অন্য জায়গায় সম্বন্ধ করছি। কিন্তু আপনি দেখবেন শ্রীনিবাস যেন ওই মেয়ের খপ্পরে না পড়ে।'

কবিরাজ মশাইকে গ্রামের প্রান্তে পেঁৗছে দিয়ে হরিহরের মন খুব উদাস হল। এখন বেশ অন্ধকার। হঠাৎ তাঁর শ্রীনিবাসকে খুব হিংসে হল। ওরকম বয়স তাঁর থাকলে হাজারটা সম্বন্ধ আসত। শ্রীনিবাসের আছে-টা কি ? যে জমিতে চাষ করে সেটাও তো তাঁর কাছেই বাঁধা। তাঁর একশ' ভাগের এক ভাগও যোগ্যতা ওর নেই। তবু অবিনাশ কবিরাজ ওর দিকে ঝুঁকেছে।

অন্ধকার গ্রাম্যপথে চলতে তাঁর কোন অসুবিধে হচ্ছিল না। পথে যার সঙ্গে দেখা হচ্ছে তাকেই কুশল জিজ্ঞাসা করছেন। শেষ পর্যন্ত শ্রীনিবাসের বাড়িতে পেঁৗছালেন তিনি। সেখানে হ্যারিকেন জ্বলছে। কয়েকজনের গলা পাওয়া যাচ্ছে। নাটক পড়া হচ্ছে। একটি গলা একদম অচেনা মনে হল। এই গ্রামের কেউ নয় নিশ্চয়ই। বেশ জোরে জোরে লোকটা বলল, 'আঃ, এভাবে তোমরা কথা বল

নাকি ? দেখে দেখে বলছ তাও মিনমিন করে ?'

'কিভাবে বলব ?' গলাটা নগেনের।

লোকটা বলল, 'নাটকটার নাম কি ? না ছদ্মবেশী ভগবান। তুমি কোন্ চরিত্রে অভিনয় করছ ? না সাক্ষাৎ শিবের চরিত্রে। শিব কি করেন ? সবসময় হাসি-হাসি মুখে বর দেন। কিন্তু ভগবান কি তোমার আমার মত মিনমিন করে কথা বলবেন ? কভি নেহী। এই যে সংলাপটা, হে বালিকা, তুমি কোন্ কারণে আমার তপস্যা করছ, এটা এভাবে বলবে।' হরিহর শুনলেন গলা কাঁপিয়ে এক নিঃশ্বাসে সংলাপটি উচ্চারিত হল। তিনি আর অপেক্ষা না করে খোলা দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেন।

তাঁকে দেখামাত্র শ্রীনিবাস উঠে দাঁড়াল। নগেনের মুখে লজ্জা এল। ঘরে আর যারা ছিল তারা মুখ নামাল। হরিহর হাত তুললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। তোমরা যে মহলা দিচ্ছ তা আমি জানতাম না। ঠিক আছে, পরে কথা বলব।'

শ্রীনিবাস বলল, 'আপনার সঙ্গে সনাতনদার আলাপ আছে ?'

হরিহর দড়ির মত পাকানো লোকটির দিকে তাকালেন, 'চেনা চেনা ঠেকছে।'

সঙ্গে সঙ্গে সনাতন দুটো হাত জড়ো করল, 'আজ্ঞে আমি সনাতন। আপাততঃ হরিপুরে থাকি। ক্ষুদ্র ব্যবসা করে কোনমতে দিনযাপন করি। তা একদা কলকাতায় থাকার সময়ে থিয়েটার করতাম। এই ছেলেরা ধরল দেখিয়ে দেবার জন্যে তাই এখানে আসা। আপনার কথা আমি খুব শুনেছি।'

'আমার কথা আবার কার কাছে শুনলেন ?'

'মতীশ বলছিল সেদিন। মতীশ রায়।'

হরিহরের চোখ ছোট হল। মতীশকে তিনি বিলক্ষণ জানেন। এই এলাকার সেরা লম্পট সে। জমিজমার কারবারী, নারাণপুরের জমি হাতাতে চেয়েছিল, পারেনি। কিন্তু মতীশ বড়লোক, তারপর বেজায় নাক উঁচু। সেই মানুষকে এই লোকটা নাম ধরে ডাকে নাকি ? এইসময় নগেন বলল, 'কটা অসুবিধে হয়েছে, মানে কথাটা আপনাকে একবার বলেছিলাম। সনাতনদার পক্ষে রোজ রাত্রে হরিপুরে ফিরে যাওয়া খুব কষ্টের। তাই এই কটা দিন যদি আপনি আপনার বাড়িতে ওঁকে থাকতে দেন তাহলে খুব ভাল হয়।'

'এ আর সমস্যা কি! জায়গা তো অঢেল রয়েছে। তা তোমাদের নাটকে স্ত্রী-চরিত্রে কারা অভিনয় করছে ? তুমি নাকি ?' জনার্দনের দিকে তাকালেন তিনি।

জনার্দন কুঁকড়ে গেল। সনাতন বলল, 'না, না। স্ত্রীচরিত্রে ছেলেদের অভিনয় করা এখন ব্যাকডেটেড হয়ে গিয়েছে।'

হরিহর মাথা নাড়লেন, 'তাহলে তো মুস্কিল হল।'

'মুস্কিল কেন ?' জনার্দনের প্রশ্ন।

'আমি তোমাদের প্রস্তাব পেয়ে গ্রামের মাতব্বরদের আজ ডেকেছিলাম। তা সব শুনে তারা কিছুতেই মত দিল না। বলল, এই গ্রামে মেয়েছেলেদের দিয়ে অভিনয়

করা চলবে না। ছেলেরা মেয়ে সাজলে নাটক হবে, নইলে নয়।'

গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল। তারপর সেটা উত্তেজনায় রূপান্তরিত হল। এদের নেতা নগেন, 'কে—কে বলেছে একথা? আপনি নাম বলুন!'

'নাম বললে তোমরা কি করবে?'

'আমরা তাদের বুঝিয়ে বলব। নাটক হল একটা শিল্প, ইণ্ডাস্ট্রি, এটা আর বেলেল্লাপনা নয়।' নগেন সনাতনের কথা উগরে দিল।

হরিহর বললেন, 'মূলতঃ আপত্তিটা খগেনদার হলেও অনেকের সায় আছে।'

'খগেন জেঠুর স্বভাব হল বাগড়া দেওয়া।' একজন চেঁচিয়ে উঠল।

'তোমরা তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করবে না।' হরিহর শাসন করলেন।

হঠাৎ নগেন জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার নিজের আপত্তি আছে?'

হরিহর একদম সময় নিলেন না, 'না। তবে বাইরে থেকে ভাড়া করা মেয়ে অভিনেত্রী আনলে আপত্তি আছে। গাঁয়ের মেয়ে-বউদের যদি অমত না থাকে, তারা যদি করতে চায় তো আপত্তি কি? কিন্তু প্রবীণদের এতে বেশী আপত্তি। তাঁরা মনে করেন এতে গ্রামের সম্মান থাকবে না।'

ধীরেন হাত নাড়ল, 'গ্রামের মেয়েরা যদি রাজী না হয়?'

নগেন বলল, 'কেউ রাজী না হলে আমার বউকে দিয়ে করাব।'

জনার্দন মাথা নাড়ল, 'না ভাই, তোর বউকে মানাবে না।'

নগেন চিৎকার করল, 'মেয়ে হওয়া নিয়ে কথা, কি বল সনাতনদা?'

সনাতন বলল, 'গলার স্বর মেয়েদের খুব সাহায্য করে বটে তবে দেখতেও তো ভাল হওয়া চাই। আমার চেহারা নিয়ে শিব সাজতে চাইলে সবাই হাসবে, তাই না?'

শ্রীনিবাসের খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। হরিহর দাঁড়িয়ে এইসব কথা শুনছেন, এটা তার পছন্দ হচ্ছিল না। সে এগিয়ে এল, 'আচ্ছা এই নিয়ে নাহয় পরে কথা বলা যাবে। কি বলিস তোরা?'

নগেন বলল, 'পরেফরে চলবে না। এখনই চল সবাই খগেনজেঠুর বাড়িতে। তিনি যদি রাজি না হন তাহলে স্পষ্ট বলে দেব আমরা তাঁদের মত মানি না। হ্যাঁ, হরিহরকাকার মত মেনে বাইরে থেকে অভিনেত্রী আনা হবে না কিন্তু গাঁয়ের মেয়েদের দিয়ে করাব। হ্যাঁরে শ্রীনিবাস, ছবি বউদির বোনকে দিয়ে নায়িকা হবে না?'

শ্রীনিবাস বলল, 'আমি কি করে বলব?'

নগেন আরও উৎসাহিত হল, 'ছবি বউদিকেও রাজী করাতে হবে। ছবি বউদি অভিনয় করলে ওঁর বোনও আপত্তি করবে না।'

এইসময় সনাতন বলল, 'তাহলে তো আগে একবার ছবি বউদিকে এবং তাঁর বোনকে দেখতে হয়।'

প্রস্তাবটা খুব খারাপ লাগল হরিহরের। তিনি শ্রীনিবাসকে বললেন, 'তুমি একটু আমার সঙ্গে বাইরে এস।'

শ্রীনিবাস তৎক্ষণাৎ তাঁকে অনুসরণ করল। খানিকটা দূরত্বে গিয়ে তিনি

বললেন, 'তোমার বন্ধুদের অযথা উত্তেজিত হতে নিষেধ কর। মনে হয় গ্রামের বয়স্কা মহিলারাও চাইবেন না নাটকে মেয়েরা অভিনয় করুক। তোমার মা কি চাইবেন বলে মনে হয়?'

'মা জানে না।' শ্রীনিবাস মাটির দিকে মুখ নামাল।

'তাছাড়া সনাতন একজন মাতাল বলে শুনেছি। ছবি বা তার বোনকে ওর সামনে হাজির করা কি উচিত কাজ হবে বলে মনে কর?'

শ্রীনিবাস মাথা নাড়ল, 'না।' তার মনে হল এই সুযোগে নাটক থেকে সনাতনকে কাটিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

হরিহর বললেন, 'সবাই যদি গাঁয়ের ছেলে হত তবু একটা কথা ছিল। সনাতন বাইরের লোক। তার চরিত্র ভাল নয়। কিছু একটা করে ফেললে আমাদের মুখে চুনকালি পড়বে। তাই না?'

'হ্যাঁ, ঠিক।'

'তা তোমরা নিজেরাই পরিচালনা করছ না কেন?'

'দেখি।'

'তাই দ্যাখ। আর হ্যাঁ, আজ অবিনাশ কবিরাজ এসেছিলেন আমার কাছে তোমার সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে। খবরটা এর আগেই কানে এসেছিল, আজ একদম পাকা হল। এদিকে ছবি তার বোনের বিয়ে তোমার সঙ্গে দিতে চাইছে। তুমি নিশ্চয়ই জানো সে কিছু দিতে পারবে না। এদিকে অবিনাশ কবিরাজ প্রস্তাব করেছেন তোমাকে কবিরাজী শিখিয়ে দেবেন যাতে আয় করতে পার। তাঁর ডাক্তারখানাও ভবিষ্যতে তুমি পাবে।'

হরিহর ছবিটা পরিষ্কারভাবে তুলে ধরলেন।

শ্রীনিবাস চুপ করে রইল। হরিহর বললেন, 'তোমার মতটা বল?'

শ্রীনিবাস নিচুগলায় বলল, 'শুনলাম কবিরাজ মশাই-এর মেয়ে যেমন কালো তেমনই মোটা।'

'দ্যাখো বিয়ে করবে তুমি, অতএব সিদ্ধান্ত নেবার ভার তোমার ওপর। কবিরাজ বললেন, বিয়ের পর কেউ আর রঙ নিয়ে মাথা ঘামায় না আর মোটাসোটা স্বাস্থ্য খুব কাজে লাগে।'

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনি বরং মায়ের সঙ্গে কথা বলুন। যা ঠিক হবে তাই মেনে নেব।'

'শোন, ছবির বোনকে তুমি দেখেছ?'

শ্রীনিবাস মাথা নেড়ে নীরবে হ্যাঁ বলল।

হরিহর হাসলেন, 'তোমার মা শুনলে অবিনাশ কবিরাজের প্রস্তাবটাই গ্রহণ করবেন, কারণ এতে তোমাদের আর্থিক লাভ হবে। কিন্তু অর্থটাই জীবনের সব কথা নয়। পুরুষমানুষের জীবনে ভাল স্ত্রীর যথেষ্ট মূল্য আছে। তা যদি আমি ছবির বোনের সঙ্গে সম্বন্ধটা পাকা করি, তুমি খুশী?'

শ্রীনিবাস একেবারে মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বলতে হরিহরের ভাল লাগল। তিনি বললেন, 'তা তোমার মায়ের সঙ্গে কথা বলতে এসেছিলাম কিন্তু এখন তো এখানে

অনেক লোক, পরেই আসব নাহয়। কিন্তু তুমি ওই লোকটিকে বিদায় কর।'

হরিহর আর দাঁড়ালেন না। ধীরে ধীরে অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে হাঁটতে শুরু করলেন। এই প্রথম গ্রামের ছেলেদের তিনি উত্তেজিত হয়ে কথা বলতে শুনলেন। এবং সেটা তাঁরই সামনে। যদিও তাঁকে ওরা অপমান করেনি কিন্তু প্রবীণদের বিরুদ্ধে যেতে এরা আর বেশীদিন অপেক্ষা করবে না তা আজ স্পষ্ট হল। ব্যাপারটা তাঁর কিছুতেই ভাল লাগছে না। একবার আগল ভেঙ্গে গেলে আর দেখতে হবে না। মরীয়া হয়ে ওরা নাটক করার চেষ্টা করবে, ছবিরাণীকে দেখলে সনাতন কিছুতেই না বলবে না। অস্বস্তিটা এইখানেই। আবার অবিনাশ কবিরাজ বলে গেল ছবিরাণীর শরীরে স্বামীর দেওয়া অসুখ থাকা সম্ভব। মনে হতেই বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল। সত্যি না হলেও খটকা তো থেকেই যাচ্ছে।

মহলা বন্ধ হয়ে শুধু উত্তেজিত কথা চলছে, শ্রীনিবাস ঘরে ঢুকে কিভাবে কথা তুলবে বুঝতে পারছিল না। এই সময় সে নিজের মায়ের গলা শুনতে পেল। সম্ভবতঃ রান্নার ঘরে বসেই তারস্বরে চিৎকার শুরু করলেন, 'ওরে বাবারে, কানের মাথা খেয়ে ফেললে রে, এটা কি মানুষের বাড়ি না বাজার! কর্তা নেই বলে সবাই মিলে ভূতের নেত্য শুরু করেছে!'

আচমকা কলরব থেমে গেল। এ ওর মুখের দিকে তাকাল। শ্রীনিবাসের মা তখনও সমানে চিৎকার করে যাচ্ছেন। নগেন জিজ্ঞাসা করল, 'কি হল তোর মায়ের?'

শ্রীনিবাস কি বলবে বুঝতে পারছিল না। মায়ের বিরুদ্ধে যে কিছু বলার ক্ষমতা তার নেই এটা বন্ধুদের নতুন করে বোঝাতে চাইল না। সে বলল, 'একটু আস্তে কথা বললে তো হয়।'

সনাতন বলল, 'রিহার্সাল তো ফিসফিস করে দেওয়া যায় না।'

শ্রীনিবাস মাথা নাড়ল, 'আমরা রিহার্সাল কোথায় দিচ্ছি! আমি বলি কি, আগে সব ঠিকঠাক হোক তারপর রিহার্সাল দেওয়া যাবে।'

নগেন প্রতিবাদ করল, 'ঠিকঠাকের কি আছে? আমরা নাটক করব। কে কি বলছে তাতে কান দেব না। তুই তোর ছবি বউদির সঙ্গে কথা বল।'

শ্রীনিবাস মাথা নাড়ল, 'না, আমি পারব না।'

'কেন? তুই পারবি না কেন?'

'আমার অসুবিধে আছে। জনার্দনকে বল, ও তো ওই বাড়িতে যায়।'

সনাতন এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। সম্ভবতঃ এদের কথাবার্তায় সে একটু একটু করে বিরক্ত হয়ে পড়ছিল। রিহার্সাল দেওয়া হবে বলে আজ সে নেশা করেনি। এখন ওই ইচ্ছে প্রবল হল। সে উঠে দাঁড়াল, 'তাহলে আজ এই অবধি থাক। আমি যেন কোথায় এখানে থাকব?'

শ্রীনিবাস বলল, 'আজ হরিহরকাকার ওখানে অসুবিধে হবে। উনি তো জানতেন না আজ থেকেই রিহার্সাল হবে। আপনি বরং কষ্ট করে হরিপুরে ফিরে যান।'

হঠাৎ ক্ষেপে গেল সনাতন, 'অ্যাঁ, তোমরা ভেবেছ কি? একজন শিল্পীকে ডেকে এনে অপমান করছ? এই মন নিয়ে তোমরা নাটক করবে? ছাই হবে!'

নগেন জনার্দন ধীরেন অনেক কষ্টে তাকে শান্ত করল। সনাতন বলল, 'ঠিক

আছে, তবে আমার একটা নিয়ম আছে। নাটকের প্রথম দিনে পার্টির কাছ থেকে একটা পাঁইট নিই। এটা হল তুক, না নিলে নাটকের বারোটা বেজে যায়। তার ব্যবস্থা করে দাও, আমি চুপচাপ চলে যাচ্ছি।'

এই গ্রামে মদের দোকান নেই। পচাই খায় যারা তারা যোগাড় করে আনে পাশের ভাটি থেকে। একমাত্র অনন্তই গ্রামের দাগী মাতাল। নগেনরা নিজেদের মধ্যে কথা বলে অনন্তর সন্ধানে চলল সনাতনকে নিয়ে। রাত বেশি হয়নি, অনন্তর সন্ধানে কিছু পড়ে থাকতে পারে। ওদের মনে হচ্ছিল এই করে গুরুদক্ষিণা দেওয়া হবে।

রাত্রে হরিহরের ভাল ঘুম হয় নি। মাঝরাত থেকেই মনে হচ্ছিল, এইভাবে একা থাকতে থাকতে তিনি ঠিক মারা যাবেন। চিন্তাটা মাথায় জেঁকে বসতেই ঘুম উধাও। ভোর হবার আগেই তিনি বাইরে চলে এলেন। খুব পাখি ডাকছে গাছগাছালিতে। তাঁর মনে হল পাখিরা খুব শান্তিতে আছে। তিনি বাগানে হাঁটতে হাঁটতে পুকুরের ধারে চলে এলেন। হালকা পানা পড়েছে জলে। এদিকটায় নজর দেওয়া হয় না। কতদিকেই যে দেবেন! হঠাৎ তাঁর হৃৎপিণ্ড ধক্ করে উঠল। বাগানের পেছনের রাস্তা দিয়ে কোমরে কলসী নিয়ে ছবিরাণী ঢুকছে। সঙ্গে গামছা, শুকনো কাপড়। চোখাচোখি হতেই ঠোঁট মুচড়ে হেসে বলল, 'আপনার পুকুরে স্নান করতে এলাম। ওই পুকুরে একটা ছাগল মরে ভাসছে।'

'ভাল, ভাল। সব খবর ঠিক আছে তো?' কথা খুঁজে পাচ্ছিলেন না তিনি।

'এই আর কি! কাল জনার্দন এসেছিল। নাটক হবে, আমাদের নামতে বলছে। বলল, আপনি নাকি মত দিয়েছেন।'

'না, না, আমি মত দেবার কে?' ঘন ঘন মাথা নাড়লেন হরিহর।

'আমিও তাই বললাম। একেই দুর্নামের শেষ নেই, তারপর আর একটা বাড়ুক তা নিশ্চয়ই আপনি চাইবেন না। বলুন?' বড় চোখে তাকাল ছবিরাণী, 'এদিকে শুনলাম হরিপুরের অবিনাশ কবিরাজ অনেক দিয়ে শ্রীনিবাসকে জামাই করে নিতে চায়। সব দিক দিয়েই কপাল মন্দ।'

'আহা চিন্তা কেন, আমি আছি। সব ভার আমার ওপর ছেড়ে দাও।'

'মুখেই বলে যাচ্ছেন কথাগুলো। কাজে করুন! এবার যান এখান থেকে। আপনার চোখের সামনে আমি জলে নামতে পারব না।' শব্দ করে হেসে ছবিরাণী পা বাড়াল।

হঠাৎ বুকে আনন্দ এল! হরিহর দ্রুত বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন।

॥ ৬ ॥

কদিন থেকেই খুব দুশ্চিন্তায় পড়েছিল ছবিরাণী। অবশ্য তার দুশ্চিন্তা একটা নয়। সবসময় সামনে চার-পাঁচ রকমের দুশ্চিন্তা পড়ে থাকে। এখন এ এসে আঁকড়ে ধরছে তো একটু পরেই ও। কখনও কখনও দুতিনটে একসঙ্গেই। ভগবানের সঙ্গে ছবির এই জীবনে দেখা হবার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু তাঁকে অষ্টপ্রহর গালাগাল দেয় সে। মানুষটার যাবতীয় শত্রুতা যেন তার সঙ্গেই। ছেলেবেলা থেকে শুধু অভাব আর অ-সুখের সঙ্গে তাকে ঠেসে রাখল। একটা ভাল লাইনও লিখতে পারল না কপালে! যদি অতই কিপ্টেমি, তাহলে এই শরীরটাকে এমন করল কেন? নারাণপুর গ্রামের অনেক মেয়ে বউ-এর মত তার শরীরের হাড় যদি গোনা যেত, চোখ গর্তে ঢুকে থাকত তাহলে বরঞ্চ ভাল হত। এখন এই শরীরটাও একটা দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আপাতত ছবিরাণীর দুশ্চিন্তা চার বিষয়ে। টানলে বাড়বে। প্রথম চিন্তা তার ধেউমানি থেকে আসা বোনকে নিয়ে। বড্ড ডানপিটে মেয়ে, সংসারের কাজে মন নেই এসব খুবই সাধারণ কথা। বোনের চেহারাপত্তর খুবই সাধারণ যদিও চোখমুখে বেশ ঝিলিক আছে। এই বোন তার কাছে আসামাত্রই শাশুড়ির মুখ কালো হয়েছিল। ওঁকে দোষ দেবে না ছবি। ছেলে বিবাগী, জমি থেকে যে আয় হচ্ছে তাতে দুটো পেটই ভাল করে ভরে না। এই সময় আর একজন ঘাড়ে পড়লে খুশি হবার কথা নয়। কিন্তু বোনকে না এনে উপায় ছিল না তার। একদম ভেসে যেত মেয়েটা।

ছবিরাণী বোনের বিয়ে দিতে চায়। পাত্র শ্রীনিবাস। বড় ভাল ছেলে। আর যাই হোক দুবেলা পেটে ভাত পড়বে। কথাবার্তা এগিয়েছে। অন্তত হরিহর কাকা তাকে কথা দিয়েছেন। শ্রীনিবাসের মায়ের বড্ড নোলা। এই চাই ওই চাই। শাখা সিঁদুর ছাড়া কিছুই দেবার ক্ষমতা নেই ছবিরাণীর। এটা জেনেও চাই। হরিহর কাকা সেটাও ব্যবস্থা করবেন বলেছেন। এই মানুষটার কাছে গ্রামের সব লোক কম বেশি উপকারী। সবাই তাঁকে একটু অন্যচোখে দেখে। কিন্তু তিনি যে ছবিরাণীকে অন্য চোখে দেখছেন তা সে টের পেয়ে গিয়েছে। পুরুষমানুষের মনের ছোবল মেয়েমানুষের বুকে চট করে লাগে। না, মুখে কিছু বলেননি তিনি। কিন্তু সে ইচ্ছে করলে লোকটাকে দিয়ে সব কিছু করাতে পারে।

নিজের সঙ্গে অনেক লড়েছে ছবিরাণী। হোক প্রায় বাপের বয়সী। টাকাপয়সা জোতজমি এবং শরীরস্বাস্থ্য ঠিক থাকলে বয়স নিয়ে কে মাথা ঘামায়? কিন্তু সে শিবরামের বউ। লোকটা এখনও পৃথিবীর কোন আনাচে-কানাচে

রয়েছে। তেমন কিছু ঘটলে লোকে অসতী বলবে।' মাঝে মাঝে মন বলে, বলুক অসতী, যে স্বামী অন্য মেয়েছেলের অসুখ শরীরে নিয়ে নিজের বউকে দুর্দশায় ফেলে বছরের পর বছর উধাও হয়ে যায় তার প্রতি কেন সে সৎ থাকবে? বুড়ি হয়ে যখন চিতায় উঠবে তখনও যদি লোকে তাকে সতী বলে তাতে তার কি লাভ! ঝাড়ু মারো অমন সতীপনার মুখে। এখন বোনের বিয়েটা যদি কোথাও হরিহরের আশীর্বাদে মিটে যায়, তাহলেই একটা দুশ্চিন্তা ঘোচে।

কিন্তু বিয়ের আগেই আর একটা দুশ্চিন্তা এসেছে। কদিন থেকে রাত্রে শোওয়ার একটু বাদেই কাতরাতে থাকে বোন। জিজ্ঞাসা করলে বলে পেটে যন্ত্রণা হচ্ছে। তেলজল মালিশ করেও কমেনি। অথচ দিনের বেলায় মোটামুটি ঠিকই থাকে, শুধু খাওয়াটা বেশ কমে গেছে। এখনই ঔষধ খাওয়ানো দরকার। বিয়ের আগে পাঁচকানে কথাটা পেঁৗছে গেলে ভাঙ্গচি দেবার লোকের অভাব হবে না। ওষুধ নিতে যেতে হবে হরিপুরে। সেখানে কবিরাজী হোমিওপ্যাথি এবং এ্যালোপাথির ডাক্তার এসেছে। দূরত্বটা কম নয়। মেয়েছেলের পক্ষে একা যাওয়াও অশোভন। কিন্তু সঙ্গী হবে কে? বোনকে নিয়ে অতটা পথ হেঁটে যেতে ভরসা পাচ্ছে না ছবিরাণী। যা এখন সে ঢেকে রাখতে চাইছে তা ওই পথ হাঁটলে প্রকাশ পেয়ে যাবেই। বোনের যা যা কষ্ট হচ্ছে তাই বিশদে জেনে নিয়ে ডাক্তারকে বলবে অসুখটা তারই হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত জনার্দনের শরণ নিল ছবিরাণী। এ গ্রামের বেশীর ভাগ মেয়ে বউ জনাকে পুরুষ বলে মনে করে না। এমন কি ওর চেহারা হাঁটাও মেয়েলি। শুনে জনা বলল, 'ওমা, অতটা পথ হেঁটে যাবে কি গো। একটা গরুর গাড়ির ব্যবস্থা করি!'

ছবিরাণী বলল, 'আঃ, কার কাছে গাড়ি চাইতে যাব? মাগুনামাগুনি দেবে নাকি সে? তার চেয়ে চল, হেঁটে চলে যাই।'

ছবিরাণীর আকর্ষণ আর যার থাক জনার্দনের ছিল না। মহিলারা তাকে আকর্ষণ করতে পারে না। কিন্তু হরিপুরে যাওয়ার জন্যে শেষ পর্যন্ত রাজী হল সে। তার মাথায় কদিন থেকে একটা চিন্তা পাক খাচ্ছে। চাষবাসে তার ভাল লাগে না। বাড়িতে রোজগারপাতি নেই বলে রোজ গঞ্জনা শুনতে হয়। বসে বসে যদি কোন কাজ করা যেত তাহলে সে করত। নাটকটাও মনে হচ্ছে ভেস্তে গেল যে তাতে সময় কাটাতে পারত। গতকাল শ্রীনিবাস তাকে নিজের মুখে বলেছে, অবিনাশ কবিরাজ পাত্র খুঁজছে মেয়ের জন্যে যাকে সে ভবিষ্যতের ডাক্তার বানিয়ে দিয়ে যাবে। একদম বসে বসে কাজ। চেয়ারে বসে রুগী দেখো আর পয়সা নাও।

জনার্দনের পাশে একগলা ঘোমটা দিয়ে ছবিরাণী চলল হরিপুরে। হাট বলতে যাওয়া নয়। শাশুড়ীকে অসুখের কথা বলা যাবে না। ফিরে এসে শুনবে পুরো গ্রাম জেনে গিয়েছে। তাকে বলা হল জনার্দনের সঙ্গে হরিপুরের থানায় যেতে হচ্ছে। সেখানে নাকি শাশুড়ির ছেলে সম্পর্কে কিছু খবর এসেছে। গিয়ে জানতে হবে। ছবিরাণী জানে ছেলের ব্যাপার নিয়ে কিছু কথা থাকলে

শাশুড়ী পাঁচ কান করবে না।

গাঁয়ের মধ্যে দিয়ে না গিয়ে মাঠ পেরিয়ে নদীর ধার দিয়ে যে পথটা মায়ের মন্দিরকে পাশে রেখে হরিপুরের পেছন দিকে গিয়ে উঠেছে সেই পথ ধরল ওরা। পথ ভাল নয় বলে বেশি লোক যাতায়াত করে না এদিকে। ফলে পায়ে পায়ে কৈফিয়ৎ দিতে হবে না। যেতে যেতে জনার্দন খুব দুঃখ করছিল। নাটকটা শেষ মুহূর্তে ভেস্তে গেল হরিপুরের সনাতনদের জন্যে। ব্যাটা জেদ ধরে রইল মেয়েছেলে না হলে নাটক করাবে না। আর নগেনটা তাতে মত দিল। সে নিজে কোন্ মেয়েছেলের চেয়ে খারাপ করত!

ঘোমটা একটু কমেছে ছবিরাণীর গাঁয়ের বাইরে এসে। হেসে বলল, 'তা আমি তো রাজীই আছি। আমাকে দিয়ে করাক তোমার সনাতনদা।'

মাথা নাড়ল জনার্দন, 'না। হবে না। গায়ের মাতব্বররা আপত্তি করেছে। মেয়েছেলে মেয়েছেলের মত থাকবে। আরে আমাকেই ধমকে চুপ করিয়ে রাখে। এমন কি হরিহরজ্যাঠাও কিছু করতে পারল না, জানো?'

'উনি রাজী ছিলেন বুঝি?'

'হুঁ।'

ছবিরাণী শব্দ করে হাসল। জনার্দন হাঁটতে হাঁটতেই বলল, 'হাসছ কেন? মানুষটা খুব ভাল। বদমতলবের পুরুষ দেখলেই আমি বুঝতে পারি।'

'ওমা, তাই? তুমিও পারো?' ছবিরাণী সত্যি সত্যি অবাক।

মুখ টিপে অবিকল নারীহাসি হাসল জনার্দন, 'হুঁ।'

কিছুক্ষণ বাদে ওরা মায়ের মন্দির দেখতে পেল। সাধারণত মন্দিরের কাছাকাছি যেতে হয় না হরিপুরে যাওয়ার বাসনা থাকলে। জনার্দন বলল, 'এত কাছে এসে মাকে দর্শন করবে না? বড় জাগ্রত দেবী তো। তোমার অসুখ সারিয়ে দেবেন।'

সময় নষ্ট করার ইচ্ছে ছিল না ছবিরাণীর। এখন দুপুর মাথায়। ফিরতে হবে আলো থাকতে। ভরদুপুরে মায়ের কাছে গিয়ে কি হবে। কিন্তু ছোকরা মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছে বলে কথাটা মনে মনে খচ্ খচ্ করতে লাগল। মন্দিরের সামনে একটা সাইকেল দাঁড় করানো রয়েছে। কাছাকাছি যেতেই চিৎকারটা ভেসে এল, 'অসময়ে কে? মায়ের কোন কাজ নেই বুঝি? হুট করে এলেই হল? তোদের চাকরানী বুঝি?'

জগাপাগলা চাতালে এসে দাঁড়িয়েছে। চোখ লাল, মুখ থমথমে। ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত, কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত রক্তবস্ত্র। জনার্দন তাকে প্রণাম করল, 'মার্জনা কর বাবা, এই পথে বউঠান যাচ্ছিল, বলল, একবার প্রণাম করবে তাই।'

'তুই কে? ছেলে না মেয়ে?'

'আরে আমি তো ছেলে, জনার্দন।'

'তাহলে নেকি নেকি কথা বলছিস কেন? দু'চক্ষে দেখতে পারি না এসব। যা, ওই গাছতলায় গিয়ে বস তুই। হাঁ, তুমি এস। মাকে প্রণাম করবে? কিন্তু মা এখন নিদ্রা গিয়েছেন যে। এ্যাই, তুই দাঁড়িয়ে আছিস কেন? যা!'

জগাপাগলার কথা শেষ হতেই জনার্দন দৌড়ে চলে গেল গাছতলায়। ছবিরাণী নরম গলায় বলল, 'তাহলে আমি যাই, অসময়ে এসে বিরক্ত করলাম।'

'দাঁড়াও, মায়ের সিঁদুর নিয়ে যাও। বৈধব্য আসবে না।' জগাপাগলা মন্দিরের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে গেল। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে অস্বস্তি হচ্ছিল ছবিরাণীর। সে দূরে দাঁড়ানো জনার্দনের দিকে তাকাল। এখান থেকে সরে যেতে পারলেই বাঁচে এখন।

জগাপাগলা ফিরে এল এক আঙ্গুল সিঁদুর নিয়ে। এসে হাঁকল, 'কাছে এস।'

মাটিতে উবু হয়ে প্রণাম করল ছবিরাণী।

'বাবা, এই আশীর্বাদ করবেন না আমাকে।'

'এ্যাঁ? সেকি? তুমি বিধবা হতে চাও?'

'আমি তো তাই, স্বামী নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন। আর কখনও ফিরবেন না।'

'কে তোমার স্বামী?'

'আজ্ঞে তাঁর নাম ধরি কি করে?'

'এখানে কোন নিয়ম নেই। যে স্বামী পগার পার হয় তার নাম ধরতে দোষ নেই।'

'ওঁর নাম শিবরাম।'

'ওহো। সেই মিলিটারি থেকে যে রোগ নিয়ে এসেছিল! ছ্যা ছ্যা ছ্যা! তুমি তার বউ? ছ্যা! তা সে তোমাকে রোগ দিয়ে যায় নি তো?'

'আজ্ঞে না।'

'তা সারা জীবন কি করবে?

'জানি না।'

'যাচ্ছ কোথায়? হরিপুরে? কেন?'

'আমার বোনের খুব যন্ত্রণা হয় পেটে। বিয়ে দেব কিছুদিনের মধ্যে। অসুখ সারাতে ওষুধ আনতে যাচ্ছি।' সত্যি কথাটা বলে ফেলল ছবিরাণী।

'দাঁড়াও। মায়ের ঘুম ভাঙ্গাতেই হচ্ছে দেখছি। আমার হয়েছে জ্বালা। সকাল থেকে এক মাতাল পড়ে আছে ওখানে। তারও মায়ের দেখা চাই।' আঙ্গুল দিয়ে পেছনের চালাঘর দেখিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল জগাপাগলা। ছবিরাণী সাইকেলটাকে দেখল। মাতাল দেখলে তার খুব ভয় করে। কখন ছাড়া পাবে কে জানে!

এই সময় জগাপাগলা ফিরে এল, 'হল না। তোমাকে হরিপুরে যেতেই হবে। মায়ের ঘুম ভাঙ্গাতে পারব না। এই জবাটা নিয়ে যাও। বোনের শিয়রে রাখবে।' ছবির হাতে ফুল দিল সে।

ঠিক তখনই চালাঘর থেকে একটা লোক টলতে টলতে বেরিয়ে এল, 'আমি মায়ের দর্শন চাই। মা কোথায়? মা মাগো!'

'মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেব।' চিৎকার করে উঠল জগাপাগলা, 'আবার বেরিয়েছিস?'

'মেয়েদের গলা পেলাম বাবা। দেখতে এলাম মা নাকি?'

'হ্যাঁ, মা। মায়েরই এক রূপ।'

'তাহলে একেই প্রণাম করি।' লোকটা মাটিতে শুয়ে পড়ছিল।

জগাপাগলা ছুটে গিয়ে তার পাছায় ক্যাঁক করে লাথি কষাল। ছবিরাণী আর দাঁড়াল না। দ্রুত চলে এল জনার্দনের কাছে, 'চল, তাড়াতাড়ি পা চালাও।'

হাঁটতে হাঁটতে জনার্দন বলল, 'কি কাণ্ড গো! সনাতনদা তোমাকে প্রণাম করল?'

'সনাতনদা? কে সে?'

'আরে আমাদের নাটকের পরিচালক। ওই তো স্ত্রী-চরিত্রে মেয়ে দিতে চেয়েছিল, বেশ হয়েছে। জব্বর লাথি খেয়েছে কিন্তু মাতাল হয়ে এখানে কি করছে সনাতনদা?'

'মন্দিরে যেজন্যে সবাই আসে।' ছবিরাণীর এখন একটু অস্বস্তি লাগছিল। সেইসঙ্গে একটু মজা। লোকটা তাকে প্রণাম করল? পাকানো চেহারার বয়স্ক লোকটা। জনার্দন তখন সনাতন সম্পর্কে যাবতীয় খবর বলে যাচ্ছে। কলকাতার বড় বড় অভিনেতা-অভিনেত্রীরা সনাতনদার খুব কাছের লোক। দারুণ নাটক জানে লোকটা। সব ভাল। শুধু ওই মেয়েছেলে মেয়েছেলে বাতিকটা ছাড়া।...

হরিপুরে পৌঁছাতে চারটে বেজে গেল। এখন ছবিরাণীর ঘোমটা আবার নেমে এসেছে নাক পর্যন্ত। তার ইচ্ছে ছিল নতুন এ্যালোপ্যাথি ডাক্তারের দোকানে যাবে। কিন্তু জনার্দন তাকে জোর করছিল অবিনাশ কবিরাজের কাছে যাওয়ার জন্যে। বলল, 'লোকটা একদম ধন্বন্তরী।'

পথে আসতে আসতে সে তার মনের ইচ্ছে খুলে বলেছিল ছবিরাণীকে। শুনে খুশি হয়েছিল ছবিরাণী। যদি শ্রীনিবাসকে অবিনাশের থাবা থেকে সরানো যায় তাহলে খুব ভাল হবে। সেক্ষেত্রে জনার্দনের সাফল্য চেয়েছিল সে। এখন মুখে বলল, 'বাড়াবাড়ি করো না বাবা। ধন্বন্তরী বলতে শুরু করে দিলে এরই মধ্যে। যাচ্ছি তবে একটা কথা, আমার পরিচয় দেবে না। বলবে তোমার বউদি। বুঝলে?'

'তুমি তো আমার বউদিই।'

'আঃ। সেটা ঠিক। তার চেয়ে বেশি কিছু বলো না। আমার বোনের সঙ্গে শ্রীনিবাসের সম্বন্ধ করছি তা যদি এর মধ্যে খবর পেয়ে থাকে কবিরাজ তাহলে আর কোন চিকিৎসা করবে না, এই বলে রাখলাম।' খুব হুঁসিয়ার হয়ে বলল ছবিরাণী।

অবিনাশ কবিরাজ একাই বসেছিলেন। জনার্দনের ইচ্ছে ছিল একেবারে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে। কিন্তু পারল না। অবিনাশ গম্ভীর গলায় ডাকলেন, 'এসো। বসো। সমস্যা কি?'

জনার্দন বলল, 'আজ্ঞে আমার বউদি। রোজ রাত্রে পেটে কষ্ট হয়।'

'বসো তোমরা।'

ওরা বসল। অবিনাশ জানতে চাইলেন, 'কি ধরণের কষ্ট, ওকে বলতে দাও।'

ছবিরাণীর মুখ ঘোমটার আড়ালে ঢাকা, বলল, 'খিমচে ধরে তলপেটে।'

'নাভির কাছে?'

'না। নাভির নিচে।'
'পেট পরিষ্কার হয় ?'
'দুদিন বাদে বাদে।'
'ছেলেমেয়ে কয়টি ?'
'হয় নি।'
'কত বছরের বিয়ে ?'
'পাঁচ বছরের।'
'ব্যথাটা কি ভিতরদিকে চাগিয়ে যায় ?'
'হ্যাঁ।'
'খাওয়া-দাওয়ার ইচ্ছে কমেছে ?'
'আজ্ঞে হ্যাঁ।'
'স্বামীকে নিয়ে আসোনি কেন ?'
'আজ্ঞে, উনি বাইরে গিয়েছেন।'
'আমার কাছে কে আসতে বলল ?'
এবার জনার্দন কথা বলল, 'আজ্ঞে আমি। আপনার প্রশংসা এত শুনেছি—।'
'কার কাছে ?'
'আজ্ঞে হরিহর জ্যাঠার কাছে ?'
'নারায়ণপুরের ? অ। সেখানেই থাক বুঝি ?'
'হ্যাঁ।'
'ওই ছোকরা, শ্রীনিবাসের সঙ্গে জানাশোনা আছে ? একদম গাধা। চেনো ?'

জনার্দন কি জবাব দেবে বুঝতে পারছিল না গাধা শব্দটা শোনার পর। ছবিরাণী তার হয়ে বলল, 'কে না চেনে ! তবে আমাদের যাওয়া-আসা নেই।'

'ঠিক করেছ ! তোমার নাম কি ?'
'আজ্ঞে জনার্দন।'

ছবিরাণী বলল, দেওর বলে বলছি না। বড় ভাল ছেলে। বশীদের পড়তে পারেনি কিন্তু বাড়িতেই থাকে আর বাংলা বই পড়ে। ডাক্তারির বইও।'

'এ্যাঁ ! ডাক্তারির বই পড় ? হোমিওপ্যাথি ? কবিরাজীর কিছু জানো ? জানো না ? হুঁম। জানার ইচ্ছে আছে নাকি ?' জিজ্ঞাসা করলেন অবিনাশ।

'ওই তো ওর বাসনা। আনারসের রস থেকে সর্দিকাশি সারাবার ওষুধ দেয় সবাইকে।'

অবিনাশ মাথা নাড়লেন, 'এত সহজ নয় ব্যাপারটা। অনেক পড়াশুনা, বাস্তবজ্ঞান দরকার হে। রুগিনীর নাম কি ?' ওষুধ দেবার জন্যে উঠলেন অবিনাশ।

জনার্দন নামটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তাকে ইশারায় নিষেধ করল ছবিরাণী। তারপর নিচু গলায় জবাব দিল, 'সবিতা। সবিতারাণী দাস।'

জনার্দন হাঁ হয়ে গেল। এই নামটা ছবিবউদির বোনের। বোনের নাম নিজের বলে চালাল কেন ছবিবউদি ? এদিকে আর তর সইছে না। কবিরাজী শেখার কথা উঠেও চেপে গেল। সে কি নিজে থেকে অবিনাশকে বলবে, আপনার মেয়েকে

বিয়ে করতে চাই। তার বদলে আমাকে কবিরাজী শিখিয়ে দিন! খুব লোভ হচ্ছিল বলতে।

অবিনাশ ওষুধ নিয়ে ফিরে এলেন। একটা আলমারির পেছনে যেতে হয় তাঁকে ওষুধ তৈরী করতে। বললেন, 'পাঁচটা টাকা দাও। সাতদিন সেবন করবে। প্রভাতে মুখ না ধুয়েই একটা তারপর ঘড়ি ধরে ছয় ঘণ্টা অন্তর। দ্যাখো কি হয়। এবার পেটে হাত দিয়ে পরীক্ষা করলাম না। না কমলে সেটা করতে হবে।'

ছবিরাণী আরও ঘোমটা টানল, 'অত টাকা তো সঙ্গে নেই!'

অবিনাশ স্থির হয়ে রইলেন, 'আড়াই টাকা আছে?'

'হ্যাঁ, তা আছে।'

অবিনাশ প্যাকেট খুলে ঠিক অর্ধেক ওষুধ বের করে নিয়ে বললেন, 'সাড়ে তিনদিনের ওষুধ রইল তাহলে। ওই সময়ের মধ্যে বাকী টাকা এনে আবার নিয়ে যেও।'

ঘোমটার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে ব্লাউজের ভেতর থেকে ছোট্ট ব্যাগ বের করে আনল ছবিরাণী। গুনে গুনে খুচরো পয়সায় আড়াইটে টাকা টেবিলে রাখল। ওষুধ নিল এবং জনার্দনকে বলল, 'চল।'

জনার্দন বলল, 'আমার ব্যাপারটা?'

অবিনাশ এই মেয়েলি স্বভাবের যুবকটাকে দেখে খুবই কৌতুক বোধ করছিলেন। এখন জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার আবার কি?'

জনার্দন আর পারল না। দুটো হাত জড়ো করে বলে ফেলল, 'আমি আপনার কাছে কবিরাজী শিখতে চাই। তার জন্যে যা বলবেন তাই করতে পারি।'

'হুম্‌ম! গাঁয়ে খবরটা খুব চাউর হয়েছে বুঝি?'

'কোন্ খবর?'

'ওই হারামজাদা শ্রীনিবাসকে যে প্রস্তাব দিয়েছিলাম?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' অকপটে বলল জনার্দন, 'আপনি আমাকে বিদ্যা দিন।'

'বাড়িতে কে কে আছে?'

'আমরা এক ভাই এক বোন। বোনের বিয়ে হয়ে গিয়েছে।'

'তা দাদা বউদি তো আছে!'

'দাদা? ওহো। ঠিক নিজের নয়। জ্ঞাতি।'

'পরে দেখা করো। একটু চিন্তা করে দেখি।'

এই সময় ভেতর থেকে একটা গলা ভেসে এল, 'চিনি কি এ জন্মে কেনা হবে?'

অবিনাশ সন্ত্রস্ত হলেন। টেবিলের কোণে রাখা একটা প্যাকেট নিয়ে তিনি জনার্দনের দিকে তাকালেন, 'যাও তো হে, ভিতরে আমার মেয়ের হাতে দিয়ে এস।'

জনার্দন লজ্জায় কুঁকড়ে গেল যেন। প্যাকেটটা নিয়ে ছবিরাণীর দিকে তাকাতেই ছবিরানী বলল, 'তুমি দিয়ে এস, আমি বাইরে অপেক্ষা করছি।'

ছবিরাণী ওষুধ নিয়ে বাইরে চলে এল। রোদ এখনও মরেনি। জোরে পা চালাতে হবে গ্রামে ফেরার সময়। অবিনাশ লোকটা চামার। এর চেয়ে এ্যালোপ্যাথি ওষুধের দোকানে গেলে হত। এক টাকায় দুই-তিনটে ট্যাবলেট পাওয়া যেত। খেলেই ব্যথা কমে।

ছবিরাণী চারপাশে তাকাল। দূরে কোথাও কেউ কিছু বলছে। মাইকে গলা ভেসে আসছে। হরিপুর মন্দ জায়গা নয়। দোকানপাট বেশ। ছবিরাণী ঘোমটা তুলে সেদিকে তাকাচ্ছিল। এই সময় একটা সাইকেল এসে থামল সামনে। যে নামল তাকে দেখেই চমকে উঠল ছবিরাণী। সেই মাতালটা। এখানে চলে এসেছে ? ছবিরাণী কি করবে বুঝতে পারছিল না এমন সময় ওপাশের দরজা দিয়ে তীরের মত ছিটকে বেরিয়ে এল জনার্দন। সামনে এসে কাঁপতে কাঁপতে কিছু বলতে গিয়েই সনাতনকে দেখতে পেল, 'ওমা সনাতনদা, আপনি এর মধ্যে ঠিক হয়ে গিয়েছেন ?'

'ঠিক হয়ে গিয়েছেন মানে ?' সনাতনের গলা থমথমে।

'মানে একটু আগে আমাদের গাঁয়ে পাশের মন্দিরে আপনাকে দেখেছিলাম।'

'আমাকে ? তোমাদের ওখানে ? ঠিক আছে তো মাথা ?'

জনার্দন হকচকিয়ে গেল, 'সেকি ? তুমি ছিলে না ওখানে ?'

'কক্ষনো না। সকালে উঠেই জ্বর-জ্বর লাগছে তাই এলাম কবিরাজ মশাই-এর কাছে।'

'সেকি গো ! ও বউঠান ? সনাতনদাকে মন্দিরে দ্যাখোনি ?'

'হুঁ। ঘোমটা টেনে মাথা নাড়ল ছবিরাণী।

'এ্যাঁ ? আপনিও আমাকে দেখেছেন ?' সনাতনদার গলায় সত্যিকারের বিস্ময়।

'দেখলাম। আপনি আমাকে—, ইয়ে, না, বলতে পারব না।'

'কি করছিলাম আমি ? মজার ব্যাপার তো।'

জনার্দন বলল, 'তুমি একদম বেহেড্ ছিলে। বউঠানকে মা ভেবে প্রণাম করতে গিয়েছিলে। জগাপাগলা খুব বকল।'

সনাতন কপালে হাত ঠেকালো, 'নাঃ, মানতেই হচ্ছে। লোকটা ম্যাজিক জানে, আমি গতকাল গিয়েছিলাম, আমায় বলল কালও তোকে আসতে হবে। আমি বললাম, কভি নেহি। অথচ দ্যাখো, আমি গেলাম না আর আমাকে তোমাদের দেখিয়ে দিল।'

ছবিরাণী বলল, 'সত্যি যদি হয় তাহলে ম্যাজিক বলছেন কেন, উনি খুব জাগ্রত সাধু।'

'তা হবে। ওহে, উনি, মানে পরিচয় জানলাম না।'

জনার্দন বলল, 'ছবিবউদি। আমি বউঠান বলি। শিবরামদার বউ। একেই নাটকে নামাতে চেয়েছিল। আমাদের গ্রামের সবচেয়ে সুন্দরী।'

'আঃ ! কি হচ্ছে কি ?' ছবিরাণী লজ্জা পেল।

'চোখে দেখিনি, কানে গলা শুনেছি, তাতেই কথাটা ঠিক মনে হচ্ছে। বাঃ, এমন গলা যার সে কেন নাটক করবে না। বুঝলেন, আমাদের দেশে প্রতিভার অপচয় এভাবেই হয়। না, না, এ ভাল কথা নয়।' সনাতনের জিভ শব্দ করল।

॥ সাত ॥

হরিপুরের রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছবিরাণী শিহরিত হল।

এ কি কথা শুনছে সে! জনার্দনের কথা না হয় ছেড়ে দিল, ওর মুখে কোন রাখ-ঢাক নেই। সুন্দর অসুন্দর তেমন করে আলাদা করা যায় না। কিন্তু সনাতনদা? তিনি পর্যন্ত তার গলা শুনে বললেন সুন্দর কথাটা বেঠিক নয়। তার মধ্যে প্রতিভা দেখতে পেলেন? গলার স্বরে? প্রতিভা কি জিনিস তা ছবিরাণী সঠিক বুঝতে পারল না। তবে শব্দটি যে প্রশংসা অর্থে ব্যবহৃত হয় তা সে অনুমান করতে পারল। অর্থাৎ তার গলায় স্বর সুন্দর, খুবই সুন্দর।

কথাটা সে নতুন শুনছে না। তবে হ্যাঁ, ছেলেবেলায় সে আদৌ দেখতে ভাল ছিল না। গলার প্রশংসাও কেউ করেনি। তার যখন এগারো-বারো বছর বয়স, শরীর বদলাচ্ছে, তখন ধেউমানি গ্রামের দাদারা আমবন বাঁশঝাড়ের পাশে দেখা হলেই বলত, আহা, তুই কি সুন্দর হচ্ছিস! গ্রামের ঠানদি পর্যন্ত পনের বছর বয়সে তার গাল টিপে বলেছিল, 'এ কি রে, এ যে একদম মাখন, টুপ করে গালে তুলবে আর তুই মিলিয়ে যাবি!' তাই শুনে মা বলেছিল, 'হঠাৎ যে কি হয়ে গেল ঠানদি, আমাদের ঘরের মেয়ের শরীর এত ডাঁসা হওয়া মানায়?' তা সেই বয়সে নিজের রূপের প্রশংসা কম শোনেনি। বিয়ে হল, শিবরাম তো যাকে বলে উন্মাদ হয়ে গেল তার শরীর দেখে। তারপর সে মিলিটারি হল। ছুটিতে এসে আদর করার সময় বলত, 'বুঝলে, পৃথিবীতে অনেক মেয়ে আছে, শহুরে মেয়েও তো কম দেখলাম না, তোমার মত শরীর কোন শালীর নেই।' আদরে বিভোর হয়ে গিয়েছিল সে। কথাটার ভেতরের মানেটাকে ধরতে একটুও ইচ্ছে করেনি। পরে রাগ হয়েছে। শহুরে মেয়ে দেখে বেড়াচ্ছে মানে তাদের সঙ্গে শোওয়াবসা করছে। খুব খেপে গিয়েছিল সেই সময়। তা খেপে কি হল? সেই মানুষ তো উধাও! আজ চাপাচাপি করেও তো খবরটা সবার জানা। খারাপ মেয়েছেলের শরীর থেকে রোগ পেয়ে নিজের শরীর নষ্ট করেছে লোকটা। হয়তো সেই লজ্জায় আর দেশে ফেরেনি। এই খবরটি পাওয়ার পর একেবারে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল ছবিরাণী। বাড়িতে খারাপ বউ থাকলে যে স্বামী ভাল মেয়ের জন্যে বারমুখো হয় তাতে কোনো আসে যায় না, কিন্তু ভাল বউকে ছেড়ে খারাপ মেয়ের জন্যে যে ভোগে তাকে কি বলা যায়? ধাক্কাটা এমন যে সব মান অভিমান রাগ আশা হঠাৎই কর্পূরের মত মিলিয়ে গিয়েছিল। হ্যাঁ, ধেউমানি ফিরে যেতে পারত ছবিরাণী কিন্তু যায়নি। শ্বশুরের ভিটেতেই পড়ে আছে শাশুড়ীর সঙ্গে। আর এই থাকাটা যে খুব শান্তির তা তো নয়! শাশুড়ী দিনরাত গঞ্জনা দিয়েই চলেছে। গাঁয়ের পাঁচটা কুলোক কানে কুমতলব ঢোকাবার চেষ্টা করে গেছে সমানে। শেষ পর্যন্ত হরিহর জ্যাঠা! তবে মানুষটি সরাসরি তাকে কোন প্রস্তাব দেননি। হাবেভাবে যেটা বোঝাবার চেষ্টা করেছেন সেটা সে বুঝে নিয়েছে। কিন্তু

হরিহর তার বাপের বয়সী। পয়সা প্রতিপত্তি ধুয়ে তো কেউ জল খাবে না!

ছবিরাণী তাকাল ঘোমটার আড়াল দিয়ে। জনার্দন কথা বলছে সনাতনের সঙ্গে। লোকটা তাকে নতুন কথা শোনাল। প্রতিভা! অনেকে তার অনেক প্রশংসা করেছে কিন্তু এমন শব্দ দিয়ে কেউ করেনি। এই সময় জনার্দন ছবিরাণীর কাছে এগিয়ে এল, 'বউদি, সনাতনদা খুব ধরেছেন। বলছেন হরিপুরেই তোমরা আস না, তা এলে যখন তখন একবার আমার বাড়িতে পা দিতেই হবে। আমি বললাম, গাঁয়ে ফিরতে দেরি হয়ে যাবে। উনি শুনছেন না।'

ছবিরাণী জিজ্ঞাসা করল, 'কতদূরে বাড়ি?'

'এই তো কাছেই। দু পা হাঁটলেই পেঁছে যাওয়া যাবে। অবশ্য বাড়ি বলতে বাসাবাড়ি। তাও ঠিক বাড়ি নয়। একটা ঘর কল-পায়খানা।' সনাতন এগিয়ে এল, 'আপনি গেলে আমি ধন্য হব। সংকোচ করবেন না, ত্রিভুবনে আমার কেউ নেই।'

ছবিরাণী কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। এই নিয়ে যদি গল্প ওঠে? হরিপুর থেকে সেই গল্পটা গাঁয়ে পেঁছতে দেরি হবে না। জনার্দন বলল, 'বউদি, পাঁচ মিনিট তো ব্যাপার! সনাতনদা একটা নাটকের বই দেবে, নিয়েই চলে আসব।'

অতএব ছবিরাণী যাত্রা করল। জনার্দন আর সনাতন আগে আগে চলেছে, পেছনে ছবিরাণী। হাঁটতে হাঁটতে ছবিরাণীর মাথায় আবার সেই ভাবনাটা এল। জগাপাগলা খুব কালীভক্ত, কালীকে নিজের মায়ের মত দ্যাখে এই গল্প সবার জানা। কিন্তু কারো অসুখ সারিয়ে দেয়নি, কারো ভাগ্যে ধনসম্পত্তি এনে দেয়নি। সেই জগাপাগলার ওখানে মাতাল সনাতনকে সে একটু আগে দেখে এসেছিল। অথচ সনাতন বলছে সেখানে আদৌ যায়নি। ওই পাজামা পাঞ্জাবি তো সেই সনাতনের পরনে ছিল। জগাপাগলার যদি অলৌকিক ক্ষমতা থাকে তাহলে খামোকা সে সনাতনকে হাজির করে সেটা দেখাতে যাবে কেন? এমন কি সাইকেলটাও সেখানে এনে দেবে?

আবার ওইরকম একটা মাতাল তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক হয়ে গেল তাও তো বিশ্বাস করা চলে না। একদিন জগাপাগলাকে জিজ্ঞাসা করলে কেমন হয়? অবশ্য ছবিরাণীর মোটেই সাহস হয় না একা ওই মন্দিরে যেতে!

'এই যে, এই বাড়ি!' টিনের দরজা খুলে সাইকেল নিয়ে ভেতরে ঢুকল সনাতন। ছোট্ট উঠোন। টিনের চালার একখানা ঘর। ঘরের ভেতর তক্তাপোশ, একখানা চেয়ার। সনাতন বলল, 'বসুন বসুন। এই খাটেই বসুন। আঃ, ঘর যেন আলো হয়ে গেল। কি খাবে হে?'

জনার্দন বলল, 'না না, খাব কি? আপনি বইটা দিন।'

'বই নিশ্চয়ই দেব। কিন্তু বাড়িতে এসে না খেয়ে যাবে কি?'

'ঠিক আছে! আপনি এই বাসায় অনেকদিন আছেন?'

'না না। তোমাদের গাঁ থেকে ফিরে এসে খবর পেলাম খালি হয়েছে। নিয়ে নিলাম। কেমন বাড়ি বলুন?'

'খুব ভাল।' মৃদুস্বরে বলল ছবিরাণী।

'আপনি কিন্তু এখনও সংকোচ করছেন। এখানে তো চতুর্থ ব্যক্তি কেউ নেই!'

ছবিরাণী শব্দ করে হাসল। কিন্তু ঘোমটা খুলল না। জনার্দনকে ইশারায় উঠোনে ডেকে নিয়ে গেল সনাতন, 'তোমরা বসো, আমি সামনের দোকান থেকে রসগোল্লা নিয়ে আসি।'

জনার্দন আপত্তি করল, 'না না, রসগোল্লার দরকার নেই।'

'চুপ করো। উনি প্রথমবার এলেন।'

সনাতন বেরিয়ে গেল। জনার্দন ফিরে এল ঘরে। এসে বলল, 'সনাতনদা মিষ্টি আনতে গিয়েছেন।'

'ওমা, কেন?' মাথা থেকে ঘোমটা খসে পড়ল।

'তোমাকে খুব খাতির করছে। ভাল লোক।'

'তখন কি যেন বলতে গিয়ে বাধা পড়ল?'

'কখন?'

'আঃ, কবিরাজের মেয়েকে চিনি দিয়ে যখন বাইরে এলে—!'

শোনামাত্র জনার্দনের মুখ লাল হয়ে উঠল, সে মাথা নিচু করল।

মজা পেল ছবিরাণী। সে হাসল, 'ওমা কি হয়েছিল ভেতরে?'

'কাউকে বলবে না তো?'

'তুমি না বলতে বললে বলব না!'

দম নিল জনার্দন, 'ভেতরে গেলাম। ভেতরে একটা উঠোন। অনেক গাছ। গিয়ে বললাম, এই যে চিনি, ডাক্তারবাবু পাঠিয়েছেন।' বলামাত্র উঠোনের ওপাশের একটা ঘর থেকে ডাক্তারবাবুর মেয়ে বেরিয়ে এল। আমাকে কিছুক্ষণ দেখে বলল, 'তুমি আবার কে? জন্মে দেখিনি। বাবার নতুন চেলা?'

'আমি কি বলব বুঝতে পারছিলাম না। মাইরি, প্রায় আমার সমান লম্বা! কি বড় বুক, কি পাছা, সব পাহাড়ের মত! আর গায়ের রঙ আমাদের কালু মোষের মত। চুলগুলো মাথার ওপরে চুড়ো করে বাঁধা। আমার হাত থেকে চিনির ঠোঙা নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, জিভ অসাড় হয়ে গেল কেন? বাপ তো সহজে কাউকে ঢুকতে দেয় না ভেতরে, নিশ্চয়ই মতলব আছে বুড়োর। তুমি পুরুষমানুষ তো, গলার স্বর যেন কেমন লাগল! সঙ্গে সঙ্গে আমার খুব ভয় লাগল। মেয়েটা যদি আমি পুরুষমানুষ কিনা পরীক্ষা করতে চায়, তাহলে আমি ওর সঙ্গে পেরে উঠব না। আর দাঁড়াই, পড়ি কি মরি করে পালালাম! বেরুবার সময় ডাক্তারের সঙ্গে একটাও কথা বলিনি।'

খিলখিল করে হাসি, তারপর সেটা বেড়ে গেল এমন যে বুকে হাত দিয়ে নিজেকে সামলালো ছবিরাণী। জনার্দন ফ্যাসফেসে গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি হাসছ বউদি?'

হাসির রেশ তখনও শরীরে, ছবিরাণী বলল, 'ওমা, হাসব না? একটা মেয়ে তোমাকে পরীক্ষা করবে বলল? এমন কথা জীবনে শুনিনি বাবা!' বলে আর একটু হাসল ছবিরাণী, 'তা দিলে পারতে ওকে পরীক্ষা করতে!'

'বউদি!' চোখ বড় করল জনার্দন। তারপর নিঃশ্বাস ফেলল, 'ওরা ঠিকই বলে।'

'কারা?'

'গাঁয়ের ছেলেরা। আমাকে নাকি মেয়ে-মেয়ে দেখায়।'

'আমার তো ভালই লাগে। তুমি কাঠখোট্টা নয়। তা পছন্দ হয়েছে তো?'

'কি?'

'কবিরাজের মেয়েকে? কবিরাজী শিখতে গেলে ওঁর মেয়েকে বিয়ে করতে হবে।'

'অসম্ভব।'

'ওমা, অসম্ভব কেন? যা স্বাস্থ্য বললে তাতে তো মনে হয় খুব খাটতে পারবে। রোগাপটকা বউ আনলে ক'দিনের মধ্যে পাটকাঠি হয়ে যাবে।' ছবিরাণী হাসল, 'তা বাবুর কি রকম মেয়েকে বউ করতে ইচ্ছে?'

জনার্দন মুখ ফেরাল, 'তোমার মত।'

আবার হাসি উছলে উঠল। জনার্দন হতভম্ব। ছবি বউদিকে সে এভাবে হাসতে কখনও দ্যাখেনি। এই সময় দরজায় এসে দাঁড়াল সনাতন। হাতে ছোট্ট চ্যাঙারি। তাকে দেখে চট করে হাসি থামিয়ে ঘোমটা তুলতে যাচ্ছিল ছবিরাণী, সনাতন বলে উঠল, 'ও কি, আবার মেঘ এসে চাঁদ ঢাকছে কেন? আমি কি শত্রু?'

ছবিরাণী ঘোমটা খোঁপা পর্যন্ত তুলল, 'আপনি বাড়িয়ে কথা বলছেন!'

'বাড়িয়ে? কোনটা বাড়িয়ে বললাম?'

'ওই যে, চাঁদফাঁদ—! আমি তো খুবই সাধারণ।'

'এটাও একটা গুণ। বিনয়। বিনয় সবার থাকে না। বিনয় কি জিনিস, জানো জনার্দন? দামী শাড়ি দেখেছ? তাঁতের শাড়ি? জমি যতই দামী হোক, যদি সুন্দর পাড় দু'দিকে না থাকে তাহলে কোন মূল্য নেই। বিনয় ওই পাড়ের মত।'

সনাতন রসগোল্লা এগিয়ে ধরল, 'এখান থেকেই তুলে নাও সবাই। এখন আর প্লেটফ্লেট খুঁজতে পারব না।'

অনেক অনুরোধে ছবিরাণী একটা মিষ্টি নিল। গোটাছয়েকের মধ্যে জনার্দন তিনটে পেটে পুরল। জল খাওয়া হলে তক্তাপোশের নিচ থেকে একটা টিনের সুটকেস টেনে বের করল সনাতন। ডালা খুলে বেছে বেছে একটা মলাট ছেঁড়া চটি বই বের করল। বইটা হাতে নিয়ে সুটকেস আবার তক্তাপোশের নিচে ঢুকিয়ে উঠে দাঁড়াল সে, 'এই বইটি আমাকে নিজের হাতে উপহার দিয়েছিলেন নরেশ মিত্র মশাই। খুব বড় অভিনেতা পরিচালক ছিলেন তিনি। একটি মাত্র স্ত্রীচরিত্র আছে।' বলেই সরাসরি জিজ্ঞাসা করল ছবিরাণীকে, 'আপনি করবেন?'

মাথা নাড়ল ছবিরাণী, 'আমি পারবই না।'

'কে বলেছে? কোনদিন চেষ্টা করেছেন?' বইয়ের পাতা ওল্টালো সনাতন। বিশেষ একটা জায়গা বের করে বলল, 'এই জায়গাটা শুনুন। ছেলে বলছে, মা, আমার বাবা কোথায়? বাবা বাড়িতে আসে না কেন? মা জবাব দেয় না। ছেলে বলে, ও মা কথা বলছ না কেন? মা তখন বলে, যে মানুষ দেশের স্বার্থ ছাড়া আর কিছু বোঝে না তার কথা আমি বলব কি করে? দেশ, দেশই সব তার কাছে। আমরা কেউ নই। সনাতন বলল, অনেকখানি অভিমান থাকবে এই কথাগুলো বলার

সময়। আমি আর একবার পড়ছি, শুনুন।'

ছবিরাণী কৌতূহলী হল। সে শুনল। এইবার সনাতন বলল, 'তুমি ছেলের সংলাপ বলবে জনার্দন, আপনি মায়েরটা। জনার্দন বল, মা, আমার বাবা কোথায় ?'

জনার্দন বলল, 'মা, আমার বাবা কোথায় ? ও মা, কথা বলছ না কেন ?'

ছবিরাণীর দিকে ইশারা করল সনাতন হাত তুলে। ছবিরাণীর গলার স্বর আটকে গেল। কথা বলতে গিয়েও পারল না। সনাতন মাস্টারের ভঙ্গীতে বলল, 'ট্রাই, আর একবার ট্রাই করুন। যে মানুষ দেশের স্বার্থ ছাড়া—।'

ছবিরাণী বলল, 'যে মানুষ দেশের স্বার্থ ছাড়া আর কিছু বোঝে না তার কথা আমি বলব কি করে ? দেশই সব তার কাছে। আমরা কেউ নই !'

পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল সনাতন। কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর বলল, 'অদ্ভুত ! এত ভাল ডেলিভারি প্রথমবারে কাউকে দিতে শুনিনি আমি। কি ভাব ফুটল ! তবে একটা ভুল হয়েছে। দেশ শব্দটা দুবার বলতে হবে। দেশ, দেশই সব তার কাছে। প্রথম দেশটা বলে একটু পজ, মানে জোর পড়ল। আহা, সত্যি কথাই বলেছি। আপনি অভিনয় না করলে প্রতিভার অপচয় হবে। আপনার মত ছাত্রী পেলে আমি দেখিয়ে দিতে পারতাম।'

জনার্দনও মুগ্ধ। সে বলল, 'তুমি খুব সুন্দর বললে বউদি।'

'ধ্যাৎ, আমার দ্বারা কি এসব হয় !'

'আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না ?' সনাতন এগিয়ে এল।

'কেউ দেখিয়ে দিলে একটু চেষ্টা করতে পারি।' ছবিরাণী মাথা নামাল।

'আমি তোমাকে দেখাব। দ্যাখো, ভাল গুরু পাওয়া যেমন শক্ত, ভাল ছাত্র পাওয়াও কিন্তু ভাগ্যের কথা। জনার্দন, নগেনকে বলো এই নাটকটা ধরতে।' সনাতনের কথা শেষ হওয়ামাত্র বাইরে থেকে কেউ ডাকল, 'সনা, সনাতন আছো ?'

সঙ্গে সঙ্গে সনাতন কেমন কুঁকড়ে গেল। চাপাস্বরে বলল, 'সব্বোনাশ হয়েছে ! এই সময়ে আবার মতীশ রায় এখানে কেন ?'

জনার্দন জিজ্ঞাসা করল, 'কে মতীশ রায় ? মাতাল মতীশ ?'

ঠোঁটে আঙুল দিয়ে সনাতন বলল, 'চুপ ! তোমরা যে এখানে আছ তা আমি ওকে জানাতে চাই না। দাঁড়াও, বিদায় করে আসছি।' সনাতন বেরিয়ে গেল।

ছবিরাণী নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কে গো ?'

'মতীশ রায়। খুব মাতাল। মেয়েছেলের রোগ আছে।'

'রোগ মানে ?'

'আমি তোমাকে বলতে পারব না।' মাথা নাড়ল জনার্দন।

বাইরে তখন কথা শোনা যাচ্ছে। মতীশ রায় জড়ানো গলায় বলছে, 'কি ব্যাপার সনা, ভরবিকেলে নতুন বাড়িতে ঘাপটি মেরে রয়েছ, ডেকেও সাড়া পাচ্ছি না যে !'

সনাতন বলল, 'এই একটু জিরোচ্ছিলাম।'

'জিরোচ্ছিলে ? বাঃ ! তা বাইরে দাঁড়িয়ে থাকব নাকি ?'

'আমার গরীবের ঘরে কি আসবেন ?'

'দ্যাখো, মালের গ্লাসের দোস্ত করেছি তোমাকে, গরীব বলে তো ভাবিনি।'

'তা না, আসলে কিছু আত্মীয়স্বজন এসেছে তো—।'

'আত্মীয় ? তোমার তো তিনকুলে কেউ নেই !'

'ওই, হয়ে গেছে আর কি !'

'উঁহু। কেমন গন্ধ বেরুচ্ছে তোমার কথায়। তা আত্মীয়দের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দাও। আমি তো তোমার দোস্ত !'

'মানে ওরা খুব পর্দানশীন তো, লজ্জা পাবে।'

'পর্দানশীন ? মানে মেয়েছেলে ? ও বাবা ! তুমি নতুন ঘর নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মেয়েছেলে এনে ফেলেছ ? তাহলে তো দেখতেই হচ্ছে !'

ছবিরাণী তক্তাপোশ থেকে নেমে পড়ল। ঘোমটা টেনে জনার্দনকে বলল, 'চল, আর এখানে বসে থাকব না।'

'ওদের সামনে দিয়েই যাবে ?'

'হ্যাঁ। একটাও কথা বলবে না। দাঁড়াবে না ডাকলেও।'

প্রথমে ছবিরাণী, তার পেছনে জনার্দন উঠোন পেরিয়ে রাস্তার দিকে এগোল। টিনের দরজার ওপাশে দাঁড়ানো সনাতন আর মতীশ রায় কিছু বলার আগেই তারা হনহনিয়ে পাশ কাটিয়ে রাস্তায় চলে এল।

কানে এল মতীশ কিছু বলছে আর সনাতন তার প্রতিবাদ করছে। অনেকটা চলে আসার পর ছবিরাণী জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার সনাতনদা মদ খায় ?'

'ওই, মানে শিল্পীদের তো একটু খেতে হয় !'

'তাই নাকি ?'

'হ্যাঁ, তাই শুনেছি।'

'তাহলে আমাদের গাঁয়ের অনন্ত মাতালও শিল্পী ! দিনরাত মদ খায় !'

'তা নয়। মাতাল হলেই কি শিল্পী হওয়া যায় ? কিন্তু শিল্পী একটু-আধটু মদ খায়, তবে মাতাল হয় না।' গুছিয়ে বলল জনার্দন।

জোরে পা চালাচ্ছিল ওরা। সন্ধ্যে নেমে গেছে। ঘুরপথ ছেড়ে এবার সোজা পথে ফিরছে সময় বাঁচাতে। ক্রমশ অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ পেছনে সাইকেলের ঘণ্টি বাজল। একেবারে কাছে এসে সনাতন বলল, 'অনেক কষ্টে মতীশকে কাটালাম। তোমরা বইটা ফেলে এসেছ, তাই দিতে এলাম।'

জনার্দন বইটা নিল। ছবিরাণী দাঁড়িয়ে পড়ল।

সনাতন বলল, 'তুমি রাগ করেছ ছবিরাণী ?'

'আমি কেন রাগ করতে যাব ?' ঘোমটার আড়ালে কথা বলল ছবিরাণী।

'আসলে লোকটা খুব খারাপ তো !'

'মদের দোস্ত খারাপ হতে যাবে কেন ?'

'আগে খেতাম। সত্যি কথা। এখন কম খাই।'

'জগাপাগলার ওখানে মাতলামো করে তাই ভাল হতে সময় লাগে না !'

ছবিরাণী এগিয়ে গেল, 'জনার্দন, চল, দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

সনাতন এগিয়ে এল, 'আমি ক্ষমা চাইছি।'

'ক্ষমা-টমা চাওয়ার কি দরকার ? আমি মাতালদের সঙ্গে কথা বলি না।'

'ঠিক আছে, আমি কথা দিচ্ছি মদ খাবো না আর।'

'আমাকে কথা দেওয়ার দরকার নেই।' ছবিরাণী হাঁটছিল!

'আমি নিজের কাছে কথা দিচ্ছি।'

'ঠিক আছে।'

'সত্যি? ঠিক আছে তো?' সনাতন দাঁড়িয়ে গেল। ছবিরাণী হাঁটা থামাল না। জনার্দন সনাতনের কাছে বিদায় নিয়ে দৌড়ল ছবিরাণীর সঙ্গে পা মেলাতে। কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'সনাতনদা সত্যি খুব লজ্জা পেয়েছে!'

ছবিরাণী উত্তর দিল না। সনাতনের উঠোন থেকে বেরুবার সময় ঘোমটার ফাঁক দিয়ে সে সতীশ রায়কে দেখেছে। লোকটা তার দিকে তাকিয়ে ছিল। এমন কুৎসিত দৃষ্টি সে কখনও দ্যাখেনি। মনে হচ্ছিল তার শাড়ি জামা ভেদ করে দৃষ্টিটা শরীরকে নোংরা করে দিচ্ছে। রাগে গা জ্বলছিল। এই সময় দূরে টর্চের আলো দেখা গেল। আলোটা দুলতে দুলতে এগিয়ে আসছে। গাঁয়ের কেউ এই সময়ে সাধারণত হরিপুরে যায় না। জনার্দন ফিসফিসে স্বরে বলল, 'হরিহর জ্যাঠা!'

॥ ৮ ॥

সনাতন চট করে সাইকেলসমেত দাঁড়িয়ে পড়ল, 'ঠিক আছে, আমি যাই।'

ছবিরাণী হাসল, 'ওমা, যাবেন কেন? এতদূরে এলেন যখন তখন গ্রামে চলুন।'

টর্চের আলো তখন বেশ কাছে। হরিহরের গলা শোনা গেল, 'কে?'

ছবিরাণী জনার্দনকে চাপা গলায় বলল, 'জবাব দাও।'

জনার্দন গলা তুলল। ফিনফিনে মেয়েলি গলায় শব্দ ছুটল, 'আমরা!'

ততক্ষণে হরিহর কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর টর্চ সরাসরি মুখে আলো ফেলছে না যদিও, তবু চিনতে অসুবিধে হল না। একটু অবাক হয়েই বললেন, 'ও, তোমরা!'

জনার্দন বলল, 'জেঠু, আমরা হরিপুরে গিয়েছিলাম। বউদির ওষুধের দরকার ছিল। তা ওখানেই সনাতনদার সঙ্গে দেখা। উনি এগিয়ে দিতে এসেছেন। সনাতনদা, মানে আমরা যে নাটক করছিলাম তার পরিচালক।'

হরিহর সনাতনের দিকে তাকালেন না, 'সেই নাটক তো অনেককাল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আবার পিছুটান কেন? যাও, তোমার শাশুড়ী খুব চিন্তা করছেন।'

শেষের কথাটা যার উদ্দেশে বলা, সে যেন একটুও অবাক হল না। জনার্দন জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি এই সময় কোথায় চললেন জেঠু?'

হরিহর একটু নড়ে উঠলেন, 'আমি? বেড়াতে বেড়াতে চলে এলাম আর কি! চল, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই।'

এবার সনাতন কথা বলল, 'আমি তাহলে চলি।'

ছবিরাণী হাসল, 'ওমা, আমাদের ওখানে যাওয়ার কথা হল না?'

'না, আজ থাক। রাত হচ্ছে।' সনাতন সাইকেল ঘোরাল। হরিহরের বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না, তাঁকে দেখে খুব বেকায়দায় পড়ে গিয়েছে সনাতন। তিনি লোভ সামলাতে পারলেন না, 'হ্যাঁ, ওকে আবার টানাটানি কেন? বেশি রাত হয়ে গেলে ওঁর অনেক অসুবিধে হবে। আমাদের গ্রাম তো নেহাৎই কাঠখোট্টা।'

সনাতন কিছু বলতে গিয়েও বলল না। সাইকেল চালিয়ে অন্ধকারে তার শরীর মিলিয়ে গেল। হরিহর ফেরার পথ ধরতেই ওরা তাঁর সঙ্গ নিল। চুপচাপ কিছুটা হাঁটার পর হরিহর জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওষুধ আনতে যাওয়া হল, কার অসুখ?'

'আমার।' ছবিরাণী জবাব দিল।

'কি হয়েছে?' অবাক হলেন হরিহর।

'নানা রকম মেয়েলি রোগ।' ছবিরাণী কথাগুলো হালকা গলায় বলল।

'ও!' সঙ্গে সঙ্গে অবিনাশ কবিরাজের কথাগুলো মনে পড়ে গেল হরিহরের।

শিবরামের শরীরে রোগ এসেছিল। সেই রোগ কি সে স্ত্রীর শরীরে দান করে গেছে? ওটাকেই কি মেয়েলি অসুখ বলছে ছবিরাণী? তিনি গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কোন্ ডাক্তারকে দেখালে?'

জনার্দন জবাব দিল, অবিনাশ কবিরাজের কাছে গিয়েছিলাম।'

'তিনি কি বললেন?'

ছবিরাণী জবাব দেবার সুযোগ পেল না, জনার্দন আগবাড়িয়ে বলল, 'বউদির পেটে ব্যথা হয় মাঝে মাঝে। অবিনাশ কবিরাজ তার ওষুধ দিয়েছেন। সঙ্গে বেশী টাকা না থাকায় কয়েকদিনের ওষুধ নিয়েছেন বউদি।'

'পেটে ব্যথা হয়?' মন থেকে যেন আচমকা অস্বস্তিটা চলে গেল হরিহরের।

'হ্যাঁ।' জনার্দন মাথা নাড়ল।

ছবিরাণী মনে মনে রেগে যাচ্ছিল জনার্দনের ওপর। এত আগবাড়িয়ে কথা বলার কি দরকার? সনাতনকে দেখামাত্র মানুষটার মুখের চেহারা দেখেছে সে। সনাতনের উপস্থিতি সহ্য করতে পারছিলেন না হরিহর এটা বুঝতে অসুবিধে হয়নি। যেন নিজের বউকে পরপুরুষের সঙ্গে দেখেছেন! সনাতন যদি লেজ গুটিয়ে না পালাতো তাহলে আর একটু মজা করা যেত। কিন্তু জনার্দনটাকে থামানো দরকার। এই সময় হরিহর জিজ্ঞাসা করলেন, 'জনার্দন, তোমার হাতে কি?'

জনার্দন পুলকিত হল, 'আজ্ঞে, নাটকের বই। সনাতনদা দিল।'

'আবার নাটকের বই নিয়ে কি হবে?'

'আজ্ঞে, একটি মাত্র স্ত্রীচরিত্র।'

'তুমি করবে?'

'আমার তো সেই রকম ইচ্ছে ছিল কিন্তু সনাতনদা বৌদিকে দিয়ে রিহার্সাল করিয়েছেন। আর কি সুন্দর বললেন বউদি!'

'সে কি? ওষুধ আনতে গিয়ে নাটকের রিহার্সাল দেওয়া হয়েছে?'

'না, মানে, সনাতনদা জোর করে ওঁর বাড়িতে ধরে নিয়ে গেলেন, তখন—।'

'তোমরা ওই মদো-মাতালের বাড়িতেও গিয়েছিলে!' বিস্ময় চাপা রইল না হরিহরের গলায়।

জনার্দন বুঝল, কথাটা বলা ঠিক হয়নি। সে শোধরাবার জন্যে বলে উঠল, 'না না, বেশিক্ষণ থাকিনি। হরিপুরের মতীশ রায় আসামাত্র চলে এসেছি।'

'মাতাল মতীশ? সে তোমার বউদিকে দেখেছে?'

'দেখবে কি করে? মাথায় ঘোমটা ছিল বউদির।'

'ও। উনি বোধহয় সনাতনের সামনে ঘোমটা দেন না?'

এবার ছবিরাণী কথা বলল, 'জনার্দন, বড়দের কথার মধ্যে তুমি কেন থাকছ? ওঁর যদি কিছু জিজ্ঞাসা করার থাকে তাহলে সেটা আমাকেই জিজ্ঞাসা করতে পারেন।'

হরিহর বললেন, 'সেই ভাল। জনার্দন, এইসব কথা গাঁয়ে গল্প করে বলার দরকার নেই। মানুষের মন বড় বিচিত্র। কি থেকে কি রটবে তা কেউ বলতে পারে না।'

দূরে নারাণপুরের আলো দেখা যাচ্ছিল। এইসময় পেছনে সাইকেলের ঘণ্টা শোনা গেল। এরা একপাশে সরে দাঁড়াতে সাইকেলটা চলে যাচ্ছিল, জনার্দন চিৎকার করে ডাকল, 'অ্যাই, নগেন—নগেন না?'

সাইকেলটা দাঁড়িয়ে গেল। নগেনের গলা শোনা গেল, 'কিরে, তুই এখানে?'

জনার্দন ছবিরাণীকে বলল, 'যাই আমি?' বলে দাঁড়াল না। এক দৌড়ে দূরত্বটা অতিক্রম করে নগেনের সাইকেলের ক্যারিয়ারে উঠে বসল। সাইকেলটা একটু টলে গ্রামের দিকে এগিয়ে যেতে হরিহর আবার হাঁটতে শুরু করলেন। এখন চারপাশে বেশ অন্ধকার। তাঁর তিন হাত দূরে ছবিরাণী হাঁটছে মাথা উঁচু করে। আজকের এই সমস্ত ব্যাপার তাঁর খুব খারাপ লাগায় অন্যরকম উত্তেজনায় হৃদয় আক্রান্ত হচ্ছিল।

ছবিরাণী ধীরে ধীরে হাঁটছিল। প্রায় দ্বিগুণ বয়সী একটি মানুষকে সে বেশ ভালভাবেই বুঝতে পারছিল। হরিহর ইচ্ছে করলে অনেক কিছু করতে পারেন। শিবরামের চাষের জমি ওঁর কাছে বাঁধা আছে। চাষ করিয়ে যে ফসল পাওয়া যায় তার কিছুটা সেই বাবদ ওঁকে দিতে হয়। ইচ্ছে করলে পুরোটাই তিনি নিয়ে নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে সারাবছর পেটে ভাত জুটবে না হরিহর তা করেন না। গ্রামের কারো সঙ্গেই খারাপ ব্যবহার করার নজির তাঁর নেই। ছবিরাণী আড়চোখে হরিহরকে দেখল। বয়স বোঝা যাচ্ছে না হাঁটা দেখে। সে নিরীহ গলায় বলল, 'কি বলছিলেন?'

অন্ধকারে থম লাগল হরিহরের, 'কি আমি? কিছু না তো!'

হাসল আলতো শব্দ করে ছবিরাণী, 'ওমা, জনার্দনকে বলা হচ্ছিল না?'

'ও। আমি বললেই বা শুনছে কে?'

'বাঃ! জনার্দনকে বলা যায় আমার বিষয়ে, আমাকে বলতে আপত্তি কেন?'

হরিহর নিঃশ্বাস নিলেন, 'অবিনাশ কবিরাজ তোমার পরিচয় জেনেছেন?'

'না। জনার্দন বলেছে আমি ওর বউদি, এই পর্যন্ত।'

'ভাল করেছ।'

'কেন, ভাল কেন?'

'উনি জেনে গিয়েছেন তোমার বোনের সঙ্গে শ্রীনিবাসের বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে। ওঁর ইচ্ছে ছিল মেয়ের সঙ্গে শ্রীনিবাসের বিয়ে দেন।'

'তা জানি। জনার্দনের ইচ্ছে, ওঁর শিষ্য হবে। তাই আমার সঙ্গী হয়েছিল।'

'জনার্দন? অবিনাশ রাজী হয়েছেন?'

'সেই রকমই মনে হল। সম্ভবতঃ মেয়ের জন্য পাত্র পাচ্ছেন না।' ছবিরাণী হেসে উঠল, 'কিন্তু এসব কথা তো আপনি তখন বলতে চাননি!'

'ও, হ্যাঁ। কাজটা তুমি ঠিক করছ না ছবিরাণী!'

'কোন্ কাজটা?'

এই সনাতনের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠতা। লোকটা মাতাল, কুলহীন। ওর সঙ্গী মতীশ রায় লম্পট। ওদের সবাই চেনে। তাদের সঙ্গে তোমার মত ঘরের বউয়ের মেলামেশা ঠিক নয়। ওরা তোমাকে বিপদে ফেলবে।'

'ওমা, আমি ঘনিষ্ঠতা করলাম কোথায় ? দেখা হতে বাড়িতে যেতে বললেন। আমি অনেক আপত্তি করলাম, শুনলেন না।'

'হুম্। বাড়ি যাওয়া অন্যায় হয়ে গেছে।'

'কেন ?'

'ও তোমার ক্ষতি করতে পারত।'

'কি ক্ষতি ?' আবার হাসল ছবিরাণী।

'আঃ! তুমি বোঝ না ?'

'ও। তা জনার্দন তো সঙ্গে ছিল।'

'জনার্দন! ওটা একটা পুরুষ নাকি ?'

'আমার ক্ষতি কেউ করবে না। যা করার ভগবান করে দিয়েছেন।'

হরিহর মাথা নাড়লেন, 'তা ঠিক। কিন্তু সেই ধাক্কা তুমি সামলে উঠেছ এইসব মানুষকে বিশ্বাস করো না ছবিরাণী।'

'কাদের বিশ্বাস করব ?'

জবাব দিতে পারছিলেন না হরিহর। তাঁর গলা বুঁজে গেল। ছবিরাণী বলল, 'বোনটার বিয়ে দিতে চাই কিন্তু আমি কি নিয়ে থাকব বলুন ? আমি তো কাদুবুড়ির মত থুত্থুরে হয়ে পড়িনি। অন্য সাধআহ্লাদ না মিটুক, কিছু একটা নিয়ে থাকি!'

অনেকখানি সাহস সঞ্চয় করে বলে ফেললেন হরিহর, 'একটা কথা বলব ?'

'বলুন।'

'যদি খারাপ লাগে, তাহলে পাঁচকান হবে না তো ?'

'খারাপ লাগার মত কথা আপনি বলতেই পারেন না!'

'ইয়ে, মানে, শিবরাম আজও আছে কিনা সে খবর নিয়ে যদি বোঝা যায় তার আর ফেরার সম্ভাবনা নেই, তাহলে তুমি আবার বিয়ে করবে ?'

'বিয়ে ? আমি ?' আঁতকে উঠল ছবিরাণী।

'হ্যাঁ। তোমার বয়স চেহারা অন্যান্য গুণ কেন মিছিমিছি নষ্ট হবে ?'

'আমাকে কে বিয়ে করবে ? যার স্বামী খারাপ মেয়েমানুষের সঙ্গে সঙ্গ করে রোগ নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়, তার সঙ্গে লোকে ফষ্টিনষ্টি করতে পারে কিন্তু বিয়ে করবে কেন ? দেশে কি কুমারী মেয়ের অভাব ?'

'ওটা তুমি আমার ওপরে ছেড়ে দাও।'

'ওমা, আপনার হাতে তেমন পাত্র আছে নাকি ?'

'সেটা আমি বুঝব।'

'কিন্তু আমার যদি পাত্র পছন্দ না হয় ? ধরুন, আপনি একটা বুড়োহাবড়া দোজবরে পাত্র জুটিয়ে আনলেন, আমি মেনে নেব কেন ?'

নিঃশ্বাস ভারী হল হরিহরের। চেহারা বা মনে না হোক, বয়সে তো তিনি বুড়ো হয়েছেন। স্ত্রী গত হওয়ায় নিঃসন্দেহে তাঁকে সবাই দোজবরে বলবে। আর এসব জেনে বুঝেই কি ছবিরাণী ওই বর্ণনা দিল ? নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করছিল তাঁর। খামোকা এইসব কথা বলে তিনি কণ্টটাকে ডেকে আনলেন।

ছবিরাণী হাসল, 'কই, কথা বলছেন না যে ?'

'তুমি ঠিকই বলেছ। ঠিক কথা কেউ বললে তার সঙ্গে তর্ক করা যায় ?'

গ্রামের মুখে এসে পড়েছিল ওরা। হরিহর বললেন, 'যা বললাম তা ভুলে যেও। আর ওই সনাতন অথবা মতীশদের প্রশ্রয় না দিলে আমার ভাল লাগবে, নিজেরও ভাল করবে। তুমি এবার যাও, আমি এদিকটায় একটু ঘুরে আসি—অনন্তটা একটু অসুস্থ হয়েছে, দেখে আসি।'

'না, আসলে আপনি ভয় পাচ্ছেন।'

'মানে ? কিসের ভয় ?'

'আমার সঙ্গে গ্রামে ঢুকতে। পাঁচজনে দেখে অবাক হবে। হয়তো কথা বলবে নিজেদের মধ্যে। আপনার মহৎ ছবিটাকে আপনি নষ্ট হতে দিতে চান না।'

'ছি ছি ছি ! আমার সঙ্গে তোমাকে দেখলে লোকে সন্দেহ করবে কেন ?'

'বেশ। তাহলে চলুন আমার সঙ্গে। আমাকে বাড়িতে পেঁাছে দিয়ে তবে যেখানে যাওয়ার সেখানে যাবেন।' ছবিরাণী ঘাড় বেঁকিয়ে বলল।

'বেশ, চল।' হরিহর এগিয়ে চললেন।

দুপাশে ঘরদোর শুরু হল। এই গ্রামে বিদ্যুৎ আসেনি। রাত বাড়লে কেউ আর লণ্ঠন জ্বালতে চায় না। প্রথমেই নিজের ঘরের দাওয়ায় বসে পঞ্চাননের গলা শোনা গেল, 'কে যায় ?'

হরিহর জবাব দিলেন, 'আমি, পঞ্চা।'

'ওহো, কি খবর দাদা, এই গেলেন—এই ফিরে এলেন !' দাঁড়াতে হল। হরিহর বললেন, 'পথে এদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। জনার্দন আর শিবরামের বউ ওষুধ আনতে হরিপুরে গিয়েছিল।'

'ও, তাই বলুন !'

আর একটু এগোতে আবার আর একটা দাওয়া থেকে শব্দ বাজল, 'কে যায় ?'

'আমি হে জগদীশ।'

'ও হরিদা ! সঙ্গে কে ?'

'শিবরামের বউ।'

'আহা ! শিবুটার কোন খবর পাওয়া আর গেল না, না ?'

'না।' হরিহর এগোলেন। ঠিক তাঁর পেছন পেছন হাঁটছিল ছবিরাণী। এখন তার মাথার ঘোমটা নাক পর্যন্ত চলে এসেছে। অন্ধকারেও সে দিব্যি পথ দেখতে পাচ্ছে তার ফাঁক দিয়ে। এবার একটু ফাঁকা জায়গা। তারপর মুদির দোকান। সেখানে মাটিতে পোঁতা বাঁশের বেঞ্চিতে জনা আষ্টেক ছেলেছোকরা গুলতানি মারছে। ফাঁকা জায়গায় আসামাত্র ছবিরাণী বলল, 'এবার কি বলবেন ?'

হাঁটতে হাঁটতে হরিহর তাকালেন। গ্রামেরই ছেলেছোকরা সব। উঁচু গলায় নিজেদের মধ্যে রসিকতা করছে। এর আগে ওদের দেখে কখনই তাঁর অস্বস্তি হয়নি। ছবিরাণীর কথা শোনামাত্র আজ সেটা হল। যেতে হলে ওদের পাশ দিয়েই যেতে হবে। গম্ভীর মুখে তিনি এগিয়ে চললেন। তাঁর কয়েক হাত পেছনে ছবিরাণী, ঘোমটা মাথায়।

ওঁদের দেখামাত্র ছেলেছোকরারা আচমকা চুপ করে গেল। যেন এই দুজনকে একসঙ্গে দেখবে কেউ কল্পনা করেনি। ওদের চুপ করা দেখে মুদির দোকানে জিনিসপত্র কিনতে আসা কেউ কেউ ফিরে তাকাল। হরিহর ওদের সামনে দাঁড়ালেন, 'একটু আগে জনার্দন এদিকে এল নগেনের সাইকেলে চেপে, কেউ দেখেছ কোথায় গেল ?'

ধীরেন বসেছিল জটলায়। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ওরা শ্রীনিবাসের বাড়ির দিকে গিয়েছে।'

হরিহরকে দাঁড়াতে দেখে ছবিরাণীও দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তার দিকে তাকিয়ে হরিহর বললেন, 'তাহলে ঠিকই আছে। চল, আমি ডেকে পাঠাচ্ছি।'

তিনি গম্ভীর ভঙ্গীতে হাঁটা শুরু করলেন। ছবিরাণী তাঁর পেছনে। ছেলের দল একেবারে নিশ্চুপ। তারা কোন কথা বলছে না। কোন মন্তব্য উড়ে এল না। হরিহর জানতেন ওরা আজ পর্যন্ত যখন কোন মন্তব্য তাঁর সম্পর্কে করেনি তখন আজও করবে না। তবু তিনি কোন ঝুঁকি নেননি। ওদের বোঝালেন ছবিরাণীকে নিয়ে কোন সমস্যা সমাধানে বেরিয়েছেন।

হরিহরের বাড়ি এগিয়ে এল। বাগান, গাছপালা, দেওয়াল। জায়গাটা বেশ নির্জন। ছবিরাণী এবার শব্দ করে হাসল, 'জনার্দনকে এত দরকার জানতাম না তো !'

'ওকে দিয়ে শ্রীনিবাসকে ডাকিয়ে আনব ভেবেছিলাম।'

'শ্রীনিবাসকে ?'

'হ্যাঁ। আজই বিয়ের দিন পাকা করতাম।'

'ওমা, সে কি করবে ? তার মায়ের সঙ্গে কথা বলা দরকার। শুনলাম তিনি এই চেয়েছেন, সেই চেয়েছেন !'

'যা চেয়েছে সব পাবে। এ গ্রামের মানুষ আর কি চাইতে পারে ? ও নিয়ে ভেবো না। যা চাইবে সব দেব। কিন্তু দিনটা ঠিক করে ফেলতে হবে।'

'আপনি সব দেবেন ?'

'হ্যাঁ।' হরিহর নিজের বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়ালেন।

'কিন্তু কেন ? এ গ্রামের প্রত্যেকেরই তো অভাব। সবাই এসে চাইলে আপনি পারবেন ?'

'তা কেন ? আমি—আমি তোমার জন্যে এটা করছি।'

'ছিঃ ! এ কি বলছেন ? লোক শুনলে বলবে কি ?'

'এখানে তো কেউ নেই। তুমি জানলেই হল।'

'না। আমি চোরের মত কিছু করি না।' হনহনিয়ে চলে গেল ছবিরাণী।

সারাটা সকাল মায়ের গঞ্জনা শুনেছিল শ্রীনিবাস। কাল রাত থেকে বুড়ীর একটু জ্বর এসেছে। তাই নিয়ে বকর বকর করে গেছে অবিরাম—অবিনাশ কবিরাজের মেয়েকে বিয়ে করলে পায়ের ওপর পা দিয়ে জীবনটা কাটানো যাবে। সেই সঙ্গে ডাক্তারিটা দিয়ে ফেলতে পারলে আর কথাই নেই। ছেলের মন সেদিকে

না গিয়ে রাক্ষুসীর পাল্লায় পড়েছে। তার ওপরে জুটেছে হরিহর। শলাপরামর্শ দিচ্ছে। নিশ্চয়ই ওই নির্লজ্জ স্বামীখাকী ওকে বশ করেছে। ভাল মানুষ—পুরুষমানুষ তো! মেয়েছেলের তাপ লাগলে মুনিদের ভাল-মানুষত্ব নষ্ট হয়ে যায় তো হরিহর ঠাকুরপো! দিতে পারবে একজোড়া খাট, একটা বড় কাঁসার ঘড়া, চাল ছাউনির টাকা, জামাকাপড়, সোনার আংটি বোতাম, সাইকেল আর নগদ পাঁচ হাজার টাকা? এক কানাকড়িও তো পকেটে নেই। খেউমানি থেকে বিয়ে না দিয়ে নারাণপুরে নিয়ে এল কেন? পাছার কাপড় ওল্টালে যে কত ঘা দেখা যাবে তার ঠিক নেই। আর এই ছেলে, যে নিজের ভবিষ্যৎ বোঝে না, ট্যাঙ-ট্যাঙ করে নাচছেন। ছি ছি! এসব দেখার চেয়ে মরণ হওয়া ঢের ভাল!

বেশিক্ষণ এই নামতা সহ্য করা অসম্ভব। আবার চোখের সামনে থেকে চলে গেলে চেঁচিয়ে কেঁদেকেটে একসা করবে বুড়ী, শ্রীনিবাস ভেবে পাচ্ছিল না কি করবে! কাল নগেন তাকে বুঝিয়েছে পৃথিবীর সব শান্তির সেরা শান্তি হল ঘরের শান্তি। বিয়ে করে বউ আনলে তাকে ঘর করতে হবে মায়ের সঙ্গে। যদি মা বিগড়ে থাকে, তাহলে সারাজীবন ধরে আগুন জ্বলবে।

নগেনের কথা মানলে অবিনাশ কবিরাজের মেয়েকে বিয়ে করা উচিত। সেই মেয়ে যত হতকুচ্ছিত হোক, বাড়িতে তো শান্তি থাকবে। এইসময় কাদুবুড়ি এল লাঠি ঠুকতে ঠুকতে। এসে দাওয়ায় বসে বলল, 'ও বউমা, তোমার আবার কি হল? বাড়িতে তো কাক চিল বসছে না!'

'কাক চিল কেন, এবার শেয়াল শকুন বসবে।'

'কি হয়েছে তা বলবে তো? ও ছিরিনিবাস, তোর মায়ের কি হল?'

শ্রীনিবাস জবাব দিল, 'মাকে জিজ্ঞাসা কর। জ্বর হয়েছে, এতবার চুপ করতে বলছি তবু কানে নিচ্ছে না।'

অতএব শ্রীনিবাসকে আবার শুনতে হল। মা বিস্তারিত ভাবে পরিস্থিতি বর্ণনা করল কাদুবুড়িকে। শ্রীনিবাস লক্ষ্য করল এবার দেয় তালিকায় আরও দুটো নতুন বস্তু সংযোজন হল। মা যতবার বিয়ে বাবদ পাওনার তালিকা করে ততবার নতুন নতুন নাম বলে।

কাদুবুড়ি বলল, 'তা অবিনাশ ডাক্তারের মেয়েকে শুনেছি চোখে দেখা যায় না। যেমন শরীর তেমন রঙ আর তেমনি গলা। খাল কেটে কুমীর ডেকে আনছ না তো? দ্যাখো বাবা!'

সঙ্গে সঙ্গে মা চিৎকার করলেন, 'মেয়েছেলের শরীর বিয়ের পর আর কদিন অপ্সরী থাকে, অ্যাঁ? এই যে তুমি, তোমাকে তো পঁচিশ বছর আগেও দেখেছি, আহা কি দেখতে ছিলে, এখন দেখলে কেউ সেটা বিশ্বাস করবে?'

কাদুবুড়ি তার পাকাচুলের মাথা নাড়ল, 'তুমিও কম ছিলে না!'

'তবে?'

'তা ও ছিরিনিবাস, মায়ের কথা শোন, মাকে দুঃখু দিস না বাবা।'

'আমি কিছুই করছি না। হরিহর কাকা বলেছিল, তাই।'

সঙ্গে সঙ্গে মায়ের গলা উঠল, 'শুধু হরিহর ঠাকুরপো? ওই স্বামীখাকী

গা-চলানি এসে তোর কানে মন্তর পড়েনি ? আমি কিছু জানি না ?'

কাদুবুড়ি আপত্তি করল, 'না বউমা, ছবি আমাদের সেরকম বউ নয়। আমি তো দুগ্গাকে বলেছি, কত জন্মের সাধনা করে ওই রকম বউ পেয়েছ। শিবু ঘরছাড়া হয়ে গেল কত বছর তবু কেউ ওর বেচাল দ্যাখেনি। তা এ গাঁয়ের যত মেয়েছেলে সব জড়ো করলেও তো ওর রূপের কাছে কেউ আসতে পারবে না। চুরি করে একটু-আধটু রস কি আর কেউ করে না ? আমি সব জানি। কিন্তু ছবি একেবারে উল্টো।'

'ও, তুমিও নুন খেয়ে বসে আছ। কেন, আমি তোমাকে খেতে দিই না ? ওই মেয়েছেলে তোমাকেও জাদু করেছে ?'

'আ মর ! আমি তো ঘাটের মড়া, বুড়ী। আমাকে বশ করতে যাবে কেন ?'

'কি দেবে ছবি ? দিতে পারবে আমি যা চাই ?'

'হ্যাঁ, এটা একটা দামী কথা। তা ও ছিরিনিবাস, তোমার মায়ের বাসনার কথা ছবিকে জানিয়েছ ? ওটা তো ভারি অন্যায়। ছবিকে গিয়ে বলো। পারলে ভাল, নইলে চুকে গেল। মেয়ের কি অভাব এদেশে ?' কাদুবুড়ি বলল।

'যে চায় সেই গিয়ে বলুক।' শ্রীনিবাস নেমে এল উঠোনে।

'ও হরি হরি ! বিয়ে করবেন উনি, ভোগ করবেন উনি, আর আমি ঘরের বউ হয়ে যাব ড্যাংডেঙিয়ে এসব বলতে ! কি ছেলে পেটে ধরেছি দ্যাখো !'

কাদুবুড়ি সান্ত্বনা দিল, 'আহা, অমন করে বলো না। ছেলে তোমার হীরের টুকরো। ও ছিরিনিবাস, যাও না, ছবিকে একটু বলো গিয়ে।'

শ্রীনিবাস সারাদিন টলোমলো করল। তারপর ঠিক করে নিল, নিজে না গিয়ে জনার্দনকে পাঠাবে। ওর মেয়েলি স্বভাবের জন্যে মেয়েরা যেহেতু ওকে পছন্দ করে, তাই ছবি বউদিকে ওই বলতে পারবে। নগেন-টগেনকে বললে পাঁচকান হয়ে যাবে কথাটা। জনার্দন তাকে বেশ পছন্দ করে।

কিন্তু জনার্দনের বাড়িতে গিয়ে শ্রীনিবাস জানতে পারল সে নাকি একটা বিশেষ দরকারে হরিপুরে গিয়েছে। ফিরতে দেরি হবে। বিপাকে পড়ল সে। বাড়িতে ফিরলেই মায়ের পাঁচালি শুনতে হবে। অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করল আজ যা হোক একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলবে। তবে হ্যাঁ, অবিনাশ কবিরাজের যে বর্ণনা পেয়েছে তাতে সেখানে বিয়ে করার কথা কল্পনাও করতে পারবে না। তার বউ হবে সুন্দর, মোলায়েম, টানাটানা চোখ, একরাশ কালো চুল, ঘাড় বেঁকিয়ে তাকাবে, ঠিক ছবি-বউদির মত। তেমন বউ না পেলে সারাজীবন আইবুড়ো হয়ে থাকবে সেও ঢের ভাল।

শ্রীনিবাস হনহনিয়ে শিবরামের বাড়ির দিকে হাঁটছিল। কিন্তু বাড়ির সামনে পৌঁছেই থমকে গেল সে। হঠাৎ যেন সব আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। একটু গোলমাল। নিজেকে ঠিক করতে কয়েক সেকেন্ড সময় নিল। তারপর চালাঘরের পাশ দিয়ে উঠোনে ঢুকল। এখন ভরবিকেল। ছায়া নেমেছে ভাল। দাওয়ায় কেউ নেই। শ্রীনিবাস এপাশ ওপাশ তাকাল। তারপর ডাকল, 'ছবি বউদি !'

নিজের গলার স্বরই অচেনা ঠেকল। এবং তখনই দুর্গামাসীর হাঁক ভেসে এল, 'কে ?'

'আমি, শ্রীনিবাস।'

ঘরের ভেতর অন্ধকার ছিল। তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল দুর্গামাসী। চুল চুড়ো করে বাঁধা। ওকে দেখে বলল, 'ও, তুই! কি চাই?'

'ছবি বউদি আছে?'

'হুঁ। তিনি চরতে বেরিয়েছেন!'

'ও। কখন আসবে?'

'সে কি আমাকে বলে গিয়েছে? হরিপুর থেকে যাতায়াত করতে কত সময় লাগে? গিয়েছে সেই সকালে, এখনও আসার নাম নেই!'

'হরিপুরে কেন?'

'তা আমি জানি না, আমাকে কিছু বলে নাকি? বোনকে বলে গিয়েছে। তা হ্যাঁরে, তুই কি ওর বোনকে বিয়ে করবি?'

ফাঁপরে পড়ল শ্রীনিবাস। কি জবাব দেবে সে? মাটির দিকে তাকাল তাই।

'তোর মাকে তো চিনি। কিছুতেই রাজী হবে না। আমার আবার আজ সারাদিন উপোস। এখনই পুজোয় বসতে হবে।' ঘুরে দাঁড়াল দুর্গামাসী।

'উপোস কেন?' শ্রীনিবাস মনে করতে পারল না আজ কোন পর্ব আছে কিনা। থাকলে মা সেটা পালন না করে থাকতেন না।

'আজ শিবুর জন্মদিন।' কথাটা বলে ভেতরে ঢুকে গেল দুর্গামাসী।

হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল শ্রীনিবাস। যে ছেলে নিরুদ্দিষ্ট, কেউ বলে সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছে, কেউ জানায় রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছে, কেউ সন্দেহ করে আত্মঘাতী হয়েছে—সেই ছেলের জন্মদিনে দুর্গামাসী উপোস করছে!

একা উঠোনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ ওর মনে হল, জনার্দন হরিপুরে গিয়েছে, আর ছবি বউদিও। ওরা কি একই সঙ্গে গিয়েছে? কি দরকার পড়ল সেখানে? জনার্দন তো এমনি এমনি হরিপুরে যাওয়ার ছেলে নয়! তার ওপর ছবি বউদির এমন কি প্রয়োজন পড়ল সেখানে? সে আশেপাশে তাকাল। ছবি বউদির বোনকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু সে তো এই বাড়িতেই আছে। নাকি ওকে সঙ্গে নিয়ে ছবি বউদি হরিপুরে গেল! দুর্গামাসীকে একথা জিজ্ঞাসা করা যায় না কিন্তু ছবি বউদির বোনের কথা ভাবামাত্র তাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করল শ্রীনিবাসের।

ঘর তো দুটো। একটায় দুর্গামাসী থাকে, অন্যটার দরজায় শিকল টানা। তার মানে বোনও বাড়িতে নেই। হয়তো দিদির সঙ্গে গিয়েছে। নিঃশ্বাস ফেলল শ্রীনিবাস। কোন কাজের কাজ হল না এ বাড়িতে এসে। বরং বিপদ বাড়ল। বাড়ি ফিরে শাশুড়ীর কাছে যদি শুনতে পায় সে এসেছিল, তাহলে ছবি বউদি তাদের বাড়িতে চলে আসতে পারে। মায়ের সামনে এসব কথা নিয়ে আলোচনা করতে পারবে না সে। শ্রীনিবাস হেঁটে চলে এল বাড়ির পেছনে। কিছু গাছ-গাছালি আছে এদিকে। বিকেলের ছায়া মেখে হাওয়া বইছে গাছেদের ফাঁক গলে। মৃদু শব্দ হচ্ছে তাই। ভারি ভাল লাগছিল তার। এ গাঁয়ের সবচেয়ে বড় বাগান হরিহর কাকার। সেখানে অনেককাল যাওয়া হয়নি। হাঁটতে হাঁটতে পেছনের ভাঙা বেড়ার কাছে চলে এল সে। অনেকদিনের পুরনো বেড়া। শিবরামদা

মিলিটারিতে চাকরি নেবার পর ওই বাখারির বেড়া দেওয়া হয়েছিল। এখন পচে খসে পড়ছে। বাড়ির পেছনেই চাষের জমি শুরু হয়ে গিয়েছে। এই সময়ে পেছনে পায়ের শব্দ বাজল। ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনদিকে তাকাতেই বুকে থম ধরল শ্রীনিবাসের।

একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ছবি বউদির বোন। দেখে মনে হচ্ছে দুপুরে ঘুমিয়েছে খুব। মাথার চুল ফুলে ফেঁপে পাছা পর্যন্ত নেমেছে। টানাটানা চোখ, টিকোলো নাক, গায়ের রঙ একটু চাপা, ডুরেশাড়িটা চমৎকার ভঙ্গীতে ওর শরীর জড়িয়ে ধরেছে। ছবি বউদির বোন তার দিকে তাকিয়ে আছে।

কি কথা বলবে শ্রীনিবাস! কথাগুলো যেন হারিয়ে যাচ্ছিল। শুধু বাতাসের শনশন শব্দ ছাড়া পৃথিবীটায় আর কেউ নেই। দিদির মত লম্বা নয় বোন কিন্তু তাতে একটুও সৌন্দর্য কমেনি। সে আমতা আমতা করে বলল, 'আমি শ্রীনিবাস।'

'জানি।' নড়ল না একটুও সেই মেয়ে।

'ছবি বউদির সঙ্গে দরকার ছিল।'

'এলে যেতে বলব?'

'না না। আমি আবার আসব।' এবার হাঁটতে শুরু করল শ্রীনিবাস।

পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় মেয়ে বলল, 'শুনুন।'

শ্রীনিবাস দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু পাশ ফিরে তাকাতে পারল না।

ছবি বউদির বোন বলল, আমার কিছু নেই, দিদির তো অবস্থা জানেন।'

'হুঁ।' গলা থেকে ওইটুকু শব্দ বের হল।

'তাহলে?'

তাহলে! যেন সমস্ত আকাশ-পাতাল জুড়ে চিৎকার শুরু হয়ে গেল। তাহলে = তাহলে? যে প্রশ্ন সে ছবি বউদিকে করতে এসেছিল তার জবাবটা তো পাওয়া গেল ওই প্রশ্নের ভেতরে। অতএব সরাসরি বলে দিলেই হয়, তাহলে সম্ভব নয়। কিন্তু কথাটা ভাবামাত্র কলজে দুমড়ে উঠল। অসম্ভব। সে মাথা নিচু করে বলল, 'আমার কিছু দরকার নেই।'

'বিয়ে করারও দরকার নেই?' একটু হাসি মিশল প্রশ্নে।

'তেমন ঘটলে তাই।'

'কিন্তু আপনার মা?'

'কেউ আমাকে জোর করে বিয়ে করাতে পারবে না।'

'কেন? যেখানে অনেক পাওয়া যাবে সেখানে বিয়ে করতে দোষ কি?'

'আমার ইচ্ছে।'

একটু চুপচাপ। শুধু বাতাসের শব্দ ছাড়া কোন শব্দ ছিল না এতক্ষণ, এখন এই মুহূর্তে বাতাসও আচমকা চুপ করে গেল। এবার অদ্ভুত গলায় ছবি বউদির বোন কথা বলে উঠল, 'আমাকে কি পছন্দ হয়েছে?'

'হুঁ।' গলা বুজে এল শ্রীনিবাসের। তারপরে মৃদু গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'আমাকে?'

'না হলে এখানে এসে দাঁড়াই?' হাসল মেয়ে, 'কিন্তু আমার তো কিছু নেই,

মা-বাবাও নেই। সম্পর্কে শুধু এই দিদি। তবু পছন্দ হল?'

'মানুষটাই তো আসল। আর সবে কি দরকার?'

'ঠিক তো?'

'ঠিক।'

'দিদি এলে কি বলব?'

'আমি—আমি—।' কথাটার শেষ মুখে এল না।

'আমি কি?'

'আমি আর অন্য কোথাও বিয়ে করব না।'

'তাতে আমার লাভ কি?'

'কেন?' চমকে উঠল শ্রীনিবাস।

'দিদি তো আমাকে সারাজীবন আইবুড়ো রাখবে না।'

'আমাকে কিছুদিন সময় দিলে ভাল হয়।'

'কত দিন?'

কতদিন? হঠাৎ কোন সময়সীমা মাথায় এল না। কিন্তু শ্রীনিবাসের মনে হল, সে যদি রোজগার করে তার মায়ের চাহিদা যা তা কিনে ছবি বউদির হাতে তুলে দিতে পারত তাহলে মায়ের মুখ বন্ধ হত। এটা তাকে করতেই হবে। সে বলল, 'খুব বেশি হলে এক বছর।'

'বেশ, দিদিকে তাই বলে দেব।'

বাড়ির বাইরে রাস্তায় নামতে যেটুকু হাঁটতে হল সেটুকুতে মনে হচ্ছিল অনন্তকাল কেটে যাচ্ছে। বাড়ির বাইরে এসে শ্রীনিবাস লাফিয়ে উঠল। তার ইচ্ছে করছিল দৌড়ে কোথাও চলে যায়। এমন আনন্দ সে জীবনে কখনও পায়নি। আহা কি গলার স্বর, কি তাকাবার ভঙ্গী! খানিকটা পথ মরা-বিকেলের আলোয় হেঁটে গেল সে একেবারেই স্বপ্নের মধ্যে। আর তারপরেই মনে এল নিজের প্রতিশ্রুতির কথা। একটা বছর। এক বছর মানে বারোটা মাস। গত বছর এই সময়টা তো এই সেদিন ছিল। মায়ের সব দাবি মানতে গেলে অন্তত হাজার দশেক টাকা রোজগার করতে হয়। এই নারাণপুরে থাকলে তা কিছুতেই সম্ভব নয়। হরিপু ও না। যেতে হবে জলপাইগুড়ি। সেখানে সব বড়লোকের বাস। চাকরি করতে চাইলে কেউ অত টাকা তাকে দেবে না।

মাঠপুকুরের ধারে উঁচু জমিতে গিয়ে বসল শ্রীনিবাস। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। ক্রমশ বুকের ভেতর ভারি হয়ে উঠছে তার। কি করে কি হবে? যেমন করেই হোক টাকাটা রোজগার করতেই হবে। কলকাতায় গেলে কেমন হয়? সনাতনদার মুখে নগেন শুনেছে কলকাতায় সিনেমা যারা করে তারা হাজার হাজার টাকা পায়। সে যদি কলকাতায় গিয়ে সিনেমায় নামে? মতলবটা নিজের কাছেই পছন্দ হল না। যদি কেউ তাকে পাত্তা না দেয়?

ব্যবসা করলে কেমন হয়? যা আছে তা নিয়ে শহরে গিয়ে একটা ব্যবসা? খুব পরিশ্রম করবে। কম খাবে। কিন্তু কিসের ব্যবসা? কোন কিছুর হদিস তো সে জানে না। বুকের মধ্যে নিজের বিরুদ্ধে একটা আক্ষেপ জড়ো হল।

নিজেকে খুব ছোট খুব দুর্বল মনে হচ্ছিল। একটি অযোগ্য মানুষ সে। তার বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই। অত ভাল একটি মেয়ের জন্যে সে কি কিছুই করতে পারে না? যে মেয়ের তাকে এত ভাল লেগেছে?

হঠাৎ আর একটি ভাবনা মাথায় এল। যদি কারো কাছে ধার পাওয়া যায়? এ গ্রামে ধার দিতে পারে শুধু হরিহর কাকা। কিন্তু তিনি কি ধার দিতে রাজী হবেন? যদি সে শোধ করতে না পারে? তিনি কি বিশ্বাস করবেন? যদি একটু একটু করে টাকা ফেরৎ নিতে রাজী হন তাহলে সে শোধ করে দেবেই।

ক্রমশ ভাবনাটা তাকে পেয়ে বসল। একটু আলো দেখতে পেল সে। একটু উত্তাপ। এদিকে যে সন্ধ্যে গড়িয়ে গেছে, অন্ধকার আরও ঘন হয়েছে তা খেয়ালে ছিল না। শ্রীনিবাস আর দেরি করল না। হনহনিয়ে হাঁটতে লাগল হরিহরের বাড়ির দিকে।

কেউ একজন আসছিল। সামনাসামনি হতেই ছবি বউদিকে দেখতে পেল শ্রীনিবাস। সে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় গিয়েছিলে?'

'মরতে।' ছবি বউদি পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল।

একেবারে হতভম্ব শ্রীনিবাস। তার সঙ্গে এমনভাবে কখনও কথা বলেনি ছবি বউদি। কি হল আজ? তাকে কি খুব অপছন্দ করছে ছবি বউদি? কেন? যাই করুক, সে কথা দিয়ে এসেছে। কথা তাকে রাখতেই হবে। হরিহরের বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল শ্রীনিবাস।

॥ ৯ ॥

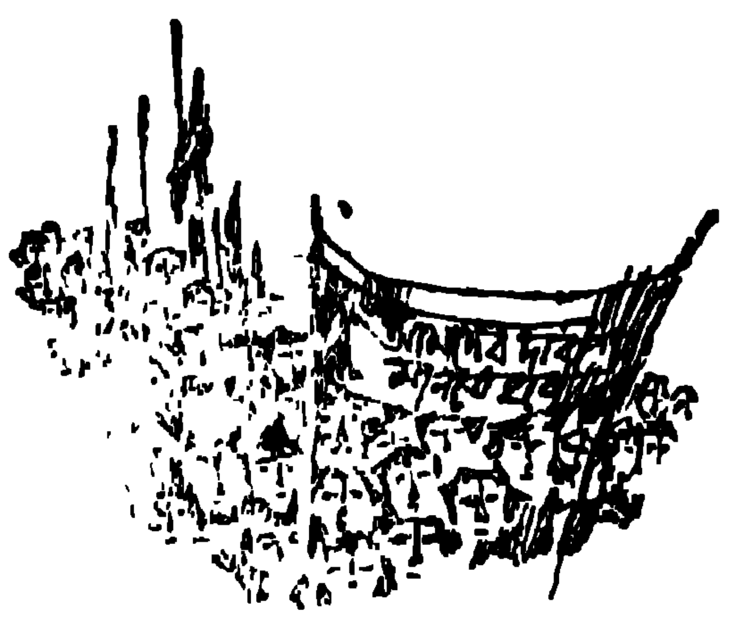

ভর-অন্ধকারে হাতমুখ না ধুয়েই দাওয়ায় বসেছিলেন হরিহর। ভাবনাটা এখন বেড়ালের নখ হয়ে সমানে আঁচড় কাটছিল। ঠিক হল না—ছবিরাণীর কাছে অতটা তরল হওয়া ঠিক হল না। কথাটা শুনে যেভাবে সে প্রতিক্রিয়া দেখাল তা মনে পড়তেই নিজেকে খুব ছোট মনে হচ্ছিল হরিহরের। দাওয়ায় পা ছড়িয়ে বসে তিনি মাঝে-মাঝেই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছিলেন। কেমন এক ধরণের পাপবোধ ক্রমশ তাঁকে ঘিরে ফেলছিল। ছবিরাণী যদি তাঁকে বিপাকে ফেলতে পাঁচজনকে জানিয়ে দেয় তাহলে তিনি কি করবেন? গ্রামের মানুষ তাঁকে যে সম্মান দেয় তা যে এক মুহূর্তে নষ্ট হয়ে যাবে। হরিহরের মনে হল তিনি বিস্মৃত হয়েছিলেন প্রতিটি জিনিসের একটা মানানসই বয়স আছে। যৌবনে যা সহজ তাকে এই বয়সে আঁকড়াতে গেলে আঘাত তো পেতেই হবে। এইসময় অন্ধকার ফুঁড়ে কাউকে এগিয়ে আসতে দেখলেন তিনি।

শ্রীনিবাস হরিহরকে দেখতে পায়নি। গেট খুলে ভেতরে ঢুকে সে একটু দাঁড়াল। ছবিবউদির কথাগুলোও এখন সে ভাবছিল না। যে উত্তেজনা নিয়ে সে ছুটে এসেছিল তা এ বাড়ির গেট খোলামাত্র উধাও হয়ে গিয়েছে। হরিহরকে কি

করে কথাটা বলবে—তাই মনে মনে সাঁতরাচ্ছিল। এইসময় হরিহর অন্ধকার দাওয়া থেকে বলে উঠলেন, 'কে ?'

শ্রীনিবাস চমকে তাকাল। তারপর বলল, 'আমি শ্রীনিবাস।'

'অ। তা কি মনে করে এই সময়ে ?' হরিহরের গলা কাঁপছিল।

'না, মানে—।'

'এগিয়ে এস। আলো আনতে বলব ?'

শ্রীনিবাস কয়েক পা হেঁটে কাছে এসে বলল, 'না, থাক।'

হরিহর বুঝতে পারছিলেন না শ্রীনিবাসের আগমনের কারণ কি হতে পারে? ছবিরাণী কি ওকে পাঠিয়েছে? নিজে না এসে ওই ছেলেটাকে দিয়ে দুটো কড়া কথা শোনাতে চায় নাকি ?

'কি বলবে বল, আমি শুনছি।'

'আপনার শরীর কি খারাপ ?'

'এ্যাঁ! কে বলল ?'

'না। এভাবে অন্ধকারে বসে আছেন, তাই!'

'এমনি বসে আছি। এখন তো আমাদের সামনে ক্রমশ ঘন অন্ধকার নামবে। বয়স তো কম হল না। কি বলতে এলে ?'

'আজ্ঞে আমার কিছু টাকার দরকার।'

'টাকা ? টাকার দরকার তো রোজগার করো।'

'চেষ্টা তো করছি। কিন্তু আপনি যদি এখন ধার দেন তাহলে শোধ করে দেব দু-এক বছরের মধ্যেই। যেভাবেই হোক।'

'এমন টাকার চাহিদা হল কেন ?'

'ইয়ে, মানে, টাকাটা না পেলে মা রাজী হবে না।'

'কিসের টাকা ?'

শ্রীনিবাস ঘাড় চুলকালো। তারপর অস্ফুটে বলল, 'বিয়ের।'

হরিহর বললেন, 'আমি তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'আজ্ঞে মা যৌতুক চেয়েছেন। ওদের সেটা দেবার ক্ষমতা নেই। আপনি যদি ধার দেন তাহলে ওরা সেটা মাকে দিয়ে দেবে। এ না হলে বিয়ে হবে না। আমি যেভাবেই হোক আপনাকে টাকাটা শোধ করে দেব।'

এতক্ষণে ব্যাপারটা পরিষ্কার হল হরিহরের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে বুকের ওপর থেকে বিরাট ভারটা নেমে গেল। তিনি পা দোলালেন, 'তাহলে বল শিবরামের বউ তোমাকে পাঠিয়েছে আমার কাছে!'

'না, না, ছবিবউদি কিছু বলেন নি।'

'তার সঙ্গে তোমার দেখাসাক্ষাৎ হয়নি এখানে আসার আগে ?'

'আজ্ঞে হয়েছিল। কিন্তু বেশি কথা বলার সুযোগ হয়নি।'

'হুঁ! কিন্তু বাবা, আমার যে টাকার গাছ আছে এমন ভাবনা ভাবা ঠিক নয়। যা হোক, এই খরচটা আমি তোমাকে দেব। না, তোমাকে নয়, ছবিরাণীকে দেব, তার বোনের বিয়ে দিচ্ছে সে, তাকেই দেওয়া দরকার। তবে ধার হিসেবে নয়, দিলে

এমনি দেব। কিন্তু একটা শর্ত আছে।'

শ্রীনিবাসের বুকে কাঁপুনি শুরু হয়েছিল, 'বলুন!'

'চার কানে যেন খবরটা না পেঁছায়। তুমি জানলে, আমি জানলাম আর যে নেবে সে জানবে। ব্যাস। এমন কি ছবিরাণীর বোনও জানতে পারবে না। আমি টাকা দিচ্ছি জানলে তো আর দেখতে হবে না। পিলপিল করে পিঁপড়ের মত সব ছুটে আসবে মধু খেতে। হাঁড়িতে জল চাপিয়ে বসে আছে তো এ গ্রামের সবাই।'

শ্রীনিবাসের মনে হচ্ছিল একবার দু'হাত তুলে নেচে ফেলে। এত সহজে এমন সমাধান হতে পারে তা সে স্বপ্নেও ভাবেনি। সে এগিয়ে এসে ধুপ করে হরিহরকে প্রণাম করল। হরিহর জিজ্ঞাসা করলেন, 'দিনটিন ঠিক হয়েছে?'

'আজ্ঞে না।'

'ঠিক আছে, ওসব তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও। আর হ্যাঁ, এখন থেকে নাটক-ফাটক বন্ধ করে কাজকর্মে মন দাও। সামনের শুক্রবার সকালে আমি জলপাইগুড়ি যাচ্ছি। কাছারিতে একটু কাজ আছে। তুমি আমার সঙ্গে চল। সেখান থেকে সস্তায় কিছু জিনিসপত্র এনে গঞ্জে বসে বিক্রি করলেও তো দুটো কাঁচা পয়সা হাতে আসে। চাষের সময়টা ছাড়া এসব কাজ করে সংসার সাজাও। এই তো বয়স।' শেষের দিকে হরিহরের গলায় যথেষ্ট স্নেহ ছিল। শ্রীনিবাসের খুব ভাল লাগল।

হরিহরের বাড়ি থেকে বেরিয়ে অন্ধকার রাস্তায় দুবার লাফিয়ে নিল শ্রীনিবাস। মন মেজাজ শরীর যেন এখন পালকের হাওয়ায় ভাসছে। হরিহর কাকা এত ভাল মানুষ? আহা, ঠিক তার বাবার কাজটা করলেন। গ্রামের বন্ধুরা অবশ্য কঞ্জুষ কিপ্পন বলে। কিন্তু এগ্রামের কোন্ ভাল কাজটা হত যদি হরিহরকাকা টাকা না দিত। কথা বলতে তো আর ট্যাক্স লাগে না তাই যা ইচ্ছে বলে দিলেই হল।

শ্রীনিবাস হাঁটছিল। তার মাথায় কেবল একটাই চিন্তা, ছবিবউদিকে বলতে হবে হরিহর কাকার কাছে গিয়ে টাকাটা নিয়ে আসার জন্যে। একটু আগে ছবি-বউদিকে যেভাবে যেতে দেখেছে তাতে বুঝতে পারছিল না এখনই প্রস্তাবটা করা ঠিক হবে কিনা! কিন্তু তার তর সইছিল না। এই সময় সে নগেনের গলা শুনতে পেল।

নগেন একা নয়। ওর সঙ্গে আরও চার-পাঁচজন আছে। শ্রীনিবাস নিজেকে বোঝাল, এখন গুলতানি করার সময় নয়। সে হাত নাড়ল, 'এখন সময় নেই, পরে কথা বলব।'

'কি এমন রাজকার্যে যাচ্ছিস রে শালা!' নগেনের গলায় বিরক্তি।

শ্রীনিবাস জবাব দিল না। দিতে গেলেই দাঁড়াতে হবে। আর দাঁড়ালেই নাটক নিয়ে আলোচনা। অসম্ভব। সে আর ওই নাটক-ফাটক নিয়ে কিছু ভাববে না। এখন তাকে রোজগার করতে হবে। বিয়ের পর তো অনেক রকম খরচ বাড়বে। সে পা চালাল। অন্ধকারেও গাঁয়ের পথে কোন অসুবিধে হয় না। হরিহর কাকার কথা মনে পড়ল। বয়স হচ্ছে, এখন সামনে আরও অন্ধকার। শ্রীনিবাস হাসল। বুড়ো হতে তার এখন অনেক অনেক বছর বাকি। এখন তার সামনে ফুটফুটে দিনের আলো।

বারান্দায় একটা কুপি জ্বলছিল। সেই কুপির পাশে বসে আছে দুর্গামাসী। বসে নিজের মনে বিড়বিড় করে যাচ্ছে। অন্ধকার উঠোনের প্রান্তে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখল শ্রীনিবাস। এখন এগিয়ে যাওয়ামাত্র যে প্রশ্নের ঝড় উঠবে তার মুখোমুখি হওয়া নিরাপদ নয়। অথচ দুর্গামাসীর ওঠার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। সে উশখুশ করছিল। মিনিট তিনেক কেটে গেলে শ্রীনিবাসের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। সে উঠোনের ধার ঘেঁষে এগোতে যেতেই পায়ে কিছু লাগল, সেটা সশব্দে গড়িয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দুর্গামাসীর গলা সপ্তমে উঠল, 'কে রে মুখপোড়া, সেই শেয়ালটা নিশ্চয়ই! দেব মুখে পোড়া কাঠ গুঁজে। ঠিক ভররাতে এয়েছে গো। বড্ড নোলা তোর, না? হাতের কাছে পাই না বলে ঘুরঘুর করা হচ্ছে? যা ভাগ, ভাগ!'

এইসময় ভেতর থেকে ছবিবউদির গলা ভেসে এল, 'কুকুর-টুকুর ঢুকেছে বোধহয়।'

দুর্গামাসী কথাটা লুফে নিলো, 'তা তো ঢুকবেই। গাঁয়ের নেড়িগুলোর তো আর যাওয়ার জায়গা নেই। মরতে এ বাড়িতেই আসা চাই। ওরাও জেনে গেছে ব্যাটাছেলে নেই, খোলা দরজা, যাও লুটেপুটে খাও।'

'কি কথা থেকে কি কথা বলছেন?

'আর কি বলব বউমা! যে যাবার সে চলে গেল আর আমি বসে আছি পাহারাদার হয়ে। গাঁয়ের পুরুষগুলোর স্বভাব তো জানতে বাকি নেই। আরে আমারও তো একদিন যৌবন ছিল। এর ওপরে তোমার বোন এসে জুটেছে। হা কপাল!'

'আপনার চিন্তা নেই। বিয়ে দিতে না পারলে ধেউমানিতেই পাঠিয়ে দেব।'

'বিয়ে দেবে? একটা পয়সা ট্যাঁকে নেই, বিয়ে বললেই হল!'

কথাবার্তা হচ্ছিল অথচ কেউ কারো মুখ দেখতে পাচ্ছিল না। একজন দাওয়ায়, অন্যজন ভেতরে। শ্রীনিবাস বুঝতে পারছিল না তৃতীয়জন কোথায় এখন। এইসময় ছবিবউদিকে বেরিয়ে আসতে দেখল সে। দাওয়ায় পা দিয়ে দুটো হাত ওপরে তুলে আলস্য ভাঙ্গল। ওই ভঙ্গীতে ছবিবউদিকে কুপির আলোয় চমৎকার লাগল শ্রীনিবাসের চোখে। শিবরামদাটা একটা যাচ্ছেতাই। এমন বউ ফেলে কেউ রোগ কেনে?

ছবিবউদি বলল, 'যান, শুয়ে পড়ুন। ভাত নামিয়ে ডাকব।

'শুয়ে কি হবে? ঘুম আসবে নাকি? একদম না। না মরলে ঘুম আসবে না।'

'চেষ্টা তো করুন। এখানে বসে সমানে কথা বলে গেলে শরীর ঠিক থাকবে?'

গজর গজর করতে করতে দুর্গামাসী উঠে গেলেন দ্বিতীয় ঘরটায়। কুপি তুলে নিয়ে ছবিবউদি উঠোনে পা দিলে। শ্রীনিবাস দেখল ছবিবউদি সোজা ঢুকে গেল রান্নাঘরে। সম্ভবত এখন ভাত রাঁধা হবে।

কি করা উচিত বুঝতে পারছিল না সে। কথাগুলো দুর্গামাসীর সামনে হোক তা সে চায় না। হরিহর কাকার কাছে কথা দিয়ে এসেছে যে চারকান জানবে না। শর্ত সেটাই। কিন্তু এখন এগিয়ে কথা বলতে চাইলেই বুড়ী ঠিক শুনতে পাবে। তখন চার নয়, গ্রামসুদ্ধু কারোর জানতে বাকি থাকবে না।

শ্রীনিবাসের মাথায় মতলবটা এল। সে যদি বাগানের মধ্যে দিয়ে ঘুরে রান্নাঘরের ওপাশে চলে গিয়ে জানলা দিয়ে কথা বলে তাহলে হয়তো বুড়ী শুনতে পাবে না।

কিংবা সে ইশারায় ছবিবউদিকে বলতে পারে, কথা আছে একটু, বাইরে বেরিয়ে এস। শ্রীনিবাস নিঃশব্দে হাঁটার চেষ্টা করলেও পড়ে থাকা শুকনো পাতায় পা লাগায় শব্দ হতে লাগল। তৎক্ষণাৎ ভেতর থেকে দুর্গামাসীর গলা শোনা গেল। তারস্বরে শেয়ালটাকে গালাগালি দিচ্ছেন। শ্রীনিবাস স্থির হয়ে দাঁড়াল। গালাগালি শান্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল। তারপর নিঃশব্দে চলার চেষ্টা করল। রান্নাঘরের পেছনে একটা নর্দমা। এখন অন্ধকারে চোখ সয়ে এসেছে। নর্দমাটাকে ঠিকঠাক দেখতে পেল তাই। রান্নাঘরের পেছনের জানলায় আলো দেখা যাচ্ছে। একচিলতে জানলা।

শ্রীনিবাস নিঃশব্দে সেই জানলার কাছে পেঁৗছে দেখতে পেল ছবিবউদি দরজা ভেজিয়ে দিচ্ছেন। এই দূরত্বে ডাকা ঠিক হবে না। বুড়ী নির্ঘাৎ শুনতে পাবে। সে অপেক্ষা করল। কিন্তু ছবিবউদি পাগলের মত ডান হাত ভাঁজ করে আঙ্গুলের ডগায় পিঠের ওপর হাতড়াবার চেষ্টা করছেন দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। শ্রীনিবাস অনুমান করল ওঁর জামার ভেতর কোন পোকামাকড় ঢুকে গেছে। অনেকবারই তারও এমন হয়েছে। হঠাৎ ছবিবউদি দরজার দিকে মুখ করে নিজের জামা খুলে ফেললেন। শ্রীনিবাসের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। মোমের মত চওড়া পিঠে কুপির আলো বুঝি ঠিকরে উঠল। জামার ভেতরে পোকাটাকে আবিষ্কার করে ছুঁড়ে ফেলল ছবিবউদি। এবং সেটা করতে গিয়ে জানলার দিকে ঘুরতে হল। নিঃশ্বাস বন্ধ ছিল প্রায়, এখন মনে হল চারপাশে ভূমিকম্প হল। ছবিবউদির যৌবনের ঔদ্ধত্য যেন অন্ধ করে দিল শ্রীনিবাসকে। সে এক লাফে নর্দমা পেরিয়ে বাগানের ভেতর দিয়ে ছুটতে লাগল। আর তখনই ছবিবউদি চিৎকার করে উঠল আতঙ্কিত স্বরে, 'কে? কে ওখানে? মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেব। কে ওখানে?'

বাকিটা শোনার জন্যে দাঁড়াল না শ্রীনিবাস। অন্ধকারে যতদূরে সম্ভব ছুটে এসে মাঠের ওপর বসে পড়ে হাঁপাতে লাগল। ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ের সঙ্গে অপর এক ধরণের শিহরণ তাকে আক্রমণ করছিল। এমন দৃশ্য সে জীবনে দ্যাখেনি। গ্রামের পুকুরঘাটে স্নানরতাদের শরীরের অংশ প্রায়ই আসতে যেতে চোখে পড়ে। কিন্তু তাদের কোনটাই এমন প্রলয় ঘটায়নি তার মনে। ছবিবউদি অমন বিরল সম্পদ নিয়ে একা সন্ন্যাসিনীর মত জীবনযাপন করে যাচ্ছেন?

এসময় তার সম্বিৎ ফিরল। ছবিবউদির বোন যদি জানতে পারে সে চোরের মত ওই দৃশ্য দেখেছে তাহলে নিশ্চয়ই ক্রুদ্ধ হবে। কিন্তু ছবিবউদি তো তাকে দেখতে পায়নি। সে অন্ধকারে ছিল। আলোয় দাঁড়িয়ে তাকে দেখা সম্ভব নয়। আর চিনতে পারলে ছবিবউদি তার নাম ধরে ডাকত। বেশ কিছুক্ষণ বসে রইল শ্রীনিবাস। শেষ পর্যন্ত সে নিশ্চিত হল তার ওই অভিযানের কথা এই বাড়ির কারো জানা সম্ভব নয়। নিশ্চিন্ত হয়ে এখন ভাল লাগল। এই মুহূর্তে ছবিবউদিকে প্রস্তাবটা দেওয়া যাচ্ছে না। কি করা যায়? সে স্থির করল আগামীকাল খুব ভোরে যখন ছবিবউদি স্নান করতে পুকুরে আসবে তখনই সে প্রস্তাবটা দেবে। একটাই রাত তো, দেখতে দেখতে কেটে যাবে।

অন্ধকার থাকতেই বিছানা ছেড়েছিল শ্রীনিবাস। দাঁতন নিয়ে বারোয়ারি পুকুরঘাটে পেঁাছে দেখল তখনও কেউ স্নানে আসেনি। নিজেকে পরিচ্ছন্ন করে সে রাস্তার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। অন্ধকার পাতলা হচ্ছে। একজন একজন করে এ বাড়ির মাসী ওবাড়ির বউরা পুকুরঘাটে চলেছে। শেষ পর্যন্ত সে ছবিবউদির দর্শন পেল। সঙ্গে সঙ্গে গতরাতের ছবিটা তার চোখের সামনে ভেসে উঠতেই শরীরের সব রক্ত মুখে জমল। ছবিবউদি রাতের শাড়ির ওপরে একটা গামছা জড়িয়েছে। চুল খোলা, হাতে শুকনো কাপড়ের পুঁটুলি। কাছাকাছি হতেই শ্রীনিবাস কথা বলতে গিয়ে বুঝল, গলায় স্বর জড়িয়ে যাচ্ছে। ছবিবউদি অবাক গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার ?'

শ্রীনিবাস কোনমতে বলতে পারল অন্যদিকে চোখ রেখে, 'বিয়ের ব্যাপারে যে টাকা লাগবে তার একটা ব্যবস্থা হয়েছে।'

'কি করে হল ?' ছবিবউদি অবাক।

'হরিহর কাকা টাকা দেবেন বলেছেন। কিন্তু আর কেউ যেন জানতে না পারে এই শর্তে। আমি শোধ করে দেব বলে ধার চাইতে গিয়েছিলাম কিন্তু উনি একেবারেই দিয়ে দেবেন বলেছেন।' কথাগুলো বলতে পেরে স্বস্তি পেল সে।

ছবিবউদি খুশি হল, 'বাঃ, ভাল হল। এখন দিন ঠিক করলেই চুকে যায়।'

'কিন্তু একটা কথা আছে।'

'কি কথা ?'

'উনি বলেছেন তোমাকে টাকাটা দেব না। শিবরামের বউকে বলবে আমার কাছে এসে নিয়ে যেতে। একবার যাওয়া দরকার।'

'উনি আমাকে শিবরামের বউ বলেছেন ?'

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল শ্রীনিবাস। এ গ্রামের কেউ নিজের স্বামীর নাম মুখে উচ্চারণ করে না। করতে নেই বলে করে না। ছবিবউদি প্রশ্ন তুলেছে, কেন করতে নেই ? তার উত্তর কেউ দিতে পারেনি কিন্তু পছন্দও করেনি।

ছবিবউদি বলল, 'আমি ও বাড়িতে গিয়ে অত টাকা নিয়ে আসব আর গ্রামের মানুষজন চোখ বন্ধ করে বসে থাকবে ?'

'তা ঠিক। তবে হরিহর কাকার পুকুরে স্নান করতে গিয়ে কথা বললে কেউ কিছু ভাববে না।' শ্রীনিবাস পরামর্শ দিল।

'বাঃ, বুদ্ধি তো খুব! ঠিক আছে, এখনই যাচ্ছি। গলায় যখন আমার কাঁটা বেঁধা তখন নিজেকেই তো সেটাকে ছাড়াতে হবে।' কথাগুলো বলে ছবিবউদি হাঁটতে শুরু করল। বোঝা গেল বারোয়ারির পুকুর নয়, হরিহরকাকার বাড়ির দিকে রওনা হল। ছবিবউদি যে এত জলদি রাজি হয়ে যাবে ভাবতে পারেনি শ্রীনিবাস। তার খুব ভাল লাগছিল। এখন শেষটা ঠিকঠাক হলে হয়। সে ঠিক করল ছবিবউদির ফেরার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।

বাইরে অন্ধকার সরে গেলেও গাঢ় ছায়া ছিল। কিন্তু হরিহরের পুকুরঘাটায় এখনও আঁধার-আঁধার ভাব। ছবিরাণী জলের দিকে তাকাল। এই পথটুকু আসার

সময় কেউ তাকে কোনপ্রশ্ন করেনি। দেখেছে কিনা তাও সন্দেহের। স্নান করে কথা বলার চেয়ে কথা বলে স্নান করা ভাল। সে এগিয়ে চলল বসতবাটির দিকে। হরিহরের কাছে যারা কাজ করে তারা এখন ধারে-কাছে নেই। বাড়িতে মেয়েছেলে না থাকলে পুরুষ চাকর-বাকররাও আয়েসী হয়ে যায়।

এইসময় ছবিরাণী হরিহরকে দেখতে পেল। উঠোনে পায়চারি করছেন। তাকে দেখতে পেয়ে যেন বেশ অবাক হলেন। তারপর দ্রুত এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার? হঠাৎ এখানে?'

ছবিরাণী হাসল, 'কেন, আমাকে তো পুকুরে স্নান করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। হয়নি?'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আমি ভাবলাম—।'

'কি ভাবলেন? কৈফিয়ৎ চাইতে এসেছি?'

'কৈফিয়ৎ? কিসের কৈফিয়ৎ?'

'চৌর্যবৃত্তির।'

'মানে? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না!'

'ন্যাকামি করবেন না।' ছবিরাণী আবার হাসল, 'রান্নাঘরের জানলা দিয়ে উঁকি মারতে পারেন কিন্তু চিৎকার শুনেই অমন দৌড়াতে হয় কেন? খানাখন্দে পা পড়লে তো তিন মাস শুয়ে থাকতে হত!'

হরিহর এবার স্পষ্টতই বিরক্ত হলেন, 'কি যা-তা বলছ?'

'যা-তা বলছি? আপনি রাত্রে আমাদের বাড়িতে যাননি?'

'কক্ষনো নয়। আমার শরীর ঠিক ছিল না। শ্রীনিবাস চলে যাওয়ার পর আমি শুয়ে পড়েছিলাম।'

'শ্রীনিবাস কখন এসেছিল?'

'আমি বাড়ি ফেরার পরই। তাকে তো আমি সব বলেছি। ছি ছি, এ কি রকম বদনাম দিচ্ছ তুমি?'

'তাহলে কে গিয়েছিল?'

'তা আমি জানব কি করে? আমার নিশ্চয়ই আত্মসম্মান বোধ আছে।'

ছবিরাণী সময়টা মনে মনে হিসেব করল। হরিহরের কাছে আসার পর শ্রীনিবাস যদি তাদের বাড়িতে যায় তাহলে সময়টা তো এমনই হতে পারে। প্রস্তাব শুনে উত্তেজিত হয়ে শ্রীনিবাসের পক্ষে তার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। হঠাৎ তাকে ওই অবস্থায় দেখে—! আচমকা লজ্জা পেল ছবিরাণী। কিন্তু ও জানলা দিয়ে উঁকি মারতে গেল কেন? সে ভেবেছিল ওটা হরিহরের কীর্তি। বয়স হলে মানুষের নানারকম ভীমরতি হয়।

ছবিরাণী বলল, 'তাহলে আমার ভুল হয়েছে।'

'হুঁ। এখন একটু সাবধানে থাকা ভাল। যাক, আপাতত পাঁচ হাজার দিচ্ছি। পরে লাগলে কিছু দেওয়া যাবে।' হরিহর ভেতরে চলে গেলেন।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ছবিরাণী। সে ভেবেছিল টাকা দেবার আগে হরিহর নিশ্চয়ই মনের কথা বলবেন। তাকে বাধ্য করতে চাইবেন। কিন্তু এসব কিছুই

করলেন না। একটু বাদে হরিহর ফিরে এলেন একটা পুঁটলি হাতে নিয়ে, 'এতে দশটাকায় পাঁচ হাজার আছে। সাবধানে শাড়িতে মুড়ে নিয়ে যেও। আর দেখো, কেউ যেন জানতে না পারে। কাল পরশু রটিয়ে দিও শিবরামের অফিস থেকে টাকা পাঠিয়েছে। তাহলে যৌতুক দেওয়ার সময় কেউ সন্দেহ করবে না।'

অতগুলো টাকা একসঙ্গে কখনও দ্যাখেনি ছবিরাণী। অবশ্য এই মুহূর্তে টাকাগুলোকে সে দেখতেও পাচ্ছে না। ছেঁড়া কাপড়ে যা মোড়া আছে তা যে টাকা তা তো ঠিকই। পুঁটলিটা নিয়ে সে হরিহরের দিকে তাকাল, 'আপনি আমাকে কেন দিচ্ছেন?'

'এমনি, ইচ্ছে হল তাই।'

'আর কিছু নয়?'

'আমি আর অপমানিত হতে চাই না।'

'আমি যদি নিজের থেকে দিতে চাই, নেবেন না?'

হরিহর কিছু বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিলেন। তারপর বললেন, 'টাকাটা হাতে নিয়ে তোমাকে কিছু বলতে হবে না। যাও, বাড়ি যাও।' হরিহর আর দাঁড়ালেন না। তাঁর চেহারা গাছপালার আড়ালে মিলিয়ে গেল। হঠাৎ কেঁদে ফেলল ছবিরাণী। নিঃশব্দে তার চোখের কোণ থেকে ঢল নামল। শিবরাম নামক একটি মানুষ তাকে সুখের স্বাদ সামান্য দিয়েই উধাও হয়েছিল। মনের বাঁধ যথেষ্ট শক্ত থাকা সত্ত্বেও সে আর কতদিন বিশ্বস্ত থাকবে?

ছবিরাণীর সেই ভোরে স্নান করা হল না।

॥ ১০ ॥

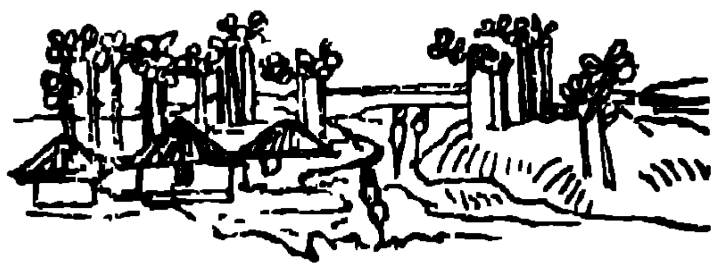

বিয়ে হয়ে গেল শ্রীনিবাসের। অনেককাল বাদে গাঁয়ের মধ্যেই পাত্রপক্ষ এবং কন্যাপক্ষের বাস। হৈ-হৈ-টা স্বভাবতই বেশি। শ্রীনিবাসের শ্বশুরাই উৎসাহ দেখিয়েছে। বিয়ে থেকে বাসর পর্যন্ত কোনটাই নম-নম করে সারা হয়নি।

কাদুবুড়ি এসেছিল বিয়ের দুদিন আগে। উঠোনে পাছা থেবড়ে বসে শ্রীনিবাসের মাকে পাকা মাথা দুলিয়ে বলেছিল, 'এ্যাদ্দিনে তোমার ঘরে লক্ষ্মী আসছে বউ। দেখো এবার কি রকম বাড়বাড়ন্ত হবে।'

শ্রীনিবাসের মায়ের শরীর ভাল ছিল না, মন বিচলিত কিছুটা। দাওয়ায় বসে উদাস গলায় বলল, 'আমার কি! আমি তো পা বাড়িয়ে বসে আছি, যে বউ আনছে সে সুখী হলেই সব ভাল।'

কাদুবুড়ি বলল, 'শুনলাম শিবরামের বউ নাকি তোমাকে বরপণের টাকা গুনে দিয়ে গিয়েছে?'

'হুঁ। স্বামী উধাও, সরকার এ্যাদ্দিন পরে তার টাকা পাঠিয়েছে, সেই টাকায়

তিনি বোনের বিয়ে দিচ্ছেন। দুর্গা কি করে মেনে নিল ব্যাপারটা তাই বুঝতে পারছি না।'

'তোমার বোঝার কি দরকার! তুমি টাকা চেয়েছ পেয়ে গেছ। সন্তানের টাকায় মায়ের দাবী আগে না স্বামীর টাকায় বউ-এর—এই তর্কের তো কোন মীমাংসা নেই। তাছাড়া শিবরাম উধাও হয়েছে কতকাল। ছবিরাণী তো শাশুড়ীকে ছেড়ে যায়নি। এ্যাদ্দিন সব বুক দিয়ে আগলে রেখেছে। তার চরিত্রের দোষ তো কেউ দিতে পারবে না।'

কাদুবুড়ি মাথা নাড়ল। শ্রীনিবাসের মায়ের ব্যাপারটা পছন্দ হচ্ছিল না। কিন্তু টাকাটা পাওয়ার পর আর নতুন করে কোন ক্ষোভ দেখাবার জোর পাচ্ছিল না।

এখন ঘাড় বেঁকিয়ে বলল, 'দেওয়ার হাত চাই বুঝলে, টাকা থাকলেই সব হয় না। বলেছিলাম কুড়িটা প্রণামী শাড়ি দিতে। আমার না হয় পাঁচকুলে কোন আত্মীয়স্বজন নেই, কিন্তু গ্রামসুবাদে যাঁরা আছেন তাঁদের তো দেওয়া উচিত। দেয়নি। দিলে তুমিও পেতে কাদুদি।'

কথাগুলো শোনামাত্র কাদুবুড়ির মনে হল সে একটা শাড়ি থেকে বঞ্চিত হয়েছে। চেয়েচিন্তে বছরে যে দুটো শাড়ি পাওয়া যায় তাই দিয়ে কোনমতে চালাতে হয়। শ্রীনিবাসের বিয়ে উপলক্ষে যদি আর একটা পাওয়া যেত তাহলে কি ভালই না হত! কষ্টটা ভুলতেই সে বলল, 'খাট আলনা তো পেলে?'

'দেবে বলেছে। বাসর সাজিয়ে দেবে।' শ্রীনিবাসের মা গলা নামাল, 'কত টাকা পেয়েছে তুমি কিছু জানো কাদুদি? এত খরচ করছে কি করে?' কথাগুলো বলেই ঘাড় করে বাঁ পাশের ঘরটা দেখে নিল। কাদুবুড়ি সেটা লক্ষ্য করে বলল, 'ছেলে আছে নাকি ঘরে?'

'হ্যাঁ। আমিই বলেছি, বিয়ের পাত্তর অত টৈ-টৈ করে ঘুরতে নেই।'

এই সময় বাইরে হরিহরের গলা পাওয়া গেল, 'শ্রীনিবাস আছ নাকি?'

শ্রীনিবাসের মা উঠে দাঁড়াল, 'আসুন, ওরে, দ্যাখ তোর জ্যাঠা এসেছে।'

নিজের ঘরে বসে শ্রীনিবাস এতক্ষণ দুই বৃদ্ধার সংলাপ শুনছিল। তার ভাল লাগছিল না। জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত মাকে সে কখনই কোন ব্যাপারে সন্তুষ্ট হতে দ্যাখেনি। টাকাটা পাওয়ার পরেও মনে মনে গুমরে যাচ্ছে। ছবিরাণী যে টাকাটা শিবরামদার জন্যে পায়নি এই সত্যিটা তাকে হজম করতে হচ্ছে। এখন হরিহরের গলা পেয়ে সে বেরিয়ে এল দাওয়ায়। হরিহর ততক্ষণে উঠোনে ঢুকে পড়েছেন।

হরিহর জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন আছেন বউঠান?'

শ্রীনিবাসের মা ঠোঁট বেঁকালেন, 'আমাদের আর থাকা! কোথায় চললেন?'

হরিহর শ্রীনিবাসকে জিজ্ঞাসা করলেন', কি ব্যাপার, মাকে বলোনি?'

শ্রীনিবাস বিরক্ত ছিল। সেই মুখেই বলল, 'বলব ভাবছিলাম।'

হরিহর হাসলেন, 'আমি একটু শহরে যাচ্ছি। উকিলবাবুর কাছে কাজ আছে। ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যাবে। তাই ভাবলাম শ্রীনিবাসকে সঙ্গে নিয়ে যাই। আজ বাদে কাল বিয়ে, এখনো ধুতি পাঞ্জাবি কেনা হয়নি। গঞ্জের দোকান থেকে না কিনে খোদ শহর থেকেই কেনা ভাল।'

শ্রীনিবাস বলল, 'মা, একশটা টাকা দাও।'

শ্রীনিবাসের মা জিজ্ঞাসা করল, 'কেন? একশ টাকার দরকার কিসে?'

'বাঃ, জামা-কাপড় কিনতে হবে না?'

হরিহর হাসলেন, 'এই বাজারে একশ টাকায় হবে না বাবা। তুমি মায়ের কাছে তিনশ চাও।'

শ্রীনিবাসের মা খেঁকিয়ে উঠল, 'অ! তিনশ? আমার টাকার গাছ আছে ভেবেছ?'

শ্রীনিবাস বলল, 'কেন? এই তো তুমি আমায় বিক্রি করে অতগুলো টাকা পেলে, তা থেকে দাও!'

সঙ্গে সঙ্গে চিল-চিৎকার ছড়ালো, 'কি বললি? আমি তোকে বিক্রি করেছি? এত বড় কথা? বিয়ে না হতেই শ্বশুরবাড়ির গোলাম হয়ে গিয়েছ? মুখ ভেঙ্গে দেব হারামজাদা। নে নিয়ে যা, সব টাকা নিয়ে যা। দূর হ এখান থেকে।'

শ্রীনিবাসের মায়ের শরীর কথাগুলো বলার সময় থরথর করে কাঁপছিল। কাদুবুড়ি সমানে তাকে চুপ করতে বলে যাচ্ছে। হরিহর এগিয়ে এলো, 'বউঠান, আপনি শান্ত হন। নাহে শ্রীনিবাস, কথাটা তুমি ঠিক বলোনি। মা কি কখনও নিজের সন্তানকে বিক্রি করে? তোমাদের সুখের জন্যেই উনি টাকা নিয়েছেন। এভাবে কথা ছুঁড়ে কাউকে দুঃখ দেওয়া ঠিক নয়।'

ততক্ষণে শ্রীনিবাসের মা ভেতরে চলে গিয়েছেন। শ্রীনিবাস দাঁড়িয়ে ছিল মুখ নীচু করে, অপরাধীর মতো। কিছুদিন ধরেই মায়ের টাকার জন্যে চাপাচাপি দেখতে দেখতে তার মন খুব বিগড়ে ছিল। আজ মুখফসকে রাগে বেরিয়ে গেছে। এই সময় সে মাকে আবার দাওয়ায় বেরিয়ে আসতে দেখল। সেই একই রণমূর্তিতে তিনটে একশ টাকার নোট ছেলের দিকে ছুঁড়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'যাও, জামাইবেশ কিনে আনো, নইলে তেনাদের মন ভরবে কেন? তোর বাপ যেন বিয়ে করেনি হরিপুরের জামা পরে!'

কাদুবুড়ি জুলজুল করে দেখছিল। এইবার বলে উঠল, 'ওমা, তুমি কত ছুঁড়লে? তিনটে একশ টাকার নোট মনে হচ্ছে! আমি ভাবলাম রাগেমেগে হাজার হাজার টাকাই ছুঁড়ে মারবে!'

শ্রীনিবাসের মা গর্জন করে উঠলেন, 'তুমি চুপ করো! তোমাকে কে ফুট কাটতে বলেছে?'

শ্রীনিবাস ততোক্ষণে টাকাগুলো কুড়িয়ে নিয়েছিল। হরিহর বললেন, 'বউঠান, এবার অনুমতি দিলে আমরা ঘুরে আসতে পারি।'

শ্রীনিবাসের মা আকাশের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'আপনার কথার ওপর আমি বলার কে?'

হরিহর হেসে ফেললেন। তারপর ইশারায় শ্রীনিবাসকে অনুসরণ করতে বলে পা বাড়ালেন। শ্রীনিবাস যখন উঠোনে, তখন কাদুবুড়ি তাকে ডাকল, 'ও ছিরিনিবাস, আমাকে পোনামি শাড়ি দিবি না?'

শ্রীনিবাস থমকে দাঁড়াল, 'মানে?'

'তোর শ্বশুরবাড়ি থেকে শুনলাম একটাও পোনামি শাড়ি দেয় নি। আমি কি ন্যাংটো হয়ে তোর বিয়ে দেখব? মানুষ আসে যায় ন্যাংটো হয়ে, বেঁচে থাকে কাপড় গায়ে!'

শ্রীনিবাস মুখ ঘুরিয়ে মাকে দেখল। মা আর দাওয়ায় নেই। সে বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে।'

গতকাল হরিহর তাকে বলেছিলেন শহরে যাওয়ার কথা। তিনি যাচ্ছেন, ইচ্ছে হলে শ্রীনিবাস যেতে পারে। জেলাশহরে বন্ধুরা খুব কমই গেছে। শ্রীনিবাসের দৌড় আলিপুরদুয়ার পর্যন্ত। জেলা-শহরে যেতে হলে মাতব্বর কারো সঙ্গে যাওয়া উচিত। বন্ধুরা তাকে তাতিয়েছিল। অন্য কেউ হলে তারাও সঙ্গী হত কিন্তু হরিহর বলেই কেউ যেতে চায়নি। সারা পথ গম্ভীর হয়ে থাকতে হবে।

গ্রাম থেকে হরিপুর পর্যন্ত হাঁটাপথে হরিহর খোশগল্পে কাটালেন। মাঝে একটু উপদেশ দিলেন শ্রীনিবাসকে। বিয়ের পর তার দায়িত্ব বেড়ে যাচ্ছে অনেক। আর একজন মানুষের ভার বইতে হবে সারাজীবন। তাই রোজগার বাড়াতে হবে এখন থেকে। বাজে কাজে সময় নষ্ট না করে চাষে মন দিতে হবে। জমি হল লক্ষ্মী। তাকে তুমি যত সাজাও সে তত তোমাকে দু'হাত ভরে দেবে। যখন চাষ থাকবে না তখন শহর থেকে জিনিস কিনে গ্রামে বিক্রি করে দু পয়সা রোজগার করতে পারে সে। এজন্যে চোখ কান খুলে চলতে হবে। এইসব। শ্রীনিবাসের কথাগুলো শুনতে ভাল লাগছিল। নিজেকে খুব দায়িত্ববান মানুষ হিসেবে ভাবতে চাইছিল সে।

হরিপুরের বাসস্ট্যাণ্ডে পৌঁছবার আগেই দুজনের সঙ্গে দেখা। প্রথমজন অবিনাশ কবিরাজ। হাতে ব্যাগ নিয়ে ধীরে ধীরে বাড়ি ফিরছিলেন। চোখাচোখি হতেই হাসলেন, 'কোথায় যাওয়া হচ্ছে?'

'এই একটু শহরে। আপনি কেমন আছেন?' হরিহর জিজ্ঞাসা করলেন।

'আমি এখনও টিঁকে আছি।' এ ছেলেটি যেন কে?'

'ওর নাম শ্রীনিবাস।'

'ওঁ হ্যাঁ, এর নাকি বিয়ে! সেই বর-পালানো বউটার বোনের সঙ্গে?'

'ওভাবে বলছেন কেন?'

'না না, আমি বলার কে! পাঁচজনে বলে আমি শুনি।'

'আপনার মেয়ের বিয়ের ঠিক হলো?'

'হবে হবে। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না। টাকা দেব, জমি দেব, সেই সঙ্গে আমার বিদ্যে শিখিয়ে দেব। আপনাদের গাঁয়ের জনার্দন তো পায়ে পড়ে আছে।'

'জনার্দন? জনার্দন তো পাত্র ভাল।'

'একটু মেনিমুখো। তা মন্দ কি? শাসনে থাকবে। চলি।' অবিনাশ কবিরাজ চলে গেলেন।

হরিহর হাসলেন, 'ওর কথায় কান দিও না। হতাশ মানুষরা চিরকাল

ঈর্ষাকাতর হয়।'

কিন্তু তখনই আবার পেছন থেকে অবিনাশ কবিরাজের ডাক ভেসে এল। তিনি দাঁড়াতে বলছেন।

হরিহর ঘুরে দাঁড়ালেন। ফিরে এসে অবিনাশ কবিরাজ বললেন, 'একটু উপকার চাইতে পারি ?'

'বলুন কি করতে হবে ?'

'শহরে যাচ্ছেন, সময় পেলে আমার জন্যে একটি বস্তু এনে দেবেন ? ওষুধ বানাতে হবে। এখানে পাচ্ছি না।'

'নিশ্চয়ই। এটুকু করতে পারব না ভাবলেন কি করে ?'

'না, পাঁচ কাজে যাচ্ছেন তো !'

'পাঁচের জায়গায় ছয় হলে অসুবিধে কি ? বলুন ?'

'বাইসনের শিং-এর টুকরো। চূর্ণ নেবেন না; পাঁচরকম মিশিয়ে দিতে পারে। চার ইঞ্চি টুকরো দেখে আনবেন। বড়জোর কুড়িটাকা পড়বে।' পকেট থেকে দুটো দশটাকার নোট বের করে এগিয়ে ধরলেন তিনি।

'বাইসনের শিং ? শহরে তাও বিক্রি হয় নাকি ?'

'হয়। চিনাবাজারের পেছনে খোঁজ নিলে পাবেন।'

কুড়িটা টাকা নিয়ে হরিহর প্রশ্ন করলেন, 'এমন আজব বস্তু থেকে কি ওষুধ তৈরি হবে জানতে খুব কৌতূহল হচ্ছে। খুব জটিল কিছু ?'

অবিনাশ মাথা নাড়লেন, 'না, না। খুবই সাধারণ। মতীশ রায় খুব ধরেছে। অর্থবান লোক। বয়স গেছে, বাসনা যায়নি। আপনাকে যে ওষুধটা দেব বলেছিলাম !'

হরিহর হঠাৎ শক্ত হয়ে গেলেন। তিনি আড়চোখে শ্রীনিবাসকে দেখলেন। কবিরাজের সামনে বেশিক্ষণ থাকা সমীচীন নয় মনে করে মাথা দুলিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন। শ্রীনিবাসের কৌতূহল বেড়ে যাচ্ছিল। পাশে হাঁটতে হাঁটতে সে জিজ্ঞাসা করল, 'আমাদের জনার্দনের সঙ্গেই কবিরাজমশাই-এর মেয়ের বিয়ে ?'

'পাত্র হিসেবে পছন্দ করেছেন। বললেন তো তাই।'

'জনাটা একথা একদম চেপে গিয়েছে আমাদের কাছে।' বন্ধুর ব্যবহারে খুশী নয় শ্রীনিবাস। হরিহর কিছু বললেন না। বাইসনের শিং তাঁকে আনতে দিয়েছেন কবিরাজ। এ দিয়ে তিনি যৌনক্ষমতাবর্ধক ওষুধ তৈরী করবেন। মতীশ রায় মাতাল, লম্পট। তাঁর থেকে বয়স কম। মতীশের প্রয়োজন হয়েছে। হঠাৎ তাঁর মন খুব বিচ্ছিরি হয়ে গেল। কবিরাজকে না বলতে পারলে ভাল হত।

স্ট্যান্ডে বাস দাঁড়িয়ে ছিল। ইতিমধ্যে মানুষজন জায়গা নিয়ে নিয়েছে। পাশাপাশি আসন পাওয়া গেল না। হরিহর সামনে বসলেন, শ্রীনিবাস পিছনে। যাত্রীরা তাগাদা দিচ্ছে বাস ছাড়ার জন্যে। ড্রাইভার যখন ইঞ্জিন চালু করছে তখন হন্তদন্ত হয়ে বাসে উঠল সনাতন। বকের মত এপাশ ওপাশ তাকিয়ে কোন আসন না পেয়ে পেছনে চলে এল। বাস ততক্ষণে স্ট্যান্ড ছেড়েছে। সনাতন শ্রীনিবাসকে দেখতে পেয়ে একগাল হেসে জিজ্ঞাসা করল, 'চললে কোথায় ?'

'শহরে।'

'আমিও যাচ্ছি। তোমার নাকি বিয়ে?'

প্রশ্নটা এত জোরে করল যে আর সবাই শুনতে পেয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে শ্রীনিবাসকে দেখল। ভারি লজ্জায় পড়ল সে। পাশের মানুষটিকে একটু সরতে বলে শরীর গুটিয়ে কিছুটা জায়গা করে দিল সে সনাতনকে। আসনে বসেই সনাতন বলল, 'তোমরা নাটক শিকেয় তুলে দিলে?'

'কেউ তেমন উৎসাহী নয়।' বিড়বিড় করল শ্রীনিবাস।

'অথচ তোমাদের গাঁয়েই একজন প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী আছে। তোমরা নাটক করলে তার প্রতিভার কথা সবাই জানতে পারত।'

'আপনি কার কথা বলছেন সনাতনদা?'

'বাঃ, ছবিরাণীর কথা। আমি তাকে রিহার্সাল করিয়েছি। উঃ, কি ডেলিভারি!'

শ্রীনিবাস হিসেবটা মেলাতে পারছিল না। কিন্তু ছবিরাণীর বিষয়ে আলোচনা আর এগোক এটা সে চাইছিল না। সে কথা ঘোরাল, 'আপনি কি হরিপুরে নাটক করছেন?'

'হরিপুরে? ছ্যা! ওখানে কেউ নাটক করতে পারে নাকি? কাদের নিয়ে করব? শহরে যাচ্ছি কারণ সেখানে কলকাতা থেকে বিখ্যাত দল কলিকাতা নাট্য সমাজ এসেছে তিনরাত নাটক করতে। সব ফিল্ম আর স্টেজের অভিনেতা-অভিনেত্রীতে দল থিকথিক করছে। ওদের ডিরেক্টর পরমহংস সেন আমার বন্ধু। একসঙ্গে শিশিরবাবুর কাছে কাজ করেছি তো। সে-ই লিখেছে যাওয়ার জন্যে। নাটক দেখবে নাকি? টিকিট লাগবে না আমার সঙ্গে গেলে।'

'নাটক দেখতে গেলে তো রাত্রে থাকতে হবে?'

'তা তো বটেই। সবার সঙ্গে আলাপ হবে।'

'নাঃ, আমরা লাস্ট বাসে ফিরে আসব।'

'ওঃ, এইজন্যেই এখানকার ছেলেদের কিছু হবে না। তোমাদের চেয়ে মেয়েরা অনেক এ্যাডভান্স। ধরো ছবিরাণী কলিকাতা নাট্যসমাজে চান্স পেয়ে গেল, আমি নিশ্চিন্ত সে মাতিয়ে দেবে।'

শ্রীনিবাস কথা বাড়াল না। কোথায় ছবিরাণী কোথায় কোলকাতার নাটকের দল। সনাতনদার শুধু বড় বড় কথা। সে মুখ ঘুরিয়ে নিল। আশেপাশের যাত্রীরা কান খাড়া করে তাদের কথা শুনছে। রস পাচ্ছে খুব। ছবিবউদিকে কেউ কেউ চিনতে পারে।

'তুমি একা যাচ্ছ?'

'না। হরিহর জ্যেঠা সামনে আছেন।'

'অ। শালা বহুৎ ঢ্যামনা।'

'মানে?'

'ওই তো তোমার গাঁয়ের মাতব্বর। জনার্দন ওর সম্পর্কে বলেছে আমাকে। গাঁয়ের সব জমি স্বনামে বেনামে দখল করে নিয়েছে।'

'আস্তে কথা বলুন, উনি শুনতে পাবেন।'

'শুনলে আমার কি? ন্যাঙটার আবার চোরের ভয়!' মুখ ব্যাজার করল সনাতন। সেদিন ছবিরাণীকে হরিপুর থেকে গাঁয়ে ফিরিয়ে দেওয়ার পথে ওই হরিহরের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় কথা শেষ করতে পারেনি সে। রাগটা তার সেই কারণেও।

'শহর আগে দেখেছ?'

'না।'

'তাহলে ওই বুড়োর সঙ্গে গিযে লাভ নেই। আমি তোমাকে শহর দেখাবো। এমন জিনিস দেখাবো যা জিন্দিগিভব ভুলবে না।'

'ওঁর সঙ্গে এসেছি, কিছু জিনিস কিনতে হবে।' দোনমনা করল শ্রীনিবাস।

'আরে জিনিস তো আমাকেও কিনতে হবে।' পকেট থেকে একটা কাগজ বের করল সনাতন, 'হিমালয় বুকে পাউডাব, আফগান স্নো, বেঙ্গোলা সাবান, রাঙ্গাজবা সিন্দুর, গৃহলক্ষ্মী আলতা, চুলের ফিতে তিন রকম, আবও অনেক কিছু। হরিপুরে এসব ভাল পাওয়া যায় না।'

শ্রীনিবাস কিছুটা অবাক, 'এসব তো মেয়েদের জিনিস!'

চোখ বন্ধ করে মাথা দোলাল সনাতন, 'একশবার। মেয়েরা আমায় বিশ্বাস কবে বলে আনতে দিয়েছে। কে দিয়েছে তা বলব না।'

শ্রীনিবাসের খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। মেযেকে তত্ত্ব দেবার জন্যে বন্ধুবা যে লিস্ট তাকে তৈরি কবে দিয়েছে তাব সঙ্গে সনাতনের লিস্টের হুবহু মিল। সনাতনদা কি কাবো বিয়ের বাজার করতে যাচ্ছে? কার বিয়ে?

শহরে ঢোকার পর প্রথম বড স্ট্যাণ্ডেই হরিহর উঠে দাঁড়িয়ে শ্রীনিবাসকে খুঁজলেন। দেখাদেখি শ্রীনিবাস উঠে দাঁড়াল। পাশে বসা সনাতন বলে উঠল, 'আরে এখনই কি? সিনেমা থিযেটার তো অনেক দূবে আছে!'

শ্রীনিবাস বলল, 'উনি নেমে যাচ্ছেন, আচ্ছা যাচ্ছি।'

বাস থেকে নেমেই হরিহর জিজ্ঞাসা করলেন, 'কার সঙ্গে কথা বলছিলে হে?'

'আজ্ঞে সনাতন। হরিপুরের।'

'সেই নাটক করনেওয়ালা! বদলোক। বাড়ির বউদের টেনে অভিনেত্রী বানায। সতর্ক থেকো ওর সম্পর্কে। কুসংস্পর্শ যতটা ত্যাগ করা যায় ততটাই মঙ্গল। এসো এদিকে।' হরিহর একটু এগিয়ে ডানদিকে নদীর ওপর সেতুতে উঠলেন।

বেশ ভয়ে-ভয়েই হাঁটছিল শ্রীনিবাস। হরিপুরের কথা বাদ যাক, খোদ আলিপুরেও এত মানুষ এত রিক্সা গাড়ি একসঙ্গে রাস্তায় হাঁটে না। এই যেন সব কটা ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল। সে দেখল পায়ের তলায় একটা প্রায়-মজা নদীতে কচুরিপানা ঠাসা। হরিহর পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, 'বর্ষায় এই নদীর চেহারা পাল্টে যায় হে। তখন শহর ডোবায়। শোন, সাবধানে হাঁটবে। শহবের লোককে চট করে বিশ্বাস করবে না। কেউ পরামর্শ দিলে কানে নেবে—মনে রাখবে না।'

প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে এ-দোকান ও-দোকান ঘুরে শ্রীনিবাসের কেনাকাটায় সাহায্য করলেন হরিহর। ধুতি পাঞ্জাবি ছাড়াও তিনখানা বয়স্কদের শাড়ি, একখানা মধ্য-বয়সীর আর…তিনখানা নববধূর শাড়ি হয়ে গেল। হরিহর বুঝিয়ে দিলেন

বয়স্কদের তিনটে শাড়ি হল, নিজের মা, ছবিরাণীর শাশুড়ী আর কাদুবুড়ির জন্যে। হাল্কা রং যেটার, সেটা ছবিরাণীর। তিনশ টাকা প্রায় শেষ। হরিহর এবার নিজস্ব কিছু কাজ সারতে চাইলেন। তাঁর দলিল অফিসে যাওয়া দরকার। ও'রা বাজারের কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। হরিহর তাকে বললেন, 'এই মিষ্টির দোকানটা দেখছ, এখানে ঠিক এক ঘণ্টা বাদে ফিরে আসব। তুমি ততক্ষণে এক কাজ করো।' পকেট থেকে দুটো দশ টাকার নোট বের করে শ্রীনিবাসের হাতে দিলেন তিনি, 'এখানকার দোকানে খোঁজ করো বাইসনের শিং পাওয়া যায় কিনা। কবিরাজ মশাই বলেছেন বাজারের পেছনে পাওয়া যায়। দেখেশুনে চারইঞ্চি মতন শিং কিনে এখানে চলে এসো।'

'বাইসনের শিং দিয়ে কি হবে?'

'কি হবে তা ছাই জানি নাকি আমি? ওসব ডাক্তারদের ব্যাপার। বেশি দেবি করো না, বুঝলে? তোমার কাপড়গুলো দাও তো আমাকে, সঙ্গে বইতে হবে না।' শ্রীনিবাসের হাত থেকে প্যাকেটগুলো নিয়ে মিষ্টির দোকানের ক্যাশিয়ারের হেফাজতে রেখে এলেন হরিহর।

হরিহর চলে গেলে কয়েক সেকেণ্ড অস্বস্তি হল শ্রীনিবাসের। সেটাকে কাটাতেই সে হাঁটতে লাগল। প্রথম দোকানে জিজ্ঞাসা করতে সে হোঁচট খেল। লোকটা খেঁকিয়ে উঠল, 'কোন্ গাঁয়ের ভূত হে তুমি? স্টেশনারি দোকানে বাইসন খুঁজতে এসেছ! যাও বাজারের পেছনে যাও।'

শ্রীনিবাস সন্তর্পণে হাঁটছে। শহরের লোক গালাগাল দিলে ভাল, মিষ্টি কথা বললে বিপদ। চারধারে প্রচুর অলিগলি। সে চিহ্ন দেখে রাখছিল। ফেরার পথ গোলালেই বিপদ। আরও দু-জায়গায় জিজ্ঞাসা করে ধমক খেয়ে সে শেষ পর্যন্ত বাজারের পেছনে এসে পড়ল। এদিকে হাঁস-মুরগী থেকে পাঁঠার মাংস বিক্রি হচ্ছে। ওদের একজন তাকে একটু দয়াপরবশত বলল, 'সোজা এগিয়ে যাও, গলির মুখে বিনোদ শার দোকানে পেয়ে যাবে।'

শ্রীনিবাস এগোল। রাস্তাটা ফাঁকা-ফাঁকা। দু-একটা রিক্সা যাচ্ছে। এই দুপুরেই একটা মাতাল রাস্তা জুড়ে হাঁটছে। পাশ কাটিয়ে গলির মুখে পেঁছে সাইনবোর্ড দেখে দোকানে ঢুকল সে। দোকানভর্তি বয়াম। তাতে নানান রকমের চূর্ণ। একজন বৃদ্ধ বসে আছেন চুপচাপ। শ্রীনিবাস তাঁর কাছে বাইসনের শিং চাইল। বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন, 'চূর্ণ না আস্ত?'

'আজ্ঞে আস্ত। চার ইঞ্চি।'

'চল্লিশ টাকা পড়বে।'

'চল্লিশ? আমাকে যে উনি কুড়ি টাকা দিয়েছেন!

'উনিটা কে?'

হরিহরের নাম বলতে গিয়েও নাম পাল্টাল শ্রীনিবাস, 'হরিপুরের অবিনাশ কবিরাজ।'

'অ। বুঝেছি। নিয়ে যাও। ভেতরে [illegible] বৃদ্ধ।

এই সময় দুজন মেয়েছেলে দোকানে ঢুকল। [illegible]য়ে বলল, '[illegible],

কবিরাজ মশাই, কি ওষুধ দিলেন, ব্যথা যে কমে না ?'

বৃদ্ধের গলা ভেতর থেকে ভেসে এল, 'আমার দোষ কি ? বলেছিলাম সাতদিন বিশ্রাম নিতে হবে। শরীরের ক্ষত নিত্য খোঁচালে শুকোবে কি করে ?'

'পেট তো শুনতে চায় না!' মেয়েছেলেটি স্বগতোক্তির মত বলে শ্রীনিবাসেব দিকে তাকিয়ে হাসল। দ্বিতীয়জন তাকে লক্ষ্য করছিল, জিজ্ঞাসা করল, 'এ পাড়ায় নতুন মনে হচ্ছে ?'

শ্রীনিবাসের গলা শুকিয়ে গেল। সে কোনমতে মাথা নাড়ল।

দ্বিতীয়জন এবাব হাসল, 'তাহলে এসো সঙ্গে, তোমায় আমি স্বর্গ দেখাবো।'

'কোথায় ?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল শ্রীনিবাস।

'গলির ভেতবে। চাব নম্বর বাডি। আমাব নাম চামেলি।'

প্রথমজন বলল, 'ছাড় তো! সব জানে। নইলে এ দোকানে আসে ?'

দ্বিতীয় বলল, 'না রে। নাক দেখ, ঘামছে। গাঁয়ের লোক মনে হচ্ছে মাইবি!'

এই সময় বৃদ্ধ ফিরে এল একটা কাগজের ঠোঙা হাতে। এসে শ্রীনিবাসকে জিজ্ঞাসা করল, 'ফুর্তি করার মতলবে এ পাড়ায় এসেছ নাকি ?'

'ফুর্তি ? কিসের ফুর্তি ?'

'পাশের গলিটা ভর্তি মেয়েছেলে। টাকা দিলে ফুর্তি দেয় ওবা। মতলব তাই নাকি ? অবিনাশ কবিরাজের লোক বলে জিজ্ঞাসা কবছি।'

শিউরে উঠল শ্রীনিবাস, 'না, না। আমি বাইসনেব শিঙ কিনতে এসেছি।'

বৃদ্ধ হাসল, 'বাইসনের শিঙ্ তো ওই কাবণে দরকাব হয়!'

রেগে গেল শ্রীনিবাস, 'নিন কুড়ি টাকা। দিন জিনিস। আজ বাদে কাল আমার বিয়ে। আমি মাতাল লম্পট নই।'

বলে প্যাকেটটা নিয়ে হনহনিযে হাঁটতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে পেছনে হাসির ফোয়াবার সঙ্গে শব্দ বাজল, 'বর যাচ্ছে—বর!'

ফেরার পথটা সে গুম হয়ে বসেছিল হরিহবের পাশে। এত সামনাসামনি সে কখনও বারবনিতা দ্যাখেনি। একই মেয়ে ঘবেব বউ আবার বা[illegible]নিতা হয় না বোধহয়। দুটো তো আলাদা জীবন। কিন্তু যারা ওদের কাছে যা[illegible] তারা ঘরের এবং বাইরেরও। হঠাৎ শরীর কেমন ঘিনঘিন করে উঠল তাব।

হবিহর প্যাকেটটা নিয়ে জিজ্ঞাসা কবেছিল, 'এতক্ষণ কোথায় ঘুরলে ?'

শ্রীনিবাস মুখ ঘুরিয়ে জবাব দিয়েছিল, 'এই এদিক-ওদিক।'

শ্রীনিবাসের বিয়ে হয়ে গেল। গ্রামের সবাই সন্তুষ্ট হয়ে খেয়ে গেল। বাসরে গান গাইল জনার্দন। হল্লোড় বলে হুল্লোড়! [illegible]বর এল কনেকে নিয়ে বাড়িতে। মুখে মুখে আনন্দ। সেই রাত কালরাত্রির রাত। [illegible] ঘর ছেড়ে তাই বন্ধুর বাড়িতে শ্রীনিবাস। কিন্তু ভোরবেলায় খবর [illegible]ল তাকে। তখনও অন্ধকার কাটেনি। রাত[illegible]দেখতে নেই সেই রাত্রে দেখতে হল।

ম[illegible]শুড়োর পাশে। শব্দ শুনে

উঠে বসে কি করবে বুঝতে পারে না। সেই অবস্থায় রাগারাগি করে শাশুড়ী, ছেলেকে ডাকতে বলে। বউ ছুটে যায় অন্ধকারে দিদির বাড়ি। ছবিরাণী ছুটে আসে তখনই। এসে দ্যাখে শ্রীনিবাসের মায়ের শরীর থেকে প্রাণ বেরিয়ে গেছে।

মায়ের সামনে এসে দাঁড়াতেই শ্রীনিবাস কালরাত্রির শেষ প্রহরে মৃতদেহের পায়ের কাছে বসে কাঁদতে থাকা বউ-এর মুখ দেখল।

সে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল।

বাইরে দাঁড়ানো বন্ধুদের কেউচাপাগলায় বলল, 'যাঃ, বেচারীদের আজ ফুলশয্যা ছিল!'

॥ ১১ ॥

শোক মানে কি? প্রিয় যা তাকে হারিয়ে ফেলার যন্ত্রণা? তাহলে বিধাতাপুরুষ ওই ব্যাপারে বড় কৃপণ, মানুষের মনে শোকের আয়ু দীর্ঘস্থায়ী করতে তিনি আদৌ ইচ্ছুক নন। যে প্রক্রিয়ায় প্রতিটি দিনের স্মৃতি দিনান্তে অতীত হয়ে যাচ্ছে, সেই একই স্রোতে তিনি আজকের অভাববোধ কালকে চিনচিনে স্মৃতি, পরশু ধুয়ে মুছে সাফ করে দেন। যুধিষ্ঠির বলেছিলেন মানুষের চরিত্র এমন যে সে যখন কাউকে মারা যেতে দ্যাখে তখন ভুলেও ভাবে না একদিন তার ওই গতি হবে। যুধিষ্ঠির এটা বলেন নি, কোন মানুষই পৃথিবীর একমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু নয়। যে কোন বিদায়ের দুঃখ তাৎক্ষণিক। প্রতিদিনের ঢেউ গতকালকে আরও অতীত করে দেয়। এসব কথা হরিহর শ্রীনিবাসকে বুঝিয়েছিলেন।

মায়ের সঙ্গে শ্রীনিবাসের জীবনযাপন শুধুই একটা অভ্যাস ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। তাঁর মৃত্যুতে সে শোকে পাগল হয় নি। ভদ্রমহিলা সারাজীবন নম্র কথা বলেন নি এবং তাঁর অনেক ব্যবহারে শ্রীনিবাসের মনে শুধু তিক্ততা জন্মেছিল। অতএব শ্মশানে বসে সে যখন গম্ভীর মুখে বসেছিল তখন হরিহর তাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। অথচ শ্রীনিবাস তাঁকে বলতে পারে নি যে সে মায়ের জন্যে আদৌ শোকগ্রস্ত নয়। মা চলে যাওয়ায় সে অনেক সমস্যা থেকে মুক্তি পেয়ে গেছে। সে দুঃখিত, কারণ আজ তার ফুলশয্যা ছিল। ইতিমধ্যেই কালাশৌচের কারণে সেটি স্থগিত বলে ঘোষণা করা হয়ে গিয়েছে। জীবনের এমন পরম রাত্রি মায়ের হঠকারী মৃত্যুর জন্যে নষ্ট হয়ে গেল। মানুষটা মারা যাওয়ার আর সময় পেল না। এখন তেরো-চৌদ্দ দিন ধরে কাছা নিয়ে ঘুরতে হবে। চোখের সামনে স্ত্রীকে দেখেও চোখ বন্ধ করে থাকতে হবে। যতদিন স্ত্রী ছিল না ততদিন একরকম ব্যাপার ছিল, এখন ক্ষুধার্তের হাতে খাবার দিয়ে নিষেধ করা হল খেতে। এটা যে কত কষ্টকর তা সে বোঝাবে কি করে? পেয়েও তো সে হারাচ্ছে। হোক সাময়িক, তবু তো হারাচ্ছে। এই শোকে সে নির্বাক ছিল।

এসবই একরকম অতীত হয়ে গেল। গ্রামের কেউ কেউ গুজন তুলেছিল

শ্রীনিবাসের বউ মস্ত অপয়া, অলক্ষ্মী। শ্বশুরবাড়িতে এসেই শাশুড়ীকে খেয়ে নিল। কথাটা শ্রীনিবাসের কানে তুলতে তাদের অসুবিধে হয় নি। শ্রীনিবাস কান দেয়নি, কান দেবার প্রয়োজন মনে করে নি। তার শরীর হৃদয় উদর তখন পরিতৃপ্তবোধে টৈটুম্বুর, এসব ছেঁদো কথা শোনার অবকাশ কোথায়? নতুন বউ কিন্তু মনে মনে একটু অস্বস্তি রাখত, মধ্যরাত্রে বিহারের পর স্বামীর কানে সেই অস্বস্তির কথা বলেও ফেলত। কিন্তু শ্রীনিবাস ফুৎকারে উড়িয়ে দিত সেটা, 'দূর! মা ভুগছিল অনেকদিন থেকে, চলে যাবে বুঝতে পেরেই তো আমাকে বিয়ে করতে বলছিল।'

শ্রীনিবাস সংসারে এখন বড়ই মনোযোগী। জল পড়তেই সে মাঠে যায়। পরিশ্রম করে। অনভ্যাসের আলস্য কাটিয়ে উঠতে দেরি করে না। গ্রামের সবাই তার প্রশংসা করেন। বন্ধুদের সঙ্গে সে খুব কমই আড্ডায় বসতে পারে। দিনভর পরিশ্রম আর সন্ধ্যে থেকে নতুন বউ। এখন এই তার জগৎ। কেউ কেউ তাকে মেনিমুখো, কেউ স্ত্রৈণ বলে সুখ পায়। শ্রীনিবাস এসব গ্রাহ্য করে না। তার এই জীবন খুব ভাল লাগছে। মাঝে মাঝেই বাড়ি ফিরে মনে হয় ভাগ্যিস মা নেই, তাহলে নতুন বৌ-এর সঙ্গে এক মাদুরে দাওয়ায় শুয়ে চাঁদ দেখতে পারত না!

ফুলশয্যার দিন বোনের শাশুড়ী মারা যাওয়ায় ছবিরাণী বেশ কাঁটা হয়ে ছিল। তার বাপের বাড়ির গ্রামে এরকম একটা ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর নতুন বউকে রাক্ষুসী চিহ্নিত করে ফেরৎ দিয়ে গিয়েছিল তার শ্বশুর। এখানে কানাঘুষোয় কথাটা শোনা গেলেও তেমন কিছু ঘটল না। তার চিন্তা হয়েছিল শ্রীনিবাসের বাড়িতে যেহেতু তৃতীয় মানুষ নেই বলে। অশৌচের সময় হবিষ্যি করতে হচ্ছে শ্রীনিবাসকে। বউ-এর সঙ্গে তার ভাল করে পরিচয় হয়নি। ফুলশয্যা হলে এক কথা ছিল। যতদিন শ্রাদ্ধশান্তি না চুকছে ততদিন বোনকে নিজের কাছে এনে রাখা উচিত। ছবিরাণীর শাশুড়ী অবশ্য ওই মৃত্যুর জন্যে বউমার বোনকেই দায়ী করেন। তবে সেই সঙ্গে ঘাড় থেকে নেমেছে বলে একটু স্বস্তিও অনুভব করেন। মৃতদেহ নিয়ে শ্মশানে যখন ছেলেরা চলে গেল তখন বোন দিদিকে জড়িয়ে ধরে খুব কেঁদেছিল। তাকে কি সান্ত্বনা দেবে ভেবে পায়নি ছবিরাণী। শ্মশানযাত্রীরা বিকেলে ফিরলে তাদের সমস্ত ব্যবস্থা করে সে বাড়ি ফিরে এসেছিল। কাদুবুড়ি বলেছিল এই কদিন বোনের সঙ্গে থাকতে। অন্তত শ্রাদ্ধশান্তি চুকে যাওয়ার পর ফুলশয্যা না হওয়া পর্যন্ত। বোনকে নিয়ে আসতে আপত্তি আবার তার ওখানে গিয়ে থাকতেও অস্বস্তি, ছবিরাণী ফিরে এসেছিল। একসময় মনে হয়েছিল হরিহরের সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করা যাক। কাদুবুড়ির মুখে সমস্যাটা জেনে হরিহর নিজেই এসে বলেছিলেন, 'কোন দরকার নেই। এখন থেকে এটা ওদের সংসার। ওদেরই বুঝতে দাও, দরকার কি নাক গলাবার!'

কিন্তু সন্ধ্যের পর রাত বাড়লে শাশুড়ী ক্রমাগত টিকটিক করতে লাগলেন। এ কেমন দিদি যে বোনকে ফুলশয্যা না হওয়া অবস্থায় অশৌচ-বাড়িতে একা ফেলে এল! সকালে যিনি মৃত্যুর জন্যে বোনকে দায়ী করছিলেন, সন্ধ্যে যেতে-না-যেতেই

তিনি তার ও-বাড়িতে থাকা নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত ছবিরাণী স্থির করল বোনের কাছে গিয়ে রাত্রে শোবে। নটা নাগাদ দুটো মুখে দিয়ে সে চাদর হাতে বের হল। অন্ধকার রাস্তায় কেউ তার মুখোমুখি হয়নি। প্রায় অদৃশ্য অবস্থায় শ্রীনিবাসের বাড়িতে সে পৌঁছে গেল। বাড়ি অন্ধকার। উঠোনে পৌঁছে সে ডাকতে গিয়ে হঠাৎ সঙ্কোচ বোধ করল। এমন অন্ধকার করে রেখেছে কেন ওরা? ছবিরাণীর মনে হয়েছিল এখানে এসে শ্রীনিবাসের কান্না শুনতে পাবে। কিন্তু চারধার বড় চুপচাপ। সে নিঃশব্দে বারান্দায় উঠল। ওরা কি খাওয়াদাওয়াও করেনি? আজ অবশ্য এ বাড়িতে উনুন জ্বালা সম্ভব নয়। চিড়েমুড়ি কি ধরে দিয়েছে বোন? ছবিরাণী দু'পা এগিয়েই থেমে গেল। এটা কার গলা? বোনের? এমন গলায় তো কখনও কথা বলেনি ও! ছবিরাণী বন্ধ দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই শ্রীনিবাসের গলা শোনা গেল। সেই শব্দাবলী কানে যাওয়া মাত্র ছিটকে সরে এল সে। তার কান ঝাঁ-ঝাঁ করছিল। দ্রুত উঠোন পেরিয়ে সে রাস্তায় নেমে পড়ল। সে যে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে তা নিজেরই জানা নেই। এবং এইভাবে বাড়িতে পৌঁছবার পর সে সম্বিৎ ফিরে পেল। শাশুড়ীকে কি বলবে? কেন সে ফিরে এল? চুপচাপ অন্ধকার দাওয়ায় বসে পড়ল সে। দুহাতে মুখ ঢাকল ছবিরাণী। দিনের বেলায় মায়ের মুখাগ্নি করে রাত্রে ফুলশয্যা পেতেছে শ্রীনিবাস। ওইসব কথাবার্তা সে নিজে একদা শিবরামের মুখে শুনেছে, ওই গলায় সে-ও কথা বলেছে। তার খুব খারাপ লাগছিল। দুটি নারীপুরুষ শোক ভুলে অসংযমী হওয়ার জন্যে যতটা, তার থেকে নিজের মনে বঞ্চিত হবার ভাবনার কারণটাই ক্রমশ প্রকট হচ্ছিল। কোন প্রিয় পুরুষের সঙ্গ থেকে সে কতদিন বঞ্চিত! শিবরাম নিরুদ্দিষ্ট। কতকাল শরীরের মধ্যেকার শরীর আনন্দিত হয়নি। তার সব আছে তবু এমন যোগিনী হয়ে থাকতে হবে কেন? ফুলদানির ফুল? প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল এই মুহূর্তে। কিন্তু কেউ তো নেই। চারপাশে এমন একটা পুরুষ নেই যে তাকে আকর্ষণ করে। হরিহরের মুখটা মনে এল। মানুষটা ভাল। কিন্তু ওঁকে দেখে বাবা বলে ভাবতে ভাল লাগে। সে নিশ্চিত আজ শ্রীনিবাস যে গলায় কথা বলছিল হরিহর এ জীবনে সেই গলা খুঁজে পাবেন না। হরিহরকে প্রেমিক ভাবতে তার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে হচ্ছে না। হরিহর যে উপকার করেছেন তার বিনিময়ে সে সব কিছু করতে পারে, কিন্তু শরীরের আনন্দ আহরণ করতে পারবে না। ক্রমশ তার চিন্তা ছিঁড়ে যাচ্ছিল। আশ্চর্য, একটা পুরুষও তার সামনে এসে কখনও দুটো ভাল কথা বলেনি! হয়তো তার গাম্ভীর্য দেখে সবাই মুখোশ পরে থেকেছে। এবং তখনই তার মনে পড়ল সনাতনের কথা। সনাতন তার রিহার্সাল দেখে কি প্রশংসাই না করেছিল! শুধু প্রশংসা? সনাতনের চোখেমুখে অদ্ভুত আনন্দ মাখামাখি ছিল। লোকটার শরীর অবশ্য দড়িপাকানো, বয়সও মাঝারি, কিন্তু কত কি জানে! কলকাতায় সিনেমা থিয়েটারের নামকরা মানুষরা ওর চেনাজানা। ছবিরাণীর মনে হল লোকটা হরিহরের মতীশ রায়ের মত লম্পট নয়। বরং সে মতীশ রায়ের নজর থেকে তাকে বাঁচাতে চেয়েছিল। সনাতন তাকে বড় অভিনেত্রী তৈরী হতে সাহায্য করতে চেয়েছিল। এখন সব দায় চুকে যাওয়ার পর এখানে এই

শাশুড়ীর ছায়ায় পড়ে থেকে কি লাভ? কি পাবে সে বিনিময়ে? সে যদি কলকাতায় পৌঁছে অনেক বড় অভিনেত্রী হতে পারে, অনেক টাকা পেয়ে মাথা তুলে থাকতে পারবে বাকী জীবনটা। তার মনে হচ্ছিল ওই রাত্রেই হরিপুরে গিয়ে সনাতনের সঙ্গে দেখা করে।

প্রথমে একটা অস্বস্তি। এতদিনের অভ্যেস এককথায় ছেড়ে যাওয়া বড় মুস্কিল। নিঃশব্দে নিজের ঘরে চলে এল ছবিরাণী। দরজা খোলার সময় খুট করে যে শব্দটা হল তাতেই গলা খুলে গেল শাশুড়ীর। নিজের বিছানায় শুয়ে চিৎকার করে শেয়ালের উদ্দেশে গালাগালি দিচ্ছেন। অন্ধকার ঘরে দাঁড়িয়ে হুহু করে কেঁদে উঠল সে। শাশুড়ীর চিৎকারটা কানে যাওয়া মাত্র সে মনস্থির করে নিল। না, এ বাড়িতে সে আর থাকবে না। চটজলদি টিনের বাক্সে যা পারল পুরে নিল। নিঃশব্দে বেরিয়ে এল বাইরে। কোনদিকে না তাকিয়ে রাস্তায়। পা বাড়াতে গিয়ে খেয়াল হল হরিপুরে যাওয়ার পথে যে মুদির দোকান পড়ে সেটা অনেক রাত পর্যন্ত খোলা থাকে। ছেলেছোকরারা আড্ডা মারে সেখানে। রাত দশটা নাগাদ সুটকেস হাতে ছবিরাণীকে গ্রাম ছেড়ে বেরুতে দেখলে সন্দেহ জাগবেই। মধ্যরাত পর্যন্ত অপেক্ষা করা তার পক্ষে আর সম্ভব নয়। সে দ্বিতীয় পথ ধরল। মন্দিরের পাশ দিয়ে নদীর ধার দিয়ে চলে যাবে। জনার্দনের সঙ্গে অবিনাশ কবিরাজের কাছে ওই পথ দিয়েই সে গিয়েছিল। হনহনিয়ে হাঁটা সুরু করল ছবিরাণী। বুকের ভেতর ভয় এবং উত্তেজনা একই সঙ্গে ছোবল মারছে। অন্ধকার মাঠটা সে পেরিয়ে গেল পাখির মত। বারেবারেই কেউ যেন তাকে পেছনে টানছে আর সেই টানটাকে অস্বীকার করে সে পা ফেলছে। একসময় অন্ধকার চোখে সয়ে গেলে সে মন্দিরটাকে দেখতে পেল। নির্জন প্রান্তরে মন্দিরটায় একটা আলো জ্বলছে। তার মানে সে অনেকটা পথ পেরিয়ে এসেছে।

মন্দির দেখামাত্র তার মনে হল সে কি কোন পাপ করছে? তার পিছুটান নেই, কেউ তার জন্যে ভাবে না, এই অবস্থায় বেরিয়ে আসা কি অন্যায়? আশৈশব থেকে যেসব সংস্কার মনের আনাচেকানাচে ছড়িয়ে ছিল তারা কিছুটা প্রবল হয়ে উঠল। ছবিরাণী স্থির করল গাঁ একেবারে ছেড়ে যাওয়ার আগে মাকে প্রণাম করে যাবে।

সে ধীরে ধীরে এগোল। চারধার সুনশান। এ তল্লাটে অপ্রয়োজনে দিনের বেলায় মানুষ আসে না, রাত্রে তো কথাই নেই। সে মন্দিরের সিঁড়িতে পৌঁছানো মাত্র গম্ভীর ডাক শুনতে পেল, 'মা, মা, দয়া কর মা। মাগো! তুই কি এতই পাষাণী?' সেই বাঁজখাই গলার ডাকে কেঁপে উঠল ছবিরাণী। মন্দিরের দরজা আধা-ভেজানো, আলো আসছে তার ভেতর থেকে। এই কণ্ঠ জগা পাগলার। জগা পাগলার ওপর মায়ের ভর হয়। মা তার মুখ দিয়ে অনেক সত্যি কথা বলে থাকেন। এই নিস্তব্ধ রাত্রে একা জগা পাগলা মাকে ডেকে চলেছে সমানে। কেন? কিসের জন্যে এই আর্তি? ছবিরাণীর মনে ঘোর লাগল। ঠিক যেভাবে শ্মশানে গেলে মানুষের মনে বৈরাগ্য আসে, যেভাবে মৃতদেহের সামনে দাঁড়ালে মন চমকে যায় ঠিক সেইভাবে এই গভীর রাত্রে মন্দিরের চাতালে দাঁড়িয়ে জগা পাগলার উদাত্ত কণ্ঠের ডাক তাকে মাতৃমুখী করল।

পা ফেলতে গিয়ে সে নিজেকে অবশ বুঝল। শরীর ভারি হয়ে গেছে। দরজা পর্যন্ত যেতেই যেন কতকাল কেটে গেল। দরজায় হাত দিতেই সেটি উন্মুক্ত হল। বিশাল প্রদীপের আলো মায়ের মুখে পড়ায় তাঁকে কী ভয়ঙ্কর সুন্দর দেখাচ্ছে। সেই মুখের দিকে তাকিয়ে ছবিরাণী নিশ্চল হয়ে পড়ল।

'কে? কে এখানে? কে তুই? কোন সাহসে এলি?'

গর্জন শুনে মুখ নামাল ছবিরাণী। মায়ের সামনে পদ্মাসনে বসে আছে জগা পাগলা। এখন তার ক্রুদ্ধ মুখ দরজার দিকে ফেরানো, শরীর মায়ের দিকে। এবং সেই শরীরে কোন বস্ত্র নেই। দিগম্বর হয়ে সে মাকে ডেকে যাচ্ছিল। ছবিরাণী জবাব দিতে গিয়েও পারল না। তার গলা শুকিয়ে কাঠ।

জগা পাগলা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল, 'তুই একা?'

ছবিরাণী মাথা নেড়ে কোনরকমে হ্যাঁ বলতে পারল।

'কোন্ গ্রামে থাকিস?'

'নারাণপুর।'

'স্বামীর নাম?'

'নেই। সে নেই।'

'এ রাত্রে মায়ের কাছে কেন? মনে ঝড় উঠেছে?'

ঝড়? নিশ্চয়ই ঝড়। ছবিরাণীর মনে পড়ল সে গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছে। এখন মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

জগা পাগলা চিৎকার করল, 'ঝড় তোকে টেনে এনেছে এখানে! সন্তান আছে?'

মাথা দোলালো ছবিরাণী, না।

জগা পাগলা এবার মায়ের দিকে ঘুরে দাঁড়াল, 'মা, মাগো, এ কি খেলা তোর? মনে মনে এই ভেবেছিলি? আমাকে তোর এত দয়া?' বলতে বলতে উপুড় হয়ে লুটিয়ে পড়ল সে মায়ের মূর্তির সামনে। তার গলা থেকে কান্না ছিটকে এল। কয়েক মিনিট ওইভাবে থেকে ধীরে ধীরে উঠে বসল জগা পাগলা। তার চোখ রক্তিম। গম্ভীর গলায় হুকুম করল, 'আয়, মায়ের সামনে এসে দাঁড়া।'

ছবিরাণী গুটিগুটি এগোল। মায়ের মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তার শরীরে কাঁটা ফুটল। সে মায়ের চোখে চোখ রাখতে পারল না। জগা পাগলা চেঁচিয়ে উঠল, 'চোখ সরাস না, মায়ের চোখে চোখ রাখ। হ্যাঁ। এবার দিগম্বরী হ। মা যেমনটি দাঁড়িয়ে আছে তেমনটি দাঁড়া, যেভাবে জন্ম নিয়েছিলি সেইভাবে।'

ছবিরাণী চোখ বন্ধ করল। কেন? কেন তাকে নগ্নিকা হতে বলছে? পৃথিবীর অন্য কোথাও হলে এই আদেশের যে অর্থ হয় মায়ের মন্দিরের ভেতরে বিগ্রহের সামনে কি সেই একই অর্থ বুঝতে হবে? অসম্ভব।

আচমকা একটা শক্ত কিছু ছুটে এসে আঘাত করল চিবুকে, তীব্র ব্যথা ছড়িয়ে পড়ার আগেই মেঝেতে ঝনঝন শব্দ হল আর সেই সঙ্গে জগা পাগলার চিৎকার, 'কথা কানে যাচ্ছে না, না?' মা যেখানে নিজে দিগম্বরী সেখানে কোন কাপড়ে নিজেকে ঢাকতে চাস? তুই এখানে এসেছিস নিজের ইচ্ছেয় ভেবেছিস? কখনো

না। মা তোকে আনিয়েছে। মহামায়া যেখানে বিবস্ত্রা সেখানে তোর কি ক্ষমতা নিজেকে আবৃত রাখার! খোল্!'

ছবিরাণীর কাঁধ থেকে আঁচল খসে পড়ল। কোমর থেকে শাড়ির গিঁট। ধীরে ধীরে সায়া ব্লাউজ এবং ভেতরের জামা মাটিতে ফেলে ছবিরাণী দুহাতে মুখ ঢাকল। কেন সে এই আদেশ পালন করছে তা সে জানে না। কিন্তু মনে হচ্ছিল ওই আদেশ পালন না করে তার মুক্তি নেই। শরীরের শিরায় রক্তে এখন ভাঁটার শীতলতা।

জগা পাগলা উঠে দাঁড়াল। তার হাতে একটি ছোট প্রদীপ। বিবস্ত্রা মানবীর সামনে বিবস্ত্র পুরুষ। কিন্তু জগা পাগলার চোখ ছবিরাণীর শরীরের সেই সব অংশে যেখানে প্রদীপের আলো পড়ছে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সে ছবিরাণীর শরীর দেখতে লাগল। সামনে পেছনে, দুপাশে। তারপর এক পা পিছিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'মায়ের দিকে তাকিয়ে দ্যাখ তোর সঙ্গে কিসের তফাৎ?'

ছবিরাণী চোখ থেকে হাত সরাল, জগা তাকিয়ে তাকে দেখছে। সে জবাব দিতে পারল না। জবাবের জন্যে অপেক্ষা করেনি জগা পাগলা, 'মায়ের পা দেখলে ভয় হয় অন্যায় দেখলেই লাথি মারবেন, বুক দেখলে মনে হয় তৃষ্ণায় সে দুগ্ধদান করবে জীবন ফিরিয়ে দিতে, মুখ দেখলে মনে হয় সন্তানের মত আদুরে, চোখ দেখলে কেঁপে ওঠে সব কিছু, ওপারের কথা ভেবে। আর হ্যাঁ, কোমর দেখলে শরীরে তাপ বাড়ে, আর এক শরীর বেড়ে ওঠে। তবে দ্যাখ, মায়ের ওই এক দেহে কত রূপ! তোর আছে?'

মাথা নাড়ল ছবিরাণী, নেই, কিছুই নেই তার।

'কি আছে তোর?'

'কিছু না।' বিড়বিড় করল সে।

'ক্রোধ আছে, লোভ আছে, মোহ আছে, মদ আছে, মাৎসর্য আছে কিন্তু সব ছাপিয়ে কাম খলবল করছে আগাপাছতলা। তবু মা তোকে নিয়ে এল এখানে। কেন? ওই কাম ভাব মুছিয়ে দিতে। শোন, তুই বস্ত্র পরে নে।'

ছবিরাণী হতভম্ব। কেন? খোলানোই বা কেন, পরে নিতে বলাই বা কেন হচ্ছে? সে জগা পাগলার দিকে তাকাল। লোকটির নগ্ন শরীর যে কোন যুবকের মত। কিন্তু নিজের শরীরের প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ নেই লোকটার। সামনে একটি নগ্ন নারী দাঁড়িয়ে যার শরীরে বিধাতাপুরুষ নিজের ভাবনা চরিতার্থ করেছেন নিপুণ হাতে, অথচ জগা পাগলার অঙ্গে কোন প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না। আশ্চর্য!

ছবিরাণী পোশাক পরল। একের পর এক। পরে সসঙ্কোচে দাঁড়াল। পোশাক পরে নেবার মিনিটখানেক বাদে সে নিঃসঙ্কোচ হতে পেরেছিল।

জগা পাগলা বলল, 'এবার বাড়ি যা।'

ছবিরাণী বলল, 'আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছি।'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু বাড়ি ফিরে যেতে হবে তোকে। না গিয়ে উপায় নেই। এখন গেলে কেউ জানবে না তুই বেরিয়ে এসেছিলি। যে স্বামী নেই তার নাম বলতে কোন বাধা নেই, কি নাম তার?'

'শিবরাম।'

'অ, তুই শিবরামের বউ? ভাল। কোন পুরুষের চোখ আছে তোর ওপর?'

ছবিরাণীর মনে হরিহরের মুখ ভেসে উঠল। সে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

'সে তোকে স্পর্শ করেছে?'

'না।'

'তুই তাকে চাস?'

'চাইলে গ্রাম ছেড়ে যাই?'

'কেন যাচ্ছিস?'

'আমার আর ওই জীবন সহ্য হচ্ছে না।'

'বুঝলাম। এই আজ রাত্রে ফিরে যা। যা বলছি!'

ছবিরাণী ধীরে ধীরে মন্দির থেকে বেরিয়ে এল। কোন্ পথে যাবে সে? কোন সিদ্ধান্ত না নিতে পেরে সে নারায়ণপুরের দিকে পা বাড়াল। গ্রামটায় এখন গভীর ঘুম।

তখন কাকভোর। গ্রামের মানুষ উঠেছে কি ওঠেনি। হরিহর দাঁতনমুখে নিজের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। বেশ কিছুদিন ছবিরাণী এদিকে স্নান করতে আসে না। বোনের বিয়ে নিয়ে ব্যস্ত ছিল, সেই কারণেই আসতে পারেনি। এখন সেসব চুকে গিয়েছে, হরিহরের মনে হচ্ছিল আজ ছবিরাণীর দর্শন পেলেও পাওয়া যেতে পারে। তিনি ঘনঘন পথের প্রান্তে দৃষ্টিনিক্ষেপ করছিলেন। হঠাৎ একটি মানুষকে হরিহর এই আবছা আলোয় দেখতে পেয়ে চমকে উঠলেন। কখনই গ্রামের মধ্যে দেখবেন বলে আশা করেন নি, হরিহর দাঁতন ফেলে দিয়ে দ্রুত এগোলেন।

জগা পাগলা খানিকটা উদ্ভ্রান্তের মত হাঁটছিল। দীর্ঘকাল এই অঞ্চলে না আসায় দিক্ ঠাওর করা তার পক্ষে একটু মুস্কিল হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ সে হরিহরকে ছুটে আসতে দেখে থমকে দাঁড়াল। হরিহর তার পা স্পর্শ করে হাত মাথায় ঠেকালেন, 'আপনি? এত কষ্ট করে কেন এলেন? ডেকে পাঠালে আমিই তো যেতাম।'

জগা পাগলা এই প্রশ্নের উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ করল না। চারপাশে তাকিয়ে বলল, 'আমি একটু আগেই এসে পড়েছি দেখছি। যাকগে, সবাইকে ডাকো। এখানে সবাই আসুক। তোমাদের কাছে আমার নিবেদন আছে।'

'নিবেদন? কি ব্যাপার?'

'বললাম তো। সবাইকে ডেকে আনো। একা একা কি শুনবে?' নিজের খোঁচা খোঁচা দাড়ি ধরে নিজেই টানতে লাগল জগা পাগলা।

হরিহর বিপাকে পড়লেন। এই মানুষটিকে তিনি চেনেন। অতএব আগে পাশের বাড়ির মানুষের ঘুম ভাঙ্গাতে হল। জগা পাগলা মন্দির ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন কিছু বলবেন বলে, শোনামাত্র দলে দলে লোক জমায়েত হতে আরম্ভ করল। হরিহর আর একবার জগা পাগলার আসার উদ্দেশ্য তাদের জানিয়ে দিলেন। জগা পাগলা তখনও একমনে নিজের দাড়ি ওপড়াবার চেষ্টা করে যাচ্ছিল। হরিহর তার কাছে গিয়ে বললেন, 'দেখুন, গ্রামের অনেকেই তো এসে গিয়েছে।'

'তা গিয়েছে। সব মেয়ে তো আসে নি!'

'আজ্ঞে, মেয়েরা তো সাতসকালে বেরুতে লজ্জা পান, তাছাড়া এ গ্রামের মেয়েরা চট করে বাইরে বেরুতে চান না, জানেনই তো!' পীতাম্বর বুঝিয়ে বলল।

'তা শোন সবাই। ক'দিন থেকে মা আমাকে স্বপ্নাদেশ দিচ্ছেন, আমি শুনছি না। কাল রাত্রে একেবারে ঝুঁটি ধরে নাড়া দিলেন। আমার সময় হয়ে গিয়েছে, যাওয়ার সময়। যে কোন দিন চলে যেতে হবে। তাহলে মায়ের পুজো কে করবে?'

জগা পাগলা চিৎকার করল। সঙ্গে সঙ্গে জমায়েতে গুঞ্জন উঠল। হরিহর বলে উঠলেন, 'এ কি কথা! আপনি খামোকা যেতে যাবেন কেন?'

'আর ভাল লাগছে না। মা আদেশ দিয়েছেন এই গ্রামের একজন পুজোর দায়িত্ব নেবে যে বিবাহিতা অথচ সন্তানহীনা, বিধবা নয় আবার সধবাও বলা যায় না। কেউ আছে তেমন?'

এ ওর মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগল। এই বর্ণনা কার সঙ্গে মেলে? হরিহর বললেন, 'আছেন একজন। কিন্তু মায়ের পুজো করবেন একজন মহিলা?'

'বাঃ, মা নিজে কি? ব্যাটাছেলে?'

'কিন্তু তিনি পুজোআর্চার কিছুই জানেন না।'

'দরকার নেই। যিনি পুজো নেবেন তিনিই শিখিয়ে দেবেন। ডাকো তাকে।'

নীলাম্বর পীতাম্বররা হরিহরের কাছে গিয়ে ফিসফিস করে কথা বলতে আরম্ভ করেছে। হরিহর বললেন, 'সধবা বলা যায় না আবার বিধবাও নয়, বিবাহিতা অথচ সন্তানহীনা বলতে এই গ্রামে শিবুর বউ-এর কথা মনে পড়ছে। শিবু বেঁচে আছে কি নেই কেউ জানে না। বেচারা বিধবাও হতে পারছে না সেই কারণে।'।

পীতাম্বর জিজ্ঞাসা করলে, 'শিবুর বৌ মায়ের পুজো করলে তুমি মেনে নেবে?'

'আমি মানার কে? জগা পাগলা স্বপ্নে আদেশ পেয়েছে।' হরিহর একজনকে দিয়ে ডাকতে পাঠালেন শিবরামের বউকে।

ভোররাতে ফিরে এসে কোন বিপত্তি হয় নি ছবিরাণীর। নিজের ঘরে সবার অলক্ষ্যে পৌঁছে চুপচাপ শুয়েছিল সে। ঘুম ছিল না চোখে। কিন্তু ঘেন্না ছিল মনে। নিজের ওপর ঘেন্না। বোন ভগ্নীপতির কাণ্ড শুনেই সে অন্ধ হয়ে গেল? কি ভেবেছিল সে? পৃথিবীর সব পুরুষ তার শরীরের উত্তাপে ফুটবে? খুব অহংকারী ছিল সে। জগা পাগলা সব ভেঙে দিল। তাকে বিবস্ত্রা করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে দেখে ছুঁতেও চাইল না। কি ঘেন্না! মা যদি জাগ্রত হন তাহলে তিনি নিশ্চয়ই বুঝিয়ে দিলেন আসল কথাটা। এখন ঘেন্না হচ্ছে সেই কারণে।

এইসময় বাড়ির সামনে ডাকাডাকি শুরু হল। হতচকিত ছবিরাণী শুনল শাশুড়ী আর লোকগুলোর কথাবার্তা। জগা পাগলা এসেছে গাঁয়ে। মিটিং হচ্ছে। তাকে যেতে হবে। স্বয়ং হরিহর তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। সঙ্কোচ আরও বাড়ল। কি বলতে চায় জগা পাগলা? কালকের রাত্রের ঘটনা? সে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছিল সেই কথা? শাশুড়ী এসে ডাকলেন। উঠে বসল ছবিরাণী। বলুক জগা পাগলা। কি বেশী আর হতে পারে এখন?

শাশুড়ীর সঙ্গে বউমা এল। এল আর পাঁচটা বাড়ির বউ। খবর রটে গেছে।

পিলপিল করে বাড়ছে ভিড়। ছবিরাণী মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। জগা পাগলা তাকে দেখে চিৎকার করলেন, 'তুই এখনও এখানে? মা তোকে ডাকে নি? আজ থেকে মায়ের সব ভার তোর। তোমরা সবাই শোন, আজ থেকে মা এর হাত ছাড়া আর কারো হাতে পুজো নেবে না। আমি চললাম।' জগা পাগলা ঘুরে দাঁড়াল।

হরিহর ব্যস্ত হলেন, 'আপনি কোথায় যাচ্ছেন?'

'জানি না। মা বাঁধন খুলে দিল। কাল সন্ধ্যে থেকে বলছিলাম তোমার পুজোর লোক যোগাড় করে নাও। ঠিক নিলেন মাঝরাত্রে।' জগা পাগলা হনহন করে মাঠ ভেঙ্গে কচি কলাপাতার রোদ মেখে হাঁটতে লাগল মন্দিরের বিপরীত দিকে।

হরিহর গেলেন না। কিন্তু গ্রামের সমস্ত আবেগতাড়িত মানুষ মায়ের নতুন পুজারিণীকে গ্রামের বাইরে নির্জন মন্দিরে পৌঁছে দিয়ে এল সসম্মানে।

॥ ১২ ॥

পরিবর্তনটা চট করে মেনে নেওয়া অনেকের পক্ষেই সম্ভব ছিল না। জগা পাগলার চেহারা কথাবার্তা আচরণ এমন এক পর্যায়ে ছিল যে মানুষ ভক্তি না করুক কিঞ্চিৎ ভয় করত। তাছাড়া তাকে স্বীকৃতি দিয়ে গিয়েছিলেন হরিহরের পিতৃদেব। বোধহয় তার কাজকর্মে কখনও বাধা দিতেন না। মেলার সময় তো বটেই, মায়ের মন্দির সম্পর্কে আশেপাশের গ্রামের মানুষদের ভয় ও সমীহ পুরোমাত্রায় ছিল। সেই মন্দিরের দায়িত্ব একজন রমণীর ওপর ছেড়ে দিতে অনেকের আপত্তি হল। বিশেষ করে যাকে চোখের সামনে এতকাল সবাই অন্য ভূমিকায় দেখে এসেছে।

অস্বস্তি যাদের প্রবল হয়েছে তাদের মধ্যে হরিহরও আছেন। গ্রামের বয়স্ক মানুষেরা তাঁকে এসে এ ব্যাপারে আপত্তি জানিয়েছে। গ্রামের স্বামীপরিত্যক্তা এক যুবতী ওই নির্জন নদীর ধারে মাঠে একা বাস করবে এ কেমন কথা? তাছাড়া সে ব্রাহ্মণবংশজাত নয়, কোনরকম আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাও নেই, জগা পাগলা যদি হঠাৎ পাগলামি করে ওই দায়িত্বে বসিয়ে দিয়ে যায়, তাহলে মেনে নিতে হবে? তাছাড়া মায়ের পুজো তো ছেলেখেলা নয়। অত্যন্ত যত্নসহকারে পবিত্রমনে রীতিনীতি মেনে পুজো করতে হয়। পান থেকে চুন খসে গেলে এ গ্রামের মানুষের সর্বনাশ হবে। ছবিরাণীর তো সেরকম কোন অভিজ্ঞতাই নেই। মায়ের পুজো যে করবে তাকে সবাই ভক্তিভরে প্রণাম করবে। ছবিরাণীকে দেখে কার মনে সেই ভক্তি আসবে? বৃদ্ধরা হরিহরকে এমন কথাই বোঝাতে লাগলেন।

যারা তরুণ তাদের মজা লাগছিল। দু-একটা রসের কথা আলোচনা করা ছাড়া তাদের অবশ্য এ ব্যাপারে কিছু করার উৎসাহ ছিল না। ছবিরাণীর শাশুড়ী শুধু স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি নাকি স্বপ্ন দেখেছেন স্বয়ং মা জগদম্বা এসে বলছেন,

এখন থেকে তোর বউমাকে মা বলে ডাকবি, প্রণাম করবি। ভোরের স্বপ্ন অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। ইচ্ছে থাকলেও কিছু বলা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠছে না।

হরিহরের মনে প্রথমে অস্বস্তি পরে জ্বালা এল। জগা পাগলা যে এমন কাণ্ড করবে তা কে জানত! ছবিরাণীকে দেখে তিনি আরও কিছুকাল আরামে বেঁচে থাকার কথা ভেবেছিলেন। ওর বোনের বিয়ের সব খরচ গোপনে দিয়ে গিয়েছিলেন। পরিস্থিতি এমন হয়ে এসেছিল যে তিনি জানতেন ইচ্ছে করলেই ছবিরাণীকে তিনি পেয়ে যাবেন। সেটা গ্রহণ করতে সংকোচ হচ্ছিল এইমাত্র। যদি পাঁচজনে জেনে যায় তাহলে আত্মহত্যা করতে হবে। নিজের সম্মান আর ভোগবাসনার মধ্যে কোনটে প্রাধান্য পাবে তাই স্থির করতে পারছিলেন না। এখন ছবিরাণী মন্দিরের দায়িত্ব নিয়ে যোগিনী হয়ে গেলে তাঁর সমস্ত বাসনার মৃত্যু হয়ে যাবে। মন্দির তাঁর। তিনি অনিচ্ছা প্রকাশ করলে ছবিরাণীর পক্ষে সেখানে থাকা সম্ভব নয়। হরিহর স্থির করলেন, কোন ব্যবস্থা নেবার আগে তিনি ছবিরাণীর সঙ্গে একবার কথা বলবেন।

মধ্যরাত্রে হরিহর বাড়ি থেকে বের হলেন। কৃষ্ণপক্ষের রাত। নিঝুম পথঘাট। হরিহর অত্যন্ত বিচলিত মনে হাঁটছিলেন। অভিসারে যাচ্ছেন বলে ভাবা তাঁর পক্ষে কণ্টকর হচ্ছিল। যদিও পাঁচজনে দেখে ফেলুক এটাও তিনি চাইছিলেন না। সবার অলক্ষ্যে তিনি গ্রাম ছেড়ে মাঠে নামলেন। সঙ্গে আলো আনেননি। পথ চলতে কণ্ট হচ্ছে তাঁর। শেষ পর্যন্ত আকাশের গায়ে মন্দিরের আদল চোখে পড়ল। ছবিরাণী ওখানেই আছে। মায়ের কাছে। ইতিমধ্যে খবর পেয়েছেন সে নাকি জগা পাগলার কাজগুলো বেশ মন দিয়ে করছে। জগা পাগলা কখন ঘুমোত কেউ জানে না। ছবিরাণীও কি এখন জেগে রয়েছে?

মন্দিরের দরজা বন্ধ। কিন্তু ভেতরে আলো জ্বলছে। সেটাই নিয়ম। মায়ের সামনে কখনও অন্ধকার রাখা হয় না। হরিহর কিছুক্ষণ মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। নিশুতি রাত্রে হাওয়া দিচ্ছে জব্বর। কিন্তু হরিহর ঘামতে লাগলেন তাঁর মনে এতক্ষণ যৌবনমানসে হেঁটে চলা ছবিরাণীর চেহারা ভাসছি । কিন্তু মায়ের মন্দিরের সামনে দাঁড়াতেই কেমন যেন হয়ে যাচ্ছিল সব। আশেপাশে কেউ কোথাও ছিল না কিন্তু আচমকা একটা কুকুর গলা খুলে ডেকে উঠল। তার ডাকে সাড়া দিল আরও দুটো। তিনতিনটে মন্দিরের প্রসাদ খাওয়া জন্তু হরিহরের দিকে তেড়ে এসে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে অনর্গল ডেকে যেতে লাগল।

হরিহর ফ্যাসাদে পড়লেন। কুকুরগুলোর ভাবভঙ্গী সুবিধের নয়। এগিয়ে গেলে যেমন বিপদ, পিছিয়ে যেতে চাইলে তাড়া খাওয়া অবশ্যম্ভাবী। এইসময় মন্দিরের ভেতর থেকে ছবিরাণীর গলা ভেসে এল, 'কি হল রে? চেঁচাচ্ছিস কেন?'

অমনি তিনটে কুকুর থেমে গেল। যেটা সর্দার সেটা দৌড়ে গেল মন্দিরের সিঁড়ির কাছে। বাকি দুটো নড়ল না। সর্দার শুধু গলা থেকে অদ্ভুত চাপা শব্দ বের করল। হরিহর দেখলেন কথা বলতে বলতে ছবিরাণী মন্দিরের দরজা খুলছে। সে কুকুরগুলোকে শুয়ে পড়তে বলছে। বারান্দায় বেরিয়ে এসে সর্দারকে দেখে ছবিরাণী বলে উঠল, 'কি হল রে ভোলা? রাতবিরেতে কখনও চেঁচাস না তো!'

শোনামাত্র ভোলা ছুটে এল হরিহরের সামনে, এসে থমকে দাঁড়াল।

ছবিরাণী এবার হরিহরকে দেখতে পেল। সম্ভবত অন্ধকার বলেই চিনতে অসুবিধে হল তার, 'কে? কে ওখানে?'

'আমি হরিহর।' হরিহর কেমন কাঁপা-কাঁপা গলায় জবাব দিলেন।

'ও, আপনি! এমন অসময়ে?' বারান্দার ধারে এগিয়ে এল ছবিরাণী, 'অ্যাই, যা তোরা এখান থেকে। গ্রামের কর্তামশাইকে চিনতে পারিস না কি রকম রে তোরা?'

দু-তিনবার ধমক খেয়ে কুকুরগুলো হরিহরকে ছেড়ে মাঠের মাঝখানে চলে যেতে বিস্মিত হরিহর বললেন, 'এরা দেখছি এর মধ্যেই তোমার পোষ মেনে নিয়েছে!'

ছবিরাণী হাসল, 'মায়ের আশ্রিত ওরা। তাই হয়তো ভালোবাসার মানে বোঝে।'

হরিহর চোখ ছোট করলেন, 'তুমি চুল ছেঁটে ফেলেছ?'

'হ্যাঁ। বড্ড ঝামেলা হচ্ছিল ওগুলো নিয়ে। কিন্তু আপনি হঠাৎ?'

'তোমার সঙ্গে কিছু কথা ছিল।'

'সেটা বলার জন্যে এই সময়টা বেছে নিলেন?'

'হ্যাঁ, কারণ পাঁচজনের সামনে আলোচনা করতে চাই না।'

'আলোচনা? তার মানে আপনি আমার কথাও শুনবেন?'

'সে তো নিশ্চয়ই। জগা পাগলা তোমাকে এই দায়িত্ব দিয়ে গেল কেন?'

'তা তো জানি না।'

'তুমি পুজো-আচ্চার কিছুই জানো না। তেমন বয়সও হয়নি। কোন পাগল যদি পাগলামি করে, তাহলে সেটা মেনে নিতে হবে?'

'এছাড়া আমার কোন উপায় ছিল না।'

হরিহর সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'উপায় ছিল না মানে?'

ছবিরাণী চুল ছেঁটেছে ঠিক ছেলেদের মত। লাল কাপড়ের ঘোমটা সেই মাথায় তুলে বলল, 'আপনি যথেষ্ট বিচক্ষণ মানুষ, বুঝে নিন।'

'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। না, না। এই কাজ করার আগে তোমার ভাল করে ভাবা উচিত ছিল। এ তোমাকে মানায় না।' হরিহর একনিঃশ্বাসে বললেন।

অল্প হাসল ছবিরাণী, 'আমাকে কি মানায়?'

পেটে জমা ছিল কথাগুলো। কিন্তু আজও এমন অন্ধকার রাত্রে মুখে তা উচ্চারণ করতে পারলেন না হরিহর। কথা ঘুরিয়ে জবাব দিলেন, 'তোমার স্থান গৃহে। মানুষের কামনা ভালবাসা গ্রহণ করবে, দেবে। এই বৈরাগ্যে নয়।'

'কামনা, ভালবাসা? কে দেবে? কে নেবে? যে চাইবে সে তো চোরের মত চাইবে। তাতে না ভরে মন অথচ মানও থাকে না।' ছবিরাণীর গলার স্বর পাল্টালো, 'আমি যদি আপনাকে স্বামী হিসেবে চাই আপনি পারবেন আমাকে স্ত্রীর সম্মান দিতে? এই গ্রামের মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পারবেন যে আপনি আমাকে চেয়েছিলেন? বলতে পারবেন আমার সম্পর্কে দুর্বলতা ছিল বলেই আমার বোনের বিয়ের খরচ আপনি নির্দ্বিধায় দিয়েছেন? বলুন, পারবেন বলতে?' আহত সাপিনীর মত গর্জে উঠল ছবিরাণী।

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন হরিহর, 'না, পারব না। কিন্তু আমি তোমার সম্পর্কে দুর্বল। গাঁয়ের অনেকেই চাইছে না তোমাকে এই মন্দিরের পূজারিণী হিসেবে দেখতে। তারা আমাকে উস্কাচ্ছে। দুর্বল বলেই আমি চুপ করে আছি। তুমি ফিরে চল। গ্রামেই থাকো। তোমাকে সহজ আটপৌরে হিসেবে দেখতে পাব এটুকুই আমার লাভ। আমি তার বেশি কিছু চাই না।'

ছবিরাণী বলল, 'আমাকে পুতুল হিসেবে দেখতে চান আপনি? আমার কোন সাধআহ্লাদ থাকবে না, আপনার পুকুরে স্নান করতে যাব আর তাই দেখে আপনি শান্তি পাবেন, এতে আমার কি লাভ? আমার যৌবন শেষ হয়ে যায়নি। আপনার কথা বাদ দিচ্ছি, অল্পবয়সীরাও যেভাবে তাকায় তার মানে আমি বুঝি। মাঝে মাঝে নিজের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলতাম। আমি তো শহরে গিয়ে ঘর নিতে পারতাম শরীরের জ্বালা মেটাতে। কিন্তু মায়ের কাছে এসে মনে হল এর চেয়ে শান্তি কিছুতেই নেই। উনি আমার পাহারাদার। আমাকে প্রতি মুহূর্তে রক্ষা করছেন। আমার মনের সব জ্বালা, সব কামনা উধাও হয়ে গিয়েছে এখানে এসে। শরীরটা আর আমার নয়। এই শান্তির জায়গাটা আপনি কেড়ে নেবেন?'

হরিহর মুগ্ধ হয়ে শুনছিলেন। এমন ব্যাখ্যা তিনি আশা করেননি। তবু বললেন, 'তুমি ভুলে যাচ্ছ মা শক্তির আধার। শাক্তমতে দেখতে গেলে সাধন-ভজনের অনেক পথ আছে। জগা পাগলা পাগল মানুষ ছিলেন। কিন্তু তেমন কোন তান্ত্রিক যদি এখানে আসে—?'

সজোরে হেসে উঠল ছবিরাণী, হরিহরকে চুপ করিয়ে দিয়ে বলল, 'মায়ের দিকে তাকিয়ে দেখুন তো। পৃথিবীর যে-কোন মেয়ের যৌবন ওঁর শরীরের কাছে ম্লান হয়ে যাবে। তিনি যখন নিজেকে রক্ষা করতে পারেন তখন তাঁর আশ্রিতার ভয় কিসে? না, আপনি আমার জন্যে চিন্তা করবেন না।'

শেষবার চেষ্টা করলেন হরিহর, 'এসব কথা তুমি মন থেকে বলছ?'

'হ্যাঁ। আমি আশ্রয় পেয়ে গেছি। আমাকে আর আশ্রয়হীনা করবেন না।'

কথাটা শোনামাত্র হরিহর পেছন ফিরেছিলেন। মন্দির অথবা ছবিরাণীর দিকে ফিরেও তাকাননি। রাত্রের অন্ধকারে ফিরে এসেছিলেন গ্রামে; নিজের বাড়িতে। স্থির করেছিলেন জগা পাগলাকে যেসব সুবিধে এবং সম্মান দিতেন ছবিরাণীর বেলায় তা বজায় রাখবেন। কিছুদিন খুব কষ্ট হত। বারংবার যেতে ইচ্ছে করত মন্দিরে। কিন্তু না যাওয়ার জেদ শেষ পর্যন্ত কষ্টটাকে অর্ধমৃত করে ফেলল। তিনি শুনতে পান ছবিরাণীকে লোকে এখন ধীরে ধীরে গ্রহণ করছে। ভৈরবী মা ডাকটা ইতিমধ্যে চালু হয়ে গিয়েছে।

শ্রীনিবাসের মনে এখন সুখের জোয়ার। তার নবীনা বউ যে এত ভালবাসতে পারবে তা সে আন্দাজ করতেও পারেনি। যেমন মিষ্টি ব্যবহার তেমনি হাতের রান্না। মায়ের চলে যাওয়া, ছবিরাণীর ভৈরবী মা হয়ে যাওয়া যে টালমাটাল পরিস্থিতি তৈরি করেছিল এখন তা অনেক সামলে নিয়েছে ওরা। মাঠের কাজ শেষ হতেই সে বাড়িতে ঢোকে। এই নিয়ে বন্ধুবান্ধবরা অনেক রসিকতা করেছে। শেষ

পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়েছে তারা। প্রকাশ্যেই বলে, এমন বউমুখো ম্যাদামারা ছেলে কখনও দেখা যায় না। তা বলুক। শূন্য বাড়িতে বউ-এর পাশে বসে থাকলেও আরাম লাগে শ্রীনিবাসের। তাদের গল্প আর শেষ হয় না। কিন্তু খেউমানি গ্রামের মেয়ে তাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছে তিন বছরের মধ্যে সে মা হবে না। ঘরে সন্তান এলেই জীবনটা বদলে যাবে। তখন হাজার চেষ্টা করলেও এই দিনরাতগুলো ফিরে পাওয়া যাবে না।

বউকে নিয়ে একবার মামাশ্বশুরবাড়িতে গিয়েছিল সে। খারাপ লাগেনি। যতই অভাব থাক, জামাই হিসেবে তারা যত্ন ভালই করেছিল। ফেরার পথে পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র থেকে বাচ্চা না হবার উপায়গুলো বউ ভাল করে জেনে এসেছিল। এই কারণে একটা খরচ বেড়েছে। প্রায় প্রতি সপ্তাহে হরিপুরে যেতে হয় শ্রীনিবাসকে। সেখানকার পানের দোকানেই জিনিসটা পাওয়া যায়। প্রথমদিকে চাইতে লজ্জা হত। এখন তাকে দেখলেই দোকানদার দিয়ে দেয়।

বউ-এর সঙ্গে মাঝে মাঝে ছবিরাণীকে নিয়েও আলোচনা হয়। দিদির এই পরিবর্তনে বউ বেশ খুশি। কিরকম প্রতাপের সঙ্গে মন্দিরের কাজ চালাচ্ছে দিদি! যারা পুজো দিতে যায় তারা দিদিকে কিরকম সমীহ করে। ওরকম শাশুড়ীর সঙ্গে পড়ে না থেকে দিদি ভালই করেছে। নিজের বিয়ের পর দিদির জন্যে তার বেশ খারাপ লাগছিল। দিদির অত যৌবন অথচ জামাইবাবু নেই এটা ভাবলে মন উদাস হয়ে যেত। এ বরং ঢের ভাল হল। শ্রীনিবাসের মন এতে সায় দেয়নি। ছবিরাণীর মধ্যে যে আকর্ষণ আছে তা ভৈরবীর বেশ পরলেই চলে যাবে, এমন হতেই পারে না। নিশ্চয়ই ওখানে কেউ না কেউ গিয়ে জুটবে। অবশ্য এসব ভেবে কি হবে? হাজার হোক সম্পর্কে তিনি বড়। শ্রীনিবাস নিজে মন্দিরের দিকে পা বাড়ায়নি।

হরিপুর থেকে একটা সাইকেল ধীর গতিতে এগিয়ে আসছিল। সাইকেল চালাচ্ছিল সনাতন, পেছনে বসে জনার্দন। জনার্দনের বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছে। কবিরাজ মশাই এখন প্রতিদিন তাকে দিয়ে দোকান খোলান এবং বন্ধ করান। তাঁর পাশে বসে চিকিৎসাপদ্ধতি অনুসরণ করতে হয় জনার্দনকে। মাঝে মাঝে ভেতরবাড়ি থেকে তলব এলে সসঙ্কোচে সেখানে যেতে হয় তাকে। যতই কুৎসিত, যতই দশাসই হোক এমন মেয়েকে জীবনসঙ্গিনী হিসেবে মেনে নিয়েছে জনার্দন। যদিও বিয়ের এখনও কিছু দেরি কিন্তু ইতিমধ্যেই সে সেইরকম ভাবতে শুরু করেছে। তাকে ভেতরে যেতে দিতে বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই কবিরাজ মশাই-এর তবে সেটা রুগী না থাকলেই।

ইদানীং কবিরাজ মশাই একটি সরলসত্য বুঝিয়েছেন তাকে। মানুষ ভয় না পেলে শরীরের জন্যে একটি পয়সাও খরচ করে না। যার যত বেশী ভয় সে তত খরচ করবে। আবার যাদের জীবনযাপন একটু লাগাছাড়া তারা তত ডাক্তার-বদ্যির ওপর নির্ভর করে। বিশেষ করে মেয়েছেলের রোগ যাদের খুব বেশী তাদের রুগী হিসেবে পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। কবিরাজ মশাই নিজের হাতে তৈরী ওষুধ জনার্দনকে দিয়ে বললেন, 'এটা মতীশ রায়কে দিয়ে এস। কিভাবে সেবন করতে হবে ভেতরে

লেখা আছে। কুড়িটি টাকা চেয়ে আনবে।'

'তিনি নিজে এসে নিচ্ছেন না কেন ?'

'ডাক্তার-বদ্যির কাছে এলে পাঁচজনকে কৈফিয়ৎ দিতে হয়। নিজের গোপন রোগের কথা কেউ কাউকে জানাতে চায় ? তবে হ্যাঁ, ওখানে গিয়ে কিছু খাবে না।'

অতএব জনার্দন এসেছিল মতীশ রায়ের বাড়িতে। বিশাল বাড়ি। গেট খুলে ঢুকতে হয়। ভেতরের ঘরে পা দিয়েই সে সনাতনদাকে দেখতে পেল। মতীশের উল্টোদিকে বসে গল্প করছে। এই ভরবিকেলেই মতীশ মদে চুর হয়ে আছে। চিনতে না পেরে খেঁকিয়ে উঠল মতীশ, 'এ্যাই, তুমি কে হে ? বলা নেই কওয়া নেই অন্দরে সেঁদিয়ে পড়েছ ? মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেব !'

সনাতনদা ঝটপট বলে উঠল, 'আরে জনার্দন, তুমি এখানে ? কি ব্যাপার ?'

'জনার্দনটা আবার কে ? হ্যাঁ, কোথায় যেন দেখেছি বলে মনে হচ্ছে !'

'জনার্দন নারাণপুরে থাকে।'

'নারাণপুর ? তা এখানে কি দরকার ?'

'আজ্ঞে কবিরাজ মশাই আমাকে পাঠিয়েছেন ওষুধ পৌঁছে দিতে।'

সঙ্গে সঙ্গে মাতালের মুখেরও পরিবর্তন হয়ে গেল, 'আরে তাই বল ! ওষুধ ? পেটটা বেশ গোলমাল করছে কদিন হল—দাও।' হাত বাড়িয়েছিল মতীশ রায়।

কিন্তু ছোঁয়াছুঁয়ির মধ্যে না গিয়ে নিরাপদ দূরত্বে থেকে ফরাসের ওপর ওষুধ রেখে জনার্দন বলল, 'উনি কুড়ি টাকা চেয়েছেন।'

'মুরগি ! আমাকে মুরগি পেয়েছে কবিরাজ ? ওর মেয়েকে দেখেছ সনা ?'

সনাতন মাথা নাড়ে—হ্যাঁ।

'চরিত্র ভাল হয়ে যায়। মরে গেলেও আমি শুতে পারব না।' পকেট থেকে দুটো দশ টাকার নোট বের করে ছুঁড়ে দিল মতীশ। জনার্দন টাকা কুড়িয়ে নিতে সনাতন জিজ্ঞাসা করল, 'কবিরাজ মশাই ওষুধের দাম তো এত নেন না ! দু-তিন টাকায় তো পাওয়া যায় !'

'জলপাইগুড়ি থেকে আনিয়েছে। আর পাঁচজন আর আমি কি সমান যে এক ওষুধে কাজ দেবে ! হয়তো দাম দশ, নিচ্ছে ডবল !' মতীশ দেখল জনার্দন বেরিয়ে যাচ্ছে। সে পিছন থেকে ডাকল, 'এ্যাই শোন ! কবিরাজ শুনছিলাম তার নতুন কম্পাউণ্ডারকে জামাই করবে। তুমিই সেই হতভাগা ?'

কি জবাব দেবে বুঝতে না পেরে ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলল জনার্দন। হা-হা করে হাসল মতীশ, 'তুমি মনে হচ্ছে ভিজে বেড়াল। মেয়েছেলে মোটা আর কালো হলে খুব খতরনাক হয়। তবে একটা বোরখা কিনে দিও।'

সনাতন বলল, 'ও খুব সরল ছেলে। থিয়েটারে মেয়ের পার্ট করতে ভালবাসে।'

'তাই বল ! তোমার লাইন ! নারাণপুরের লোক ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' জনার্দন বলল, 'এবার যাই।'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও। তোমাকে আমি সনাতনের ঘরে দেখেছি। ঠিক ?'

সনাতন বলল, 'আপনার স্মৃতিশক্তি দেখছি খুব প্রবল।'

একগাল হাসল মতীশ, 'সেই মেয়েছেলেটা নাকি এখন ভৈরবী হয়ে গিয়েছে ?'

জনার্দন বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'ওই চেহারা নিয়ে ভৈরবী! মামদোবাজী?'

'উনি চুল ছেঁটে ফেলেছেন। গেরুয়া, লাল কাপড় পরেন। একা মন্দিরে থাকেন।'

'ভৈরব যায় না?' মতীশ হাসে।

'ভৈরব?' হকচকিয়ে যায় জনার্দন।

'শোন, তোমাদের গাঁয়ের লোক রাত্রে সেখানে গিয়ে পাহারা দেয়?'

'আজ্ঞে না।'

পকেট থেকে পাঁচটা টাকা বের করে ছুঁড়ে দেয় মতীশ, 'শোন, আগামী অমাবস্যা, মানে দুদিন পরে আমি মধ্যরাত্রে মন্দিরে গিয়ে পুজো দেব। মানত করেছি। তোমাদের ভৈরবীকে গিয়ে বল সেই রাত্রে অন্য কোন পুজো না রাখতে। কোন পাবলিক যেন সেখানে ভিড় না জমায়। রাজী করিয়ে এসে, আরও পাবে। না, তুমি একা যাবে না। সনাতন, তুমিও যাও সঙ্গে। ভৈরবী বলে কথা!'

অগত্যা সনাতনদার সাইকেলের পেছনে বসতে হয়েছিল জনার্দনকে। সারাটা পথ সনাতনদার আফসোস শুনতে হয়েছে। কত সম্ভাবনা ছিল ছবিবউদির! কি গলা! কি ফিগার! এমন ছাত্রী সহজে পাওয়া যায় না। কলকাতা গেলে বছর-খানেকের মধ্যেই ফিল্মস্টার হয়ে যেত। ভৈরবী হবার খবর শুনে খুব দুঃখ পেয়েছে সনাতনদা। একটা প্রতিভার অপমৃত্যু হল। এই যে আজ সনাতনদা যাচ্ছে, যেতে কি একটুও ইচ্ছে হচ্ছে? মোটেই নয়। কিন্তু মতীশ রায়কে সন্তুষ্ট না করে কোন উপায় নেই। প্রচুর টাকা ধার হয়ে গেছে লোকটার কাছে। পুজো দেবে না ঘণ্টা! মতলব অন্য। তবে ছবিরাণীকে যেটুকু জেনেছে তাতে মনে হয় ব্যাপারটা সামলে নেবে সে। হঠাৎ সনাতন জিজ্ঞাসা করে, 'এখন কেমন দেখতে হয়েছে তাকে?'

জনার্দন জবাব দেয়, 'ঠিক ভৈরবীদের মতন।'

সনাতন কোন জবাব দিল না। নারী সম্পর্কে সে তো নিরাসক্ত নয়। যৌবনে ভোগটোগ ইচ্ছেমতন করেছে। তবে তার জন্যে অর্থ এবং সময় ব্যয় করেনি। জীবনে থিয়েটারটা ঠিকমত করা হল না বলে মনে দুঃখ আছে। এখন মনে হল ছবিরাণীর শরীর নয়, ওর প্রতিভাই আবার থিয়েটারের জগতে নতুন করে নিয়ে যেতে পারত তাকে। শেষ চেষ্টা যদি করা যায় তাহলে মন্দ কি!

হরিপুরের মোড়ে পোর্টেবল মাইকে বক্তৃতা চলছে। ইন্দিরা গান্ধীর কালো হাত গুঁড়িয়ে দাও, ভেঙে দাও। শ'খানেক মানুষ জুটে গিয়েছে ইতিমধ্যে। জনার্দন বলল, 'সনাতনদা, একটু দাঁড়াবেন?'

'আবার দাঁড়াবো কেন?' সনাতন বিরক্ত হল। রাজনৈতিক মিটিং তার একদম ভাল লাগে না। সবাই একটা ছোট্ট সত্যি নিয়ে অনেক মিথ্যে বানিয়ে বানিয়ে বলে। সাজানো কথা বলতে হলে নাটক করো। কিন্তু তার পা মাটি স্পর্শ করতেই জনার্দন নেমে দাঁড়াল। বক্তা তখন প্রচণ্ড আবেগে বলে যাচ্ছেন—'ইন্দিরা গান্ধী দেশের কি সর্বনাশ করতে যাচ্ছেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন নেহেরুর মেয়ে

বলে। গণতান্ত্রিক দেশে প্রধানমন্ত্রীত্ব কখনই পারিবারিক সম্পত্তি হতে পারে না। কংগ্রেস ভারতবর্ষকে নিজেদের সম্পত্তি ভাবে। কংগ্রেসকে ত্যাগ করুন, ভারত বাঁচান।'

সনাতন বলল, 'চল হে।'

জনার্দন সাইকেলে উঠতে যাচ্ছিল, এই সময় একজন এগিয়ে এল, 'তুমি জনার্দন না?'

জনার্দন মাথা নাড়ল। লোকটি বলল, 'খুব ভাল হল দেখা হয়ে। তোমাদের গ্রামের নগেনের সঙ্গে আমার খুব ভাল আলাপ আছে। আমি যতীন।'

'ও।'

'তোমাদের গ্রামের অবস্থা কি রকম?'

'কি রকম মানে?'

'বেশির ভাগ তো ভাগচাষী। নিশ্চয়ই প্রচণ্ড অত্যাচার চলে সেখানে। এই ব্যবস্থাটা ভাঙা দরকার। এতদিন পার্টি এদিকে জনমত গঠনের কাজ তেমনভাবে করে উঠতে পারেনি। কিন্তু মানুষ আমাদের খুব নিচ্ছে। তোমাদের গ্রামে কখনও কোন দল সভা করেছে?'

'না।' জনার্দন মাথা নাড়ল।

'ভাল। আমরা একদিন ওখানে গিয়ে সবাইকে বুঝিয়ে বলব। তোমাদের সাহায্য চাই। মানুষ হিসেবে আর একটু ভালভাবে বেঁচে থাকতে হলে জনমত গঠন করা দরকার। তুমি নগেনকে আমার কথা বলো।' যতীন হাসল।

'কাল যাবেন?'

'এই ধরো, সামনের শনিবারে!'

সাইকেলের ক্যারিয়ারে বসে জনার্দন বলল, 'এইসব মিটিং শুনলে গা গরম হয়ে যায়।'

সনাতন হাসল। প্যাডেল ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, 'তোমাদের গাঁয়ে কোন পলিটিক্স নেই, পার্টির অফিসও নেই, না?'

জনার্দন জবাব দিল, 'না। শুধু ভোটের আগে মাইকে বলে যায়।'

সনাতন মাথা নাড়ল, 'এখন আর খাল কাটতে হয় না। কুমীর নিজেই খাল কেটে ঢুকে পড়ে। বুঝবে একদিন! বাঘ ভাল না কুমীর ভাল!'

॥ ১৩ ॥

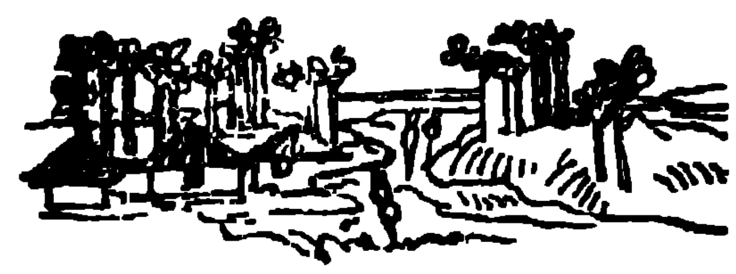

কে বাঘ কে কুমীর বোঝার চেষ্টা করল না জনার্দন। তার শুধু মনে হল একটা কোন অমঙ্গল ঘটতে চলেছে। সনাতনদা পোড়-খাওয়া মানুষ, তিনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু জনার্দনের কাছে বাঘ-কুমীরের সমস্যার চেয়েও বড় হল, মন্দিরে যাওয়া। মতীশ রায় হুকুম করেছেন, পাঁচটা টাকা ছুঁড়ে দিয়েছেন, তাই ছবি ভৈরবীর কাছে যেতে হবে পুজোর প্রস্তাব নিয়ে। অমাবস্যার রাত্রে মতীশ রায় পুজো দিতে আসবে, অতএব কেউ যেন তখন ভিড় না জমায়। জনার্দন বুঝতে পারছে কথাটা সরল নয়। একটু গোলমাল আছেই। এবং ছবি ভৈরবী সেটা বুঝতে পারবে।

ছবি বউদির সঙ্গে জনার্দনের ভাল সখ্যতা ছিল। এই তো কিছুদিন আগেও ওঁকে নিয়ে সে হরিপুর গিয়েছিল মন্দিরের রাস্তা দিয়ে ওষুধের জন্যে। আজকে যে অবিনাশ কবিরাজের সঙ্গে একটা সম্পর্ক হতে চলেছে তার সেটাও তো ছবি বউদির কল্যাণেই। তখন অবশ্য বউদি বলত, এখন কিছুই বলে না। এখন বলার সুযোগই হয় না। যে কয়দিন সে মন্দিরে গিয়েছে ছবি বউদিকে একা পায়নি। এমন কি তাকে দেখে ছবি বউদি পরিচিত ভাব দেখায়নি। লোকে বলে সারাক্ষণ একটা ঘোরের মধ্যে থাকে ছবি বউদি। তাই বউদি না বলে ছবি ভৈরবী বলা ঢের ভাল।

সনাতন সাইকেল চালাতে চালাতে বলল, 'কার কপালে কি আছে তা কে বলবে? লোকটা ছিল পোর্ট কমিশনারের কেরানী, হয়ে গেল বাংলা সিনেমার এক নম্বর নায়ক। কপাল বড় গোলমেলে জিনিস হে। তবে ভেতরে কিছু থাকা চাই। সাধারণ অবস্থায় লোকে সেটা টের পায় না, বিখ্যাত হয়ে গেলে চাপা থাকে না। এই আমি, আমার মধ্যে কি আছে তুমি টের পাচ্ছ? তেমনি ছবিরাণীকে নিয়ে যখন তুমি এসেছিলে তখন জানতে ওর মধ্যে কি আছে!' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল সনাতনদা।

অবাক হয়ে জনার্দন জিজ্ঞাসা করে, 'আপনি সে-সময় বুঝতে পেরেছিলেন উনি একদিন ভৈরবী হয়ে যাবেন?'

'না।' ভৈরবী হবে বুঝতে পারিনি। আসলে ভৈরবী হওয়া তো ওর জন্যে ছিল না। এটা সাময়িক। 'ওকে অভিনেত্রী হতে হবে। সেটা আমি তখনই বুঝতে পেরেছিলাম। এখন ছবিরাণী ভৈরবীর ভূমিকায় অভিনয় করে যাচ্ছে।'

'কিন্তু সবাই বলে উনি ঠিক ভৈরবীর মতন।'

'হ্যাঁ। সেটাই পারফেকশন।'

খানিকটা চলার পরে জনার্দন বলে, 'আমার কেমন ভয় করছে।'

'ভয়? কেন?'

'মতীশবাবু যেটা বলতে বললেন সেটা শুনে যদি উনি রাগ করেন ?'

'করতেই পারে। মতীশের ধান্দা তো খারাপ।'

'খারাপ মানে ?'

'মেয়েছেলে দেখলেই ওর জিভে জল আসে। এই বয়সেও। যেদিন আমার বাড়িতে ছবিরাণীকে দেখেছিল সেদিন থেকে আমার পিছনে লেগে আছে।'

'ওরে বাবা! তাহলে আমি যাব না।'

'সে কি ? কোন কাজ করবে বলে অঙ্গীকার করলে পিছিয়ে যেতে নেই।'

মন্দিরের চাতালে জনাপাঁচেক মানুষ বসেছিলেন। সাইকেল থেকে নেমে জনার্দন দেখতে পেল ছবি ভৈরবী তাঁদের কিছু বলছে। লোকগুলো অন্য গ্রাম থেকে এসেছে। ওরা দুজনে ধীরে ধীরে সিঁড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সামনে মায়ের ঘরের দরজা খোলা। মাকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। জনার্দনের গলা শুকিয়ে গেল।

ওদের দেখতে পেয়ে সে মুখ ফেরালে। তার চুল একেবারে মুড়িয়ে ছাঁটা। গায়ে লালবস্ত্র। একদম অচেনা বলে মনে হচ্ছিল।

ছবি ভৈরবী সস্নেহে ডাকলে, 'এসো। পুজো দেওয়া হবে নাকি ?'

সনাতনদা জবাব দিল, 'না। দর্শন করতে এলাম।'

'আহা, কি ভাল! মা তোমাদের দিনরাত সব জায়গায় দেখে যান অথচ মাকে দেখতে তাঁর কাছে আমাদের আসতে হয়। হ্যাঁ. যা বলছিলাম—' ছবি ভৈরবী লোকগুলোর দিকে তাকালে, 'শরীর থাকলে অসুখ হবে। একটা কলও চলতে চলতে খারাপ হয়, খারাপ হলে সারাতে হয়। মা যেমন শরীর দিয়েছেন তেমনি অসুখও। মা যেমন কাউকে চাষ করার জন্যে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তেমনি কাউকে চিকিৎসা করতে। তাই ভাল ডাক্তার দেখাও। মায়ের চরণামৃত দিয়েছি কিন্তু রোগ সারবে ডাক্তারের কাছে গেলে।'

এক বৃদ্ধ বললেন, 'আমাদের গ্রামের যশোদাজীবনের পেটের অসুখ সেরে গিয়েছিল জগা পাগলার দেওয়া মায়ের চরণামৃত খেয়ে। আপনি তাই করুন, ডাক্তার বদ্যির ওপর আমার কোন আস্থা নেই।'

'ওমা, তাহলে তো তোমার মায়ের ওপরেই আস্থা নেই! ডাক্তার তো মায়ের সৃষ্টি। এই যে এখানে একজন কবিরাজের শিষ্য আছে, সে কি বলে ?' ছবি ভৈরবী জনার্দনকে দেখিয়ে দিলে।

বৃদ্ধ জনার্দনকে চিনতে না পেরে জিজ্ঞাসা করেন, 'কোন্ কবিরাজ ?'

জনার্দনের গলা শুকিয়ে এসেছিল। কোনমতে বলল, 'আজ্ঞে অবিনাশ কবিরাজ।'

সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠেছিল বৃদ্ধ, 'অ! হরিপুরের অবিনাশ ? এক নম্বরের চামার। শুনি পয়সা হাতিয়ে নেয়, অসুখ সারে না। ওরকম লোক মায়ের আশীর্বাদ কখনও পেতে পারে না। আমাকে আর একটু চরণামৃতই দিন আপনি।'

অগত্যা ছবি ভৈরবী উঠে ভেতরে গেল। পবিত্র চরণামৃত নিয়ে এসে বৃদ্ধের

হাতে দিতে তিনি সেটা ভক্তিভরে গ্রহণ করলেন। ছবি ভৈরবী বললে, 'আচ্ছা এবার তোমরা এসো। তবে এখনও বলি ভাল ডাক্তার দেখাও। এক জমিতে ভাল ফসল হয় না বলে সব জমি নিষ্ফলা হবে ভাবা ভুল।'

লোকগুলো নমস্কার করে চলে গেলে সিঁড়িতে দাঁড়ানো সনাতনদা বলে উঠল, 'চমৎকার অভিনয়।'

'অভিনয় ?' ছবি ভৈরবী চমকে উঠল।

নিশ্চয়ই। তবে লোকগুলোকে ভুল বোঝানো 'এই যা!'

ছবি ভৈরবী হাসলে, 'অভিনয় করার জন্যেই তো আসা। এই যেমন আপনি, ছিলেন নিজের মত, মা আপনাকে পাঠিয়ে দিলেন পৃথিবীতে। যাও ওই চরিত্রে কিছুদিন অভিনয় করে এসো। সেই স্বদেশ ছেড়ে বিদেশে আসতে কি কারো ইচ্ছে হয়! তবু দেখতে দেখতে আশিভাগ সময় কাটিয়ে দিলেন প্রবাসে। অভিনয় করে।'

'প্রবাসে মানে ? বাংলাদেশ কি আমার দেশ না ?'

'যতক্ষণ ওই দেহ থাকবে ততক্ষণ নিশ্চয়ই ওই দেহটার দেশ। কিন্তু আপনি তো ষাট বছরের জন্যে ওই দেহটা ধরেছেন। দেহ পড়ে গেলে ফিরে যাবেন নিজের দেশে, তাই এটা আমার আপনার সবার প্রবাস। এখানে যা করছেন সেখানে তো তা করতেন না। তাহলে এ জীবন আপনার অভিনয় নয় ?' ছবি ভৈরবী শান্ত গলায় বললে।

'আমি মাত্তর ষাট বছর বাঁচবো ?' ফ্যাসফেসে গলায় বললেন সনাতনদা।

'এই দ্যাখো, আসতে চাননি পৃথিবীতে, জন্মমাত্র কেঁদেছিলেন সেজন্যে। আবার এসেই মায়া জন্মে গেল। তা হয়। কেউ কোথাও বেড়াতে গিয়ে যদি জায়গাটাকে ভাল লেগে যায় তখন বলে আর কদিন থেকে যাই। যাক গে। আজ খুব মজা হয়েছে। এক শুঁড়ি এসেছিল মায়ের কাছে। বলল তার নাকি মদ ছাড়া দেবার কিছু নেই। তাই দিয়ে গেছে। আপনি তো ওসব খান। দাঁড়ান, নিয়ে আসছি।' ছবি ভৈরবী মন্দিরের ভেতরে চলে গেল। জনার্দন দেখল সনাতনদাকে তখন খুব কাহিল মনে হচ্ছে। সেই সবজান্তা ভাবটা মোটেই নেই।

ছবি ভৈরবী একটা পাত্র নিয়ে বেরিয়ে এলো, 'মাকে যে যা দেয় তা ওঁর সামনে রেখে দিই, মায়ের প্রসাদ হয়ে যায়। নিন, বাড়ি গিয়ে বন্ধুবান্ধব নিয়ে খাবেন। আমার এখন অনেক কাজ।'

সনাতনদা পাত্রটা নিলেন, 'আমি যেজন্যে এসেছিলাম—।'

'কি জন্যে ?'

'এ জীবন কি ভাল ?'

'মানে ? এ কি কথা ? সারাক্ষণ মায়ের কাছে আছি। মা আমাকে আগলে রেখেছেন, এর চেয়ে আর কিসে ভাল হতে পারে ?'

'ও, আচ্ছা। কিন্তু ষাট বছরই আমি বাঁচবো ?'

'হ্যাঁ, ষাট বছরে আপনার ওই শরীরের মৃত্যু হবে।'

হঠাৎ সনাতনদার মুখ দুমড়ে মুচড়ে গেল, 'আমার আর পাপ করতে একটুও

ইচ্ছে হয় না। লোভের বশে করে ফেলি।'

'করবেন না। যাদের সঙ্গ পাপ করতে বাধ্য করে তাদের বোঝান।'

'মতীশ রায়কে বোঝাব এমন ক্ষমতা নেই। সে আগামী অমাবস্যার রাত্রে তোমার কাছে পুজো দিতে আসতে চায়।'

'আমার কাছে কেন হবে? বলুন মায়ের কাছে! নিশ্চয়ই আসবে।'

'কিন্তু তার মতলব অন্য। কুমতলব।'

হেসে উঠল ছবি ভৈরবী, 'তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন কেন? মায়ের যদি তেমন ইচ্ছে হয় তো হবে।'

'কিন্তু মতীশ পারে না এমন কোন কাজ নেই!'

'তিনি দশ বছর ছোট হতে পারেন?'

'এ্যাঁ? তা কি করে সম্ভব?'

'তাহলে? অনেক কাজ আছে যা তাঁর পক্ষে করা অসম্ভব। এবার যান।' ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে থেমে গেল ছবি ভৈরবী, 'তুমি কেমন আছ জনার্দন?'

মাথা নাড়ল জনার্দন, ভাল।

'কবিরাজী শিখছ?'

'হ্যাঁ, একটু একটু।'

'বিয়ে করবে?'

জনার্দন মাথা নিচু করল। জবাব দিল না।

ছবি ভৈরবী বলল, 'পৃথিবীতে কেউ খারাপ হয়ে আসে না। ভাল ব্যবহার করলে সবাই ভাল থাকে। মন যা চাইছে তাই করবে। মনের বিরুদ্ধে যেও না। যাও।'

ছবি ভৈরবী ভেতরে চলে গেলে জনার্দন বলল, 'চলুন সনাতনদা।'

সনাতন যেন আচ্ছন্ন হয়ে ছিল। কোনমতে বলল, 'অ্যাঁ? চল!'

মদের পাত্র হাতে নিয়ে সাইকেল চালানো যায় না। আর এখন সাইকেল চালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা যেন সনাতনের ছিল না। অগত্যা অনিচ্ছা সত্ত্বেও জনার্দনকে সাইকেল চালাতে হল। এখন সন্ধ্যে পেরিয়ে গিয়েছে। কবিরাজমশাইকে মতীশ রায়ের ওষুধের দাম পোঁছে দেওয়া হয়নি। অতএব যেতেই হল হরিপুরে।

জনার্দন ভেবেছিল বাসস্ট্যাণ্ডে পোঁছেই নেমে পড়বে। কিন্তু পেছন থেকে সনাতনদা কেমন গলায় বলল, 'একেবারে মতীশ রায়ের বাড়ি চল।'

অগত্যা তাই যেতে হল।

মতীশ রায়ের বাড়িতে আলো জ্বলছে। সাইকেল থেকে নেমে সেটাকে একপাশে ঠেস দিয়ে রাখতেই সনাতনদা মদের পাত্র নিয়ে এগোল। হঠাৎ জনার্দনের ইচ্ছে হল ওদের কথাবার্তা শোনার। সে অনুসরণ করল।

মতীশ রায় তার বাইরের ঘরে বসেছিল চোখ বন্ধ করে। পায়ের শব্দ পেয়ে চোখ খুলল, 'অ! আসা হল? খবর কি?'

সনাতনদা বলল, 'উনি প্রসাদ পাঠিয়েছেন। মায়ের প্রসাদ।'

'এ্যাঁ? সন্ধ্যেবেলায় প্রসাদ? তুমি খেপে গেলে নাকি?'

'আজ্ঞে, এটা কারণবারি।'

'তাই বল!' মতীশ উচ্ছ্বলিত, 'ভৈরবীর কারণবারি! তা বলে এসেছ তো আমার প্রস্তাবখানা? কি বলল? রাখো এখানে।'

সনাতন সযত্নে পাত্র নামিয়ে বলল, 'উনি আপত্তি করেননি। তবে আমি বলি কি, পুজো দিতে গেলে ঠিক আছে, অন্য কিছু মাথায় থাকলে না যাওয়াই ভাল। মানুষটা একেবারে বদলে গিয়েছে।'

'দ্যাখো সনাতন, আমাকে জ্ঞান দিতে এসো না। ওই শরীর অবহেলায় নষ্ট হবে আমি চাই না। আহা, এখনও চোখে লেগে আছে।' মতীশ রায় পাত্র তুলে ঢাকনা খুলে ঘ্রাণ নিল, 'আহা! মনে হচ্ছে কুঞ্জপুরের কামাইশুঁড়ির হাতে তৈরী?'

হঠাৎ সনাতনদা ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠল, 'আমি আর বেশীদিন বাঁচবো না। ষাট বছর হতে বেশী দেরি নেই আমার।'

খুব অবাক হল মতীশ রায়, 'একথা কে বলেছে তোমাকে?'

'আজ্ঞে, ভৈরবী।'

'সে তোমার সময় বলে দিল কদিন ভৈরবী হয়েই? বুজরুকি!'

'আপনি না দেখলে বুঝতে পারবেন না। সেই চুল নেই, সেই আকর্ষণ উধাও। একেবারে ভৈরবী-ভৈরবী দেখতে হয়ে গিয়েছে।' কাঁদতে কাঁদতে বলল সনাতনদা।

'আঃ, থামো তো!' ধমকে উঠলো মতীশ রায়, 'মদ খাও।'

দুটো গ্লাসে ছবি ভৈরবীর দেওয়া কারণবারি ঢেলে একটা এগিয়ে দিল মতীশ রায়, 'খাও। মজার ব্যাপার! কারণবারি পান কর। আমার যাওয়ার কথা শুনে খুশী হয়েছে বলেই তো পাঠিয়েছে।'

সনাতনদা কাঁপা হতে গ্লাস নিয়ে খানিকটা মুখে ঢালল। মতীশ রায় দরজার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কে ও? সেই ছোকরাটা? তা এখানে কি করতে? চলে?' গ্লাস তুলে দেখাল সে।

জনার্দন মাথা নাড়ল, না।

'তাহলে দাঁড়িয়ে থাকা কেন? কেটে পড়।' চোঁ চোঁ করে গ্লাস শেষ করল মতীশ। তারপর আবার ঢালল, 'জিনিসটা বড় ভাল হে! মধু। অমৃত। শেষ করো। অঙ্গ জুড়িয়ে যাচ্ছে।' দ্বিতীয় গ্লাস শেষ করল মতীশ। তারপর বলল, 'আজ যেন পানের ইচ্ছে বেড়ে যাচ্ছে।'

সনাতনদার গ্লাস শেষ হয়েছিল। সে দ্বিতীয় গ্লাস ভরল। তারপর ঘুরে তাকিয়ে জনার্দনকে বলল, 'তুই কি রে? লোকটা তোর গুরুকে চামার বলল আর তুই মুখ বুজে থাকলি? জানিস না, যদ্যপি মোর গুরু শুঁড়ি বাড়ি যায় তদ্যপি মোর গুরু রামানন্দ রায়। তার ওপর হবু শ্বশুর তোর!'

সনাতনদার গলা এখন বেশ স্বাভাবিক। কথা শুনে হো হো করে হাসল মতীশ রায়। কিন্তু হাসতে হাসতেই তার গলা ভেঙে গেল, 'তুমি ষাট, আমি কদ্দিন হে?'

সনাতন বলল, 'ভৈরবী বলতে পারবে।'

'আমি মরে গেলে কি হবে?' মতীশ রায় যেন আচমকা পাল্টে গেছে।

'মরে গেলে কি হবে কে জানে।'

'নরকে যাব। কত পাপ করেছি। জীবনভোর শুধু পাপ।'

'আমিও।' সনাতন মাথা নাড়ল।

'এ্যাই শালা, চুপ। তুই কি পাপ করেছিস রে? আমার কড়ে আঙুলও না। ষোল বছর বয়স থেকে যাকে পেয়েছি তাকেই ভোগ করেছি। আটশো পর্যন্ত গুনতে পারি। তারপর গুলিয়ে যায়। তিন-তিনটে খুন করেছি। দারোগা টাকা পেয়ে কেস হাপিস করে দিয়েছে, জানিস?' মতীশ যেন কথাগুলো শোনাতে মরীয়া হয়ে উঠেছে।

'যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন পাপ করতে হবে।' সনাতন মাথা নাড়ল।

'চোপ! একদম চোপ! আমি আর নতুন পাপ করব না। কোন শালা আমাকে দিয়ে করাতে পারবে না।'

'মদের ঝোঁকে প্রতিজ্ঞা না করাই ভাল।'

'আবার কথা! যখন আমি কথা বলব তখন চুপ করে থাকবে। হুঁ, নতুন পাপ আর করব না। পুরোনো পাপ করলে দোষ নেই, তাই সেগুলো করব।'

'অমাবস্যায় পুজো?'

'মাথা কামিয়ে ফেলেছে?'

'প্রায়।'

'দূর শালা, লম্বা চুল না থাকলে মেয়েছেলে বলে মনে হয় না। তার ওপর ফস করে বলে দিক আমি আর এক বছর বাঁচবো, ব্যাস হয়ে যাবে! না যাচ্ছি না, আমি তোমার মত গাধা নই।' আর এক গ্লাস মদ নিল মতীশ রায়।

চুপচাপ বেরিয়ে এল জনার্দন। মানুষ মৃত্যুকে এত ভয় পায়? নইলে মতীশ রা॰ র মত লোক এত পাল্টে যায়? অবশ্য এটা মদের ঝোঁকে হতে পারে। হঠাৎ তার মনে হল ছবি ভৈরবী এই মদে কিছু মিশিয়ে দেয়নি তো, যা খেয়ে এমনটা হল! ভৈরবীরা তো অনেক কিছু পারে। সে ঠিক বুঝতে পারছিল না।

অবিনাশ কবিরাজের ডিসপেনসারি বন্ধ। অথচ রাত দশ॰॰ পর্যন্ত কবিরাজ মশাই রোগী দ্যাখেন। বিকেলে যখন বেরিয়েছিল তখন তিনি কিছু বলেননি। একটু ইতস্তত করল জনার্দন। টাকাটা দিয়ে যাওয়া উচিত। হয়তো শরীর খারাপ বলে ভেতরে চলে গিয়েছেন। সে পাশের টিনের দরজায় শব্দ করল।

দুবারের পর ভেতর থেকে সাড়া এল। প্রচণ্ড বিরক্তির গলা, 'কে রে? রাত-দুপুরে না এসে কি উপায় নেই? গলায় শব্দ নেই কেন?'

'আমি, জনার্দন।'

সেই একই স্বর, 'এতক্ষণে আসা হল? মতীশ রায় কি মদ গেলালো? বাবা বসে বসে হাঁপিয়ে গেল আর ওনার আসার সময় হল না! হাত গলিয়ে হুড়কো খুলে নাও। আমি যেতে পারব না।'

অগত্যা জনার্দন টিনের দরজার ফাঁক দিয়ে হাত গলিয়ে ভেতরের হুড়কো খুলল। অন্ধকার উঠোন। এদিকে আলো জ্বালা হয়নি। সে উঠোন পেরিয়ে

বারান্দায় দাঁড়াল। তারপর নম্র গলায় ডাকল, 'কবিরাজ মশাই !'

'ন্যাকা !' শব্দ ছিটকে এল পাশের ঘর থেকে, 'গলা শুনে মেয়েছেলে লজ্জা পাবে ! বাবা কলে গিয়েছে। কুঞ্জপুরের হলধর বর্মন গাড়ি পাঠিয়ে নিয়ে গিয়েছে। ফিরতে রাত হবে।'

তাকে দেখা যাচ্ছে না। ভেতরে একটা লণ্ঠন জ্বলছে, সেটা দরজার কাছে নামানো। জনার্দন বলল, 'কবিরাজ মশাই মতীশ রায়ের কাছ থেকে ওষুধের দাম আনতে বলেছিলেন, সেটা নিয়ে এসেছি।'

'দিয়ে যাও। আমি বাবা বিছানা থেকে নামতে পারব না।'

অগত্যা জনার্দন ভেতরে ঢুকল। কোনদিকে না তাকিয়ে টেবিলের ওপর টাকাটা রেখে বলল 'এবার আমি যাই !'

কবিরাজ মশাই-এর মেয়ে খেঁকিয়ে উঠল, 'যাই ? কেন, আমি কি পেত্নী ?'

'আজ্ঞে না।' দ্রুত মাথা নাড়ল জনার্দন।

'তাহলে ঘরে ঢুকেই যাই বলছ কেন ?'

জনার্দন তাকাল। অল্প আলোয় দেখল কবিরাজ মশাই-এর মেয়ে বিছানায় পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে। গায়ের রঙের সঙ্গে অন্ধকার বেশ মিলেমিশে রয়েছে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে ? শরীর খারাপ ?'

'কেন ? ওষুধ দেবে নাকি ?'

'না, না। এমনি জিজ্ঞাসা করছি।'

'ইস্ ! জবাব দিলে যেন আমার পায়ের ব্যথা চলে যাবে।'

'পায়ে ব্যথা হল কেন ?'

'খেটে। খাটতে খাটতে আমার গতর গেল। তাকিয়ে দেখছ কি, এখানে এসে বসে আমার পা টিপে দিতে পারছ না ? বেশি জোরে দেবে না বলে দিচ্ছি।'

কোন মেয়ের পা এখন পর্যন্ত টেপেনি জনার্দন, কিন্তু এখন মনে হল ওটা করলে বেচারা আরাম পাবে। সে আড়ষ্ট হয়ে হেঁটে খাটের এক কোণে বসল। প্রায় গদার মত নির্লোম পা থেকে হাঁটু পর্যন্ত শাড়ি টেনে তুলে এগিয়ে দিল সে। কাঁপা হাত পায়ের গোছে রাখল জনার্দন। চেহারা দেখে যা মনে আসে পায়ের গোছ তার থেকে হাজারগুণ নরম।

সঙ্গে সঙ্গে একটা হাত বাড়িয়ে জনার্দনের ঘাড় চেপে ধরে সজোরে তার মাথাটাকে নিচে নামিয়ে এনে চুমু খেল ফটাস করে কবিরাজ মশাই-এর মেয়ে। ঘাড়ের ব্যথার সঙ্গে চুম্বনের স্বাদ মিলেমিশে একাকার হতেই ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াল জনার্দন নিজেকে ছাড়িয়ে, 'এ কি হচ্ছে ?'

'কি হচ্ছে মানে ? পা টেপালাম বলে পুরস্কার দিলাম !'

'আমার এমন পুরস্কার চাই না।' প্রচণ্ড রাগ হয়ে গেল জনার্দনের।

'কি ? এত বড় কথা ?'

'হ্যাঁ। আমি কবিরাজ মশাইকে বলে দেব।'

'কি বলবে ?'

'তুমি যা করলে।'

'ছি ছি ছি তুমি ব্যাটাছেলে ?'

'মানে ?'

'ভাবী স্ত্রীর কথা শ্বশুরকে যে বলে সে ব্যাটাছেলে নয়।'

'সুড়সুড়ি দিচ্ছ কেন ? টিপতে বললাম না ? জোরসে টেপো।'

ধমক খেয়ে জনার্দন জোরে জোরে টিপতে লাগল চরণ। কবিরাজ মশাই-এর মেয়ের আরাম লাগছিল। তার মুখ থেকে আঃ ওঃ শব্দ ছিটকে আসছিল। ডান পা সরিয়ে নিয়ে বাঁ পা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'এবার এটা। আজ বাদে কাল তুমি আমার বর হবে। সব স্বামী বউ-এর পা টিপে দেয়, জানো ?'

'কি করে জানবো ?'

'ন্যাকা !' মেয়েছেলের সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি করোনি কখনও ?'

'না।'

'সে কি ? তা তোমার সঙ্গে কেউ ওসব করবে না। এটা আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল। ম্যাদামার্কা পুরুষ। তোমাকে পুরুষ বলেই মনে হয় না।'

'আমি তার কি করব ?'

এবার হাসি বাজল, 'সত্যি তুমি পুরুষ তো ?'

জনার্দন ঢোক গিলল, 'নিশ্চয়ই।'

'তাহলে কোন মেয়ের সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি করোনি কেন ?'

'আমি ওসব পছন্দ করি না।'

'ন্যাকা ! আমার কাছে ভালমানুষ সাজা হচ্ছে ! শোন, বিয়ের পর আমি এবাড়ি ছেড়ে যেতে পারব না।'

'আমি কি বলব ?'

'এখন তো মেনি-মেনি কথা। বিয়ে হয়ে গেলে হুকুম করলে মজা দেখিয়ে দেব। থাক, আর পা টিপতে হবে না। অনেক পাপ হয়ে গেল এর মধ্যে। এদিকে এগিয়ে এসো, একটু পুণ্য করি।'

জনার্দন কথাটার মানে বুঝতে না পেরে পা থেকে হাত সরিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তার মানে ? কিসের পুণ্য ?'

'এসো এদিকে। আমি উঠতে পারছি না।'

জনার্দন এগিয়ে গেল। ইশারা দেখে মাথার পাশে বসল।

'বার বার আমাকে ঠেস দিয়ে কথা বলবে না কিন্তু।'

'একশবার বলব। তুমি হিজড়ে। গোঁফ কামিয়ে মেয়ে সাজো ন্যাটকে। আমাকে গলায় দড়ি দিয়ে জলে ফেলে দিচ্ছে !'

'আমি হিজড়ে ?' গরগর করে উঠল জনার্দন।

'নিশ্চয়ই। নইলে চুমু খেতে লাফিয়ে উঠলে কেন ?'

জীবনে প্রথম চুম্বনের স্বাদ নোনতা ঢেউ তুলছিল মৃদু। হঠাৎ এসব কথা শুনে জনার্দন ক্ষিপ্ত হয়ে গেল। সে পাগলের মত হাত বাড়িয়ে কবিরাজ মশাই-এর মেয়েকে জড়িয়ে ধরে স্ফীত ঠোঁটে চুমু খেতে লাগল, 'দ্যাখো, আমি পুরুষ কিনা, দ্যাখো, দ্যাখো !'

চুপচাপ চুম্বন নিয়ে গেল কবিরাজ মশাই-এর মেয়ে। তারপর উঠে বসে আঁচল ঠোঁট মুছে বলল, 'এবার এই কথাটা আমি বাবাকে বলব।'

'এ্যাঁ!' হতভম্ব হয়ে গেল জনার্দন।

'হ্যাঁ। আমাকে ভয় দেখাচ্ছিলে না? চুমু তো একটা তিনবছরের বাচ্চাও খেতে পারে। চুমু খাওয়া মানে পুরুষ হওয়া? প্রমাণ কি?'

'কি করলে প্রমাণ দেওয়া হবে?' জনার্দন অসহায় গলায় বলল।

'সেটা সময় হলে বলব। এখন আমার শরীর খারাপ।'

'পায়ের ব্যথা সারেনি?'

'দূর! তোমাকে মানুষ করতে অনেক সময় লাগবে। যাও, এখন চোখের সামনে থেকে দূর হও। বাবার ফেরার সময় হল।'

নারায়ণপুরের মাঠে আজ মাইক বাজছে। দুপুর থেকেই 'হ্যালো' 'হ্যালো' শব্দ শোনা যাচ্ছিল। বিকেলে সমস্ত গ্রাম সেখানে ভেঙে পড়েছে। মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে শহর থেকে আসা একজন বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, 'আপনারা ভেবে দেখুন এতদিনে কি পেয়েছেন? স্বাধীনতা আপনাদের কি দিয়েছে? যে দেশের কোটি কোটি মানুষের উনুনে আগুন জ্বলে না সেই দেশে মাত্র কয়েক হাজার মানুষ সবরকম আনন্দ উপভোগ করেন! আপনাদের শোষণ করে তাঁরা ফূর্তি করছেন! আপনারা রক্ত দিয়ে ফসল ফলাচ্ছেন আর তাঁরা সেটা ভোগ করছেন! এই বুর্জোয়া শাসন ব্যবস্থায় বড়লোক আরও বড়লোক হচ্ছে, গরীব আরও নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে।

'কিন্তু এভাবে আর বেশীদিন চলতে পারে না। যেসব জমিদার, জোতদার, ব্যবসায়ী জনসাধারণকে শোষণ করছে আমরা তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবো। আমরা সর্বহারা। সর্বহারার শেকল ছাড়া অন্য কিছু হারাবার নেই। আপনারাই বুঝুন, কিভাবে জীবনযাপন করছেন এখন? আমরা দেখেছি এই গ্রামের বেশীর ভাগ জমি একটি বিশেষ মানুষের দখলে। আপনারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সেই জমি চাষ করে ফসলের অনেকটা তাঁর হাতে তুলে দিচ্ছেন আর তিনি কখনও লাঙ্গলে হাত না দিয়েই সম্রাট হয়ে রয়েছেন। আজ পর্যন্ত এই গ্রামে কেউ এসব কথা বলতে আসেননি তাই এখানে জনমত সংগঠিত হয়নি। এবার আর দেরি নয়, আসুন, আপনারা আমার সঙ্গে গলা মেলান, লাঙ্গল যার জমি তার!'

বক্তার গলার স্বর গগনভেদী হল। কিন্তু মঞ্চের পাশে দাঁড়ানো কয়েকজন ছাড়া কেউ স্লোগানে গলা মেলাল না। শ্রোতারা একেবারে বাকরহিত।

বক্তা এরকম অভিব্যক্তি আশা করেননি। তিনি আবার চেঁচালেন, 'চুপ করে থাকবেন না। এখন আর চুপ করে থাকার সময় নেই। পশ্চিমবাংলার গ্রামে গঞ্জে শহরে নির্যাতিত মানুষেরা এতকালের ভয় সরিয়ে রেখে এক হচ্ছেন। বলুন আপনারা, লাঙ্গল যার, জমি তার!'

এবার মিনমিনে প্রতিধ্বনি হল। বক্তা প্রবল উৎসাহে চেঁচালেন, 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ! ইনকিলাব—'

এবার সাড়া পাওয়া গেল, 'জিন্দাবাদ।'

মিটিং চলেছিল রাত সাড়ে সাতটা পর্যন্ত। চারজন বক্তা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই কথা বলেছিল। সেইসব কথা শুনতে শুনতে নারায়ণপুরের মানুষের রক্ত কিছুটা উষ্ণ হল। যতীনের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল নগেন। শ্রীনিবাস এবং জনার্দন একেবারে সামনে। জনার্দনের মনে হল লোকটা খুব ভাল কথা বলে।

মিটিং শেষ করে সাইকেলে এবং রিক্সায় চেপে ওরা চলে যেতেই বৃষ্টি নামল। দুদ্দাড় করে লোকজন ছুটতে লাগল নিজের নিজের বাড়ির দিকে।

ঘরে ফিরে গামছায় মাথা মুছতে মুছতে শ্রীনিবাস তার বউকে বলল, 'আজ জব্বর ব্যাপার হল। আমাদের গাঁয়ে কখনও এমনটা হয়নি।'

শ্রীনিবাসের বউ সবিতা হাসল, 'মাইকের আওয়াজ শুনলেই আমার যাত্রার কথা মনে পড়ে। ধেউমানিতে মাইক বাজিয়ে যাত্রা হত। কতদিন দেখি না, হ্যাঁগো, আমাকে যাত্রা দেখাতে নিয়ে যাবে?'

॥ ১৪ ॥

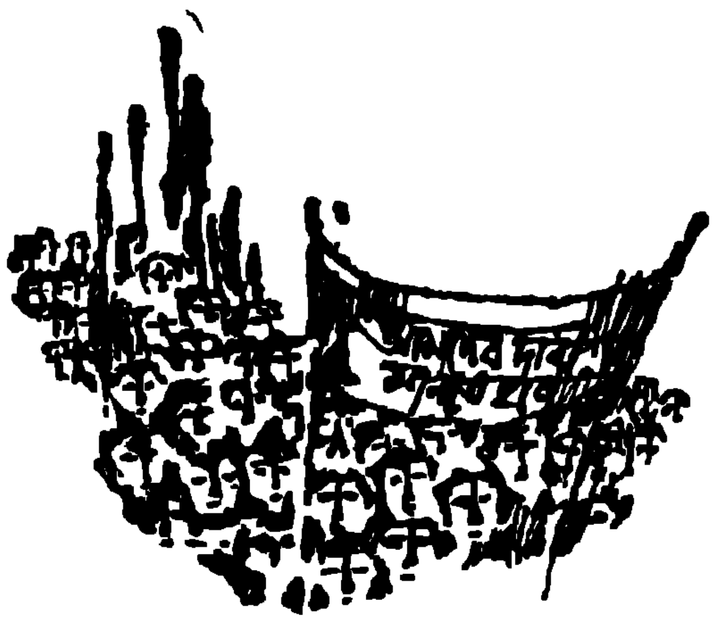

আজ খুব গুমোট। গাছের পাতা নড়ছে না এই সাত-সকালেই। ওরা বটতলায় বসে গুলতানি করছিল। গতকাল যে ব্যাপারটা ঘটে গেল তাই মুখে মুখে ফিরছিল। নগেন বলছিল, 'কথাগুলো কিন্তু মন্দ বলেনি। আমাদের কারোর জমি নেই অথচ চাষ করি আমরাই। ঠিকই বলেছে, লাঙল যার জমি তারই হওয়া উচিত।'

জনার্দন মাথা নাড়ল, 'হরিহর জ্যাঠার নামে জমি থাকলে অসুবিধে কি?'

ধীরেন বলল, 'অসুবিধে কি মানে? ফসলের ভাগ দিতে হচ্ছে না?'

জনার্দন আপত্তি করল, 'বাঃ, তেমনি উনি বীজ, সার এসব দিচ্ছেন যে!'

নগেন বলল, 'তা দিন। আসলে নিজের জমি বললে যেরকম বল মনে আসে তা পরের জমিতে হয়? হয় না। আমরা যদি ইচ্ছে করি তাহলে বিক্রিও করতে পারব না। কি বলিস শ্রীনিবাস?'

শ্রীনিবাস চুপচাপ বসেছিল একপাশে। সে খুবই চিন্তান্বিত। গতরাত্রে বউ আবদার করে বলেছে যাত্রা দেখতে যাবে। এ গ্রামে এখন যাত্রা হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। যেতে হলে আলিপুরদুয়ার। কম খরচ? তাছাড়া যাত্রা হয় রাত্রে। তাই সেখানে থাকতেও হবে। এত ঝক্কি কে সামলাবে? অথচ বউ তো কখনও আবদার করেনি কিছু। মুখ ফুটে প্রথমবার বলল, না বলতেও প্রাণ চাইছে না।

নগেন আবার বলল, 'আরে, কি ভাবছিস তুই?'

'যাত্রার কথা।' মুখফসকে বেরিয়ে এল।

'যাত্রা? মানে? কাল এখানে যা হল তা কি যাত্রা?' নগেন চেঁচালো।

হো হো করে হাসল জনার্দন। হাসির শেষটা খুবই মেয়েলি শোনাল। জনার্দন

বলল, 'যাত্রাই তো। শ্রীনিবাস ঠিকই বলেছে। চারপাশে লোক জমা করে অচেনা কিছু লোক কি গলা ফাটাল! আহা! সুরে সুরে বলে গেল, আমাদের দাবি মানতে হবে, ইনকিলাব জিন্দাবাদ, ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও।'

নগেনের কথাগুলো পছন্দ হচ্ছিল না। তার বন্ধু উদ্যোগী হয়ে এই গ্রামের মানুষদের উপকার করতে চেয়েছে। অথচ এরা তাই নিয়ে ঠাট্টা করছে।

ধীরেন বলল, 'যাই বলিস, ওরা যখন মাইকে ওই কথাগুলো বলে চেঁচাচ্ছিল তখন গায়ের মধ্যে সিরসির করছিল। বাপ্‌স! কিন্তু তোর যাত্রার কথা মনে হল কেন?'

শ্রীনিবাস অকপটে বলে ফেলল, 'আমার বউ যাত্রা দেখতে চেয়েছে।'

সঙ্গে সঙ্গে হুলুস্থুল পড়ে গেল। সবাই জানতে চায় ব্যাপারটা কি ঘটেছিল। লজ্জিত শ্রীনিবাস ঘটনাটা জানাল। নগেন গালে হাত দিয়ে বলল, 'চেয়েছে যখন তখন একটা ব্যবস্থা করতেই হয়। কি বলিস?'

জনার্দন ঠোঁট ওল্টালো, 'মেয়েমানুষ যা চাইবে তাই দিতে হবে?'

নগেন ধমকালো, 'এ্যাই! তুই মেয়েমানুষের কি বুঝিস?'

'আগে বুঝতাম না, এখন বুঝি।' জনার্দন হাসল, 'একদম পাত্তা দিতে নেই, দিলেই মাথায় চড়ে বসবে, হ্যাঁ!'

ধীরেন চোখ ছোট করল, 'কবিরাজের মেয়ের সঙ্গে খুব ভাব হয়েছে মনে হচ্ছে!'

'ভাব? সেটা করতে এসেছিল, পাত্তা দিইনি।'

'কি রকম? এই জন্য, তুই আজকাল সব চেপে যাচ্ছিস!'

জনার্দন খুশি হল। বন্ধুরা তাকে কোনোদিন পাত্তা দেয় নি। মেয়েমুখো মিনমিনে ইত্যাদি বিশেষণ তার সম্পর্কে ব্যবহার করে গেছে। তার কথা বলার ধরণ যদি মেয়েলি হয় তাহলে সে কি করবে? সে কি ইচ্ছে করে করে? আজ বন্ধুরা যখন ঘটনা শোনার জন্যে তাকে তোয়াজ করছে তখন তার খুব ভাল লাগল। বন্ধুরা তাকে ঘিরে ধরেছে। সে চোখ বন্ধ করে বলল, 'কবিরাজ মশাইয়ের মেয়ের নাকি খুব মুখ, কাউকে পরোয়া করে না, আমি সেই মুখ বন্ধ করে দিয়ে এসেছি।'

'কি রকম?' বন্ধুরা জানতে চাইল।

'আমি বলেছি একদম ট্যাঁ-ফোঁ করা চলবে না। চুমুটুমু আমি না চাইলে খাবে না। স্পষ্ট বলে দিচ্ছি।' গলা তুলে বলল জনার্দন।

সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার উঠল। নগেন পর্যন্ত বলে উঠল, 'চুমু, চুমু মানে?'

শ্রীনিবাস চোখ বড় করে বলল, 'তোকে চুমু খেয়েছে?'

'খেলেই আমি খাব নাকি? এমন ধমকেছি যে শরীর খারাপ হয়ে গেল!' প্রবল উৎসাহে জানাল জনার্দন। হঠাৎ তার নিজেকে বেশ বড়সড় পুরুষ বলে মনে হচ্ছিল।

নগেন জিজ্ঞাসা করল, 'কিভাবে চুমু খেল?'

'কি ভাবে আর! আমার ঘাড় ধরে মাথা কাছে নিয়ে!'

আবার হাসির ফোয়ারা ছিটকে উঠল। ধীরেন বলল, 'এ কি রে! এ তো শ্যাওড়াগাছের পেত্নীরা করে! ঘাড় ধরে মটকে দেয়।'

জনার্দন রেগে গেল, 'মুখসামলে কথা বল ধীরেন। আমি যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছি, তার সম্পর্কে এমন কথা বলার রাইট তোর নেই।'

ধীরেন বলল, 'আমি তার সম্পর্কে বলেছি নাকি? সে যা করেছে তাই বলেছি।'

'সে কি করেছে তুই দেখতে গিয়েছিলি?'

'তুই তো বললি।'

নগেন উত্তেজনা থামাল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। জনার্দন, তুই বেশ করেছিস। বউদের একদম মাথায় তুলবি না। বিয়ের আগেই যখন সেটা বুঝিয়ে দিয়েছিস তখন পরে তো আরও ভালো হবে। ইনকিলাব জিন্দাবাদ। জনার্দন, যুগ যুগ জিও।' স্লোগানের ভঙ্গীতে কথাগুলো বলতেই সবাই ওই ভঙ্গীতে চেঁচিয়ে উঠল। জনার্দন কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না।

একসময় আড্ডা ভাঙল। শ্রীনিবাস একাই ফিরছিল! জনার্দনের ব্যাপারটা তার মাথায় পাক খাচ্ছিল। সে কোনদিন বউকে শাসন করেনি। শাসন করলে অনেক সমস্যা এড়ানো যায়। কিভাবে বললে যাত্রা দেখার ব্যাপারটা বন্ধ করা যায় ভাবতে ভাবতে সে হাঁটছিল। সে বিড়বিড় করে স্লোগানটা উচ্চারণ করল, 'চলবে না, চলবে না। আমাদের দাবি মানতে হবে। চলবে না, চলবে না।' অন্যমনস্ক শ্রীনিবাস খেয়াল করেনি তার গলার স্বর বেড়েছে। এবং পথের আশেপাশে যারা ছিল তাদের অনেকেই ঘুরে তাকে দেখছে।

বাঁ হাতে পুঁইশাকের গোছা নিয়ে হরিহর হনহন করে ওই পথে আসছিলেন। হঠাৎ তিনি শ্রীনিবাসকে দেখতে পেলেন এবং স্লোগান তাঁর কানে পেঁছিল। তিনি থমকে দাঁড়ালেন। গতকাল এই গ্রামে প্রথম রাজনৈতিক দলের সভা হয়েছে। প্রথমেই তাঁর খুব অপছন্দ হয়েছিল। পরে নীলাম্বরের মুখে বিস্তারিত শুনে গুম হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর বুকের ওপর বসে কিছু বাইরের লোক তাঁরই দাড়ি ওপড়াবার চেষ্টা করেছে। তাঁকে গ্রামের লোকদের চোখে অত্যাচারী শয়তান প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে। হরিহর কিছুতেই বিশ্বাস করেননি গ্রামের মানুষেরা এই প্রচারে কান দেবে। হ্যাঁ, জমি তাঁর কিন্তু কখনই তিনি জমিদারের মত ব্যবহার করেননি। সবার সুখে দুঃখে সব সময় পাশে থেকেছেন। নীলাম্বরও তাঁকে বুঝিয়েছিল একথা। গ্রামের সব মানুষ হরিহরের সঙ্গে আছে। বাইরের লোকের প্ররোচনায় কেউ কান দেবে না। হরিহরের মনে হয়েছিল, অঙ্কুরেই কিছু করা দরকার। এমনিতে তিনি নরম মানুষ। কিন্তু প্রয়োজনে কতখানি শক্ত হতে পারেন তা এরা কেউই জানে না। ছবিরাণীর ভৈরবী হয়ে যাওয়াটাকে তিনি কোনোমতে হজম করেছেন। না করে কোন উপায় ছিল না। কিন্তু গ্রামের আবহাওয়া বিষাক্ত করতে তিনি কিছুতেই দেবেন না। বেঁচে থাকতে নয়।

হরিহর শ্রীনিবাসের দিকে তাকালেন। এ কি শুনছেন তিনি? হঠাৎ সামনে কিছু দাঁড়িয়ে পড়ায় শ্রীনিবাসের চৈতন্য ফিরল। হরিহরকে দেখে থতমত খেয়ে গেল সে। হরিহর চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি বলছিলে তুমি?'

'আজ্ঞে, ইনক্লাব জিন্দাবাদ।'

'মানে কি?'

'জানি না তো!'

হঠাৎ হরিহর যেন নাড়া খেলেন। তাঁর আচরণ পরিবর্তিত হল। যদিও বেশ চেষ্টাকৃত, কিন্তু তিনি হাসলেন, 'বাবা শ্রীনিবাস, তুমি আমার একটু উপকার করবে?'

হরিহরের এই পরিবর্তনে শ্রীনিবাস আরও হকচকিয়ে গেল, 'নিশ্চয়ই।'

'এই শাক ক-গাছা যদি তোমার শাশুড়ীকে পৌঁছে দাও তাহলে খুব ভাল হয়। বৃদ্ধা একা মানুষ, বাগানে তাঁর পুঁই হয়নি, আমার কাছে খেতে চেয়েছিলেন। বেলা যাচ্ছে, রাঁধবেন কখন! এদিকে আমাকে একবার এখনই গঞ্জে যেতে হবে, বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছে।' কাতর মুখে কথাগুলো বললেন হরিহর।

বেঁচে গেল যেন শ্রীনিবাস, 'দিন আমাকে, এক্ষুনি পৌঁছে দিচ্ছি।'

শ্রীনিবাসের হাতে পুঁইশাক দিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগলেন হরিহর। তাঁর বুক জ্বলে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত শ্রীনিবাসও? ছেলেটাকে তিনি স্নেহ করতেন, ভদ্র বিনয়ী বলে। কে যেন বলেছিল, ভাগাড়ে আগুন লাগলে মন্দিরও বাদ যায় না। হুম্, দেখাচ্ছি! শুধু ভালমানুষীটাই এরা দেখেছে, এবার মন্দটা বুঝবে, তবে দেখবে না।

গরম ভাতে গব্য-ঘি মেখে অনেকখানি আলুসেদ্ধ এবং একটি কাঁচা লঙ্কা চেখে চেখে খাওয়া অনেক কালের অভ্যেস, কিন্তু আজ হরিহরের এসবে তৃপ্তি ছিল না। খাওয়া কোনমতে সেরে তিনি খালিগায়ে বাগানে হাঁটছিলেন। ওরা কি ভাবছে তাঁকে? চশমখোর? রক্তচোষা? তাঁর কালো হাত ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে চায়? কারা দেবে? যারা তাঁর অন্নে প্রতিপালিত? নব্বুই ভাগ পরিবার কোন না কোন ভাবে তাঁর কাছে ঋণগ্রস্ত। তিনি আজ পর্যন্ত কারো ওপর অত্যাচার করেননি। তাহলে? হরিহর কল্পনা করলেন, সমস্ত গ্রামের মানুষ পিলপিল করে এসে তাঁর বাগান তছনছ করে দিচ্ছে, বাড়ি ভেঙে দিচ্ছে! হরিহর শিউরে উঠে পুকুরের দিকে তাকালেন। দু বছর জাল ফেলেননি। পোনাগুলো বেশ গায়েগতরে হয়েছে। এগুলোও যাবে তাহলে! এবং পুকুর দেখতে দেখতে তাঁর ছবিরাণীর কথা মনে পড়ল। ছবিরাণী এই পুকুরে স্নান করতে এসেছিল এক ভোরে। হঠাৎ তাঁর মাথায় অন্য চিন্তা এল। হ্যাঁ, ছবিরাণী পারে তাঁকে রক্ষা করতে। এখন তো তার বেশ নামডাক হয়েছে। চরণামৃত খাইয়ে অনেকের অসুখ সারাচ্ছে।

ভরদুপুরে চারপাশ যখন ঝিঁ-ঝিঁ করছে তখন ছাতামাথায় বাড়ি থেকে বের হলেন হরিহর। ছাতির আড়ালে মুখ ঢেকে গ্রাম পেরিয়ে মাঠে নামলেন। মাঠ ভেঙে দ্রুতপায়ে পৌঁছে গেলেন নদীর ধারে মন্দিরের কাছে। দূর থেকেই দেখতে পেলেন মন্দিরচত্বর ফাঁকা, এমন কি কুকুরগুলোও নেই। কিন্তু হঠাৎই তাঁর পায়ের ওজন বাড়ল, গতি কমল। দু-তিনবার গলাখাঁকারি দিয়ে হরিহর মন্দিরের সিঁড়ির নিচে পৌঁছে গেলেন। কি বলে ডাকবেন তিনি? নতুন ভৈরবী? নতুন মা? ভৈরবী মা? নাকি সেই ছবিরাণী! হরিহর তাকালেন, মন্দিরের দরজা ভেজানো। অবশ্য এইসময় বন্ধ থাকারই কথা। দুপুরের ভোগের পরে মায়ের এখন বিশ্রামের সময়।

'ওমা, আপনি?'

পেছন থেকে গলা ভেসে আসতেই চমকে ফিরে তাকালেন হরিহর। আর তৎক্ষণাৎ তাঁর শরীর জমে গেল। নদীতে স্নান সেরে ফিরছে ছবিরাণী। মাথায় ভেজা গামছার স্তূপ। গায়ে সিক্ত গৈরিক বসন লেপ্টে আছে। চেষ্টা সত্ত্বেও ছবি-রাণীর কাঁধ উন্মুক্ত। আহা, কি রূপ! হরিহরের গলা শুকিয়ে গেল।

ছবিরাণী বলল, 'একটু অপেক্ষা করুন, আমি শুকনো কাপড় পরে আসি।'

চোখের সামনে দিয়ে সে মন্দির-সংলগ্ন ছোট ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। যদিও মাথার চেহারা এখন কদমফুলের মত অথবা বিপরীত ভাবে চিন্তা করলে শকুনের মাথার কথা মনে আসে কিন্তু ভেজা শরীরে চলার ভঙ্গী তো রম্ভাকেও হার মানায়। হঠাৎ চৈতন্য ফিরল হরিহরের। এসব তিনি কি ভাবছেন? মায়ের মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে এই চিন্তা? ছি ছি ছি! হোক না দরজা ভেজানো, মায়ের চোখকে তিনি তো ফাঁকি দিতে পারবেন না! তাঁর পিতৃদেবের কখনই এই দোষ ছিল না। ছি ছি ছি!

'আসুন, বসুন।'

চোখ তুলে দেখলেন, ছবিরাণী মন্দিরের বারান্দায় তাঁর জন্যে আসন পেতে দিচ্ছে। তিনি আপত্তি করলেন, 'আহা, ওখানে তো এমনিতেই বসা যায়, আবার আসন কেন?'

'বড্ড তেতে আছে। আপনার শরীর জ্বলবে!' মৃদু হাসল ছবিরাণী।

চমকে উঠলেন হরিহর। শরীর জ্বলবে মানে? কথাটা অন্য অর্থে নয় তো? তবু বললেন, 'এত দেরিতে স্নান হল? খাওয়াদাওয়া হবে কখন?'

'একা মানুষ। সকালের কাজ শেষ করতে করতে দেরি হয়ে গেল। তাও আজ শনি মঙ্গল নয় বলে পুজো দেবার ভিড় হয়নি। আপনি কি খেয়ে এসেছেন? ছবিরাণী খানিক তফাতে পা মুড়ে বসতেই হরিহর লক্ষ্য করলেন সে জামা পরেনি।

'খালি মেঝেতে বসলে তুমি, ওখানে গরম নেই?' ইচ্ছে করেই জিজ্ঞাসা করলেন।

'ঠাণ্ডা বলুন আর গরমই বলুন, সবকিছু আমার সয়ে গেছে। তা বলুন, আমার কোন অপরাধ হয়েছে? এই অসময়ে আপনি?'

'এখানে আসতে বুঝি সময় বিচার করতে হয়?'

'তা নয়। এখন তো মায়ের দরজা বন্ধ। আপনাদের বংশের মন্দির, আপনি সবার থেকে ভাল জানেন।'

'মন্দিরের কথা আজকাল ভাবার সময় পাই না।'

'জগা পাগলা থাকতে কিন্তু পেতেন।'

হঠাৎ হরিহরের গলা পাল্টে গেল, 'আচ্ছা, এ জীবন কেমন লাগছে?'

চোখ তুলল ছবিরাণী, 'সত্যি কথা বলব? প্রথমে খুব ভয় পেয়েছিলাম। যা কোনদিন করিনি তা কি করে করব? তিনদিন বাদে এক মধ্যরাত্রে তিনি এলেন।'

'কে?'

'আমার গুরুদেব। নব্বুই বছর বয়স তাঁর। সিদ্ধবাবা। বললেন, বেটি, মাকে ডাকবি, মাকে খাওয়াবি সাজাবি এতে অসুবিধে কোথায়? তোর নিজের মেয়ে থাকলে যা করতিস তাই করবি। তবে নিজের কথা যদি ভাবিস তাহলে ঠিক

পথ দিয়ে সঠিকভাবে তোকে হাঁটতে হবে। আমি তাঁকে বললাম পথ চিনিয়ে দিতে। তিনি আমাকে তন্ত্রমতে দীক্ষা দিলেন।'

'কি ভাবে ?'

'সেটা আমার গোপন ব্যাপার।'

'তাহলে তুমি সত্যিকারের ভৈরবী ?'

হাসল ছবিরাণী, 'ভৈরবী বললেই ভৈরবের কথা মনে আসে। আমার তো কোন ভৈরব নেই। শুনেছেন কিছু ?'

'নেই, কিন্তু অভাব হবে না।'

'হবে। কারণ যিনি প্রকৃত ভৈরব তিনি নিরাসক্ত মানুষ। মন এবং শরীরের ওপর তাঁর অসম্ভব দখল। শব কিংবা নারীর মধ্যে কোন পার্থক্য তিনি করেন না। এমন মানুষের সংখ্যা খুব কম। যাকগে, বলুন কেন এসেছেন ?'

হঠাৎ সব গোলমাল হয়ে গেল হরিহরের। যে জ্বালা নিয়ে তিনি এখানে ছুটে এসেছিলেন তা যেন চাপা পড়ে গেল। তিনি বেশ আবেগেই বলে উঠলেন, 'ছবিরাণী, তুমি একদিন বলেছিলে প্রকৃত সম্মান দিলে জীবন অন্যরকম হত। সেদিন আমি লোকলজ্জায় সেটা দিতে পারিনি। আমার চোখ তখন বন্ধ ছিল। কিন্তু এখন আমি প্রস্তুত। তোমার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে আমি তোমাকে স্ত্রী হিসেবে পেতে চাই।' কথাগুলো বলে স্পষ্ট চোখে তাকালেন হরিহর।

ছবিরাণীর মুখে বিচিত্র আলো খেলে গেল। সে হাসল, 'আর হয় না।'

'কেন ?' ব্যাকুল হলেন হরিহর।

'গতকালটাকে কি আপনি আজ ফিরিয়ে আনতে পারেন ?'

'পারব না। কিন্তু আমি কি গত হয়ে গেছি ?'

'বালাই ষাট। আপনি কেন গত হয়ে যাবেন ? আমি হয়েছি। আমার সে মনটাই মরে গিয়েছে। একদম।'

'তাহলে আমি তোমার সঙ্গ পাব না ?'

হঠাৎ হাসির ঝিলিক উঠল ছবিরাণীর ঠোঁটে, 'পারবেন ? কিন্তু সে কাজটা তো আপনার পক্ষে সহজ মোটেই নয়।'

'কি কাজ ?'

'অনেকগুলো। প্রথমত, আপনাকে গৃহীজীবন ত্যাগ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, তন্ত্রমতে দীক্ষিত হতে হবে। তৃতীয়ত, নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত করার সাধনা সম্পূর্ণ করতে হবে। তখনই আপনি আমার ভৈরব হতে পারবেন। আমরা একসঙ্গে বাস করতে পারব। আপনি পারবেন এসব করতে ?'

হরিহর মাথা নাড়লেন, 'হুঁম, তুমি খুব বুদ্ধিমতী। বেশ শোন, আমি তোমাকে একটা কথা বলে যাচ্ছি। যদি কখনও মনে কর এই জীবন তোমার ভাল লাগছে না, তাহলে তৎক্ষণাৎ আমাকে খবর পাঠিও। এই মন্দিরেই আমি মন্ত্র পড়ে তোমাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে ঘরে নিয়ে যাব। এবার চলি।' হরিহর উঠে দাঁড়ালেন।

'দাঁড়ান। এরকম নির্জলা যাবেন না।' ছবিরাণী ব্যস্ত পায়ে ছোট ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। ফিরে এল এক গ্লাস জল আর দুটো বাতাসা নিয়ে, 'নিন,

এটুকু খেতে হবে।

হরিহর গ্রহণ করলেন। তারপর দোনামনা করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, তোমার শরীর তোমাকে জ্বালায় না?'

এমন প্রশ্নেও হেসে ফেলল ছবিরাণী, 'জ্বালাতো। কিন্তু প্রতি রাত্রে মায়ের সামনে দাঁড় করিয়ে জগা পাগলা আমার শরীরের সমস্ত চিতা নিভিয়ে দিয়ে গেছেন। মা যদি ইচ্ছে না করেন তাহলে কোন পুরুষের পক্ষে সেই নিভে যাওয়া চিতাগুলোকে আবার জ্বালানো সম্ভব হবে না।'

এবার হরিহর অবাক চোখে তাকালেন। গ্লাস ফেরৎ দিয়ে মাথা নাড়লেন। খুব লজ্জা হল তাঁর। তারপর মন্দির থেকে ছাতি বগলে নিয়েই হাঁটতে লাগলেন।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছবিরাণী গলা তুলল. 'এ কি করছেন, ছাতি খুলুন! ছাতি বগলে নিয়ে কেউ খালি মাথায় যায়?' সম্বিৎ ফিরতে ছাতি খুললেন হরিহর।

সন্ধ্যের মুখেই বৃষ্টি নামল। মেঘ করেছিল বিকেলে। সেই মেঘের ওপরে আরও মেঘ জমল। বৃষ্টি নামল অঝোর ধারায়। বোধহয় বর্ষা এল।

ঘরে আলো না জেবলে শুয়ে ছিলেন হরিহর। ছবিরাণী সম্পর্কে তাঁর চিন্তা শেষ। সে ভৈরবী হবার পর যদিও সক্রিয়ভাবে আর ভাবেননি কিন্তু মনে যে ভাবনা ছিল তা মন্দিরে গিয়ে বোঝা গিয়েছে। আজ ঘুরে আসার পরে তিনি নিশ্চয়ই ও ব্যাপারে নিরাসক্ত হবেন। কিন্তু এই গ্রামের মানুষগুলো? যদি পর পর মিটিং হয়, তাহলে তো সবই গোল্লায় যাবে। আসল ক্ষতি তো লোকগুলোরই? ছটফট করছিলেন তিনি। বাইরে প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল। বৃষ্টির শব্দে কান পাতা দায়। শ্রীনিবাসটাও ওইসব আওড়াচ্ছিল! তিনি শুনেছেন, কোথাও কোথাও জোতদারদের ধরে গলা কেটে ফেলা হয়েছে। শ্রীনিবাস যদি তাঁকে ওইরকম করে? কিছুই বিশ্বাস করা যাচ্ছে না এখন।

রাত দশটা নাগাদ বাইরে উঁকি মারলেন হরিহর। বৃষ্টিতে অন্ধকারও সাদা হয়ে যাচ্ছে। মানুষ কেন, একটা ব্যাঙও বাইরে পড়ে নেই। হরিহর মাথা নাড়লেন। তাঁর পূর্বপুরুষ এই গ্রাম তৈরি করেছিলেন। সঙ্গী লোকলস্কররাই গ্রামের অন্য মানুষদের পূর্বপুরুষ। না, তিনি কিছুতেই এদের সর্বনাশের পথে ঠেলে দিতে পারবেন না।

বৃষ্টি থামল শেষরাতে। হরিহর সেই অন্ধকারেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন। তারা ফুটছে। শেষরাত্রের তারারা। অথচ গ্রামের মাটি এখন ভিজে কাদা। জুতো পরে হাঁটার উপায় নেই। হঠাৎ যেন তার চোখে পড়ল তাঁর গেটের ধারে নধর হয়ে ওঠা শালগাছটা নেই। এদিকে শাল তেমন হয় না। অনেক যত্ন করে গাছটাকে বড় করেছিলেন। হাতখানেক হয়েছিল গাছটা। গাছের দামও অনেক। সেইটে উধাও। বৃষ্টির রাত্রে কেউ তার গোড়া কেটে হাওয়া করে দিয়েছে। চিৎকার শুরু করলেন হরিহর। ঘুম ভেঙে গ্রামের মানুষরা ছুটে এল। ঘুম ভাঙল আশপাশের বাড়ির মানুষদের। কাদা মাড়িয়ে সেই প্রায়-ভোরে দাঁড়িয়ে

তারা বলাবলি করতে লাগল, এ কি অদ্ভুত ব্যাপার! বেমালুম একটা গাছ চুরি? এ গ্রামে কখনও হয়েছে? তাও আবার হরিহর মশায়ের শালগাছ? হিম্মত কি? হরিহর প্রচণ্ড উত্তেজিত। চিৎকার চেঁচামেচিতে যখন কাজ হল না তখন তিনি স্থির করলেন থানায় যাবেন। এমন ব্যাপার তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারবেন না। পুলিশ এসে বিচার করুক। সঙ্গে সঙ্গে গরুরগাড়ি বের করা হল। এক রাত্রের প্রবল বৃষ্টিতে হরিপুরে যাওয়ার পথের দাগ শেষ হয়ে গেছে। গরুরগাড়ি ছাড়া যেতে হলে আছাড় খেতে হবে কয়েকবার। সবার চোখের সামনে হরিহর হরিপুরে যাত্রা করলেন গরুরগাড়িতে চেপে।

সময় লাগল কিছুটা। ততক্ষণ ভোর হয়েছে। বৃষ্টিভেজা হরিপুরের রাস্তায় মানুষজন নেই। হঠাৎ হরিহরের চোখে পড়ল জনার্দন চোরের মত আসছে। ওর জামা-কাপড় শুকনো, কাদার দাগ নেই। তার মানে ছোকরা গতরাত্রে হরিপুরেই ছিল!

গরুরগাড়িতে চেপে হরিহর এই কাকভোরে হরিপুরে আসবেন চিন্তা করেনি জনার্দন। সে সদ্য বিড়ি খেতে শিখেছে। একটি বিড়ি ধরিয়ে মাথা গুঁজে হাঁটছিল। নিজের নাম শুনে পাশ ফিরে তাকিয়ে প্রায় পাথর হয়ে গেল।

গরুরগাড়ি থেমেছে। মুখ বের করে হরিহর জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখানে কি করছ?'

'আজ্ঞে—এমনি।' জনার্দন ঠোঁট চাটল।

'কে থাকে এখানে? কার কাছে ছিলে রাত্রে?' হরিহরের সন্দেহ বাড়ছিল।

'না, মানে কবিরাজ মশাই অনেক রাত্রে ফিরলেন, বৃষ্টি পড়ছিল, তাই—।'

'সেখানেই থেকে গিয়েছিলে?'

মাথা নেড়ে কোনমতে হ্যাঁ বলল জনার্দন।

'বাড়িতে খবর দিয়েছিলে?'

'আজ্ঞে উপায় ছিল না।'

হরিহর কোন কথা আর বাড়াতে চাইলেন না। গাড়ি চলল থানার দিকে। তাঁর মনে হল ছেলেগুলো সব উচ্ছন্নে যাচ্ছে। বিয়ের আগেই কোন ছেলে ভাবী শ্বশুরবাড়িতে রাত কাটায়? কবিরাজ মশাই বা কি রকম মানুষ? আর ছেলেটার মধ্যে একটা চোর-চোর ভাব ছিল। নিশ্চয়ই কোন অন্যায় করেছে। তিনি ব্যাপারটা মাথায় আনতে চাইলেন না।

দাঁতন করছিলেন দারোগাবাবু লুঙ্গি পরে, খালিগায়ে। কালো লোমশ শরীর। একটা সেপাই টুলে বসে ঢুলছিল। হরিহর গরুরগাড়ি থেকে নেমে বললেন, 'নমস্কার। আপনাকে সাতসকালে বিরক্ত করতে এলাম।'

পিচ্ করে থুতু ফেলে দারোগা বললেন, 'কি ব্যাপার?'

'চুরি হয়ে গেছে।'

'চুরি? কোথায়?'

'আমার বাড়ি থেকে। আমাকে আপনি চিনতে পারছেন তো?'

'বিলক্ষণ!' পিচ্ করে থুতু ফেললেন দারোগা, 'কি গেল?'

'গাছ—একটা ডাগর শালগাছ।'

'গাছ? অ্যাঁ! গাছ বললেন?'

'ঠিকই। আমার খুব প্রিয় গাছ। সাত হাত হয়েছিল।'

'কে নিয়েছে?'

'জানি না। তবে নিলে গ্রামের লোকই নেবে।'

'কেউ শত্রুতা করছে? আপনি শুনেছি ওদের দেবতা!'

'ছিলাম। কিন্তু পলিটিক্যাল পার্টি ঢোকার পর হাওয়া বদলেছে।'

'পলিটিক্যাল পার্টি? গাছের সঙ্গে পলিটিক্স আছে নাকি?'

'থাকলেও থাকতে পারে।'

'হুম্। কিন্তু মুশকিল হল তদন্তে যে লোক পাঠাবো, আপনার গ্রামে ঢোকার পথ তো কাদায় ভরে গেছে নিশ্চয়ই! যাবে কি করে?'

'এই গরুরগাড়ি আছে সঙ্গে। পৌঁছে দিয়ে যাবে।' হরিহর জানালেন।

'সাতসকালে কি যেতে চাইবে? আপনাকে না বলতেও বাধছে।'

'কি করলে ওরা যাবে বলুন!'

'হেঁ হেঁ। বুঝতেই পারছেন। পিসফুল এরিয়া। কোন ক্রাইম হয় না। বর্ডারও ধারেকাছে নেই। সবাই শুকিয়ে চামচিকে হয়ে গেছে। পানিশমেন্ট পোস্টিং!'

'নিয়ে যেতে হলে কত দিতে হবে?'

'না, না, দিতে হবেই এমন কোন ব্যাপার নয়। তবে খুশি হয়ে মিষ্টি খাবার জন্যে দিলেও দিতে পারেন। অপরাধীকে অবশ্যই ধরে দেব। ধরে কোমরে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে এসে এমন মারব, চাই কি মাসখানেক জেলের ঘানি ঘুরিয়ে দেব। শতখানেক দিয়ে দেবেন।' পিচ্ করে থুতু ফেললেন দারোগা।

হরিহর সন্ত্রস্ত হলেন, 'না, না। জেলে পাঠানোর দরকার নেই। মারধোর করবেন না। দুশোবার উঠবোস করাবেন। আমি এসে অনুরোধ করলে লোক দেখিয়ে ছেড়ে দেবেন। আমি অন্যকে কষ্ট দিতে চাই না।'

'যাচ্চলে! আপনি আবার আমাকে জড়াচ্ছেন এর মধ্যে? অপরাধী ধরলেই হাত নিশপিশ করে মারার জন্যে। নিজেকে সামলে রাখা খুব মুশকিল হয়। আর আপনি গাছের শোকে ছুটে এসেছেন এত কষ্ট করে অথচ মারতেও দেবেন না! দেবেন আরও পঞ্চাশ বাড়িয়ে।'

দারোগা দাঁতনটা শূন্যে ছুঁড়ে দিলেন। অনেকটা ওপরে উঠে সেটা পড়ল থানার ছাদে। হরিহর ফতুয়ার পকেট থেকে দশ টাকার পনেরটা নোট বের করে গুনে গুনে দারোগার হাতে দিলেন, 'দেখে নিন।'

'আঃ, কি যে লজ্জা দেন! এসব কেউ কম দেয় নাকি? থার্টি ইয়ার্স এক্সপেরিয়েন্স। এই চৌবে, চৌবে?' হঠাৎ হেঁকে উঠলেন দারোগা।

লিকলিকে চেহারার একটা সেপাই, যার গোঁফটাই বিশাল, বেরিয়ে এল থানা থেকে। দারোগা তাকে হুকুম করলেন দুজন সেপাই নিয়ে হরিহরের সঙ্গে যেতে। যে করেই হোক গাছচোরকে ধরে আনতে হবে। মেজাজ খারাপ করার কোন কারণ

নেই। পঞ্চাশ টাকা জল-খাওয়ার জন্যে দেওয়া হবে। চৌবে প্রস্তুত হবার জন্যে চলে যেতেই দারোগা বললেন, 'একশো বললাম না কেন জানেন? বেশী লোভ দেখানো অত্যন্ত অন্যায় হবে। পরে ওই রেট না পেলে শালারা কাজই করবে না।'

সাড়ে আটটা নাগাদ গরুরগাড়ি গ্রামে পেঁছল। হরিহর গাড়োয়ানের পাশে বসে এসেছেন। পুলিসদের নামতে দেখে ভিড় জমে গেল। চৌবে গোঁফে তা দিয়ে কাটা গাছের গোড়া লক্ষ্য করল কিছুক্ষণ। চারপাশের ভিজে মাটিতে অনেক পায়ের ছাপ। চৌবে নিচু গলায় হরিহরকে বলল, 'কোন্ লিয়া আপকো মালুম হ্যায়?'

হরিহর জবাব দিলেন সবাইকে শুনিয়ে, 'আমি জানব কি করে? যদি জানতাম তাহলে কি থানায় যেতাম? কী বলে দ্যাখো!'

নীলাম্বর এবং পীতাম্বর দাঁড়িয়েছিল। নীলাম্বর বলল, 'মনে হয় একজনে কাটেনি। দল ছিল সেপাইজি!'

'দল? হামকো দলফল মৎ দেখাও।' চৌবে দু'পা এগিয়ে গিয়ে একটা দাগ দেখতে পেল। কাদার ওপর ঘষটে যাওয়ার দাগ। সে হাত নেড়ে সঙ্গীদের ডেকে চিৎকার করল, 'ইধারসে লে গিয়া। এহি দাগ ফলো করো।'

তিন সেপাই বীরদর্পে ভেজা মাটির ওপর ঘষটানো দাগ অনুমান করে চলতে লাগল। ওদের পেছন পেছন অন্তত জনা-কুড়ি মানুষ। যত এগোয় তত ভিড় বাড়ে। হরিহরও চলেছেন ওদের সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত দাগটা যেখানে শেষ হল সেখানে শ্রীনিবাস দাঁড়িয়ে, পেছনের দাওয়ায় ঘোমটা মাথায় তার বউ। চৌবে গিয়ে শ্রীনিবাসকে ধরল, 'এই গাছ কাঁহা?'

'গাছ? গাছ মানে?' হতভম্ব শ্রীনিবাস।

হরিহর এবার এগিয়ে এলেন, 'বাবা শ্রীনিবাস, গতরাত্রে বৃষ্টির মধ্যে আমার নধর শালগাছটা চুরি গেছে। সেই গাছ বয়ে নিয়ে যাওয়া সময় চোর মাটিতে যে দাগ ফেলেছিল তা তোমার বাড়ির সামনে শেষ হয়েছে। তুমি কি কিছু জানো?'

'আজ্ঞে না। আমি তো সারারাত ঘুমোচ্ছিলাম।'

চৌবে হাঁকলো, 'কৌন দেখা তুম ঘুমাতা থা?'

'আজ্ঞে, আমার বউ।'

হো হো করে হাসল চৌবে। তারপর বীরদর্পে এগিয়ে গেল। শ্রীনিবাসের বাড়ির চৌহদ্দিতে বাঁখারির বেড়া দেওয়া; গাছটাকে পাওয়া গেল সেই বেড়ার এক পাশে।

চৌবে উল্লসিত। সঙ্গে সঙ্গে দড়ি পড়ল শ্রীনিবাসের কোমরে, 'চল শালা, চুরি কিয়া, না? থানামে চল পহেলে।'

আচমকা একটা কান্না ছিটকে উঠল। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে শ্রীনিবাসের বউ দাওয়া থেকে নেমে পাগুর হয়ে দাঁড়িয়ে সেই কান্নাটা ছড়িয়ে দিল। গ্রামের সমস্ত মানুষকে নির্বাক করে সেপাইরা শ্রীনিবাসকে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছিল হরিহরের বাড়ির দিকে, যেখানে গরুরগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। নগেন ছুটে এল হরিহরের পাশে, 'হরি—হরিকাকা, শ্রীনিবাস কখনই চুরি করতে পারে না, ওকে যে ধরে নিয়ে যাচ্ছে! আপনি দেখুন!'

হরিহর চৌবের কাছে এগিয়ে গেলেন, 'সিপাইজি, এ লেড়কা খুব ভাল।'

'ভাল ? ইসকো পাশ গাছ মিলা, থানামে যানেই পড়েগা। হাম নেহি ছোড়েগা ইসকো। আপ কুছ মৎ বলিয়ে।'

গ্রামের লোক দেখল সেপাইরা গরুরগাড়িতে উঠে বসে শ্রীনিবাসকে কোমরে দড়ি দিয়ে টানতে টানতে থানায় নিয়ে চলল। কাদা-জ্যাবজেবে রাস্তায় বেচারা শ্রীনিবাস কোনমতে টাল সামলে চলছিল। কিছুদূর সঙ্গী হয়েও শেষ পর্যন্ত ফিরে এল গ্রামের মানুষ। এসে দেখল হরিহর তাঁর কাটা গাছের ওপর বসে মাথা চাপড়ে বিলাপ করছেন, 'এ কি হল ? যে গ্রামে কোনদিন পুলিসকে ঢুকতে হয়নি সেই গ্রামের কি সর্বনাশ হল !'

॥ ১৫ ॥

এতক্ষণ কেউ কোন কথা বলেনি। গ্রামের যে সমস্ত মানুষ দৃশ্যটি দেখেছিল তারা হতভম্ব, যারা দেখেনি তারা শোনামাত্র ছুটে আসছিল। শ্রীনিবাসের বউ মাটিতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। তাকে ঘিরে কিছু বউ-ঝি জটলা করছে। নীলাম্বর শোকে মুহ্যমান হরিহরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল, 'একটা উপায় বের করতেই তো হবে। আমাদের গাঁয়ে এমন কাণ্ড তো কখনও হয়নি !'

ধীরেন বলল, 'এ অবিচার। এতবড় গাছ শ্রীনিবাস একা কেটে বয়ে আনতে পারে নাকি ? আর যদি পারেও, তাহলে নিজের চুরির জিনিস কেউ নিজের ঘরের সামনে ফেলে রাখে ?'

পীতাম্বর বলল, 'ঠিক কথা। এটা সেপাইসাহেবকে বোঝানো উ[illegible]ত ছিল হরিহর !'

এইসময় অনন্তর গলা পাওয়া গেল। সাতসকালে সে নেশা করেনি বলেই কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক নয়, 'বলি ও হরিহর, গাছ কাটা গেছে দেখেই তুমি কোন্ বুদ্ধিতে থানায় ছুটলে ? থানার ব্যাপারটা আমার চেয়ে ভাল কেউ জানে ? মাল খেয়ে কতবার সেখান থেকে এসেছি। অতি নচ্ছার জায়গা।'

কথাটা শোনামাত্র সবাই বলতে লাগল, এত সামান্য কারণে হরিহরের থানায় যাওয়াটা মোটেই উচিত হয়নি। হরিহর কপাল চাপড়ালেন, 'মাথার ঠিক ছিল না গো। অত আদরের শালগাছটা চুরি হয়ে গিয়েছে দেখে—তা আমি তখন চেঁচিয়ে সবাইকে ব্যাপারটা শোনালাম, কই কেউ তো এগিয়ে এসে বললে না গাছটা এখানে পড়ে আছে ? বলেছ কেউ ? থানায় যাচ্ছি শু[illegible] কেউ বাধা দাওনি। শ্রীনিবাসকে আমি কম ভালবাসি ? কি নম্র, বিনয়ী ছেলে। আমি ওকে নিজের ছেলের মত মনে করি। যদি জানতাম গাছটা ওর বাড়ির সামনে পড়ে আছে—হায় হায় !'

অনন্ত বলল, 'যা হয়ে গেছে তা নিয়ে ভেবে কোন লাভ নেই। ছেলেটাকে থানা

থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এসো। তুমি গেলেই ছেড়ে দেবে। যাও!'

হরিহর একটু অবাক হলেন। মাতালরা অনেক খবর রাখে। সন্দেহ করেছে নাকি অনন্ত? তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি গেলেই ছেড়ে দেবে তোমাকে কে বলল? দেখলে তো, কত করে বললাম সেপাইকে! আমার কথায় কানই দিল না। দারোগা নিশ্চয়ই আর এক কাঠি ওপরে যাবে।'

অনন্ত মাথা নাড়ল, 'যাবে না। কতবার আমি তোমার নাম করে পার পেয়ে গেছি।'

'আমার নাম করে!' হরিহর হতভম্ব।

অনন্ত হাসল, 'তুমি হলে এ গ্রামের ধনী মানুষ। সেই খবর দারোগা রাখে না ভেবেছ? তোমাকে হাতে রাখলে তার দু'পয়সা রোজগার হবে!'

সঙ্গে সঙ্গে পীতাম্বর বলল, 'হরিহর, তুমি ব্যবস্থা কর একটা। দেখছ তো, কচি বউটা কাটা লাউলতার মত পড়ে আছে। আহা রে!'

হরিহর উঠে দাঁড়ালেন, 'নিশ্চয়ই করব। আমি বেঁচে থাকতে ওর কোন ক্ষতি হতে দেব না। চল তোমরা আমার সঙ্গে।'

হরিহরের আহ্বানে অনেকেই মুখ-চাওয়াচাওয়ি করল। শুধু নগেন এবং পীতাম্বর সঙ্গী হল। নগেনের ধমকে ধীরেন শেষ পর্যন্ত পিছু নিল।

এখন হরিপুরের রাস্তা খুব খারাপ। গোড়ালি ডুবে যাওয়া কাদায় সুস্থভাবে হাঁটা খুব মুশকিল। চারজন মানুষ যতটা দ্রুত সম্ভব হেঁটে চলেছিল। একই পথে এবং একই সকালে দুবার যাতায়াত হরিহরের পক্ষে অত্যন্ত পরিশ্রমসাপেক্ষ কাজ। কিন্তু তিনি মনে মনে প্রফুল্ল ছিলেন। যাক, এখন পর্যন্ত সব কিছু পরিকল্পনামত ঘটে যাচ্ছে। শ্রীনিবাসকে ধমক দিয়ে দারোগা যখন ছেড়ে দেবেন তখন হরিহরের প্রতি শ্রদ্ধায় গাঁয়ের মানুষ নুইয়ে পড়বে। ওই ছোকরাও আর এই জীবনে জিন্দাবাদ বলার সাহস পাবে না।

থানায় ঢুকেই পীতাম্বর বলল, 'ও হরিহর, তুমিই যাও, কথাবার্তা বল। আমি এখানে রইলাম।'

'আমি একাই বলব? তোমরা সঙ্গে এলে ভাল হত না?' হরিহর জিজ্ঞাসা করলেন।

ধীরেন বলল, 'আমার তো কেমন ভয়-ভয় করে।'

নগেন নিচুগলায় জানাল, 'যদি পয়সাকড়ি চায় আমরা থাকলে, বুঝতেই পারছেন।'

হরিহর মাথা নাড়লেন। দেড়শ টাকা গুনে দিয়ে এসেছেন দারোগার হাতে। সেসব কথা এদের না শোনাই ভাল। থানার সামনের কুয়োর জলে পা ধুয়ে জুতো পরলেন তিনি। উত্তেজনার মাথায় গরুরগাড়িটা আনা হয়নি। হলে এত কষ্ট সহ্য করতে হত না। অবশ্য গরুরগাড়িতেও সুখ নেই। কাদায় এমন নেচেছিল যে মাজায় ব্যথা হয়ে আছে।

দারোগা ঘরে নেই। তাঁকে দেখতে পেয়ে চৌবে এগিয়ে এল, 'ফিন কিয়া হায়?'

'বড়বাবুকে ডাক। দরকার আছে।' গম্ভীর গলায় হুকুম করলেন হরিহর।

চৌবে হাসল, 'জরুর। কিন্তু হামলোগকো চা-পানিকে লিয়ে কুছু[illegible] দিবেন!'

হরিহর অবাক, 'আরে! তখন তো দিয়ে গেলাম!'

চোবে বলল, 'উ তো ভাত রুটিকো লিয়ে। আভি বকশিশ দিজিয়ে।'

অগত্যা হরিহর গোটা পাঁচেক টাকা চোবের হাতে তুলে দিলেন। একশ পঞ্চান্ন হয়ে গেল। এর সঙ্গে গাছটার দাম আছে। উঃ, একটু বেহিসেবী কাজ হয়ে গেল মনে হচ্ছে!

বকশিশ নিয়ে চোবে চলে গেল। বসে আছেন তো বসেই আছেন হরিহর। পেটে ছুঁচো ডন মারছে যেন। তিনি বাইরে বেরিয়ে এসে নগেনকে ডাকলেন, 'দারোগাবাবু তো নেই। কি করা যায় বল তো! তোমাদের ক্ষুধাতৃষ্ণা পায়নি?'

নগেন বলল, 'আজ্ঞে তা একটু পেয়েছে। এতটা পথ—তার ওপর যা কাদা!'

'আমার আবার সিঙ্গাড়া খাওয়া চলবে না। দুটো রসগোল্লা পেলে ভাল হত।' পকেট থেকে আরও পাঁচটা টাকা বের করে তিনি নগেনের হাতে দিলেন, 'তোমরা যা খাবে খাও, আমার জন্যে শুধু দুটো রসগোল্লা। বুঝলে? পিত্তি পড়লে আর দেখতে হবে না।'

খুশী হয়ে নগেনরা চলে গেলে আবার বসে বসে হাই তুলছিলেন হরিহর। না, আর তাঁর গাঁয়ে বিদ্রোহ হবে না। শালার ইনকিলাবওয়ালারা বারোটা বাজিয়ে দিয়েছিল প্রায়! এইসময় তাঁর ছবিরাণীর কথা মনে পড়ল। যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ! কদিন মন্দিরে থেকে ছবিরাণী যেন সত্যি সত্যি ভৈরবী হয়ে গেল! মনে আর কোন কুচিন্তা আসে না এখন ওকে দেখলে।

'কি ব্যাপার? আবার কেন?' দারোগার গলা শুনে হরিহর চোখ খুললো।

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। সব কাজ সুসম্পন্ন হয়েছে।' হরিহর উঠে দাঁড়ালেন।

'হুঁ। আমি যাতে হাত দিই তা বিফলে যায় না।'

'তা আমি বলি কি স্যার, এবার ওকে ছেড়ে দিন। সঙ্গে নিয়ে যাই।'

'কোথায়?' দারোগা চোখ তুললেন।

'গাঁয়ে। নিয়ে গেলে লোকে একটু বেশী মান্য করবে।'

'অসম্ভব।' দারোগা মাথা নাড়লেন।

'তার মানে? আপনার সঙ্গে সেরকমই তো কথা হয়েছিল!'

'হয়েছিল। কিন্তু অবস্থাটা পাল্টে গিয়েছে।'

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'বোঝাচ্ছি। আপনি দেশের কোন খবর রাখেন না দেখছি। ইমার্জেন্সি চালু হয়ে গেছে, জানেন? এখন সবরকম রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ একদম বন্ধ।'

'ও। কেন হল এরকম?'

'কিছু মানুষ দেশের ঐক্য নষ্ট করতে চাইছে. অশান্তি সৃষ্টি করছে। তাদের হাত থেকে দেশকে বাঁচাবার জন্যে সরকার এই ব্যবস্থা নিয়েছেন।'

'বুঝলাম। কিন্তু তার সঙ্গে আমাদের শ্রীনিবাসের কি সম্পর্ক?'

'ছিল না, কিন্তু এখন হয়েছে। দেশের পক্ষে বিপদজনক মানুষ যারা তাদের

গ্রেপ্তার করার জন্যে একটা আইন তৈরী হয়েছে। তার নাম মিসা। প্রতিটি এলাকা থেকে সেই রকম কিছু লোককে ধরপাকড় করা আরম্ভ হয়েছে ওই আইনে। এমন আইন যে তার বিরুদ্ধে কোন কেস করা যাবে না। কেস ধরেছি তার প্রমাণ দিতে হবে না। মুশকিল হল, আমার এলাকায় সেরকম লোক নেই। অথচ একটা কেসও যদি না দিই, তাহলে প্রেস্টিজ থাকবে না। বড়সাহেব রেগে যাবেন। বুঝতে পারছেন আমার অবস্থা?'

দারোগা একটা বিড়ি ধরালেন। তারপর চোখ বন্ধ করে বললেন, 'আপনি বলেছিলেন গাছের সঙ্গে পলিটিক্স থাকলেও থাকতে পারে। যদি থাকে তাহলে ভবিষ্যতে সর্বনাশ হবে। তাই আমি ওকে মিসা আইনে সদরে চালান করে দিলাম। একটা কেস হয়ে গেল আমার।'

আঁতকে উঠলেন হরিহর, 'সে কি? আপনি ওকে সদরে পাঠিয়ে দিলেন? আমি আপনাকে কত করে বললাম, টাকা দিয়ে গেলাম, আমার কথা রাখলেন না?'

'টাকার কথা অত জোরে বলতে নেই। তাছাড়া অবস্থা পাল্টে গিয়েছে এখন। আপনি চলে যাওয়ার পরেই আমি এসব জানতে পারলাম। অন্য দারোগার অ্যাক্‌শন নেবার আগেই আমার অ্যাক্‌শন নেওয়া হয়ে গেল। প্রমোশনের সময় এইটেও কাজে লাগবে।' দারোগা ধোঁয়া ছাড়লেন।

হরিহর ঝুঁকে পড়লেন, 'দারোগাবাবু, ওকে আপনি ছাড়াবার ব্যবস্থা করুন। দয়া করে আমার কথা রাখুন। এর জন্যে আর কত দিতে হবে বলুন, আমি দেখছি।'

দ্রুত মাথা নাড়লেন দারোগাবাবু, 'অসম্ভব। একবার সদরে পাঠিয়ে দেওয়ার পর আমার আর কোন হাত নেই। এটা এমন একটা আইন, কবে ছাড়া পাবে কেউ বলতে পারে না। শ্রীনিবাস এখন দেশের পক্ষে অত্যন্ত বিপদজনক ব্যক্তি। মানে কাগজে-কলমে।'

'আপনি আমার মাথা খারাপ করে দিলেন। যারা স্লোগান দেয় তাদের ধরতে পারেননি?'

'পাগল! আজ নেই কিন্তু কাল হয়তো আসবে ক্ষমতায়। ওদের কেউ চটায়?'

'পাঁচশো দেব।' সোজা হয়ে বসলেন হরিহর।

দারোগা হাসলেন, 'আপনি মিসা ব্যাপারটা বুঝতেই পারলেন না। ওই আইনে যাকে ধরা হয় তাকে একমাত্র দেশের প্রধানমন্ত্রী ছাড়া কেউ ছাড়াতে পারে না। লক্ষ টাকা দিলেও নয়।'

হরিহরের মাথা খারাপ হবার উপক্রম হল, 'কবে ছাড়া পাবে ঠিক নেই?'

'না। সারাজীবন জেলে পচে মরতে পারে। ভালই হল, আপনাকে কেউ আর বিরক্ত করতে সাহস পাবে না।'

'আপনি, আপনি খুব অন্যায় করলেন দারোগাবাবু!' উত্তেজনায় কাঁপছিলেন হরিহর।

'কি বলতে চাইছেন?' দারোগা চোখ ছোট করলেন।

'আপনার সঙ্গে আমার অন্য কথা হয়েছিল। সে কারণে টাকা খরচ করেছিলাম আমি।'

হঠাৎ দারোগা উঠে দাঁড়ালেন, 'এ্যাই দেখুন, ফের যদি একই কথা ফ্যাচফ্যাচ করে বলেন, তাহলে আপনাকেই মিসা করে দেব। বুঝবেন মজা।'

হাঁ হয়ে গেলেন হরিহর। হঠাৎ একটা শিরশিরে ঠাণ্ডা স্রোত তাঁর মেরুদণ্ডকে জড়িয়ে ধরল। তিনি হাত তুললেন, 'ঠিক আছে। একটা অনুরোধ রাখবেন?'

'বলুন।'

'আমার সঙ্গে গাঁয়ের কয়েকজন আছেন। তাদের ডেকে আপনি খবরটা দিয়ে দেবেন?'

'বড্ড বেশী আবদার করেন আপনি। এসব কি মাংনামাংনি হয়?'

বিনা বাক্যব্যয়ে দশ টাকার নোট টেবিলে রাখলেন হরিহর। সেদিকে একবার তাকিয়ে ঠোঁট মোচড়ালেন দারোগা। তারপর বাঁ হাতে টাকাটাকে তুলে নিয়ে হাঁকলেন, 'কে আছিস, বাইরে নারাণপুরের যারা আছে তাদের ডেকে আন।'

দুহাতে মুখ ঢেকে বসেছিলেন হরিহর। অনুশোচনায় তাঁর বুক পুড়ে যাচ্ছিল। এ কি হল? এমনটা তো তিনি চাননি! শ্রীনিবাস যদি জানতে পারে, গাঁয়ের লোক যদি জানতে পারে, তাহলে কোনদিন ক্ষমা করবে না। তিনি চেয়েছিলেন ওকে উপলক্ষ করে সবাইকে একটু সমঝে দিতে। হঠাৎ দারোগার গলা কানে এল, 'আসুন। ওটা কি হাতে?'

'আজ্ঞে, রসগোল্লার ভাঁড়।' নগেনের গলা শুনলেন তিনি।

'দেখি এদিকে!' দারোগা হুকুম করলেন।

কিছুক্ষণ রসগোল্লা খাওয়ার শব্দ হল, 'শ্রীনিবাসকে সদরে পাঠিয়ে দিয়েছি। সে দেশের পক্ষে খুব বিপদজনক ব্যক্তি। মিসায় বন্দী হয়েছে সে। বুঝলেন?'

পীতাম্বরের গলা শোনা গেল, 'কিন্তু—'

'বাইরে থেকে বোঝা যায় না। তলায় তলায় ওর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল সেই দলের যারা এ দেশটাকে ধ্বংস করতে চায়। বুঝলেন?'

এবার নগেন বলল, 'কিন্তু ও তো কখনো—একবারই মাত্র শহরে গিয়েছিল!'

দারোগা হাসলেন, 'তখনই তো কাজটা করেছে। রিপোর্ট আছে।'

হরিহর এবার মুখ তুললেন, 'কিন্তু সে আমার সঙ্গে গিয়েছিল। সারাক্ষণ সঙ্গে ছিল।'

'সারাক্ষণ? মনে করে দেখুন! পেচ্ছাপ পায়খানা করতেও ছেড়ে যায়নি?'

একটু ভাবলেন হরিহর, 'ও হ্যাঁ, কিন্তু ও গিয়েছিল ওষুধ আনতে। কবিরাজ মশাই বলেছিলেন নিয়ে আসতে তাই গিয়েছিল। তাও ক'মিনিটের জন্যে।'

'ব্যাস, বোঝা গেল। তখনই ওদের সঙ্গে যোগাযোগ হয় যা আপনি জানেন না।'

হরিহর এবার নগেনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সর্বনাশ হয়ে গেল গো। আমাদের শ্রীনিবাস সারাজীবন জেলে পচে মরবে। কি হবে এখন?'

দারোগা বললেন, 'যান আপনারা। পলিটিক্স থেকে দূরে থাকুন বাঁচতে চাইলে।'

চার হতভম্ব মানুষ থানার সামনে এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। নগেন এবং ধীরেন বুঝতে পারছিল না কি করা উচিত। গ্রামে গিয়ে একথা বলবেই বা কি করে ?

হরিহরের চোখ দিয়ে জল গড়াল। সেটা দেখতে পেয়ে পীতাম্বর বলল, 'কর্মফল, বুঝলে ? কয়লা খেলে আঙরা তো হাগবেই। ছোঁড়া তলায় তলায় এই ছিল !'

নগেন ঝাঁকিয়ে উঠল, 'মিথ্যে কথা। ওকে আমি খুব ভাল জানি।'

হরিহর বললেন, 'দাঁড়াও তোমরা। আমি একটু কবিরাজ মশাই-এর কাছে যাব। শুনেছি শহরে ওঁর বেশ জানাশোনা আছে। যদি কোন সুরাহা করা যায় !'

'দারোগা যে বলল কেউ ছাড়াতে পারবে না ?' ধীরেন বলল।

'দেখি। যেতে হবে সেখানে।' হরিহর এগোলেন। পেছনে চলল বাকি কজন।

কবিরাজের বাড়ির সামনে ওরা দাঁড়াতেই তিনি ভেতরে ঢুকলেন। কবিরাজ নেই। দু-একবার ডাকাডাকি করতেই কবিরাজের মেয়ে বেরিয়ে এল, 'অ। বাবা তো নেই। আজ বিকেলে ফিরবে।'

'কবে গিয়েছেন তিনি ?' হরিহর জিজ্ঞাসা করলেন।

'গতকাল।'

'অ।' হরিহর মাথা নাড়লেন, 'তাঁকে বলো, আমি এসেছিলাম। ও হ্যাঁ, জনার্দন কি এসেছিল ?'

কবিরাজ মশাই-এর মেয়ে যেন আড়ষ্ট হল সামান্য। তারপর মাথা নাড়ল, 'না তো !'

হরিহর নিজেকে সামলে নিলেন, 'তা মা, একটা কথা বলি। জনার্দন ছেলে ভাল। দোকান খালি পড়ে থাকে, আর সে নেই এ কেমন কথা ? কবিরাজ মশাই তো তাকে হাত ধরে কাজ শিখিয়ে দিচ্ছেন ! যদি বল তো গাঁয়ে গিয়ে তাকে পাঠিয়ে দিই।'

'বাবা নেই সবাই জানে। কি ওষুধ দিতে কি দিয়ে দেবে সে —তারপর আর এক বিপত্তি। দরজা বন্ধ করে দিচ্ছি। আপনি কোন চিন্তা করবেন না।'

হরিহর আর দাঁড়ালেন না। দুঃসাহস তো কম নয় ! কবিরাজ মশাই নেই, অথচ এখানে সারারাত কাটিয়ে গেল ছোকরা ? সমাজ সংসার সব রসাতলে গেল ? ওই মেয়েটার শরীর ছাড়া তো আর কিছু নেই। চটক পর্যন্ত নেই চোখেমুখে। তাতেই ভুলে গেল ছোকরা ! না, একটু কড়কে দেওয়া দরকার। আগে শ্রীনিবাসের ব্যাপারটার একটা হিল্লে হোক, তারপর দেখা যাবে।

প্রায় চোরের মত ওঁরা গ্রামে ফিরলেন। তিনি মুখ খোলার আগেই সমস্ত গ্রাম যেন জেনে গেল খবরটা। আবার ভিড় এবং পীতাম্বর যা শুনেছিল তাই সাতকাহন করে শোনাতে লাগল। শ্রীনিবাসের দেখা এ জীবনে পাওয়া যাবে না। যাবজ্জীবন কারাবাস। সে শুধু গাছ চুরি করেনি, এই দেশের সর্বনাশ যারা করতে চায় তাদের সঙ্গেও হাত মিলিয়েছিল। দারোগাবাবু নিজের মুখে বলেছেন। এসব শুনে

বিস্ময়সূচক শব্দ ছিটকে উঠছিল বারংবার।

এখন গ্রামের প্রায় সব মানুষ হরিহরের মুখের দিকে তাকিয়ে। শহরের কোন কোন বড়মানুষকে তিনিই একমাত্র চেনেন। যদি শ্রীনিবাসের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছে তা সত্যি না হয়—। গুঞ্জন চলছিল। হঠাৎ একটা কান্নার শব্দে সবাই সচকিত হল। হরিহর দেখলেন, মাথায় ঘোমটা একটি শাড়ি জড়ানো শরীর ছুটে এসে আছড়ে পড়ল তাঁর পায়ের ওপর।

তিনি হাঁ-হাঁ করে উঠতেই সেই তরুণী ককিয়ে কেঁদে উঠল, 'ওকে বাঁচান। আমি জানি ও কোন দোষ করেনি। সারারাত ঘরে ছিল ও।'

পীতাম্বর নিচু গলায় বলল, 'শ্রীনিবাসের পরিবার।'

তরুণী তখনও কেঁদে যাচ্ছে, 'দিদি বলেছিল আপনি আমার বাবার মত, ওকে বাঁচান। আপনার পায়ে পড়ছি বাবা।'

শক্ত হয়ে গেলেন হরিহর। দিদি বলেছিল? ছবিরাণী এই কথা তার বোনকে বলে গিয়েছে?

॥ ১৬ ॥

কোনরকমে পা সরিয়ে নিলেন হরিহর। হাত বাড়াতে গিয়েও থেমে গেলেন, 'আচ্ছা, অমন করে কেঁদো না মেয়ে। শ্রীনিবাস তো আমার ছেলের মতনই। ছেলের বিপদে পাশে দাঁড়াবো না!'

'আমি জানি না।' কাঁদতে কাঁদতে বলে যাচ্ছিল মেয়েটা, 'তিনভুবনে আমার কেউ নেই, দিদি সংসার ছেড়ে ভৈরবী হয়ে গিয়েছে। নিজের মা বাবা নেই। যার হাতে দিদি দিয়েছিল সে আজ চলে গেল। আমার কি হবে গো? আপনি আমার বাবার মত, দিদি বলেছিল—এঁ এঁ এঁ।'

হরিহর বললেন, 'তোমার দিদি ঠিকই বলেছিলেন। তোমার কোন ভয় নেই। আমি যদ্দিন আছি তুমি নিশ্চিন্তে থাকবে। তোমার স্বামীকে ছাড়িয়ে আনতে আজই আমি সদরে যাব।'

হরিহরের এই ঘোষণায় সবাই খুব খুশী হল। যার টাকা আছে সে চেষ্টা করলে আজকাল কী না হয়। কিন্তু যদি আজই শ্রীনিবাসকে ছাড়ানো না যায় তাহলে ওর বউ কোথায় থাকবে? একা যুবতীকে থাকতে দেওয়া কি উচিত হবে? ক্রন্দনরত বধূটির সামনেই গুঞ্জন উঠল।

পীতাম্বর বলল, 'এ তো আর শুধু গাছচুরির কেস নয় যে টাকা দিলেই ছেড়ে দেবে। গতবছর শহরে গিয়ে সেই ছোকরা নিশ্চয়ই এমন কিছু করেছিল, বুঝতেই পারছ সবাই, সরকারের পেছনে লাগলে কি সরকার ছেড়ে দেবে?'

সঙ্গে সঙ্গে আলোচনা ঘুরে গেল অন্যখানে। শ্রীনিবাস কি করতে পারে? পার্টির লোকজন মিটিং করে যাওয়ার পর অনেকেই ওকে ইনকিলাব জিন্দাবাদ বলতে

শুনেছে। কিন্তু তার আগে ও কখনই এসব কথা বলত না। গেল বছর তেমন কোন কাণ্ড শহরে গিয়ে করলে এতদিন মুখ বন্ধ করে বসে থাকবে কেন? কেউ কেউ আবার এর মধ্যে হরিপুরের অবিনাশ কবিরাজের হাত দেখতে পেল। অনেকদিন থেকেই লোকটার ইচ্ছে ছিল মেয়ের সঙ্গে শ্রীনিবাসের বিয়ে দেয়। ইচ্ছে পূর্ণ হয়নি বলে মনে রাগ থাকা স্বাভাবিক। শহরে যাতায়াত আছে লোকটার। কোথায় কার কাছে চুকলি কেটে এসেছে হয়তো। কিন্তু হরিহর এক ধমকে এই গুঞ্জন থামিয়ে দিলেন। অবিনাশ কবিরাজ কখনও এসব কাজ করতে পারেন না। তাছাড়া ওঁর মেয়ের সঙ্গে জনার্দনের বিয়ে তিনি পাকা করে ফেলেছেন। গ্রামের মানুষের কাছে খবরটা দেখা গেল নতুনই। জনার্দন অবিনাশ কবিরাজের কাছে কাজ শিখতে যায় বলেই সবাই জানত। জনার্দনের এক কাকা দাঁড়িয়ে ছিল জটলার মধ্যে। শোনামাত্র সে চিৎকার করে উঠল, 'অ্যাঁ, কি বলছেন আপনি? আমরা কেউ জানলাম না, আর বিয়ে পাকা হয়ে গেল? এ কি কাণ্ড!'

নীলাম্বর জিজ্ঞাসা করল, 'কেন? জনার্দন তোমাদের বলেনি?'

'না তো! অবিনাশ কবিরাজ বিয়ে পাকা করার কে? এ্যাঁ, জনা কোথায়? ডাকো জনাকে!' জনার্দনের কাকা হৈ-চৈ বাধিয়ে দিলেন। লোক ছুটল জনার্দনের সন্ধানে।

হরিহর থামাতে চাইলেন এই গোলমাল, 'ঠিক আছে, এ বিষয় নিয়ে আলোচনার সময় এখন নয়। আগে শ্রীনিবাসের ব্যাপারটা চুকুক।'

'এ কি রকম কথা বলছেন আপনি?' জনার্দনের কাকা প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, 'আমাদের বংশের সুনাম, পূর্বপুরুষদের নাম সব ধুয়ে মুছে যাবে যে।'

'ঠিক আছে, তোমরা যা করার করো, আমি পরে শুনে নেব।' হরিহর শ্রীনিবাসের বউকে বললেন, ওঠো মা, বাড়িতে যাও। আমি দেখছি কি করা যায়।'

দু-তিনজন বয়স্কা মহিলা বউটিকে ধরে নিয়ে গেল। বেচারা একদম বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। পীতাম্বর জিজ্ঞাসা করল, 'শহরে কি এখনই যাওয়া হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। জানি না আজই ফিরতে পারব কিনা। সকাল থেকেই তো এই কাজ চলছে, কোন করার সময় পাইনি। স্নানাদি মাথায় উঠেছে—' হরিহর বাড়ির পথ ধরলেন।

পীতাম্বর বলল, 'এখন বেলা বেশী নেই, আমি বলি কি কাল সকালেই সদরে গেলে কাজ হবে।'

হরিহর দাঁড়িয়ে পড়লেন। কথাটা ঠিকই, এখন যথেষ্ট বেলা হয় গেছে। তৈরী হয়ে হরিপুরে যেতেই বিকেল গড়িয়ে যাবে। সদরে গিয়ে কাজের কাজ কিছুই হবে না। তার চেয়ে ভোর-ভোর বেরিয়ে পড়াই ভাল। শ্রীনিবাসের বউকে দেখে, ওর কান্না শুনে মনে হয়েছিল তখনই সদরে চলে যাওয়া উচিত। কিন্তু শুধু আবেগ নিয়ে এগোলে কোন লাভ হবে না।

পীতাম্বর বলল, 'আজ রাত্রে না হয় শ্রীনিবাসের বউকে কারো বাড়িতে রাখা যাবে, কিন্তু ওকে যদি না ছাড়ানো যায় তাহলে কি করা হবে সেটাই ভাবা দরকার।'

হরিহর বললেন, 'কারো বাড়িতে থাকার কি দরকার? মন্দিরে গিয়ে দিদির

কাছে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে। মন্দিরের পেছনের ঘরে দুজনের তো স্বচ্ছন্দে জায়গা হয়ে যাবে।'

পীতাম্বর বলল, 'ওইরকম ফাঁকা মাঠের মধ্যে অল্পবয়সী মেয়েটাকে রাখা উচিত হবে?'

হরিহর উষ্ণ হলেন, 'কি বলতে চাও? আমাদের ভৈরবী কি বৃদ্ধা? তিনি যদি একা থাকতে পারেন তাহলে নিজের বোনকে সঙ্গে রাখতে পারবেন না? ঠিক আছে, বিকেলে গিয়ে আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলব।' হরিহর আর দাঁড়ালেন না।

স্নানাহার সেরে হরিহর বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, এইসময় জনার্দন এল চোরের মত। বারান্দার নিচে দাঁড়িয়ে নিচু গলায় কোনমতে উচ্চারণ করল, 'জ্যাঠামশাই!'

হরিহর চোখ মেললেন। মাদুর পেতে শুয়েছিলেন। তিনি উঠে বসে বললেন, ,বলো।'

'জ্যাঠামশাই, আমার কি হবে!' জনার্দনের মুখ নামানো।

'কিসের কি হবে?'

'কাকাবাবু বলছেন ত্যাজ্যপুত্র করবেন।'

'ত্যাজ্যপুত্র? অবশ্য ভাইপো তো পুত্রের সমান।'

হঠাৎই ফুঁপিয়ে উঠল জনার্দন, 'আপনি বাঁচান জ্যাঠামশাই।'

'ওঁদের বক্তব্য কি?'

উত্তর দিতে গিয়েও পারল না জনার্দন। গলার স্বর জড়িয়ে গেল। হরিহর বেশ জোরে ধমক দিলেন, 'কি হচ্ছে, এ্যাঁ? তুমি কি সত্যি সত্যি পুরুষমানুষ নও? মেয়েদের মত কাঁদছ!'

জনার্দন নিজেকে সামলালো, 'আমাকে ওঁরা নিষেধ করছেন হরিপুরে যেতে।'

'বয়স্করা যদি যুক্তিযুক্ত কারণে নিষেধ করেন, তাহলে তোমাকে সেটা শুনতে হবে।'

'কিন্তু, কিন্তু আমি তো কথা দিয়ে ফেলেছি।'

'কি কথা?'

'আমি ওকে বিয়ে করব।'

হরিহর কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন কথা দিলে? জানি, যৌবনে মন চঞ্চল হয়। কিন্তু কবিরাজের মেয়ে তো মোটেই সুন্দরী নয়, তার কথাবার্তার মধ্যেও মিষ্টতা নেই। তাকে দেখে চঞ্চল কেন হলে?'

'আজ্ঞে—।'

'বল, খুলে বল।'

'আজ্ঞে প্রথমত, কথা না দিলে ওর বাবা আমাকে কবিরাজী শেখাতেন না। কবিরাজী আমার খুব ভাল লেগেছে। চটপট অনেক কিছু এর মধ্যেই শিখে ফেলেছি। কবিরাজ মশাইও বলছেন—আমার হবে। আমার তো অন্য কিছু হল না, কবিরাজী যদি হয় তাহলে বাকি জীবন ভালভাবে থাকতে পারব।' জনার্দন কথাগুলো বলে কাতর চোখে তাকাল।

'বুঝলাম। তিনি প্রতিশ্রুতি আদায় করে তোমাকে ছাত্র হিসেবে নিয়েছেন!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'শর্ত শোনার পর তুমি আমাকে ব্যাপারটা জানালে না কেন?'

'সময় পাইনি, মাথারও ঠিক ছিল না।'

'কি এমন রোজকার করছিলে যে সময় পাওনি?' বেশ জোরেই প্রশ্নটা করলেন হরিহর।

'আজ্ঞে—।' থেমে গেল জনার্দন।

'দ্বিতীয় কারণটি কি? প্রথমত বলে তুমি শুরু করেছিলে!'

জনার্দন জবাব দিতে পারছিল না। চোরের মত একবার তাকাল।

'তুমি ওই বাড়িতে রাত কাটাও। কবিরাজ মশাই যখন বাইরে যান তখনও থাকো, তাই না?'

হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল এবার জনার্দন, 'উনি হুকুম করেন বলে থাকি।'

'বাড়িতে কি বল?'

'বাড়িতে খবর পাঠাই, ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কলে যাচ্ছি।' কাঁদতে কাঁদতে জানাল জনার্দন।

'উনি হুকুম করেন কেন?'

'ওর মেয়ে একা থাকবে, দিনকাল খারাপ—তাই।'

'আগে কি করতেন? যখন তুমি ওখানে যাওনি?'

'তখন, তখন আমি জানি না।'

'যুবতী মেয়েকে তোমার মত অল্পবয়সীর দায়িত্বে কেউ রেখে যায়? বাজে বকছ!'

'না, না। সত্যি কথা।'

'আমি বিশ্বাস করি না।'

'আসলে, আসলে, ওঁর মেয়েই বলত।'

'মেয়ে বলত? কেন?'

'আমাদের, আমাদের, আমি বলতে পারব না, আপনি রাগ করবেন।'

'বলতে তো কিছু বাকি রাখোনি, আর লজ্জা কিসের?'

'আমাদের—।' থমকে গেল জনার্দন।

হরিহর তাকালেন, 'তোমাদের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক হয়েছে?'

শব্দ না করে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলে মুখ নিচু করল জনার্দন। হরিহর কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর শান্ত গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'একথা কাকাদের বলেছ?'

আঁতকে উঠল জনার্দন, 'না, না!'

'না বললে ওঁরা সমস্যাটা বুঝবেন কি করে?'

'আমাকে মেরে ফেলবে ওরা। এমনিতে ওরা বলছে দেখতে খারাপ, আমার চেয়ে নাকি বয়সে অনেক বড়।' বিড় বিড় করল জনার্দন।

মাথা নাড়লেন হরিহর, 'তোমার থেকে তো বড় হওয়া স্বাভাবিক।'

'তারপর দেনাপাওনার ব্যাপারে কথা হয়নি—অথচ বিয়ে ঠিক হয়ে গেল।'

'দেনাপাওনা? তোমাকে কত টাকায় বিক্রী করতে চায় ওরা?'

'দশহাজার টাকা নগদ, পাঁচভরি সোনা আর বউভাতের খরচ।'
'বাব্বা! তোমার এত দাম নাকি?'
'না। কিন্তু ওরা তাই বলল।'
'আমার কাছে এসেছ কেন? এত কথা আমাকে বলার কি দরকার ছিল?'
'আজ্ঞে আপনি আমাকে বাঁচান।'
'কেন? আমার কি দায় তোমাকে বাঁচাবো?'
জনার্দন মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। জবাব দিতে পারল না। হরিহর উঠলেন, ঘটি থেকে জল ঢেলে মুখে চোখে দিলেন, 'তোমার বন্ধু ওদিকে জেলে বসে আছে আর তুমি বিয়ের জন্যে এখানে দাঁড়িয়ে কেঁদে ভাসাচ্ছ!'
'তাহলে আমাকে তাই করে দিন!' জনার্দন উৎসাহিত হল যেন।
'কি করব?' অবাক হয়ে তাকালো হরিহর।
'শ্রীনিবাসের মত সারাজীবন যাতে জেলে থাকতে পারি।'
'চুপ করো।' থমকে উঠলেন হরিহর, 'মিসা কি তুমি জানো? একবার ভেতরে গেলে আর এই জীবনে আলোর মুখ দেখবে না। কাল তোমার বন্ধুকে ছাড়াতে যাব, জানি না কি হবে!'
'তবু তাই ভাল। বেঁচে থাকলে, মানে, বিয়ে না করে বেঁচে থাকলে ও আমাকে শেষ করে দেবে। প্রথম দিনেই বলেছে আজ থেকে সে আমার বউ, যদি পালাবার চেষ্টা করি তাহলে আমাকে ছেড়ে দেবে না। তাছাড়া—।' জনার্দন আবার থামল।
'ভাল, খুব ভাল। তাই জেলে বসে ওর হাত থেকে পালাতে চাইছ! তা— তাছাড়াটা কি?'
'আমি ওকে কথা দিয়েছি। জীবন দিয়েও কথা রাখতে হয়।'
এবার হেসে ফেললেন হরিহর, 'বাঃ! খুব ভাল। কথাটা কি আগেই দিয়েছিলে?'
'না, পরে।'
'স্ত্রী হিসেবে তাকে তোমার কেমন লেগেছে?'
'মুখ মিষ্টি নয়, কিন্তু—আপনাকে বলতে পারব না।'
'বলতে হবে না।'
'না জানেন, আমাকে সবাই মেয়ে-মেয়ে বলত। বন্ধুরা আমার মেয়েলি স্বভাব নিয়ে ঠাট্টা করত। কেউ কেউ আমায় মেয়ে মনে করে অন্যরকম কথা বলত। নাটকে মেয়ের পার্ট আমার বাঁধা ছিল। এমন কি গাঁয়ের মেয়ে-বউরাও আমাকে ছেলে ভেবে দূরে সরিয়ে রাখত না। আর এই সবের জন্যে আমিও নিজেকে ঠিকঠাক ব্যাটাছেলে বলে ভাবতে পারতাম না। ও আমার সেই মনের ভাবটাকে দূর করে দিয়েছে। আমি যে সত্যি সত্যি ব্যাটাছেলে সেটা প্রমাণ হয়েছে ওর জন্যে। আর যে মেয়েকে আমি গ্রহণ করেছি তাকে ছেড়ে গিয়ে অন্য মেয়েকে বিয়ে করতে পারব না।' বেশ জোরের সঙ্গে বলল জনার্দন।
হরিহর সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকালেন কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। গ্রামের অনেক মানুষই তাঁকে একা পেলে নিজের দুঃখকষ্টের কথা বলে। তারা জানে সেসব কথা হরিহর পাঁচকান করবেন না। কিন্তু এরকম কাণ্ড কখনও শোনেননি তিনি।

তবে ছোকরার মধ্যে সততা আছে। এখনও প্রতিজ্ঞা রাখতে বদ্ধপরিকর। মজা লুটে পালিয়ে আসার কথা চিন্তা করছে না।

জনার্দন ব্যাকুল গলায় বলল, 'জ্যাঠামশাই!'

'ঠিক আছে। কাল তুমি আমার সঙ্গে শহরে চল। জেলে যখন থাকতে আপত্তি নেই, তাহলে একটা চেষ্টা করি। শ্রীনিবাসের বউ আছে ঘরে—তাকে ছাড়িয়ে যদি বদলে তোমাকে রাখতে বলি তাহলে মনে হয় ওরা খুব একটা আপত্তি করবে না। তোমার তো এখনও বিয়ে হয়নি যে সংসার নষ্ট হয়ে যাবে। বন্ধুর বিরাট উপকার করবে তুমি।' হরিহর দরজার দিকে এগোলেন কথাগুলো বলে।

জনার্দন জিজ্ঞাসা করলে, 'কাল কখন রওনা হবেন?'

'কেন?'

'ইয়ে, যাওয়ার আগে ওকে জানিয়ে আসব। কোনদিন তো আর দেখা হবে না।'

জনার্দন গম্ভীর গলায় বলতেই হরিহর হেসে বললেন, 'ভোর-ভোর। তবে তোমাকে যেতে হবে না।'

'মানে?' হকচকিয়ে গল জনার্দন।

'যেতে হবে না। কবিরাজ মশাই-এর মেয়ের সঙ্গে তোমার যাতে বিবাহ হয় সেই চেষ্টা করব। তবে একটা কথা, কোন অবস্থাতেই বিয়ের আগে তুমি সেখানে রাত্রিবাস করবে না। যাও।'

জনার্দন চলে গেল। যাওয়ার সময় যেন তার পায়ে ছন্দ এল। হরিহর তাকিয়ে থাকলেন। আগুন কি রাত্রেই শুধু জ্বলে? দিনে জ্বলতে বাধা কোথায়? বলতে হয় বলে কথাগুলো তিনি বললেন। হঠাৎ এক শূন্যতাবোধ তাঁকে আক্রমণ করল। তাঁর নিজের জীবনটা ভিজে ন্যাতা হয়ে রইল চিরটাকালের জন্যে।

এখন বিকেল। পুকুরপাড়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন হরিহর। কেউ জানে না, হয়তো কোনদিন জানবে না। কিন্তু এখন বুকের ওপর ভীষণ চাপ আসবে। কাজটা করার আগে তাঁর ভাবা উচিত ছিল, পুলিশকে বিশ্বাস করতে নেই। নিজেদের স্বার্থের জন্যে তারা কোথায় যেতে পারে সেটা তাঁর আন্দাজ করা উচিত ছিল। শ্রীনিবাস ছেলে হিসেবে তো ভালই ছিল। পার্টির দাদাদের শোনানো বুলিগুলো কপচাতে গেল বলেই তাঁর মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল। তখন মনে হয়নি, ওকে একদিনের জন্যে থানায় পাঠালে শেষতক এমন অবস্থা হবে। ওর স্ত্রী আজ যখন কাঁদছিল তখনই নিজেকে পাষণ্ড বলে মনে হচ্ছিল তাঁর। কেন তিনি এমন একটা কাণ্ড করতে গেলেন? একটা সংসার ভেঙ্গে তছনছ হয়ে গেল তাঁর জন্যে! আগামীকাল সদরে গিয়ে কিভাবে ছোকরাকে ছাড়াবেন তা নিজেই জানেন না! এর জন্যে যদি ভালরকম খরচ করতে হয় তিনি করবেন—একেই বলে নিজের ফেলা থুতু নিজেই গেলা। বুদ্ধিসুদ্ধি আর কবে হবে!

হরিহর দেখলেন, পুকুরের জলে একটা বড় মাছ ঘাই মেরে গেল। যাক। হঠাৎ যদি তাঁর বুকের কল বন্ধ হয়ে যায় তাহলে এসবের কি হবে? ওই মাছটাকে খাবে কে? কেউ না। গ্রামের মানুষ চেটেপুটে সাবাড় করবে সব। এখনই একটা উইল

করা দরকার। উইলে কাকে দিয়ে যাবেন সব ? মাথা কাজ করছিল না হরিহরের। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল একটা কাজ করার কথা আছে। মন্দিরে যেতে হবে। এমাসের খরচার টাকাটা দেওয়া হয়নি এখনও। জগা পাগলার আমলে পাঠিয়ে দিতেন, এখনও তাঁর লোক গিয়ে দিয়ে আসে, কিন্তু আজ নিজেই যখন যাচ্ছেন তখন আর অন্যের হাত দিয়ে পাঠাবেন কেন !

মনের অস্বস্তিটা যাচ্ছিল না। কেবলই মনে হচ্ছিল কাউকে ব্যাপারটা বলা দরকার। জমিজমা রাখতে গেলে মাঝেমধ্যেই কিছু অন্যায় কর্ম করতে হয়। সেসবের বেলায় এমন বিবেকদংশন হয় না। কিন্তু শ্রীনিবাস! তবে এটা ঠিক, এই গ্রামে আর পার্টির দাদাদের কথায় কোন কাজ হবে না। আচ্ছা, কাজ হলে কি হত ? যে যা জমি চাষ করছে সে-ই জমির মালিক হয়ে গেলে কতটা অবস্থা ফিরত ? ধরা যাক তিনি নিজেই বলে দিলেন একথা। সরকারের কাছে গিয়ে লিখিয়ে দিয়ে এলেন প্রত্যেকের নামে নামে জমিগুলো। তারপর বীজধান সার থেকে শুরু করে নানান খরচা ওরা সামলাতে পারবে ? পার্বণী উৎসবগুলো পালন করতে পয়সা পাবে ? বেশীরভাগের ছেলেরা তো বড় হয়ে সদরে ছুটছে ! তাদের জমি চাষ করবে কে তখন ? এরাই লোক রাখবে ভাগে চাষ করে দিতে। সেই ভাগচাষী যখন বলবে চাষ করছি যখন জমি আমার, তুমি ভাগো, তখন এরা কোথায় যাবে ? হ্যাঁ, এখন জমির মালিক তিনি। নিজের নামে এত জমি রাখা যায় না বলে বেনামদার রেখেছেন। কিন্তু কেউ বলতে পারবে না গাঁয়ের কোন মানুষ না খেয়ে আছে, কারো গায়ে কাপড় নেই, ভাগের ফসল তিনি নিশ্চয়ই নেন কিন্তু সেটার বিরাট অংশ যে এদের প্রয়োজনে খরচ হয়ে যায় তা কেউ জানে না নাকি ? জানে। তবু লোভ। মালিক হব জমির। গজগজ করছিলেন হরিহর।

মাঠ ডিঙিয়ে মন্দিরে পৌঁছাতে সন্ধ্যে নেমে গেল। দূর থেকেই ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পেলেন। মন্দিরের সামনে পৌঁছে একটু তাজ্জব। এমন সময়েও এতদূরে প্রচুর মানুষ এসেছে আরতি দেখতে। তা সংখ্যায় জনাতিরিশেক হবেই। মহিলাও আছেন। মন্দিরের বারান্দায় সিঁড়িতে ছড়িয়ে বসিয়ে আছে তারা। সবাই নারাণপুরের নয়। কিছু অচেনামুখও আছে। ভিড়ের পেছনে দাঁড়িয়ে তিনি দেখলেন ছবিরাণী পঞ্চপ্রদীপ হাতে নিয়ে মায়ের সামনে দুলে দুলে আরতি করছে, ছবিরাণী নয়, ভৈরবী মা। পরণে রক্তবস্ত্র, চুল মুড়িয়ে কাটা।

আরতি শেষ হল। ধ্বনি উঠল। এখন প্রণাম করছে ভৈরবী মা, আর তাকে অনুসরণ করছে সবাই। প্রণাম শেষ হলে অনুরোধ শুরু হল। মা, আমার ছেলের এই, মা, আমার স্বামীর এই ! ভৈরবী মা চুপচাপ শুনে গেল সব। লোক যখন একটু ক্লান্ত হল তখন সে বলল, মা নিশ্চয়ই সবকথা শুনেছেন। তিনি তাঁর মত করে প্রতিবিধান করবেন। তোমরা এমন কাজ করো না যাতে মা কষ্ট পান। যাও, এখন বাড়ি যাও।

তবু কেউ কেউ নাছোড়বান্দা হল। ভৈরবী মা তাদের ধমকে থামিয়ে দিল। বলল, 'এখন মায়ের শোওয়ার সময়। তাঁর আসন তুলে দরজা বন্ধ করব আমি। নিয়মের ব্যতিক্রম হলে মহাপাপ হবে। যাও তোমরা।'

ভৈরবী মা দাঁড়িয়ে দুটো হাতের আঙ্গুলগুলো এমনভাবে নাড়ল যে হরিহর তাজ্জব হয়ে গেল। একেবারে নিজের সত্তা ভুলে না গেলে কেউ এইভাবে আঙ্গুল নাড়তে পারে না। মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ভৈরবী মা ভেতরে। বাইরে বেশ অন্ধকার নেমে গেলে লোকজন বাড়ির পথ ধরল। অন্ধকার বলেই হরিহরকে কেউ লক্ষ্য করেনি। দুতিনজন মানুষ তখনও দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ কুকুরের চিৎকার শুরু হতে তারা গুটি গুটি সরে পড়ল। হরিহর ওই কুকুরগুলোকে ভাল চেনেন। চিৎকার করতে করতে ছুটে এল তারা। এটা এক আশ্চর্য ব্যাপার। দিনের বেলায় অথবা সন্ধ্যা নামলেও ওরা চুপচাপ ঘুরে বেড়ায়। মানুষজন দেখে হাঙ্গামা বাধায় না। কিন্তু যেই রাত্রে মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে যায় অমনি ওদের আচরণ পাল্টে যায়। অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প চালু আছে ওদের নিয়ে। মানুষ, দুর্বল মানুষেরা সেই গল্প বিশ্বাস করতে চায়।

হরিহর জিভে শব্দ করতেই কুকুরগুলো দাঁড়িয়ে গেল কিন্তু চিৎকার থামাল না। কানের পর্দায় একনাগাড়ে হয়ে যাওয়া কর্কশ চিৎকার বেশিক্ষণ সহ্য করা মুশকিল। একটা ঢিল ওদের দিকে ছোঁড়ার বাসনা সংবরণ করলেন হরিহর। এখন চেনা লোক বলে ঝাঁপিয়ে পড়লে না। ছুঁড়লে সেই সংকোচ থাকবে না ওদের। মন্দিরের দরজা বন্ধ। আলো আসছে না বাইরে। হরিহর এগিয়ে গিয়ে মন্দিরের বারান্দায় বসতেই কুকুরগুলো চিৎকার করতে করতে কাছে চলে এল। ভাল খেতে পায় না এরা অথচ তেজ কত! জগা পাগলা আচ্ছা পাহারার ব্যবস্থা করে গেছে ছবিরাণীর জন্যে! কিন্তু মন্দিরের দরজা খুলবে কখন? মাকে ঘুম পাড়ানো হচ্ছে। ডাকাডাকি করলে হিতে বিপরীত হবে। তিনি দুহাতে কান পাতলেন। কিছুক্ষণ বাদে ভৈরবী মায়ের গলা ভেসে এল, 'কি হল রে? ডাকাত পড়ল নাকি? ওরে, এবার থাম তোরা।'

গলা কানে যেতে উৎসাহ বেড়ে গেল কুকুরগুলোর। এবার দরজা খুলল মায়ের ঘরের। এক হাতে হ্যারিকেন অন্যহাতে লাঠি নিয়ে ভৈরবী মা দর্শন দিলেন, 'কে? কে ওখানে বসে? রাত্রে মায়ের মন্দিরে থাকার নিয়ম নেই। ঘরে চলে যাও। যেতে দেখলে কুকুরগুলো কিছু বলবে না।'

পাশে আলো, পেছনে আলো, ভৈরবী মাকে অদ্ভুত অতিপ্রাকৃত দেখাচ্ছিল। হরিহর উঠে দাঁড়ালেন। গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন, 'আমি হরিহর।'

'ও।' সঙ্গে সঙ্গে লণ্ঠন নেমে গেল নিচে।

'এসময়ে আসা অনুচিত হয়েছে। আসলে আজ সারাদিন ধরে এত ঝামেলা গিয়েছে। কুকুরদের একটু চুপ করানো কি সম্ভব?' হরিহর কানে হাত দিলেন।

ভৈরবী এগিয়ে গেল একধারে, 'এ্যাই! যা—যা তোরা, পালা এখান থেকে।'

সঙ্গে সঙ্গে গলার আওয়াজ পাল্টে গেল। কুঁই কুঁই করতে করতে ওরা চলে গেল অন্ধকারে। হরিহর বললেন, 'এই টাকাটা রাখো। মন্দিরের খরচ।' তিনি দশটাকার কয়েকটা নোট মেঝেতে রাখলেন।

ভৈরবী মা বলল, 'ব্যাপারটা নিয়ে আমিই কথা বলব ভাবছিলাম। এখানে যেসব ভক্ত আসে তারাই এত ফলমূল চালডাল কাপড় দিয়ে যায় যে আমাকে কিছুই

কিনতে হয় না। খামোকা টাকা নিয়ে লাভ কি! এ টাকা আপনি নিয়ে যান।'

হরিহর অবাক। জগা পাগলা আধপাগলা হলেও দোকানপাট করত ওই টাকায়। তিনি বললেন, 'চাল ডাল ফল পাওয়া যায় মানছি, কিন্তু নুন মশলা নিশ্চয়ই তারা দেয় না!'

'আমি এখন সেদ্ধ ছাড়া খাই না। একটু নুন পেলে অনেকদিন চলে যায়।'

'কিন্তু আমার পিতৃদেব এই মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই সেবার ব্যবস্থা করেছেন, প্রতিদিনের ভোগের একটা না একটা আমাদের অর্থে হবে এটাই বাসনা ছিল।'

'ঠিক আছে। রোজ ভোরে কিছু তৈরী করে পাঠিয়ে দেবেন।'

'তুমি সব জানো—আমার ঘরে কেউ নেই যে এ কাজ করতে পারে। যাক, এ নিয়ে আমি কথা বলতে চাই না। টাকা যেমন মন্দিরের জন্যে দেওয়া হত তেমনই দেওয়া হবে। কিভাবে সেটা খরচ করবে তা তোমার ইচ্ছের ওপর নির্ভর করছে। আমি এসেছি অন্য গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে।'

'শ্রীনিবাসের ব্যাপারে যে আপনি আসবেন তা আমি জানতাম।'

হরিহর বললেন, 'খবরটা তাহলে তোমার কাছে পৌঁছেছে!'

'দূরত্ব তো বেশি নয়।'

'তা নয়। তোমার বোন এসেছিল?'

'না, পৌঁছে দেবার লোকের অভাব হয় না এদেশে। তার ওপর খবরটা খারাপ হলে কথাই নেই।'

'তুমি কি বিশ্বাস করো শ্রীনিবাসকে পুলিশ অন্যায় করে ধরেছে?'

'শ্রীনিবাস ওসব করতে পারে না। কেউ সাজিয়েছে।'

'কে?'

'আমি জানব কি করে?'

'তোমার সঙ্গে মায়ের এখন সম্পর্ক নিবিড়। তিনি জানতে পারেন।'

'মা আমার কাছে আত্মশক্তি। ওঁর দিকে তাকালে মনের জোর বাড়ে। অন্য কোন বুজরুকিতে আমি বিশ্বাস করি না। কেন, আপনি জানেন না?'

'আমি? হ্যাঁ জানি। কিন্তু প্রকাশের সময় এটা নয়। আগামীকাল তাকে ছাড়াতে যাব সদরে। যদি সক্ষম হই তো ভাল, নইলে বিনাদোষে শাস্তি পাবে সে। এখন কথা হল, তার স্ত্রী, তোমার বোনের কি ব্যবস্থা হবে? যুবতী মেয়ের একা থাকা ঠিক নয়।' হরিহর তাকালেন। কিছুটা দূরে দাঁড়ানো ভৈরবী মা কোন কথা বলল না।

হরিহর বললেন, 'এখানে তুমি একা থাকো। তোমার বোনকে যদি এখানে—।'

কথা শেষ হল না হরিহরের, তার আগেই ভৈরবী মা চেঁচিয়ে বলল, 'না।' তারপর নিচু গলায় বলল, 'আমি জানতাম এ কথাই বলবেন আপনি। সংসার ছেড়ে এই জীবনযাপন করছি আমি কি কারণে তা আপনার অজানা নেই। এখন আমি ঠিক আছি। সন্ন্যাসিনী হবার যোগ্যতা নেই কিন্তু সংসারীও নই। পায়ে শেকল নেই তাই ইচ্ছে হলে যেদিকে দুচোখ যায় চলে যেতে পারি। কিন্তু বোনকে যদি

আমার ওপর চাপিয়ে দেন, তাহলে তো আবার সংসারেই ঢুকে যাওয়া হবে। তার অসুখ হলে দেখতে হবে, কেউ তাকে বিরক্ত করতে এলে রক্ষা করতে হবে। তাছাড়া প্রতিমুহূর্তে সে নিঃশ্বাস ফেলবে তার স্বামীর জন্যে, তখনই মনে হবে পুরনো কথা। ওসব আমি ভুলে যেতে চাই।'

'তাহলে কি করব ওর ব্যাপারে?'

'শ্রীনিবাস কি জেল থেকে ছাড়া পাবে না?'

'কালকে না পেলেও একদিন তো পাবে।'

'সে কি চাইছে?'

'তার এখন শোকাবস্থা। কাঁদতে কাঁদতে আমায় বলল, রক্ষা করুন। তুমি নাকি তাকে বলে গেছ আমি তার বাবার মত। বলেছ একথা?' হরিহর তাকালেন।

'হ্যাঁ, বলেছি। ও আমার অনেক ছোট। মা চলে যাওয়ার পরে আমিই মায়ের ভূমিকা নিয়েছিলাম। আমি যদি ওই কথা বলে আসি তাহলে খুব ভুল বলেছি কি?'

'না, বল নি।' হঠাৎ আবার এক নতুন আবেগে আক্রান্ত হলেন হরিহর, 'ছবিরাণী, তুমি—তুমি যদি রাজী থাকো তাহলে আমি শাস্ত্রমতে তোমাকে বিবাহ করতে রাজি আছি।'

আচমকা সশব্দে হেসে উঠল ভৈরবী মা। মাথায় হাত দিয়ে বলল, 'এই চুলে ঘোমটা পরব? পাগল! তাছাড়া শাস্ত্রমতে আমি এখনও বিবাহিতা। সধবার দুই স্বামী সম্ভব?'

'শিবরাম হয়তো বেঁচে নেই।'

'হয়তো!'

'বেঁচে থাকলে সে নিশ্চয়ই যোগাযোগ করত।'

'বেশ। ধরে নিলাম সে বেঁচে নেই। কিন্তু আপনার সংসারে গিয়ে আমি কি দেব? আমার শরীরে এখন অনেক রোগ, বাইরে থেকে বোঝা যায় না। আপনি নিঃসন্তান। ওখানে গেলে আমি এতগুলো গ্রামের মানুষের মুখে মা ডাক শোনা থেকে বঞ্চিত হব। তাই না?'

'ভবিষ্যতের কথা কে বলতে পারে!'

'ঠিক আছে। আমায় একটু চিন্তা করতে সময় দিন। এই ভৈরবীর ভূমিকায় অভিনয় করতেও তো আমি পাচ্ছি না। ভক্তরা চায় আমি তাদের রোগ ভাল করে দিই, তাদের ম্যাজিক দেখাই, আমি যে নিজেই ওসব বিশ্বাস করি না তা কি করে বোঝাই। এ এক যন্ত্রণা। শুধু মা ডাক শোনার লোভে পড়ে আছি এখানে।'

'ঠিক আছে। তুমি চিন্তা করো। তোমার বোনের ব্যাপারে কি করব?'

'ওকে আপনার কাছে রেখে দিন। আপনার মেয়ের মত থাকবে।'

'আমার বাড়িতে অন্য মেয়েমানুষ নেই। সে যুবতী।'

'কন্যা যুবতী হলে বুঝি পিতা তাকে ত্যাগ করে?'

'বেশ। আগামী কাল আমি গ্রামে থাকব না, তাকে তোমার কাছে আসতে বলব, কিছু প্রতিবেশীকে সঙ্গে নিয়ে। তোমার বক্তব্য ওদের বলো। আমি আদেশ

পালন করব।'

'আদেশ বলছেন কেন? আপনি ভাল মানুষ বলেই একটা মেয়ের এমন দায়িত্ব নিচ্ছেন। আমি জানি ও আপনার কাছে নিরাপদে থাকবে।'

হরিহর সিঁড়ির দিকে এগোলেন। একটু ভাবলেন। শ্রীনিবাসের ব্যাপারে তাঁর যে ভূমিকা ছিল সেটা বলার জন্যে উশখুশ করলেন। কিন্তু সাহস পাচ্ছিলেন না।

'আপনি কিছু বলবেন?'

'এঁ্যা! না। মানে, আচ্ছা ছবিরাণী, যদি কখনও জানতে পারো আমি খুব বড় একটা অন্যায় করেছি কিন্তু সেটা করার আগে বুঝতে পারিনি পরিণাম এমন হবে, তাহলে?'

'আপনি যদি প্রায়শ্চিত্ত করেন তাহলে আর কি বলার আছে!'

'প্রায়শ্চিত্ত? ঠিক আছে। আমি তাহলে আসছি।'

হরিহর অন্ধকার মাঠে নেমে পড়লেন। হঠাৎ তাঁর মন বেশ হালকা হয়ে গেল। হ্যাঁ, প্রায়শ্চিত্ত তিনি করবেনই। যেমন করেই হোক। শ্রীনিবাসের বউ-এর গায়ে তিনি বেঁচে থাকতে কোন আঁচড় লাগতে দেবেন না। ওকে কাল যদি ছাড়াতে পারেন, তাহলে ওর জমির ফসলের ভাগ এ জীবনে নেবেন না। হঠাৎ হরিহরের মনে হল, কেউ যেন তাঁকে দেখে সাঁ সাঁ করে পাশ কাটিয়ে মন্দিরের দিকে চলে গেল। অন্ধকারে মুখ দেখতে পেলেন না তিনি, কিন্তু হাঁটাটা বেশ চেনা মনে হচ্ছিল। যাক গে, ছবিরাণীকে পাহারা দেবার জন্য কুকুর আছে—যতদিন সে মন্দিরে থাকবে।

॥ ১৭ ॥

ভোর-ভোর রওনা হলেন হরিহর। তখনও আকাশে মেঘ মোষের মত হাঁসফাঁস করছে। জল ঢেলেছে মাঝ-রাত পর্যন্ত। গ্রামের রাস্তাঘাট চপচপে। এখন বৃষ্টি নেই কিন্তু রোদও নেই। গরুরগাড়ি ছাড়া এই অবস্থায় হরিপুরে যাওয়া মানে কাদায় ভূত হয়ে পৌঁছাতে হবে। বগলে ছাতি, হাতে কাপড়ের ব্যাগ নিয়ে হরিহর বাড়ির সামনে দাঁড়ালেন। তাঁর পরনে লংক্লথের সাদা পাঞ্জাবি, ধুতি হাঁটু পর্যন্ত তুলে পরা, পায়ে রবারের পাম্পসু। গতরাত্রে পাঁচজনকে ডেকে শহরে যাওয়ার সময় সঙ্গী হতে বলেছিলেন তিনি। সকালে যে উত্তেজনা ছিল, এক বেলা যেতে না যেতেই তা থিতিয়ে গেছে। শ্রীনিবাসের জন্যে সবাই দুঃখ পেয়েছে কিন্তু ইতিমধ্যে কাজও পড়ে গেছে প্রত্যেকের। একমাত্র অনন্ত আগবাড়িয়ে সঙ্গী হতে চেয়েছে। গতরাত্রে যথারীতি মদ খেয়েছিল অনন্ত। তার কথায় কেউ কান দেয়নি। নেশার ঝোঁকে সে শ্রীনিবাসের জন্যে অনেক দুঃখ করেছিল। অতএব হরিহর ঠিক করেছিলেন তিনি একাই রওনা হবেন। বিবেকের কামড় ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠছিল তাঁর কাছে। কি করতে গেলেন আর কি হয়ে গেল! ভেবেছিলেন ছোকরাকে যদি দারোগাবাবু সামান্য রগড়ে দেয়, তাহলে গাঁয়ে

ওইসব ইনকিলাবি চিৎকার বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু একেবারে সারাজীবনের জন্যে জেলে পচবে জানলে কখনই নালিশ জানাতে যেতেন না। তার ওপর যদি থানা থেকে কথাটা বেরিয়ে আসে, গাঁয়ের লোক জানতে পারে, তাহলে মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না। তার আগে শ্রীনিবাসকে ছাড়াবার শেষ চেষ্টা করবেন। ওর বউটা গতরাত্রে বাড়ি ছেড়ে নড়েনি। ফলে গাঁয়ের দুজন মহিলা ওর সঙ্গে রাত কাটিয়েছে। একটা দুটো রাত এমন করা সম্ভব, কিন্তু—

গরুরগাড়ির জন্যে অপেক্ষা করছিলেন হরিহর। কাজের লোককে পাঠিয়েছেন গাড়োয়ানকে খবর দিতে। সাতটার বাস হরিপুর থেকে ধরলে একটু তাড়াতাড়ি শহরে পৌঁছানো যায়। বুকপকেট থেকে ঘড়ি বের করে সময় দেখে চঞ্চল হলেন। এইসময় গাড়োয়ান গাড়ি নিয়ে এল। সাবধানে পেছনে উঠে বসে হরিহর হুকুম করলেন, 'তাড়াতাড়ি চালা বংশী, বাস ধরতে হবে।'

'আর তাড়াতাড়ি! হাঁটু পর্যন্ত কাদা। শালার সরকার আছে কেন তাই বুঝতে পারি না। জন্মইস্তক দেখে আসছি, বর্ষায় রাস্তা বলে কিছু থাকে না। হেই হেট্ হেট্।' বংশী তার গরুদের ছোটাতে চেষ্টা করল। গ্রামের মাঝখানে তবু একরকম, বাইরে বেরুলে কাদায় ডোবা বানমাছের কাছেও হার মানতে হবে।

বসার জন্যে মোটা চট পেতে রেখেছিল বংশী। জুতো খুলে পাশে রেখে আরাম করে বসলেন হরিহর। তাঁর সামনে গ্রামটা সরে সরে যাচ্ছে। এই গ্রামকে তিনি সত্যি খুব ভালবাসেন। মনে হয় এই কথাটাই গ্রামের মানুষ আজকাল ঠিকঠাক বোঝে না। চোখ বন্ধ করলেন তিনি। অন্ধকারে ছবিরাণীর মুখ ভেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বুকের হাড়ে টনটনানি। এ জীবনে তিনি ছবিরাণীকে পাবেন না। যে সময় পেতে পারতেন সে সময় সাহস আনতে পারেননি মনে। পাঁচজনকে ডেকে বলতে পারেননি, যার স্বামী বারো বছর নেই সে বিধবা। তাকে আমি স্ত্রীর মর্যাদা দেব। ইচ্ছে থাকলেও সংস্কার প্রবল হয়ে দাঁড়িয়েছিল তখন। আর এখন তো সে সত্যিকারের ভৈরবী হয়ে গিয়েছে। অভিনয় করতে করতেই মানুষ একসময় সেটাকেই সত্যি করে ফেলে।

'আরে বাবা, দাঁড়া দাঁড়া। শালা দুচোখ আকাশে তুলে দৌড়াচ্ছে। আমি যে ভোর থেকে এখানে দাঁড়িয়ে তা কি দৌড়ানো দেখব বলে? হাঁদারাম!' চিৎকারটা ভেসে আসতেই বংশী গাড়ি থামাল। হরিহর একটু অবাক হয়ে ঝুঁকে দেখলেন, কাদা বাঁচিয়ে বকের মত পা ফেলে অনন্ত এগিয়ে আসছে। তার বগলে জুতোজোড়া চেপে ধরা। পরনে পাজামা পাঞ্জাবি। পাজামা হাঁটু পর্যন্ত গোটানো। গাড়ির পেছনে এসে অনন্ত হাসল তার তোবড়ানো মুখে, 'সরে বসো।'

'তুমি?' বেশ অবাক হয়ে গেছেন হরিহর।

'বাঃ! কাল বললাম না, আমি সঙ্গে যাব! সময়টা ঠিক করিনি, তাই রাত থেকে দাঁড়িয়ে আছি।' পাশ কাটিয়ে উঠে বসে জুতোজোড়া সন্তর্পণে রাখল অনন্ত।

গাড়ি চলতে শুরু করলে হরিহর বললেন, 'আমি ভেবেছিলাম তুমি নেশার ঝোঁকে যেতে চেয়েছ।'

অনন্ত হাসল, 'এটাই সুবিধে। লোকে তাই ভাবে। পরে কথা না রাখলেও কৈফিয়ৎ দিতে হয় না তাই। কিন্তু তোমার ক্ষেত্রে তা করতে পারি না। একা একা শহরে যাবে কি? তাছাড়া নিজের প্রয়োজনে যাচ্ছ না। গাঁয়ের মানুষ চাইলে তাই যাচ্ছ। বিড়ি খাবে?'

'নাঃ।' হরিহর মুখ ফেরালেন।

অনন্তটাকে এখন ভদ্র দেখাচ্ছে। পরিষ্কার জামাকাপড় পরেছে। তাঁর বাল্যবন্ধু। একসময় কি ডানপিটে অথচ পরোপকারী ছেলে ছিল। কাজকর্ম কিছুই করল না। মদ খেয়ে খেয়ে নিজেকে একজন নামকরা মাতাল করে ফেলল। অনেকবার বলেছেন হরিহর মদ খাওয়া বন্ধ করতে। কিন্তু অনন্তর যুক্তিটা অদ্ভুত—শোন হরিহর, তোমাকে পাঁচজনে চেনে কেন? না তোমার টাকা আছে, জমিজমা আছে, লোকের উপকার করো, তাই। গাঁয়ে তো প্রচুর লোক থাকে। গাঁয়ের বাইরে তাদের নাম কেউ জানে? হরিপুরে গিয়েই না হয় জিজ্ঞাসা কর, ভাই, খগেন কোথায় থাকে? সঙ্গে সঙ্গে জবাব পাবে, কোন্ খগেন? কেউ চিনবে না। কিন্তু যদি বল অনন্ত মাতালকে চেনো? সবাই চট করে মাথা কাৎ করবে, চিনি না আবার! নারাণপুরের অনন্ত তো! হে হে, এই মাল খাই বলেই তো পাঁচজনে চেনে আমাকে। গাঁয়ের নামটাও প্রচার হয়।' এর পরে আর যুক্তি দিয়ে কথা বলার কোনো মানে হয় না। লোকটা মদ খেয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছে যারা বলে তাদের সঙ্গে তিনি একমত, কিন্তু লোকটা শব্দটিতে তাঁর অস্বস্তি হয়। অনন্ত তাঁর ন্যাংটো বয়সের বন্ধু ছিল। তাকে লোকটা বলে ভাবতে কষ্ট হয়। একসময় গাঁয়ের অনেকেই চেয়েছিল ওকে তাড়িয়ে দিতে। হরিহর আপত্তি করেছিলেন। অনন্ত মদ খায় বটে কিন্তু কারো কোন অনিষ্ট করে না। মেয়েবউদের অসম্মান করে না। একথা তো অস্বীকার করা যাবে না।

কাদায় গাড়ির চাকা আটকে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে বংশীকে নামতে হচ্ছে ঠেলার জন্যে। হরিহর জিজ্ঞাসা করলেন, 'অনন্ত, আজ কি করবে? আমার সঙ্গে থাকলে মদ খাওয়া চলবে না।'

অনন্ত হাসল, 'তাই তো গতরাত্রে পেটপুরে খেয়ে নিলাম।

'আশ্চর্য!'

'আশ্চর্যের কিছু নেই হরি। যার যা খাবার।'

'কিন্তু তোমার মতলবটা কি? হঠাৎ সঙ্গে যাচ্ছ?'

'মতলব একটা আছে হরি। খুলে বলি তাহলে? আমার কাছে কিছু লুকোছাপা নেই। অনেকদিন শহরে যাইনি। বাসভাড়া যা তা দিয়ে পেটপুরে মদ খাওয়া যায়। বছর আটেক আগে একবার গিয়েছিলাম। সেখানে একজনকে কথা দিয়েছিলাম।'

'কি কথা?'

'সেটা বলা যাবে না ভাই। একেবারে গোপন ব্যাপার।' অনন্ত ভাঙা মুখে হাসল।

'তাহলে তুমি আমার কাছছাড়া হচ্ছ?'

'আধ ঘণ্টা। মাইরি বলছি, আধ ঘণ্টায় যাব আর ফিরে আসব।'

হরিহর আর কথা বললেন না। তাঁর মনে হল অনন্ত সঙ্গে যাওয়ায় ভালই হয়েছে। একেবারে মুখ বন্ধ করে থাকতে হবে না। দুপুরের মধ্যে যদি শ্রীনিবাসকে ছাড়ানো যায় তো সন্ধ্যে-সন্ধ্যে হরিপুরে ফিরে আসবেন। ওর বউটাকে আজ রাত্রে আর একা থাকতে হবে না।

হরিপুরের বাসস্ট্যান্ডে পেঁছাতেই গরুদুটো নাজেহাল হয়ে গেল। গাড়ি থেকে নেমে হরিহর বংশীকে বললেন, 'দুটো টাকা রাখো। এখানেই দিনটা কাটাও। শেষ বাস পর্যন্ত অপেক্ষা করে তারপর গ্রামে ফিরে যেও। বুঝতে পারলে কথাগুলো?'

বংশী ঘাড় চুলকালো, 'সঙ্গে তো পয়সা নেই, দুটো টাকায় দিন কাটানো যাবে?'

হরিহর আরও দুটো টাকা বের করে কি ভেবে শেষ পর্যন্ত পাঁচটা টাকাই দিলেন। অনন্ত জুলজুল করে টাকাগুলো দেখছিল। এবার বলে উঠল, 'ঝোপ বুঝে কোপ মারলি বংশী!'

বংশী বলল, 'এ আবার কি কথা? সারাদিনের খাওয়া আছে না? আমি একা নাকি? এ দুটোকেও তো খাওয়াতে হবে! তুমি যখন নেশায় থাকো তখন ভাল মানুষ, বুঝলে?'

বাসের দেরি আছে। প্রথম বাস ছেড়ে গেছে। শহর থেকে যেটি আসছে সেটিই আবার ঘুরে যাবে। তার মানে শহরে পেঁছাতে সকাল পার হয়ে যাবে। হরিহর অনন্তকে নিয়ে চায়ের দোকানের সামনে পোঁতা বেঞ্চিতে বসলেন। অনন্তই চায়ের সঙ্গে বিস্কুটের হুকুম করল। এই সময় অবিনাশ কবিরাজকে দেখতে পেলেন হরিহর। হাতে ব্যাগ নিয়ে ফিরছেন। হরিহর উঠে হাত নাড়তেই অবিনাশ এগিয়ে এলেন, 'আরে! এখানে কেন?'

'শহরে যাচ্ছি।'

'কাল আপনি আমাদের বাড়িতে গিয়েছিলেন শুনলাম!'

'হ্যাঁ।'

'কোন প্রয়োজন ছিল?'

একটু ইতস্তত করলেন হরিহর, 'দুটো কারণ ছিল। আমাদের গাঁয়ের শ্রীনিবাসকে পুলিস সদরে চালান দিয়েছে। তাকে ছাড়াতেই যাচ্ছি। আপনার পরিচিত কেউ যদি সেখানে থাকে—!'

'শ্রীনিবাস? ও, সেই ছোকরা! না, না। আমার কেউ নেই হরিহরবাবু।'

দ্রুত মুখ নাড়তে লাগলেন অবিনাশ কবিরাজ। হরিহর বুঝলেন শ্রীনিবাসের নাম শুনেই সহযোগিতা করবেন না অবিনাশ। তিনি মেনে নিলেন। প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব পছন্দ অপছন্দ থাকে। এ-ব্যাপারে কথা বলে কোন লাভ নেই। তিনি বললেন, 'ও। দ্বিতীয় ব্যাপারটা হল, আমাদের জনার্দনের সঙ্গে যদি আপনি মেয়ের বিয়ের দিনটা পাকা করেন তাহলে খুব ভাল হয়।'

'দিন পাকা? আমি তো এ ব্যাপারে কিছুই ভাবিনি!'

'ভাবেননি? ছেলেটি আপনার কাছে শিক্ষানবিসী করছে!'

'তা করছে। কিন্তু ছাত্রকে জামাই করব কিনা ভাবতে হবে না ?'

হরিহর তল পাচ্ছিলেন না। তিনি জানতেন কবিরাজ মশাই-এর সম্মতিতেই জনার্দনের সঙ্গে ওঁর মেয়ের সম্পর্ক গড়ে উঠছে। জনার্দন তাঁকে মিথ্যে কথা বলবে ভাবতে পারছেন না। তিনি বললেন, 'তাহলে এখনই আপনার ভাবা শেষ করা দরকার কবিরাজমশাই। পাঁচজনে পাঁচকথা বলতে শুরু করেছে।'

'তাই নাকি ? কী বলছে ?'

'ওই যা বলে, জনার্দনের সঙ্গে আপনার কন্যার অন্তরঙ্গতা তৈরি হয়েছে।'

অবিনাশ হাসলেন, 'মানবচরিত্র তো আপনি জানেন। যারা এসব বলে বেড়ায়, তারাই আবার সেই মুখ হাঁ করে আমার তৈরি পাঁচন খেতে আসে। তবে যখন বলছেন, ভেবে দেখব। ছেলেটি কেমন ?'

'ভাল। বেশ ভাল।'

'স্বভাব বড্ড মেয়েলি।'

'তা একটু। তবে মেয়ের যদি সেটা পছন্দ হয়, তাহলে তো আপত্তির কিছু নেই।'

'হুঁ। জনার্দনের বাড়ির লোকের শুনেছি প্রচণ্ড খাঁই। ছেলে তো ওই। কোন গুণ নেই। আমি যদি শিখিয়ে-পড়িয়ে দিই, তাহলে দুটো পয়সা রোজগার করলেও করতে পারে। অথচ তার আত্মীয়স্বজন মনে করে হীরের টুকরো। এটা চাই, ওটা চাই। আরে, আমি মরলে তো সবই ওরা পাবে। এখন চাই চাই করে আমার মাথা বিগড়ে দেওয়ার কোন মানে আছে ?'

'সেরকম হলে বিয়ে দেবেন না। আর জনার্দনকেও যেতে নিষেধ করুন। আপনি না বলতে পারলে আমি বলব।' হরিহর জানিয়ে দিলেন।

অবিনাশ ঘুরে দাঁড়ানো অনন্তর দিকে একবার তাকিয়ে নিলেন। তারপর চাপা গলায় বললেন, 'ও কাজটা একদম করবেন না। আমি এতক্ষণ আপনার কাছে ভাঙছিলাম না। বিয়ে আমাকে জনার্দনের সঙ্গেই দিতে হবে কিন্তু দিতেথুতে পারব না বলেই না-না করছি।'

'বিয়ে দিতে হবেই কেন ? দেবেন না সাধ্য না থাকলে !'

'সাধ্য যে একেবারে নেই তা তো নয়। কিন্তু দিয়ে হাত খালি করে বসে থাকলে ভবিষ্যতে কি হবে ? মেয়েকে তো জানি। শ্বশুরবাড়িতে বেশীদিন ঘর করতে পারবে বলে মনে হয় না। ধরুন, সে চলে এল কিন্তু জনার্দন এল না। তখন ? জিনিসপত্র গেল, জামাইও হারালাম।'

'তা এ ঘটনা তো যে কোন জায়গায় বিয়ে দিলে ঘটতে পারে।'

'পারে বলেই তো ঘরজামাই খুঁজছি। একেবারে ছেলের মত থাকবে। জনার্দন তিন পোয়া রাস্তা এগিয়ে এসেছে। আর এক পোয়া এলেই মনস্থির করে ফেলব। আরে, মতীশ রায় না ?' অবিনাশ কবিরাজের কথা শুনে হরিহর তাকালেন বাঁদিকে। মতীশ রায়কে তিনি আগে কয়েকবার দেখেছেন কিন্তু পরিচয় হয়নি। লোকটা শুধু মাতালই নয়, লম্পটও।

মতীশ রায় হাত জোড় করল—'নমস্কার কবিরাজ মশাই।'

'নমস্কার। শরীর কেমন?'

'আপনার ওষুধে কাজ হচ্ছে। শহরে যাচ্ছি।'

'একটু পানভোজন কমান। নইলে ওষুধের গুণ থাকবে না।'

মতীশ রায় হাসল। অনন্ত দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ। মতীশকে দেখে পিছু হেঁটে খানিকটা দূরে চলে গেল। অবিনাশ বললেন, 'এঁর সঙ্গে আলাপ আছে? ইনি হরিহর রায়। নারাণপুরের জমিদার।'

হরিহর তৎক্ষণাৎ আপত্তি করলেন, 'ছি ছি! জমিদার কেন হব? এখন আর কারো জমিদারি আছে নাকি? তবে জমির আয়ে বেঁচে আছি বলতে পারেন। আপনার কথা বিলক্ষণ শুনেছি।'

মতীশ রায় হরিহরকে ভাল করে দেখল, 'আপনি বিশেষ কোন কাজে যাচ্ছেন?'

অবিনাশ কবিরাজ জবাব দিলেন, 'কাজ মানে? বনের মোষ তাড়ানোই তো ওঁর কাজ। গাঁয়ের কিছু হলে লোক ছুটে আসে ওঁর কাছে সাহায্যের জন্যে। কে না কে কি করেছে, পুলিশ সদরে ধরে নিয়ে গিয়েছে, অতএব তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে এসো। যত্তসব!'

'কি ব্যাপার? চুরি-চামারির কেস নাকি?' মতীশ প্রশ্ন করল।

'না। একদম ভুল-বুঝাবুঝি হয়েছে। থানার দারোগা ছেলেটিকে হাতে পেয়ে সদরে চালান দিয়েছে কোন কেস খুঁজে না পেয়ে। এখন তার আর কিছু করার নেই।' হরিহর জবাব দিলেন।

'ও। এস. পি. সাহেবের সঙ্গে পরিচয় আছে?'

হরিহর জবাব দেবার আগেই বাস এসে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেল। যারা অপেক্ষা করছিল, তারা জায়গা নেবার জন্যে দরজার দিকে দৌড়াল। হরিহর উদ্বিগ্ন হলেন কিন্তু মতীশ হাত নাড়লেন, 'ব্যস্ত হবেন না। জায়গা রাখার কথা আমার বলা আছে।' হরিহর দেখলেন অনন্ত বাসের দরজায় ঠেলাঠেলি করছে। মিনিটখানেকের মধ্যেই অবশ্য সব শান্ত হয়ে গেল। জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে ইশারায় অনন্ত তাঁকে ডাকছে এখন।

হরিহর বললেন, 'তাহলে এগোনো যাক।'

বাসের দরজায় পৌঁছাতেই একজন নেমে এল, 'ড্রাইভারের পাশের বেঞ্চিটা রেখেছি।'

'ঠিক আছে। যা।' মতীশ রায় হুকুম করল।

ওপরে উঠে মতীশ লম্বা বেঞ্চিতে গা এলিয়ে বসে বলল, 'এখানে বসতে পারেন।'

হরিহর মুখ তুলে দেখলেন, অনন্ত জানলার ধারে বসে তাঁর দিকে বকের মত তাকিয়ে আছে। ডান হাত বাড়িয়ে পাশের আসন আগলে রেখেছে সে। ইতিমধ্যেই বাস প্রায় ভর্তি। তিনি ইশারায় অনন্তকে সেখানেই বসতে বলে মতীশ রায়ের পাশে বসলেন।

মতীশ জিজ্ঞাসা করল, 'এস. পি. সাহেবের সঙ্গে দেখা করবেন?'

'আমি ঠিক জানি না কি করতে হবে। আমার এক পরিচিত ভদ্রলোক আছেন, যিনি কোর্টে মুহুরির কাজ করেন। তাঁকে গিয়ে বলব বলে ঠিক করেছি।'

'না, না। মুহুরি-ফুহুরি দিয়ে এসব কাজ হবে না। একেবারে খোদ কর্তাকে না ধরলে পুলিশ কথা শুনবে না। ঠিক আছে, দুপুরে না হয় আমি আপনাকে নিয়ে যাব।'

'আপনার সঙ্গে এস. পি. সাহেবের আলাপ আছে?'

'বিলক্ষণ। তাঁর খাতায় আমি আমার খাতায় তিনি। অবশ্য খাতাটা লেখা হয় না।'

'মানে বুঝলাম না!'

শব্দ করে হেসে উঠল মতীশ, তারপর বলল, না বোঝাই ভাল। তবে যে দোকান থেকে আপনি প্রতিমাসে একশ টাকার জিনিস কেনেন, তার কাছে দরকারে দুটো বাতাসা চাইলে কি সেটা ফাউ হিসেবে দেবে না? আপনার কাজটা হল সেই ফাউ-এর মত। সিগারেট চলে?'

হরিহর মাথা নাড়লেন, না। লোকটিকে তিনি ঠিক বুঝতে পারছিলেন না।

বাস চলতে শুরু করলে মতীশ সিগারেট টানতে টানতে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনাদের গ্রামে নাকি এক ভৈরবীর উদয় হয়েছে! সুন্দরী যুবতী ভৈরবী!'

হরিহর চমকে উঠলেন। কিন্তু নিজেকে সংবরণ করলেন তিনি, 'সংসারজীবনে তিনি সুন্দরী ছিলেন। তবে মায়ের মন্দিরে যাওয়ার পর আর আগের চেহারা নেই।'

'চেহারা পাল্টে ফেলেছেন?'

'যে স্থানে যেমন। এখন তিনি একদম বদলে গেছেন।'

'সেইরকমই কানে এসেছে। আমার এক চামচে আছে, নাটকফাটক করে। সে বলছিল কিছুদিন আগেও নাকি ওই ভৈরবী তার ঘরে এসেছিল, তার কাছে নাটক শিখেছিল। তা আমি তাকে পাঠিয়েছিলাম ভৈরবীকে দেখতে।' মতীশ হাসল।

খবরটা নতুন। হরিহর অবাক হলেন। ওই চামচে নিশ্চয়ই সনাতন। গ্রামের ছেলেরা তাকে নিয়ে নাটক করবে বলে মেতেছিল। ছবিরাণীকেও নামাতে চেয়েছিল। সেইটেই এখন ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে গল্প করা হচ্ছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তারপর?'

'সন্ধ্যের পর গিয়েছিল। গিয়ে দ্যাখে চুল ছেঁটে রক্তবস্ত্র পরে একগাদা কুকুর নিয়ে বসে আছে। সেইসব কুকুরের জ্বালায় কাছে ভিড়তে পারেনি সনাতন। ওয়ার্থলেস! আরে মশাই, মেয়েছেলে হল জলের মতন। যে পাত্রে রাখবেন মনে হবে সেই পাত্রেরই উপযুক্ত। পাত্র বদলান আবার চেহারা পাল্টে যাবে! খ্যাক-খ্যাক হাসল মতীশ।

'আমার মনে হয় এ বিষয় নিয়ে কথা না বলাই ভাল।'

'ও, সরি! আপনাদের গাঁয়ের ব্যাপার! আমারই উচিত হয়নি কথা বলা।'

'আসলে আমরা ওই মায়ের মন্দিরের পুজারীকে অন্য চোখে দেখি।'

কথাবার্তা এখানেই থেমে গিয়েছিল। বাকি পথটায় ভিড়ের জন্যেই চুপ করে থাকা সহজ হল। শহরে পৌঁছাতে দশটা বেজে গেল। বাস থেকে নেমে মতীশ জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি এস. পি. সাহেবের কাছে যাবেন?'

একটুও ইচ্ছে হচ্ছিল না কিন্তু যোগাযোগটা হাতছাড়াও করতে পারলেন না হরিহর। বললেন, 'আপনার যদি অসুবিধে না হয়—।'

'না, না। আমি তো নিজে থেকেই বললাম। আমি বেবি হোটেলে উঠব। আপনি একটা নাগাদ সেখানে চলে আসুন। যে কোন রিক্সাওয়ালা বেবি হোটেল চেনে।' কথাগুলো বলে মতীশ রায় একটা রিক্সার দিকে এগিয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত চলে এল কাছে, 'কি ব্যাপার? ওই ব্যাটার সঙ্গে কি কথা হচ্ছিল? উফ! সেই যে হরিপুর থেকে আঠার মত লেগে গেছে—। তুমি আমাকে মাতাল বলে গালাগাল দাও, ও ব্যাটা তো আমার চেয়েও বড় মাতাল। শহরে আসে কেন জান?'

মাথা নেড়ে না বললেন হরিহর।

'ভোগ করতে। বাড়িতে দু'দুটো মেয়েছেলে রেখেছে। যখন তাতে অরুচি আসে, তখন শহরে এসে মুখ বদলায়। হাড়ে হারামজাদা। অভাব দেখলেই পয়সা ছড়ায়।'

'তুমি এত জানলে কি করে?'

'পচা গন্ধ বাতাসে ভাসে।'

'ঠিক আছে। যে যা করছে করুক। দশটা বেজে গেল, বিভূতিবাবুকে তো বাড়িতে পাব না। চল কোর্টে গিয়ে দাঁড়াই।' হরিহর হাঁটতে লাগলেন।

'বিভূতিটা আবার কে? থানায় যাবে না? শ্রীনিবাস তো সেখানেই আছে?'

'বিভূতি হল মুহুরি। তাকে নিয়ে গেলে সুবিধে হবে।'

'ও। তা কতদূর? রিক্সা করলে হয় না?' পিছু পিছু হাঁটছিল অনন্ত।

'পরিষ্কার রাস্তা, বৃষ্টিবাদল নেই, খামোকা রিক্সা করব কেন?'

প্রায় দেড় কিলোমিটার পথ ভেঙে যখন কাছারিপাড়ায় ওরা পৌঁছাল তখন অনন্ত হাঁপাচ্ছে। পথের পাশেই ঝুপড়ি মিষ্টির দোকানের বেঞ্চিতে বসে সে বলে উঠল, 'উঃ, এত জোরে কেউ হাঁটে? তোমার কি বয়স বাড়ছে না হরি?'

'বয়স ঠিক বাড়ছে তবে তোমার মত অত্যাচার করিনি বলে ঝাঁঝরা হয়ে যাইনি!'

'বুঝলাম। খুব খিদে লেগেছে। এ্যাই, চারটে পান্তুয়া দে দু জায়গায়।' হাঁক মারল অনন্ত।

বাধা দিলেন হরিহর, 'পান্তুয়া খেতে হয় তুমি খাও। আমি একটা সন্দেশ দিয়ে জল খাব।'

চারটের বদলে সাতটা পান্তুয়া পেটে পুরে অনন্ত জিজ্ঞাসা করল, 'ভাত খাবে না?'

'ভাত? এখন কি?'

'না, না। দুপুরের কথা বলছি।'

'না। হোটেলের রান্না সহ্য হয় না আমার। আজ যদি ফিরে যাই তবে মিষ্টি খেয়ে নেব।'

কথাগুলো শুনেই কাছে সরে এল অনন্ত, 'যা বলেছ। আমি বলি কি, হোটেলে খাওয়ার দরকার নেই। আমরা যদি টাকা ধরে দিই তাহলে দুজনের জন্যে বাড়ির রান্না রেঁধে দেবে একজন। মানে আমার খাতিরেই রেঁধে দেবে।'

'কে ?'

'সেটা বলতে পারব না। গোপন ব্যাপার। তবে তুমি যদি রাজী হও তাহলে বলতেই হবে।'

হরিহর কৌতূহলী হলেন। অনন্ত তাঁর কাছে কিছু গোপন করার চেষ্টা করেও স্বভাবের জন্যে পারছে না। দেখাই যাক না ব্যাপারটা। তিনি বললেন, 'বেশি যদি খরচ না হয় তো আপত্তি কিসের! কত পড়বে ?'

'পনের টাকা দাও। তার কমে হয় না।'

'দশ টাকায় দুজনের পেটচুক্তি খাওয়া হয়ে যায়, জানো ?'

'আরও কমে হয়। সে খাওয়া পেটে সইবে? কাউকে ওর কমে দেওয়া যায় ?'

'এই কেউটি কে ?'

'আমার পরিচিত।' মাথা নামাল অনন্ত।

'ঠিক আছে। দেওয়া যাবে।'

'দেওয়া যাবে! এখন না দিলে কখন বাজার করবে, রাঁধবে কখন ?'

'এখন এখানে তাকে পাচ্ছ কি করে ?'

'কাছেই বাড়ি। ওই যে বটগাছটা দেখছ, তার পাশের রাস্তা। পাঁচ মিনিটে যাব আর আসব। তোমার বিভূতি আসার আগেই আমি ফিরব।' হাত বাড়াল অনন্ত।

টাকা বের করে অনন্তকে দিলেন হরিহর, 'দেখো, এই টাকায় মদ গিলে এসো না!'

সঙ্গে সঙ্গে জিভ বের করে টাকা হাতেই দুই কান ধরল অনন্ত, 'ছি ছি! আমি মাতাল কিন্তু চরিত্রহীন নই।'

অনন্ত চলে গেলে হরিহর কোর্ট-বাড়িতে একটা পাক দিয়ে এলেন। না, বিভূতি মুহুরি নেই। শেষ পর্যন্ত তার দেখা পেলেন একটা চায়ের দোকানে। তাঁকে দেখে বিভূতি হাতজোড় করল, 'আরে আপনি? কখন এলেন? কোন গোলমাল হয়েছে?'

হরিহর তাকে সবিস্তারে ব্যাপারটা বললেন। মিসা শুনে মকে গেল বিভূতি, বলল, 'সর্বনাশ! এ খুব খারাপ ধারা। ছেলেটা করেছিল কি ?'

নিজের ব্যাপারটা চেপে গেলেন হরিহর। বললেন, 'কিছুই করেনি। পুলিশ ভুল করে ওকে ধরেছিল। শেষে কেস না পেয়ে চালান দিয়েছে। একটা কিছু ব্যবস্থা না করলেই নয়!'

'খরচ করতে পারবেন ?'

'খরচ?' একটু ভাবলেন হরিহর। তারপর বললেন, 'কত ?'

'সেটা থানায় না গেলে বলতে পারব না। একটু দাঁড়ান, হাতের কাজ সেরে নিই আগে।'

বিভূতি আবার দোকানের ভেতর চলে গেল। শ্রীনিবাসের মুক্তির জন্যে টাকা খরচ করতে হবে! যেন তাঁরই দায়! হরিহর ঠোঁট কামড়ালেন। অবশ্য একটু দায়িত্ব থেকে যাচ্ছেই। তিনি যদি থানায় গিয়ে শ্রীনিবাসের নাম না বলতেন, তাহলে ওকে এখানে আসতে হত না। তাই বলে গ্যাঁটের পয়সা ঢালতে হবে? দেখা যাক।

হরিহর ভাবলেন পঞ্চাশ, বড়জোর একশ পর্যন্ত উঠবেন তিনি। নইলে সংসারটা ভেসে যাবে ওর।

কুড়ি মিনিট বাদে বিভূতি বেরিয়ে এল, 'চলুন। একটা রিক্সা ডাকি।'

হরিহর ফাঁপরে পড়লেন। অনন্তর দেখা নেই এখনও। তার পাঁচ মিনিট কখন শেষ হবে কে জানে! একবার কাছছাড়া হলে বেচারা ফিরতেও পারবে কিনা সন্দেহ। পকেটে তো কিছু নেই। কিন্তু বিভূতিকে দাঁড় করিয়ে রাখা যায় না। কাজের মানুষ। সঙ্গে যাচ্ছে এই ঢের। রিক্সায় উঠে বিভূতির পাশে বসে তিনি অনন্তকে দেখতে পেলেন। দূরে দাঁড়িয়ে বিড়ি ফুঁকছে। কাছাকাছি যেতেই সে লাফিয়ে উঠল, 'আরে! তুমি রিক্সায়? যাচ্ছ কোথায়? আমিও রিক্সা নিচ্ছি কিন্তু!'

বিভূতি বলল 'লোকটা কে?'

হরিহর জবাব দিলেন, 'আমরা এক গাঁয়ে থাকি।'

থানায় পৌঁছে বিভূতি তাঁকে নিয়ে সরাসরি দারোগাবাবুর ঘরে ঢুকে পড়ল। পেছনে অনন্ত। বিভূতিকে দারোগাবাবু বিলক্ষণ চেনেন। বললেন, 'কি ব্যাপার? সদলে?'

বিভূতি বলল, 'বিপদে না পড়লে কি কেউ থানায় আসে! ইনি হরিহরবাবু, নারাণপুর গ্রামের বর্ধিষ্ণু ব্যক্তি। আপনাকে এঁর উপকার করতে হবে।'

'কি ব্যাপার?'

'এঁর গাঁয়ের একটি নিরপরাধ ছেলেকে লোকাল থানা ধরে এখানে চালান করেছে। কেস না পেয়ে মিসায় ঢুকিয়ে দিয়েছে।'

'মিসা?' চমকে উঠলেন দারোগা, 'ওরে বাবা! মিসায় ধরলে আমি কেন আমার চৌদ্দপুরুষ কিছু করতে পারবে না। এমন একটা কেস নিয়ে এলে যে হাত খুলব তার উপায় নেই। দূর!'

॥ ১৮ ॥

হরিহর স্তব্ধ হয়ে গেলেন। কোথা থেকে কি হয়ে গেল! কে জানত সামান্য একটু শায়েস্তা করার চেষ্টা শেষ পর্যন্ত এইখানে পৌঁছাবে! থানার দারোগা পয়সা পেলে দিনকে রাত করে দিতে পারে কিন্তু সেই লোকও কানের লতি ছুঁয়ে বলল, 'ক্ষমা করবেন মশাই, আমার ক্ষমতা নেই। যদি পারেন এস. পি. সাহেব পারবেন। নইলে সরাসরি মন্ত্রীকে ধরুন। পশ্চিম-বঙ্গের মন্ত্রী নয়, খোদ দিল্লীর মন্ত্রী।'

থানার বাইরে এসে মুহুরি মশাই-এর সঙ্গে আলোচনা করেও যখন হরিহর কূল পাচ্ছিলেন না তখন অনন্তকে দেখা গেল এক সেপাই-এর সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলতে। মিনিটতিনেক বাদে সে লাফিয়ে লাফিয়ে কাছে এল, 'ও হরিহর, আমাদের শ্রীনিবাসের সঙ্গে দেখা করবে নাকি? দেখা করতে হলে বিশ টাকা ছাড়তে হবে!'

হরিহর অবাক হলেন, 'দেখা করার জন্যে বিশ টাকা ?'

'তার কমে হবে না।' ঘনঘন মাথা নাড়ল অনন্ত, 'তোমার কেপ্পন স্বভাবটা আর গেল না ! যে ধারায় জেল হয়েছে তাতে মানুষ তো দূরের কথা, মাছি পর্যন্ত ওর দেখা পাবে না। হুঁ হুঁ বাবা, আমি বলে রাস্তা খুঁজে পেলাম।'

'কি রকম ?' হরিহর জিজ্ঞাসা করলেন।

'ওই যে দাঁড়িয়ে আছে খাকি হাফপ্যান্ট পরে, ওর নাম তুলসীচরণ। জেলার সেরা চোলাই খাইয়ে। কিছুদিন হরিপুর থানায় ছিল যে। তখন একসঙ্গে কত মৌজ করেছি। আমার সঙ্গে সমানে টক্কর দিয়ে যেত ও ! তা তুলসীচরণকে আমি সমস্যার কথা বললাম। ও বলল, কোন চান্স নেই। ওর বউ-এর আবার বিয়ে দেওয়া যেতে পারে। মিসা খুব মারাত্মক ধারা। তা আমার কথা শুনে বলল, ওর এক বন্ধু আছে জেলখানায়, সে-ও ভাল খাইয়ে, তার সঙ্গে দেখা করতে কুড়িটি টাকা লাগবে। সে-ই গোপনে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেবে।' অনন্ত হাসল।

'জেলের সেপাই চোলাই খায় ?'

'দ্যাখো বাপু, খায় বলেই তো রক্ষে ! কেমন লাইন হয়ে গেল !'

এস. পি. সাহেব অবাঙালী, তাঁর কাছে গিয়ে কোন লাভ হবে না। মিসার মামলা কোর্টে ওঠে না যে জামিনের চেষ্টা হবে। মুহুরি কুড়িটাকার পথ ধরতে বলে নিজে দশটি টাকা দক্ষিণা নিয়ে বিদায় হল।

অনন্ত রিক্সা ডেকে আনলে হরিহর ওর পাশে উঠে বসলেন। অনন্ত জিজ্ঞাসা করল, 'চারটে বাজতে কি খুব দেরি আছে ?'

'তা আছে।'

'তাহলে একটু সময় কাটাবার ব্যবস্থা করতে হয়। চারটের আগে তো দেখা করতে দেবে না। এই বেলা দুটো পেটে পুরে নিলে হয় না ?'

হরিহর বললেন, 'মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল হে !'

অনন্ত ফিক করে হাসল।

হরিহর বিরক্ত হলেন, 'হাসছ যে ? হাসির কথা নাকি ?'

অনন্ত হাসিমুখে জবাব দিল, 'নিত্য মাল খেলে কিংবা ঘরে গৃহিণী থাকলে কথাটা মুখে আনতে না। হাসি সেই কারণেই।'

'মানে বুঝলাম না !'

'সরল কথা। মাল খেলে দিল বিরাট চওড়া হয়ে যায়। তখন এইসব ছোটখাটো দুঃখ সেই দিকে জায়গা পায় না। আবার ঘরে গৃহিণী থাকলে তার জিভের জ্বালার মনে কোন সাড় থাকে না। কার দুঃখ কে বোঝে তখন !'

হরিহরের মজা লাগল না কথাটা শুনে। তিনি গম্ভীর মুখে বসে রইলেন।

সেই দুপুর হরিহরের কাছে একটি অভিজ্ঞতা। স্ত্রীলোকটির রান্নার হাত ভাল। মশলা ছাড়া সব পদ রান্না করা হয়েছে। অত্যন্ত যত্নে পরিবেশন করা হল। টিনের ছাদ, বাখারির দেওয়ালের ওপর পুরোনো সিমেন্টের চাবড়া, মেঝের অজস্র ফাটাফুটি দাগ। অভাব যেন নখ বের করে আছে। শীর্ণা স্ত্রীলোকটি আধহাত ঘোমটা টেনে

ওই ঘরেই পিঁড়ি পেতে খাবার সাজিয়ে দিয়েছিল। হরিহর দেখলেন অনন্ত পরম-তৃপ্তিতে ভাত খেয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে এইটে ওইটে চাইছে। স্ত্রীলোকটি ঘোমটার আড়ালেই ঠারেঠোরে অনন্তকে কিছু জানাচ্ছে। যে সাংকেতিক ভাষা স্বামী-স্ত্রীর বোধগম্য তা অনন্ত দিব্যি বুঝতে পারছে। অনন্তর জীবনের এই দিকটা হরিহর জানতেন না। স্ত্রীলোকটির মুখ দেখা যাচ্ছে না কিন্তু কালো কাঠির মত দুটি হাত দেখে যা অনুমান করতে পারছেন তাতে কোন পুরুষ আকৃষ্ট হতে পারে বলে তাঁর মনে হচ্ছে না।

খাওয়া শেষ হলে হরিহর না বলে পারলেন না, 'রান্না চমৎকার হয়েছে।'

সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত গলা তুলল, 'শুনলে? বড়বাবু তোমার প্রশংসা করছেন। বুঝলে হরিহর, এই কারণেই তোমাকে আমি হোটেলে খেতে নিষেধ করেছিলাম। ওখানে বারোয়ারি রান্না, এমন যত্ন পাবে কি করে?'

জবাব না দিয়ে হরিহর উঠে দাঁড়ালেন। দরজার বাইরে বালতিতে জল ধরা ছিল, তার ওপর একটা নরেকেল তেলের কৌটো যেটাকে মগ হিসেবে ব্যবহার করা হয় এই বাড়িতে। হরিহর মুখ ধুয়ে নিলেন।

এইসময় স্ত্রীলোকটি চাপাস্বরে অনন্তকে কিছু বলল। অনন্ত এগিয়ে এল, 'ও বলছে, তক্তাপোষে চাদর পেতে দিয়েছে, ইচ্ছে হলে একটু গড়িয়ে নিতে পার।'

হরিহর মাথা নাড়লেন, 'হাত ধুয়ে নাও। আমরা এখানে গড়াতে আসিনি।'

স্ত্রীলোকটি তাঁর সঙ্গে কথা বলেনি। কিন্তু অনন্তর সঙ্গে যে ভাল সম্পর্ক আছে তা ওদের ইশারায় কথাবার্তা বলার ধরণেই টের পাচ্ছিলেন। বেরুবার আগে তিনি অনন্তর হাতে আরও দশ টাকা দিয়ে বললেন, 'এটা ওকে দিয়ে দাও। অনেক পরিশ্রম তো হল।'

অনন্ত মাথা নাড়ল, 'আহা, এর কি দরকার ছিল! আগেই তো টাকা দিয়ে দিয়েছি!'

হরিহর কথা না বাড়িয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, কানে এল স্ত্রীলোকটি বলছে, 'মিনসের লোভ যায় না, এর থেকেও ভাগ নিচ্ছ? নিজের চোখে দেখেছি দশ টাকা দিয়েছে!'

হরিহরকে বড় রাস্তায় এসে ধরল অনন্ত। হরিহর হনহনিয়ে হাঁটছিলেন। এখন দুপুর শেষ কিন্তু রিক্সাওয়ালারা পথে সংখ্যায় খুবই কম। অনন্ত জবাবদিহির গলায় বলল, 'ওর সঙ্গে আমার অনেকদিনের পরিচয়। মানুষটি রাঁধে ভাল।'

হরিহর আর কথা বাড়াতে চাইছিলেন না। এই স্ত্রীলোকটির সঙ্গে অনন্তর যাই সম্পর্ক থাক তাতে তাঁর কি এসে যায়। তাছাড়া মাতাল অনন্ত কালেভদ্রে শহরে আসে। স্ত্রীলোকটির সঙ্গে যোগাযোগ থাকতেই পারে না। ওই অভাবী স্ত্রীলোকের কোন প্রয়োজনই সে মেটাতে পারে না। হৃদয় ব্যাপারগুলো অর্থ-প্রয়োজনের ধাক্কায় অকালেই মরে যায়। অতএব ওদের সম্পর্কের ধরণটা কি তা নিয়ে কথা বলে সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না।

শ্রীনিবাসের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল অনেক কাঠখড় পোড়াবার পর। সরাসরি অনুমতি পাওয়া যায় নি। সেই সেপাইটির সূত্র ধরে অনন্ত এক ফাঁকে ভেতরে

ঢোকার অনুমতি যোগাড় করল। জেলার সাহেবও চোখ বন্ধ করলেন। লোহার গারদের ওপাশে শ্রীনিবাস আসামাত্রই ডুকরে কেঁদে উঠল, 'ও জ্যাঠামশাই, এরা আমাকে মেরে ফেলবে। জীবনে ছাড়বে না বলছে। আমি কি করেছি? আমি তো কোন অন্যায় করিনি।'

সিপাই ধমক দিল, 'অ্যাই চোপ! কাঁদলে ভেতরে নিয়ে যাব।'

ছেলেটার শরীব এই সময়েই বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছে। হরিহরের খুব কষ্ট হচ্ছিল। অনন্ত পাশ থেকে বলে উঠল, 'বাবা শ্রীনিবাস, সত্য কথা বল। গ্রামে বসে তুমি কিছু করো নি একথা সবাই জানে। কিন্তু গতবার হরিহরের সঙ্গে শহরে এসে কি কারো সঙ্গে দেখা করেছিলে? সেই ফাঁকে কিছু হয়েছিল?'

'ভগবানের দিব্যি, কিছুই করিনি। অনন্ত কবিরাজ একটা ওষুধ নিয়ে যেতে বলেছিলেন, তাই নিয়েছি। আমি গাছ চুরি করিনি। ও জ্যাঠামশাই, আমাকে বাঁচান।' হাউ মাউ করে কাঁদতে লাগল শ্রীনিবাস।

হরিহর জড়ানো গলায় বললেন, 'বাবা, তোমাকে বাঁচাতে যদি দশ হাজার টাকা খরচ হত তাও আমি করতে রাজি ছিলাম। কিন্তু মুহুরি বলছে এই মিসার বিরুদ্ধে কোন মামলাই করা যায় না। কেন এমন হল? তবে কদ্দিন আর ধরে রাখবে, ছাড়তে ওদে[illegible] হবেই। তুমি একটু ধৈর্য ধরো বাবা।'

অনন্ত জিজ্ঞাসা করল, 'এরা খেতেটেতে দেয়?'

'হুঁ, ঘ্যাঁট আর মণ্ড।'

অনন্ত জিজ্ঞাসা করল, 'বিড়ি সিগারেট?'

'আমি খাই না।'

'ইয়ে, নেশার জিনিসটিনিস—।'

'আমি জানি না।'

সিপাই শুনছিল চুপচাপ। এবার দাঁত বের করে বলল, 'সব পাবেন বাবু। দশ টাকা দিলে পাঁচ টাকা আমাদের আর পাঁচ টাকায় কয়েদী যা চাইবে তা পেয়ে যাবে।'

হরিহর দুটো কুড়িটাকার নোট সেপাই-এর হাতে দিলেন, ' র খাবার যেন ভাল হয়।'

'বিলকুল চিন্তা করবেন না। আজ রাত্রে মাংস খাইয়ে দেব। কিন্তু শুনছি ওকে নাকি বহরমপুর জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।' সেপাই নোটগুলো পকেটে পুরলো।

সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে কেঁদে উঠলো শ্রীনিবাস।

হরিহর বললেন, 'বহরমপুর জেল? সে তো অনেক দূর!'

শ্রীনিবাস মাথা নাড়তে লাগল, 'আমি বেঁচে থাকি আর মরে যাই তাতে কোন ভয় নেই কিন্তু ওর কি হবে, ও জ্যাঠামশাই, ও কোথায় যাবে?'

'কার কথা বলছ?' হরিহর ধরতে পারেন নি।

অনন্ত চাপা গলায় বলল, 'ওর বউ-এর ক[illegible] বলছে।'

'ও। শোন বাবা, আমি যদ্দিন বেঁচে আছি তার কোন কষ্ট হতে দেব না। সে আমার মেয়ের অভাব পূর্ণ করবে। তুমি কোন চিন্তা করো না।' হরিহর ঘোষণা করলেন।

অনন্ত হাসল, 'রাজেন্দ্রাণীর মত থাকবে।'

সেপাই আর কথা বাড়াতে দেয়নি। সাক্ষাৎপর্ব এখানেই শেষ হয়ে গেল। যেন কোন বন্দীকে ফাঁসির কাঠগড়ার দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, শ্রীনিবাসের চলে যাওয়ার সময় মুখচোখের অভিব্যক্তি সেইরকম ছিল। সেপাইদের টাকাকড়ি মিটিয়ে হরিহর জেলের বাইরে এসে কালভার্টের ওপর ধপ করে বসে পড়লেন, অত্যন্ত বিমর্ষ দেখাচ্ছিল তাঁকে। অনন্ত জিজ্ঞাসা করল, 'কি হল ?'

'শরীর মন খুব ভারী হয়ে গেছে অনন্ত।' বিড়বিড় করলেন হরিহর।

'এই রকম সময়ে একটু ওষুধ খেলে দেখবে আবার চাঙ্গা হয়ে উঠবে।'

'ওষুধ ?' মুখ তুললেন হরিহর।

'ওই যে আমি যা খাই !' হাসল অনন্ত।

'মাথা খারাপ ? আমি মদ খাব ?' চোখ বড় করলেন হরিহর।

'আর পনের মিনিট বাদে শেষ বাস ছাড়বে। পেঁছিতে রাত গভীর। বাসটা না ধরতে পারলে এই শহরেই রাত কাটাতে হবে। এখানে বসে মদ খেলে কে জানতে পারছে ? রাত্রের মদ সকাল হলে পেচ্ছাপ হয়ে যায়।'

হরিহর এক ঝটকায় উঠে দাঁড়ালেন। সামনে দাঁড়ানো একটা রিক্সায় উঠে হুকুম করলেন, 'চটপট বাসস্ট্যান্ডে চল।'

অনন্ত ছুটে এসে রিক্সায় উঠল। পরিকল্পনা ভেস্তে যাওয়ায় তাকে খুব বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। হরিহর চুপচাপ বসেছিলেন। তাঁর মাথায় অনেক ভাবনার মধ্যে আর একটা ভাবনা জায়গা নিয়েছিল, সত্যি যদি বাস না পেয়ে শহরে থাকতে হয় তাহলে তিনি কি করবেন ? সারাজীবনে যা করেননি আজ রাত্রে সেই বেহিসেবী জীবনযাপন করলে কেমন হয় ? এতকাল তো নিজেকে সংযমের বেড়ায় আটকে রেখেছেন ! এ নিয়ে ভাবতেই সারা শরীরে কাঁটা ফুটল। অনন্তটা সঙ্গে থাকায় কোন কিছুতেই অসুবিধে হবে না। রাত্রের মদ দিনে যেমন পেচ্ছাপ হয়ে যায়, এক রাত্রের যা কিছু নিষিদ্ধ সুখ পরের সকালে আর কে মনে রাখবে ? তাঁর চিত্তে যখন এমন দোটানা ঠিক তখনই রিক্সা স্ট্যান্ডে পেঁছে গেল। শেষ বাস তখনও দাঁড়িয়ে। রিক্সার ভাড়া মিটিয়ে গম্ভীরমুখে হরিহর বাসে উঠে পড়লেন। হতাশ অনন্ত চাপা গলায় বলল, 'শালা !'

পাঁচ টাকা ধার নিয়ে হরিপুরে থেকে গেল অনন্ত। বাস থেমেছিল রাত সোওয়া নটায়। অত রাত্রেও নাকি অনন্তর খুব প্রয়োজন হরিপুরে। প্রয়োজনটা কি বুঝতে পেরেও আপত্তি করেননি হরিহর। গরুর গাড়ি তখনও অপেক্ষায় ছিল। সেটা চলতে শুরু করলে গা এলিয়ে দিলেন। আকাশে তারা দেখা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। কাদাপথে সারাদিন দাঁড়ানো গরু দুটো গাড়ি টেনে নিয়ে যাচ্ছিল কোনমতে। শুয়ে শুয়ে হরিহর আকাশ দেখলেন। চারপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার। শুধু গাড়োয়ানের গলা ছাড়া কোন শব্দ নেই।

শ্রীনিবাসের বউটির দায়িত্ব তিনি নিশ্চয়ই নেবেন। স্ত্রী কোন সন্তান রেখে যাননি। মেয়েটি সন্তানের মত থাকবে। কিন্তু তার মন পড়ে থাকবে স্বামীর জন্যে। যদি সে কোনদিন জানতে পারে এই দুর্দশার জন্যে তিনিই দায়ী, তাহলে

কি হবে? হরিহর চোখ বন্ধ করলেন। অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত তাঁকে করতেই হবে। মেয়েটিকে সব দিক থেকে ভরে দেবেন তিনি। পিতৃস্নেহে আগলে রাখবেন। স্বামী-প্রেম পিতৃস্নেহের বিকল্প হয় না ঠিকই, তবু—। গ্রামে গিয়ে সবাইকে বলতে হবে। আজ রাত বেশ গভীর, কাল সকালেই ডেকে বলতে হবে। শ্রীনিবাসের বউ যদি তাঁর বাড়িতে থাকতে না চায় তো অন্য যেখানেই থাকুক তিনি খবর নেবেন। গ্রামের সবাই ঠিক করে দিক সে কোথায় থাকবে। তবে তাঁর কাছে থাকলে তিনি শান্তি পেতেন। কথাটা গ্রামের লোকদের মুখ দিয়ে বের করাতে হবে।

হঠাৎ তাঁর মনে ছবিরাণীর মুখ ভেসে উঠল। ছবিরাণী যদি আদেশ করে তাহলে তার বোন সেটা অমান্য করতে পারবে না। গ্রামের সবাই মেনে নেবে। শ্রীনিবাসের সঙ্গে দেখা করে আসার কথা ছবিরাণীকে জানানো দরকার। তিনি যে চেষ্টা করছেন, আন্তরিকভাবেই করছেন, সেটা জানতে পারলে ছবিরাণী নিশ্চয়ই খুশি হবে। অনন্তর সঙ্গে সেই স্ত্রীলোকটি যে ইঙ্গিতময় ভাষায় কথা বলছিল, তাঁর সঙ্গে ছবিরাণী কখনও সেই ভাষায় কথা বলেনি। বললে বোধ হয় শান্তি পাওয়া যেত। সব মানুষের কপালে একই কথা লেখা থাকে না। মাতাল অনন্ত এদিক দিয়ে তাঁর চেয়ে ভাগ্যবান। রাত বেশি হলেও ভৈরবীদের ঘুমাবার সময় নিশ্চয়ই হয়নি। তাছাড়া মায়ের মন্দিরে সন্তান যে কোন সময় যেতে পারে। যদি ছবিরাণী ঘুমিয়ে পড়ে তাহলে বিরক্ত না করে চলে আসবেন। জেগে থাকলে অনুরোধ করবেন বোনের দায়িত্ব তাঁকেই দেওয়া হোক এই মর্মে ছবিরাণী যেন হুকুম করে গ্রামবাসীদের।

গ্রামের কাছাকাছি পৌঁছে হরিহরের খেয়াল হল। এই গরুর গাড়িতে চড়ে মন্দিরে যাওয়া এত রাত্রে অনুচিত হবে। গাড়োয়ান সাক্ষী থেকে যাবে, কাল সকালেই গাঁয়ের মানুষ জেনে যাবে। কার মনে কি আছে কে বলতে পারে! এই নিয়েই নানান গল্প তৈরি হবে!

চুপচাপ গ্রামে ঢুকে তিনি গাড়ি ছেড়ে দিলেন। নিজের বাড়ির দিকে অন্ধকারে এগিয়ে যাওয়ার সময় যেই টের পেলেন কেউ কাছাকাছি নেই অমনি পথ বদলালেন।

বুকের ভেতরটায় একটু কাঁপুনি এল। এই বয়স্ক বুকেও অদ্ভুত রোমাঞ্চকর অনুভূতি। কেউ যদি দেখে ফ্যালে সেই উদ্বেগও তার সঙ্গে মিশে ছিল। প্রায় চোরের মত হাঁটছিলেন তিনি। সারাদিনের ঘোরাঘুরির ক্লান্তি শরীরটাকে অবসন্ন করলেও তিনি সেটাকে উপেক্ষা করছিলেন। মাঠ ডিঙিয়ে বহুদূরে আসার পরে টিপটিপ বৃষ্টি শুরু হল। খোলা আকাশের তলায় আলের ওপর দাঁড়িয়ে একটু ইতস্তত করলেন তিনি। বৃষ্টি বাড়বেই। জব্বর বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ভিজে একসা হয়ে যেতে হবে। অবশ্য যে পথ পেছনে ফেলে এসেছেন তা ধরে ফিরে যেতে চাইলেও ভিজতে হবে। আবার পা চালালেন হরিহর।

দূর থেকে বিদ্যুতের আলোয় মন্দির দেখতে পেলেন তিনি। এক ঝলক দেখা, তারপর বহুগুণ অন্ধকার। এবং এইসময় কুকুরের চিৎকার শুরু হল। হরিহর ভেবে পাচ্ছিলেন না কি করবেন! অন্ধকারে কুকুরগুলো যদি তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাহলে আর তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। সেই সময় বৃষ্টিটা জোরে নামল। মাথা জামাকাপড় ভিজে একসা। কিরকম শীত-শীত করতে লাগল তাঁর। আর

কুকুরগুলো যেন বৃষ্টির জল গায়ে পড়তেই ডাক থামিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ছুটল। হরিহর এগোলেন। তাঁর ধুতি শরীরের সঙ্গে লেপ্টে যাচ্ছিল, তিনি না হেঁটে পারছিলেন না।

মন্দিরের দরজা বন্ধ। পেছনের ছোট্ট চালাঘরেও আলো জ্বলছে না। সিঁড়ি ভেঙে চাতালে উঠলেন তিনি। দরজা ভেজানো না ভেতর থেকে বন্ধ তা তিনি বুঝতে পাচ্ছিলেন না। চালাঘর থেকে মন্দিরের ভেতরটা অনেক নিরাপদ। ছবিরাণী নিশ্চয়ই মায়ের বিগ্রহের পাশেই শুয়েছে। কিন্তু কি নামে তাকে ডাকা যায়? ভৈরবী মা বলতে জিভ স্বস্তি পায় না, আবার এই পরিবেশে ছবিরাণী ডাকটা ঠিক মানায় না।

তিনি দরজায় চাপ দিলেন। মায়ের মূর্তির সামনে একটি প্রদীপ জ্বলছে। সেই স্বল্প আলোতেও বোঝা গেল ঘরে কোন মানুষ নেই। ছবিরাণী কোথায় গেল?

দরজা ভেজিয়ে হরিহর বারান্দায় এলেন। তুমুল বৃষ্টি ঝরছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ না চমকালে পৃথিবীর কিছুই দেখা যেত না। জল মাথায় নিয়ে তিনি চালাঘরের দিকে এগোলেন। শীত তাঁর শরীরে কাঁটা তুলছিল। চালাঘরের কাছে পেঁাছে ভেতরে আলো দেখতে পেলেন। ঘরটি সুগঠিত নয়। ছবিরাণীকে ডাকতে গিয়ে থেমে গেলেন হরিহর। একটি পুরুষকণ্ঠ শোনা যাচ্ছে। তিনি নিঃশব্দে ঘরের একপাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর কান বাখারির দেওয়ালের সঙ্গে লাগানো। পুরুষটি বলছে, 'তুমি এত নিষ্ঠুর, আমি ভাবতে পারিনি!'

'নিষ্ঠুর? আমি? চমৎকার!' ছবিরাণীর গলায় বিস্ময়, একটু থেমে সে বলল, 'আর পারছি না, এবার তুমি চলে যাও।'

'সত্যি সত্যি আমায় চলে যেতে বলছ?' পুরুষটির গলায় বিস্ময়।

'হ্যাঁ।'

'ছবি?'

'তুমি আমাকে ও নাম ধরে ডেকো না। ছবি মরে গেছে।'

পুরুষটি বিড়বিড় করল কিছু, তারপর বলল, 'আমি—আমি কোথায় যাব?'

'যে চুলোয় ছিলে।'

'কোন মানুষ যদি একবার ভুল করে, তাহলে তার শাস্তি কি সারাজীবন পাবে?'

'এ ভুলের কোন মাপ নেই। গাঁয়ে বউ পড়ে রইল। তার যৌবন আছে। একের পর এক পুরুষের প্রলোভন সে উপেক্ষা করে বেঁচে আছে আর স্বামী বিদেশে গিয়ে পয়সা দিয়ে মেয়েমানুষ ভোগ করছে, করে রোগ কিনছে। ছি ছি ছি! আজ তুমি কেন এসেছ আমার কাছে? কি দিতে পার তুমি?'

'আমি—আমি তোমাকে সব দেব ছবি।'

'ঠিক আছে। আমি এই ভৈরবীজীবন ছেড়ে দিচ্ছি। প্রকাশ্যে আমাকে নিয়ে তোমাকে ঘর বাঁধতে হবে। ডাল-ভাত গায়ের কাপড় আর একটা সন্তান ছাড়া আমাকে কিছুই দিতে হবে না তোমাকে। পারবে দিতে?' ছবিরাণীর গলা ওপরে উঠল।

'সন্তান!' পুরুষকণ্ঠ কেঁপে উঠল।

'হ্যাঁ। আমার যত বয়সই হোক এখনও মা হবার ক্ষমতা রাখি। আমি তাই চাই।'

'ছবি— !'

'রোগ তোমার সেই ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে, না ?'

'হ্যাঁ। কিন্তু মা না হয়েও তো একসঙ্গে থাকা যায়।'

'দূর হও, দূর হও আমার সামনে থেকে। তুমি পুরুষ? ছি ছি ছি! হা ভগবান, কেন একে সামনে আনলে ? কি করেছি আমি ? আমার কপাল পুড়েছিল, কি অপমান, তবু মেনে নিয়েছিলাম। আমার বোনটারও তো একই দশা হল। আঃ !'

'ছবি— !'

'এখনও বসে আছ ?'

'সত্যি আমি চলে যাব ?'

'যাবে না? বেশ চল আমার সঙ্গে গাঁয়ে। এই রাতদুপুরে সব্বাইকে ঘুম থেকে তুলে তোমাকে দেখাব। জিজ্ঞাসা করব—এ আবার আমাকে নিয়ে অন্য শহরে গিয়ে ঘর বাঁধতে চাইছে, আপনারা বিচার করে যা রায় দেবেন তাই মানব।'

'না।'

'কেন ?'

'মিলিটারি জানে আমি সন্ন্যাসী হয়ে গেছি। তারা আমায় খুঁজেও পায় নি। এতবছর সত্যি আমি হিমালয়ে এক সাধুর আশ্রমে চাকরের কাজ করেছি। তিনিই আমাকে বাঁচিয়েছেন। কিন্তু গাঁয়ের মানুষ জানলে পুলিশ জানবে। তারা জানাবে মিলিটারিকে। ওরা আমাকে ঠিক শাস্তি দেবে।'

'কি করেছিলে তুমি ?'

'না বলে চলে যাওয়াই তো অপরাধ !'

ছবিরাণী হঠাৎ গলা পাল্টাল, 'অন্য মেয়েছেলের কাছে কেন গিয়েছিলে ?'

'লোভ। আমার বড় লোভ হয়েছিল।'

'সেই মেয়েছেলেটাকে আমার কাছে নিয়ে এস।'

'এ্যাঁ! তাকে আমি পাব কোথায় ?'

'কেন ? ঠিকানা জান না ?'

'জানতাম, সে তো অনেক বছর আগের কথা। রোগে ভুগে মরে গেছে হয়ত। তারা কি চিরকাল এক ঠিকানায় থাকে ?'

'তাদের সঙ্গে যারা শোয় তাদেরও এক ঠিকানা থাকে না। দূর হও এখান থেকে।'

'আমি যদি না যাই ?'

'মানে ?'

'যদি জোর করে এখানে থাকি ?'

'কাল সকাল হলে ভক্তরা এলে দেখিয়ে দেবো তোমাকে।'

'যদি তোর জীবনে কাল সকাল না আসে ?'

'তার মানে ? তুমি আমায় খুন করবে ?'

'হ্যাঁ। যদি আমি জীবনে কিছুই না পাই তাহলে তুই কেন বেঁচে থাকবি ? দিনের পর দিন আমি চোরের মত বেঁচে আছি। দাড়িগোঁফ দেখে লোকে এখন আমাকে শিবরাম বলে চিনতে পারে না। খোঁজ নিয়েছি কত কায়দা করে। হরিপুরের ভাটিখানায় তোকে নিয়ে রসের আলোচনা হয়। সেখানেই জানলাম জগা পাগলার বদলে তুই এখানে ভৈরবী হয়ে জমিয়ে বসেছিস। আমি বিশ্বাস করি না— তুই লুকিয়ে আছিস। এই ভেক ধরে মতলব হাসিল করতে তো খুব সুবিধে। তবু এসেছিলাম যদি তোর মন ফেরানো যায় ! আর আর তোকে ছাড়ছি না ছবি।'

'বেশ। চেষ্টা করে দ্যাখো, আমাকে তুমি মারতে পার কিনা ?'

'মারব, মারব। হাতে এখন অনেক সময়। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। কাকপক্ষীতেও টের পাবে না। মারার আগে তোকে আর একটু দেখি।'

'তুমি বেলায় বেলায় এসে এই ঘরে বসেছিলে তাই বুঝতে পারনি। আমাকে যারা পাহারা দেয় তারা বাইরে ঘুরছে। একবার ডাকলেই তারা তোমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তখন যাবে কোথায় ?'

'সে দেখা যাবে। কয়েকটা দিশি কুকুর তো !'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর ছবিরাণীর গলা শোনা গেল, 'ঠিক আছে। এই ভাল। তুমি আমাকে মেরেই ফেলো। কিন্তু এখানে না মেরে মায়ের সামনে মার।'

'মায়ের সামনে মানে ?'

'মন্দিরের ভেতরে।'

'কেন ? সেখানে কোন তুকতাক আছে নাকি ?'

'মানে ?'

'শুনতে পেলাম তুই নাকি তুক করে রোগ সারাচ্ছিস !'

'সেটা জানলে তোমার অসুখটাকেই সারিয়ে দিতে পারতাম।'

'বেশ, চল, মন্দিরেই চল। কিন্তু সাবধান, কুকুরগুলোকে ডাকবি না। আমি তোর পেছনে আছি। সেগুলো তেড়ে এলে এই ছুরি তোর পিঠে বসিয়ে দেব।'

ছবিরাণী কোন কথা বলল না। ঘরের দরজা খোলার শব্দ হল। হরিহর চটপট সরে দাঁড়ালেন। শিবরাম এসেছে ফিরে ? মন্দিরে ছবিরাণীকে নিয়ে যাচ্ছে খুন করার জন্যে, এ হতে দেওয়া যায় না। তিনি কি করতে পারেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। খোলা দরজায় শিবরামের গলা ভেসে এল, 'জোর বৃষ্টি পড়ছে !'

'ভালই তো। মরার আগে স্নান করে নিই।' বলতে বলতে ছবিরাণী বেরিয়ে এল। ঠিক তার পেছনে যে লোকটা, তাকে শিবরাম বলে চিনতে বেশ অসুবিধে হচ্ছিল হরিহরের। ছবিরাণীর শরীরের পেছনে তার হাত। নিশ্চয়ই ওই হাতে ছুরিটা ধরা আছে। বৃষ্টির মধ্যে হেঁটে ওরা মন্দিরের সিঁড়িতে পেঁৗছে গেল। চোখের আড়ালে যেতেই হরিহর বেরিয়ে এলেন। পা টিপে টিপে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে মন্দিরের সামনে পেঁৗছে দেখলেন দরজা খোলা, ওরা ভেতরে ঢুকে গেছে।

কিছু একটা করা দরকার। কি করা যায় ? ওঁর প্রচণ্ড আফসোস হচ্ছিল। হাতের কাছে একটা লাঠি পর্যন্ত নেই। হঠাৎ মন তৈরি করে নিলেন হরিহর।

জানান দিয়ে সোজা দরজায় গিয়ে দাঁড়াবেন। একই সঙ্গে দুজনকে নিশ্চয়ই খুন করতে পারবে না শিবরাম। তিনি চাতালে উঠে দরজার দিকে এগিয়ে যেতেই শিবরামের পেছনদিকটা দেখতে পেলেন।

'যেভাবে জন্ম নিয়েছিলাম সেইভাবেই যেতে চাই। একটু দাঁড়াও।' ছবিরাণী তার বস্ত্র ত্যাগ করছিল।

শিবরাম বলল, 'এসব আবার কি?'

'বললাম তো। যাকে বলি দেওয়া হয় তার অঙ্গে বস্ত্র থাকতে নেই।'

আধা অন্ধকারে ছবিরাণী বস্ত্রত্যাগ করতে করতে হঠাৎ প্রদীপটা নিভিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে শিবরাম চিৎকার করে উঠল, 'এ্যাই, কি হচ্ছে?'

অন্ধকারে ছবিরাণীর গলা ভেসে এল, 'এই মুহূর্তে যদি বিদায় না হও, তাহলে মাথা দু' ফাঁক করে দেব। আমার হাতে মায়ের খাঁড়া।'

'তুই, তুই—।

'শেষবার বলছি চলে যাও।'

'তবে রে! আঃ! উঃ!' ছিটকে বেরিয়ে এল শিবরাম। হরিহর সরে দাঁড়ালেন। চাতালে পড়ে গেছে শিবরাম। তার হাতের ছুরি শব্দ করে ছিটকে গেছে। উন্মাদিনীর মত খাঁড়া হাতে ছবিরাণী তেড়ে এল বাইরে। তাকে দেখে পড়ি কি মরি করে শিবরাম পালালো বৃষ্টির মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে কুকুরগুলো চিৎকার করে উঠল। সম্ভবত ছুটন্ত মানুষ তাদের বৃষ্টির ভয় দূর করে দিল। শিবরামের পরিত্রাহি চিৎকার বৃষ্টি ছাপিয়ে কানে এল।

হরিহর দেখলেন, হঠাৎ পাথর হয়ে গেল ছবিরাণী। খাঁড়াটা হাতে নিয়েই সে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল চাতালে। তার পর হাউহাউ করে কেঁদে উঠল দু'হাতে মুখ ঢেকে। হরিহর তাকে কিছুক্ষণ কান্নার সুযোগ দিলেন। ধীরে ধীরে মন্দিরে ঢুকে অন্ধকারে হাতড়ে ছবিরাণীর ছেড়ে ফেলা কাপড় তুলে আবার বাইরে বেরিয়ে এলেন। ছবিরাণী তখনও কেঁদে চলেছে। তিনি তার শরীরে কাপড় ছড়িয়ে দিতেই তার কান্না থেমে গেল। চমকে মুখ ফিরিয়ে চিৎকার করে উঠল, '[illegible]?'

হরিহর শান্তগলায় বললেন, 'আমি হরিহর। বিশেষ কাজে এসেছিলাম। সেকথা এখন থাক। ঘরে যাও, বিশ্রাম নাও। আমি ভোর পর্যন্ত বারান্দায় আছি।'

॥ ১৯ ॥

এরকম একটা রাত মানুষের জীবনে কদাচিৎ আসে, কারো কারো হয়তো আসেই না। মন্দিরের চাতালে বসে হরিহর তেমন একটা রাত কাটালেন। ভেতরের দরজা ভেজানো, ছবিরাণী সেই যে ভেতরে ঢুকেছে আর বের হয়নি, দরজায় আগলও দেয়নি।

শিবরাম এসেছিল—তার মানে শিবরাম বেঁচে আছে। নিরুদ্দিষ্ট লোকটা মরে গিয়েছে এমন একটা ভাবনা ভাবতে বেশ ভাল লাগত তাঁর। শুধু তিনি কেন, এই গ্রামের সবাই বিশ্বাস করেছিল শিবরাম মরে গেছে। সেই শিববাম আজ রাত্রে এসে ছবিরাণীর ওপর হামলা করে গেল। রোগগ্রস্ত স্বামীর সঙ্গে ছবিরাণী চলে যেতে চায়নি, তাকে অস্বীকার করেছে। কিন্তু কেন? যে মেয়ে কোন পুরুষের সঙ্গে নিজস্ব সম্পর্ক পাতায়নি, কোন লোভীর হাত স্পর্শ করেনি, সে নিজের স্বামীকে এত বছর পরে পেয়েও তাকে অস্বীকার করবে কেন? হরিহর এইসব ভেবে চলেছিলেন। এবং এরই মধ্যে একটা ঝকঝকে ভোর চুপিসাড়ে এসে পড়েছে তা তিনি টের পাননি। হরিহর পুবের আকাশে আলো দেখতে পেয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

কুকুরগুলো মাঠের মাঝখানে মাটিতে মুখ রেখে বসেছিল। আশেপাশে কোন গ্রামের চিহ্ন নেই। কিন্তু এমন ব্রাহ্মমুহূর্তে হরিহরের প্রায়ই মনে হয়, প্রকৃতির প্রাণ জেগে ওঠে চমৎকার ভাবে। গাছ আকাশ এমন কি আকাশের সাদা মেঘগুলোও আলোর স্পর্শ পাওয়ার আগে থেকেই কথা বলতে তৈরি হয়ে যায়। আজকের এই ভোর তার ব্যতিক্রম নয়। তিনি ধীরে ধীরে চাতাল থেকে নেমে দাঁড়ালেন।

কুকুরগুলো মুখ তুলল। রাত্রে যারা হিংস্র ছিল তারা এখন অলস চোখে একবার দেখে আবার মুখ নামিয়ে নিল। হরিহর আশ্বস্ত হলেন। যদি ওরা তেড়ে আসত, তাহলে ছবিরাণীকে ডাকা ছাড়া কিছুই করার ছিল না। অথচ ছবিরাণীও ভৈরবী হবার আগে ওদের অপরিচিত ছিল। তখন জগা পাগলা ছাড়া আর কারও বশ্যতা স্বীকার করেনি ওরা। অথচ যেই ছবিরাণী ভৈরবী হয়ে এখানে থেকে গেল অমনি কুকুরগুলো ওকে মেনে নিল। হরিহর এগিয়ে গেলেন নদীর দিকে। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। ছবিরাণীকে তিনি ডাকেননি। কালকের ঝড়ের পরে ওর অবস্থা স্বাভাবিক না থাকারই কথা।

নদীতে জল নেই বললেই হয়। হরিহর এপাশ-ওপাশে তাকালেন। প্রাতঃকৃত্য শেষ করার সময় এখন। বাড়িতে ফিরে গিয়ে সেটা করতেন কিন্তু ছবিরাণীকে না জানিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। তিনি এলোমেলো হাঁটতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। দূরে ঝোপের মধ্যে কেউ পড়ে আছে। মানুষ বলেই মনে হচ্ছে। হরিহর দ্রুত হাঁটতে লাগলেন। ঝোপের কাছে পৌঁছে রক্তাক্ত মানুষটিকে দেখতে পেলেন তিনি। আচমকা মানুষটিকে চিনতে পারলেন না। উপুড় হয়ে পড়ে আছে। সমস্ত শরীর রক্তাক্ত। মানুষটি জীবিত না মৃত বোঝা যাচ্ছে না।

হরিহর চারপাশে তাকালেন। কোন মানুষ নেই। তিনি নিচু হয়ে ঝোপের

মধ্যে ঢোকার চেষ্টা করলেন। শরীরটাকে উল্টে দিয়েই বুঝতে পারলেন প্রাণ অনেকক্ষণ দেহ ছেড়ে চলে গিয়েছে। গলার শিরাগুলো ছেঁড়া। কোন হিংস্র জন্তুর ধারালো দাঁতের শিকার হয়েছে লোকটা। সঙ্গে সঙ্গে তিনি চমকে উঠলেন। শিবরাম! গতরাত্রে যে আর্তনাদ কানে গিয়েছিল তা শিবরামেরই। কুকুরগুলো ধাওয়া করে এই ঝোপের মধ্যে নিয়ে এসে ওর টুঁটি ছিঁড়ে দিয়েছে।

শিবরামের মুখের দিকে তাকান। জন্ম থেকে যৌবন পর্যন্ত দেখা এই ছেলেটিকে তিনি এখনো চিনতে পারছেন না। এক যুগ হারিয়ে থাকা শিবরামের চেহারা পাল্টে গিয়েছে শুধু সময়ের জন্য নয়, রোগও তার কারণ। ছবিরাণীর ওপর অত্যাচার করার প্রতিশোধ নিলেন মা! হরিহর দ্রুত ফিরলেন। এখনই গ্রামের লোকদের খবর দেওয়া দরকার। কাউকে থানায় পাঠাতে হবে। এটি অবশ্যই পুলিশ কেস।

মন্দিরের সামনে এসে তিনি দাঁড়ালেন। লোকটা কে লোকে জানতে চাইবে। পুলিশ তো নিশ্চয়ই হাজারটা প্রশ্ন করবে। শিবরামের পরিচয় পেয়ে গ্রামের মানুষের প্রতিক্রিয়া কি হবে তিনি বুঝতে পারছিলেন না। কেউ যদি চিনতেও না পারে, তাহলে ছবিরাণী নিশ্চরই মুখ বন্ধ করে থাকবে না। লোকে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে পারে, এই ভোরে তিনি মন্দিরে কেন এসেছিলেন? মুখে না জিজ্ঞাসা করলেও মনে ভাববে। তাহলে?

বন্ধ মন্দিরের দিকে তাকালেন হরিহর। এক লহমায় মন স্থির করে নিলেন। না, আর কোন সংকোচ নয়। লোকলজ্জার ধার ধারবেন না তিনি। যে যাই ভাবুক, যেটা সত্য সেটাই তিনি বলবেন। কিন্তু তার আগে ছবিরাণীকে জানানো দরকার।

চাতালে উঠে তিনি মৃদুস্বরে ডাকলেন, 'ছবিরাণী!'

কোন সাড়া এল না। দরজার সামনে এগিয়ে গেলেন, 'ছবিরাণী!'

এবারও কোন উত্তর নেই।

দ্বিধায় পড়লেন হরিহর। নাম ধরে তৃতীয়বার ডাকতে গি-ও পারলেন না। তাঁর গলা থেকে বেরিয়ে এল, 'ভৈরবী?'

এবার যেন সাড়া পাওয়া যাবে এমন মনে হল হরিহরের! কিন্তু এই ডাকও বিফলে গেল। দোনমনা করতে করতে হরিহর ছবিরাণীর কাছে পেঁছাতে ভেজানো দরজায় চাপ দিলেন। দরজা খুলে গেল। ভেতরে এখনও অন্ধকার। জিভ বের করে মা সেই অন্ধকারে মিশে আছেন যেন। হরিহর মন্দিরের ভেতরে ঢুকে চতুর্থবার ডাকতে গিয়েই চমকে উঠলেন। দুটি পা শূন্যে ঝুলছে। সমস্ত শরীর নগ্ন। জিভ বেরিয়ে এসেছে। যেন মাটি থেকে মা কালী নিজেই শূন্যে উঠে গেছেন। চিৎকার করে উঠলেন হরিহর। তারপর পাগলের মত ছিটকে বেরিয়ে এলেন মন্দির থেকে। একটা কুকুর ডেকে উঠল তাঁকে ছুটতে দেখে। হরিহর দৌড়তে লাগলেন। তাঁর বুকে চাপ পড়তেই একসময় দাঁড়াতে হল। মুখ ঘুরিয়ে মন্দিরের দিকে তাকাতে দেখলেন গাছের আড়ালে চলে গেছে অনেকটা। কিন্তু তার চোখের পাতায় সেই দুটো পা, নগ্ন শরীর আঠার মত আটকে গেছে। কিছুতেই ছাড়াতে পারছিলেন না তিনি। হয়তো এই জীবনে পারবেনও না।

॥ ২০ ॥

এমন ঝড় এই গ্রামে কখনও উঠেছে বলে হরিহরের স্মরণে নেই। এমন কি শ্রীনিবাসের কোমরে দড়ি পরানোর ঘটনাটাও এর কাছে কিছু নয়। দু'দুটো মানুষের মৃতদেহ মন্দিরের সামনে শুইয়ে রেখে পুলিস জনে জনে জিজ্ঞাসা করেছে সারাদিন। প্রথমদিকে একটু ধন্দে পড়লেও গ্রামের মানুষ মৃতদেহটি যে শিবরামের তা চিনতে পেরেছে। আর সেটা চেনার পরে ভৈরবী মা হঠাৎই ছবিরাণী হয়ে গিয়েছে তাদের কাছে। স্বামীকে কুকুর দিয়ে খাইয়ে নিজে আত্মহত্যা করেছে ছবিরাণী। কিন্তু পুলিশ জানতে চাইছে কেন এমন কাজ করল ছবিরাণী? কেউ জবাব দিতে পারেনি। যিনি পারতেন সেই হরিহরও নির্বাক হয়ে গেছেন।

গ্রামের মানুষেরা ভিড় জমিয়েছিল দুপুর পর্যন্ত মন্দিরের সামনে। ছবিরাণীর কাপড়ে ঢাকা মৃতদেহের পাশে কান্নায় ভেঙে পড়া সবিতারাণীকে সামলে রাখার চেষ্টা করেছে গ্রামের কিছু বউ-ঝি। কাঁদতে কাঁদতে বেচারার গলা বসে গেল এক সময়। স্বামী জেলে, একমাত্র দিদি প্রাণহীন অবস্থায় মাটিতে শুয়ে, বেচারা এখন হাঁটু গেড়ে বসে আকাশের এদিকে চোখ-বন্ধ মুখ তুলে হাঁপিয়ে যাচ্ছে সমানে। শব্দহীন।

দারোগাবাবু হরিহরের সামনে এলেন, 'মনে হচ্ছে দাম্পত্যকলহ। লোকটার শরীরে কুকুরের দাঁতের চিহ্ন স্পষ্ট। ভৈরবীর গলার ফাঁসটাও জেনুইন। মনে হয় এ নিয়ে আর ঝামেলা হবে না। এর আগের বার আপনার অনুরোধ রাখতে পারিনি, এবার যাতে গ্রামের মানুষ বিব্রত না হয় সেই চেষ্টা করব। তবে নিয়মরক্ষার ব্যাপার—বডি দুটো সদরে চালান করতে হবে। আপনি কি বলেন?'

হরিহর অনেকক্ষণ বাদে কথা বললেন। গলা শুকনো, 'আপনি যা চান তাই হবে।'

'আহা, আমি তো অনেক কিছু চাইতে পারি! ধরুন, ভৈরবীটির বয়স স্বাস্থ্য মানে শরীর এখন ভরা নদীর মত। মাঠের মধ্যে মন্দিরে একা থাকত। তার যে কোন প্রেমিক ছিল না তা কে জানে? অস্বাভাবিক কিছু নয়। এসবের পেছনে সেই লোকটি থাকতে পারে। দশ-পনেরজনকে থানায় ধরে নিয়ে গিয়ে খবরটা বের করে ফেলা এমন কিছু হাতিঘোড়া ব্যাপার নয়। ও যে লোকটার গায়ে কুকুরের দাঁতের দাগ, সেগুলো ওকে মেরে ফেলার পরেও হতে পারে। বুঝলেন না? আমি চাইলে অনেক কিছুই হতে পারে। কিন্তু এসব আমি চাইছি না। গতবার আপনাকে বিফল করেছি, এবার সেটা শোধ করব। তবে পারলে, মানে, ইচ্ছে হলে একবার থানায় আসবেন। একসঙ্গে চা খাওয়া যেতে পারে।'

দারোগাবাবুর নির্দেশে বাঁশে মৃতদেহ দুটো বেঁধে সেপাইরা হাঁটতে শুরু করল

গরুরগাড়ির রাস্তা পর্যন্ত। সেখানে গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। মৃতদেহ তাতে তুলে দেওয়ামাত্র আর একবার কান্নার রোল উঠল। বসা গলাতেও ছবিরাণীর বোন সবিতারাণী চিৎকার করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। হরিহর চোখ বন্ধ করলেন। যে ছিল বিকাল পর্যন্ত স্বপনচারিণীর মত, যার শরীর, কথা বলা হাঁটা চলা বুকে তরঙ্গ তুলত সেই ছবিরাণী এখন একটি লাস হয়ে চলে যাচ্ছে গরুরগাড়িতে উপুড় হয়ে শুয়ে। দূর শালা! এই তো জীবন! আর এই জীবনের জন্যে সারা জীবন ধরে কত ন্যাকামি, ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। আর তখনই তাঁর কানের কাছে নীলাম্বরের গলা বাজল, 'যা করার তো এখনই করতে হয়!'

হরিহর জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার?'

খগেন ঘোষ বললেন, 'মা তো আর এই মাঠের মধ্যে একা পড়ে থাকতে পারেন না। আজ সারাদিন পুজো হয়নি, ভোগ পড়েনি। তোমার বাপের আমল থেকে এমন ঘটনা কখনও ঘটেনি। এমন কি জগা পাগলাও যাওয়ার আগে ভৈরবী মাকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছিল।'

পীতাম্বর পাশেই ছিল, বলল, 'কিন্তু মায়ের পুজো তো যে কেউ করতে পারে না।'

হরিহর বলে উঠলেন, 'যদ্দিন কোন সাধক এসে দায়িত্ব না নেন তদ্দিন কোন বামুন-ঠাকুরকে বলুন দুবেলা ফুলবাতাসা দিয়ে যেতে। আমি আর কিছু ভাবতে পারছি না।'

পীতাম্বর বলল, 'না, তা বললে চলবে কেন? এই মা জাগ্রত। আমাদের গাঁয়ের সবকিছু এই মায়ের আশীর্বাদের ওপর দাঁড়িয়ে। জগা পাগলা যখন পুজো করত তখন কারো কোন অমঙ্গল হয়েছে? হয়নি। ভৈরবী বানাবার পর কি হল? মা যে অসন্তুষ্ট হলেন তা কারো বুঝতে বাকি আছে? তবে এক্ষেত্রেও তিনি শাস্তি দিলেন ভৈরবীর ভগ্নিপোতকে জেলে পাঠিয়ে। আমরা সেটা বুঝতে পারিনি বলে আজ চোখে আঙুল দিয়ে দুজনকেই শেষ করে দিলেন। এখনও যদি না বুঝি, তাহলে এবার সর্বনাশটা হবে আমাদের সবার।'

হরিহরের কথা বলতে ভাল লাগছিল না। এই মন্দির পত্তন করেছিলেন তাঁর পিতাঠাকুর। গতকাল পর্যন্ত দেখাশোনা এবং সমস্ত খরচের দায়িত্ব তাঁর ছিল। কিন্তু দেবতার মন্দির সম্পর্কে নিজের নিয়ম চলতে পারে না। গ্রামের পাঁচজনের দেবী হয়ে গেছেন মা। অতএব এরাই ঠিক করুক কি করলে ভাল হবে। তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে নগেন ধীরেন জনার্দনদের ডাকলেন। এদের বয়স বাড়ছে কিন্তু এখনও মাতব্বররা এক আসনে বসতে দিতে রাজী নয়। হরিহর বললেন, 'তোমরা কাকা জ্যাঠাদের সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করো মন্দিরের পুজো কিভাবে হবে, কে করবে। আমার আর কদিন, এখন থেকে গ্রামের ভালমন্দের ভার তোমাদেরই নিতে হবে। আমি বাড়িতে আছি। শরীর ভাল লাগছে না।'

বাড়িতে ফিরে এসেছিলেন টলতে টলতে। ধপ করে দাওয়ায় বসে পড়লেন হরিহর। এখন দুপুর পেরিয়ে গেছে। ছায়া ঘন হবার সময় এটা। তাঁর শরীর মনে এখন শুধুই ক্লান্তি। কাজের লোক বালতিতে পা মুখ ধোওয়ার জল

এনে দিলেও হাত নাড়তে ইচ্ছে করছে না। তিনি এক গ্লাস জল চাইলেন।

তৎক্ষণাৎ আদেশ পালিত হল। শুকনো গলা দিয়ে জল নামতে একটু আরাম বোধ হল। গ্লাস নামিয়ে রেখে চোখ বন্ধ করলেন তিনি। যাকগে, সব শেষ হয়ে গেল যখন তখন তাই হোক। দারোগা বলছিল ইচ্ছে করলে দশ-পনেরজনকে জেরা করে ঠিক খুঁজে বের করতে পারতেন ভৈরবীর প্রেমিককে। ভৈরবীর প্রেমিক! কথাটা কানে যাওয়া মাত্র বুকের ভেতর হৃদ্‌পিণ্ড নড়ে উঠেছিল। তিনি কি সত্যি ওর প্রেমিক ছিলেন? হ্যাঁ, ছবিরাণী সম্পর্কে তিনি দুর্বল ছিলেন এবং একথা ছবিরাণী ছাড়া ত্রিভুবনে আর কেউ জানে না। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে ছবিরাণী দুর্বল ছিল এমন কোন ইঙ্গিতও তিনি পাননি। তাহলে? কিন্তু ছবিরাণী কেন আত্মহত্যা করল? কুকুরগুলো যে শিবরামকে মেরে ফেলেছে তা মন্দিরের বন্ধ ঘরে বসে তার জানার কথা নয়। তাহলে? যদি তিনি ওই সময় ওখানে উপস্থিত না থাকতেন তাহলে কি ছবিরাণী আত্মহত্যা করত? তৃতীয় কোন মানুষ তার দুর্বল জায়গা দেখে ফেলেছে এই লজ্জা কি তাকে অন্ধ করে তুলেছিল? হরিহর ধীরে ধীরে শুয়ে পড়লেন। তাঁর মাথা ঘুরছিল। কাজের লোক কখনই বাবুকে এইভাবে দাওয়ায় চিৎ হয়ে শুতে দ্যাখেনি। তারা ব্যস্ত হতেই হরিহর হাত নাড়লেন, 'আমার কিছুই হয়নি। আমাকে একটু একা থাকতে দে তোরা।'

স্বামীকে পুলিস ধরে নিয়ে গেল চোখের সামনে, পাঁচজনে বলছে এ যাত্রাই প্রায় শেষযাত্রা, অন্যদিকে বাঁশে ঝুলিয়ে দিদিকে গরুরগাড়িতে তুলল পুলিসগুলো গ্রাম-সুদ্ধ লোকের সামনে, দুটোই শোক, কিন্তু কোন্ শোকটি হৃদয়বিদারক তা ঠাওর করতে অসুবিধে হয়নি সবিতারাণীর। দিদির আত্মহত্যার সংবাদ পেয়ে সে গলা ছেড়ে কেঁদেছে, মাটিতে আছাড় খেয়েছে, আলুথালু হয়ে ছুটে গিয়েছে মন্দিরে, এসবই ঘটনা। কিন্তু বিয়ের দিন থেকেই তো দিদির সঙ্গে সুতো ছিঁড়েছিল। সেটা আরও স্পষ্ট হয়েছিল দিদির ভৈরবী হওয়ার সময় থেকেই। মন্দিরের দিকে পারতপক্ষে সে যেত না। দিদি তো গ্রামেই আসত না। প্রতিবেশিনীদের মুখে ভৈরবী মায়ের ক্রিয়াকলাপ শুনে প্রায়ই মনে হত, এও কি সম্ভব? দিদি তো খুব সাধারণ মেয়েমানুষ ছিল। হ্যাঁ, শরীর স্বাস্থ্য মুখ চেয়ে দেখার মত, এইটুকুই।

কিন্তু শ্রীনিবাসকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর সে যখন গভীর জলে পড়েছিল তখনই মনে হয়েছিল, আর কেউ না থাক দিদি তো কাছাকাছি আছে! বিপদেআপদে তার কাছে ছুটে যাওয়া যেতে পারে! অনেকেই বলেছে, যাও না দিদিকে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর কবে স্বামী ছাড়া পাবে, ভর হলে ঠিকঠাক বলে দেবে। লোভ হত কিন্তু তবু যায়নি সে। কারণ তার মনে হত দিদির পক্ষে কোন অলৌকিক কাজ করা সম্ভব নয়।

আজ দিদির শরীর গরুরগাড়িতে চাপিয়ে ওরা যখন চলে গেল তখন সবিতা-রাণীর মনে হল ত্রিভুবনে তার আর আপনজন বলতে কেউ রইল না। শ্রীনিবাস সামনের শীতে ঘরের চাল ছাইবে বলেছিল, হবে না। এই বর্ষায় প্রচুর জল পড়বে। নগদ পয়সা হাতে নেই, বস্তার ধান শেষ হলে পেটে খিল দিয়ে পড়ে থাকতে

হবে। শ্রীনিবাস যদি কোনদিন জেল থেকে ছাড়া না পায় তাহলে তাকে এভাবেই বেঁচে থাকতে হবে। কি লাভ? তার চেয়ে আত্মহত্যা করাই ভাল। শ্রীনিবাস এর আগে শহরে গিয়ে কি করেছিল তা কখনই তাকে বলেনি। সেই না-বলা কথাগুলোর জন্যেই এই সর্বনাশ। দিদির মৃত্যু যদি শ্রীনিবাসের গ্রেপ্তারের আগে হত, তাহলে তার মনে এত ধকল আসত না।

শ্রীনিবাসের চলে যাওয়ার পর থেকে কদিন খাবারের ডাক এসেছিল প্রতিবেশীদের বাড়ি থেকে। মন্দির থেকে ফিরে আসার পর সবাই চিন্তিত, ভৈরবীর মৃত্যুতে সবিতারাণীর কোন পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম করতে হবে কিনা। তাকে বসিয়ে রাখা হয়েছিল ঘরের সামনে উঠোনে। এতক্ষণে তার ভাগ্য নিয়ে সবাই দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করতে শুরু করেছে। স্বামী গেল, দিদি গেল, এমন অভাগিনী সচরাচর দেখা যায় না। এই সময় খগেন ঘোষ এলেন। তিনি বামুনঠাকুরের সঙ্গে কথা বলে জেনেছেন ভৈরবীর আত্মহত্যার জন্যে সবিতারাণীকে কোন কিছুই করতে হবে না। প্রথম কথা, গোত্রান্তর হয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয়, ভৈরবী হবার পর রক্তবস্ত্র পরিধান এবং সংসার ত্যাগ করায় ভৈরবীকে সন্ন্যাসিনীই বলা উচিত। সন্ন্যাসিনীর মৃত্যুতে কারো অশৌচ হয় না।

খগেন ঘোষের সঙ্গে নীলাম্বর পীতাম্বররা এসেছিল। নীলাম্বর বলল, 'বউমা, তোমার তো সবদিক গেল। মামার বাড়ির লোকেরা কি খোঁজখবর নেয়?'

মাথা নিচু করে বসেছিল সবিতারাণী। দ্বিতীয়বার প্রশ্নটি করা হলে সে মাথা নেড়ে না বলল। পীতাম্বর বলল, 'মহা মুশকিলের ব্যাপার হল!'

খগেন ঘোষ বললেন, 'মুশকিল বলছ কেন? একটা বিহিত করে দিলেই হয়!'

'আপনি আমি বিহিত করলে বাগড়া দেবে ওই ছোকরারা। হরিহর কেন যে আজ ওদের উসকে দিয়ে গেল তা বুঝলাম না। বললাম তারু পণ্ডিত অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, তাঁকে দিয়ে মায়ের পুজো করাও, তো বলে কিনা লোকটা সুদে টাকা খাটায়। বিহিত দিলে সেটা মান্য হবে এমন কোন নিশ্চয়তা আছে?' নীলাম্বর যেন তার ভাইয়ের মনের কথাগুলো বলে ফেলল।

কথা বাড়ছিল। ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠল সবিতারাণীর একা থাকাটা এখন এই গ্রামের অন্যতম প্রধান সমস্যা। অল্পবয়সী যুবতী, সদ্যবিবাহিতা। মন এবং মতি চঞ্চলা থাকবেই। এমন একজনকে বসিয়ে বসিয়ে দুবেলা কে কতদিন খাওয়াতে পারে? শ্রীনিবাস চাষ না করলে ঘরে ফসল আসবে না। হরিহর ওই জমিতে যাকেই চাষের অনুমতি দিক সে নিশ্চয়ই নিজের ভাগ থেকে সবিতারাণীকে অকারণে অংশ দিতে আসবে না। তাছাড়া একজন যুবতী নারীর মাথার ওপর কোন অভিভাবক থাকবে না এ কেমন কথা! শিবরাম নিরুদ্দেশে গেলে ছবিরাণীর মাথার ওপরে তার শাশুড়ী ছিলেন। এমন কি শ্রীনিবাস যাবজ্জীবনে গেলে সবিতারাণীর ওপর ভৈরবী ছিল। তা কাছে না থাকলেও কাছাকাছি ছিল। এখন তো কোন ছাদ নেই। তাহলে?

গুঞ্জন যখন পাক খাচ্ছে তখন সবিতারাণী সোজা হয়ে বসল, 'আচ্ছা, আমি যদি আত্মহত্যা করি, তাহলে এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে তো?'

কথাটা শুনে কেউ চমকালো, কেউ অবাক হল। খগেন ঘোষ বললেন, 'বউমা, আত্মহত্যা মহাপাপ। জেনেশুনে সেটা হতে দিতে পারি না আমরা।'

গলা ভাঙা, শব্দ বের হচ্ছে ফ্যাসফেসিয়ে, সবিতারাণী জিজ্ঞাসা করল, 'তাহলে আমি কি করব আপনারাই বলে দিন।'

পীতাম্বর অনেকক্ষণ ধরে তার খড়খড়ে দাড়িতে হাত বোলাচ্ছিল। এবার বলল, 'একটা খুব ভাল রাস্তা আছে। দুটো সমস্যার সমাধান একসঙ্গে হয়ে যাবে।'

তার ভাই নীলাম্বর যেন এই প্রথম দাদার মনের কথা বুঝতে পারল না। কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি রাস্তা?'

পীতাম্বর তাকে সরিয়ে দিয়ে বলল, 'ব্যাপারটা সকলে ভেবে দেখুন। আমাদের জগা পাগলা ছিল সত্যিকারের সাধক। মানুষ চিনতে তার ভুল হত না। নিজে যাওয়ার আগে সে গ্রামে এসে ছবিরাণীকে ভৈরবীপদে বরণ করে গিয়েছিল। ভৈরবী হবার পরে আমরা ছবিরাণী সম্পর্কে কোন কুৎসা কোন গল্প শুনিনি। তার মানে সে যোগ্য মানুষ ছিল। দিদির কিছুটা বোন সব সময় পায়। সবিতারাণীকে যদি আমরা মন্দিরের ভৈরবী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করি তাহলে অন্যায় হবে না অথচ সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।'

কথা শেষ হওয়া মাত্র গুঞ্জন উঠল। কেউ কেউ সবিতারাণীর দিকে অন্য চোখে তাকাতে লাগল। এমন প্রস্তাব কল্পনাতেও না থাকায় কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না সবিতারাণী।

খগেন ঘোষ মাথা নাড়লেন, 'বারো বছরের ওপর শিবরাম নিরুদ্দিষ্ট ছিল। বারো বছর বেপাত্তা থাকলে স্বামীকে মৃত ধরে নেওয়া হয় বলেই জগা পাগলা ছবিরাণীকে ওই পদে বসিয়েছিল। কিন্তু আমাদের শ্রীনিবাস তো জীবিত। কয়েক দিন আগে হরিহর তার সঙ্গে কথাও বলে এসেছে। আর ধরো, সরকার বাহাদুরের মনের পরিবর্তন ঘটল, হঠাৎই যদি শ্রীনিবাস ছাড়া পেয়ে যায় তাহলে কি হবে?'

পীতাম্বর হাসল, 'আপনি দিবাস্বপ্ন দেখছেন। দারোগাবাবু বলে দিয়েছেন যে ধারায় সে চালান গেছে তা থেকে নিস্তার নেই।'

এই সময় নগেন ধীরেন জনার্দনরা দল বেঁধে উপস্থিত হল সেখানে। পীতাম্বরের প্রস্তাব শুনে হকচকিয়ে গেল তারা। নগেন বলল, 'কিন্তু কাকাবাবু, একবার যে ভৈরবী হবে তার তো আর সংসার করা চলবে না।'

পীতাম্বর হাসল, 'সে তো একশবার।'

'কিন্তু সরকার যদি ভোটে হেরে যায় তাহলে শ্রীনিবাস ছাড়া পাবেই। ভোটে কে জিতবে কে হারবে তা তো কেউ বলতে পারে না। আর শ্রীনিবাস ফিরে এলে সে নিশ্চয়ই বউকে মন্দিরে থাকতে দেবে না।' ধীরেন যুক্তি দেখাল।

এইবার নীলাম্বর ক্ষেপে গেল, 'আশ্চর্য, তোমরা আবার বাগড়া দিচ্ছ! মেয়েটা যে আত্মহত্যা করতে চাইছে, তার চেয়ে এই ব্যবস্থাটা ভাল নয়?'

আত্মহত্যার কথা শোনেনি নগেনরা, এবার হকচকিয়ে গেল।

বৃদ্ধ খগেন ঘোষ জিজ্ঞাসা করলেন, 'মা, তোমার সম্মতি আছে এই ব্যবস্থায়?'

সবিতারাণী মাথা নাড়ল, 'না, আমি কখনও একা থাকিনি, থাকতে পারব না।'

পীতাম্বর বলল, 'সেখানে তো ভয়ের কিছু নেই। তাছাড়া পাহারাদার হিসেবে জগা পাগলার কুকুরগুলো আছে। চোরের মত হানা দিয়েছিল বলে তারা শিবরামের কি অবস্থা করেছে তা দেখলে তো ? তোমার দিদিকে কখনও বিপদে পড়তে হয়নি।'

'না হোক।' সবিতারাণী জোরে জোরে মাথা নাড়ল, 'তাছাড়া ওসব আমার ধাতে আসে না। পুজোটুজো আমি করতে পারব না।'

'তাহলে তুমি কি করতে চাও ?' নীলাম্বর জানতে চাইল।

'বলেছি তো—আত্মহত্যা! এই ঘরে না খেয়ে শুয়ে থাকতে থাকতে যদি মরে যাই তাহলেই শান্তি। আমি ভৈরবী হতে পারব না।'

যেন অত্যন্ত অবাধ্য মেয়ে মুখরা হয়েছে এমন মনে হচ্ছিল বয়স্কদের! নগেন বলল, 'গ্রামের কেউ না খেয়ে মরে যাবে তা তো হতে দেওয়া যায় না।'

ধীরেন বলল, 'তুমি আমাদের বন্ধুর বউ। সে ফিরে এসে জানতে চাইলে কি জবাব দেব আমরা ? না, না, এ হয় না।'

হঠাৎ সবিতারাণী উঠে দাঁড়াল, 'তাহলে আমাকে একটু সময় দিন। তাঁকে প্রশ্ন করে আসি। তিনি যে নির্দেশ দেবেন তাই হবে।'

সবিতারাণী সবার সামনে দিয়ে হরিহরের বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল।

॥ ২১ ॥

হরিহর দেখলো একটি স্ত্রীলোক তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে। নিজের বারান্দায় অলস ভঙ্গীতে বসেছিলেন তিনি, এই দেখাটা মাথায় স্পষ্ট হতে সময় লাগল একটু। সঙ্গে সঙ্গে ধড়মড়িয়ে সোজা হলেন। এবার চোখে পড়ল কিছুদূরে গ্রামের কিছু কৌতূহলী মুখ।

সবিতারাণী বলল, 'আমি এখন কি করব?'

হরিহর প্রশ্নটির অর্থ ধরতে পারলেন না, 'কি করব মানে?'

'ওরা বলছে মায়ের মন্দিরে ভৈরবী হয়ে যেতে!'

এবার হরিহর উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর সামনে সবিতারাণী, ছবিরাণীর বোন, শ্রীনিবাসের বউ। শ্রীনিবাসের কথা মনে পড়তেই সেই অপরাধবোধে আক্রান্ত হলেন। ছবিরাণীও নেই। ছবিরাণীর বোন সবিতারাণী। কিন্তু কোন বাহ্যিক মিল নেই দুই বোনের গড়নে।

'দিদি বলেছিল আপনার কাছে আসতে।' সবিতারাণী মাথা নিচু করে বলল।

'ঠিকই এসেছিস মা। ভৈরবী হতে হবে না তোকে। সবাইকে দিয়ে তো সব কাজ হয় না।' হরিহর বেশ শান্তস্বরে কথাগুলো বললেন।

এবার নীলাম্বর এগিয়ে এল, 'তাহলে দুটো সমস্যা হবে। মন্দিরের পুজো—।'

হাত তুলে তাকে থামালেন হরিহর, 'বন্ধ থাকবে।'

'বন্ধ থাকবে? কি বলছ?'

'ঠিকই বলছি। যদ্দিন প্রকৃত পুজারী না পাওয়া যায় ততদিন মন্দির বন্ধ থাকবে। ভুল আমারই হয়েছিল। জগা পাগলা চলে যাওয়ার সময় ওই রায় না মেনে তখনই যদি বন্ধ করে দিতাম তাহলে আজও দুটো মানুষ পৃথিবীতে বেঁচে থাকত।' হরিহরকে খুব বিমর্ষ দেখাচ্ছিল।

'এ হতে পারে না। এতদিনের মন্দির, গাঁয়ের সবার ভালমন্দ ওর সঙ্গে জড়িত, এক কথায় সেই মন্দিরের পুজো বন্ধ করে দেওয়া যায় না।' পীতাম্বর বলে উঠল।

'বেশ। তোমরা যা ভাল বোঝ তাই কর। ওই মন্দির সম্পর্কে আমার আর কোন আগ্রহ নেই, দায় নেই। যে সাহায্য চাইবে দেব। তোমরা সবাই মিলে কি করবে ভেবে দ্যাখো।'

নগেন বলল, 'আমাদের শ্রীনিবাসের বউ-এর তো কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই, তাই সবাই মিলে ওকে ভৈরবীর কাজটা দিতে চেয়েছিল—।'

'ভৈরবীর কাজ কাউকে দেওয়া যায় না। যে করবে তাঁকে দেখে সাধকরাই চিনতে পারবেন। আর ওর যাওয়ার জায়গা নেই মানে? এত বড় বাড়ি পড়ে আছে কি করতে? মা যদি ছেলের কাছে থাকে, তাহলে কারও দুশ্চিন্তা রইল না। কিরে,

তুই আমার মা হয়ে থাকবি ?' কাতর চোখে সবিতারাণীর দিকে তাকালেন হরিহর।

হঠাৎই দু'হাতে মুখ ঢেকে ডুকরে কেঁদে উঠল সবিতারাণী। তারপরই হরিহরের পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, 'বাবা, আপনি আমাকে বাঁচান।'

'ছি ছি ছি! ওঠ, ওঠ। মা কখনও ছেলের পায়ে পড়ে নাকি! আমার পাপ আর বাড়াস না মা—ওঠ।' সবিতারাণীকে কোন রকমে সোজা করে দাঁড় করালেন হরিহর। তারপর অন্যান্যদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ বিষয়ে তোমাদের কোন বক্তব্য আছে ?'

এইরকম একটা প্রস্তাব যে হরিহর করতে পারেন তা সম্ভবত কারও কল্পনায় ছিল না। সেই কারণে জবাব চটজলদি এল না। হরিহরের মা ডাক, তুই-তুই করে কথা বলা যে সম্পর্কের ভিৎ তৈরি করে ফেলেছিল সেটা অস্বীকার করার সাধ্য ওদের হল না। নগেনই প্রথম কথা বলল, 'এর চেয়ে ভাল আর কি হতে পারে ?'

হরিহর হাসলেন, 'এতদিন ছন্নছাড়া ছিলাম, আজ থেকে ঘরে মা এল। তোর স্বামী ফিরে না আসা পর্যন্ত তুই এখানে যেমন খুশি তেমন থাক। ওবাড়ির দরজায় তালা দিয়ে আয়। তোমরা কেউ অন্নদার মাকে পাঠিয়ে দিও তো একবার।'

কেউ কেউ যে চাপাগলায় কথা বলেনি তা নয়। শ্রীনিবাসের তরুণী বউ হরিহরের বাড়িতে রাজরাণীর মত আছে। যতই মা-মা বলুক, তুইতোকারি হোক, হরিহর তো একেবারে অথর্ব নয়। তাঁর শরীর স্বাস্থ্য অনেক যুবকের চেয়েও ভাল। বছর পঞ্চাশেক আগে ওঁর চেয়ে বেশী বয়সের মানুষ পনের বছরের ছুঁড়িকে বিয়ে করত। একটু সন্দেহ, খানিকটা ঈর্ষা গ্রামের কিছু মানুষের মধ্যে পাক খেতে খেতে একসময় চাপা পড়ে গেল। অন্নদা তার মাকে নিয়ে নাজেহাল ছিল। বউ-এর সঙ্গে মায়ের বনাবনি নেই। প্রথম প্রথম মায়ের পক্ষ নিয়ে ঝগড়া করত অন্নদা বউ-এর সঙ্গে। কিন্তু যেই বুঝল মায়ের চেয়ে বউ বেশিদিন বাঁচবে, তখন থেকে সে চুপ মেরে গিয়েছিল। হরিহরের ডাক পেয়ে সে স্বচ্ছন্দে মাকে পাঠিয়ে দিল সবিতারাণীর সঙ্গে বাস করতে। অন্নদার মা যেন এতে স্বস্তি পেল। তবু দুবেলা তার ছেলের কাছে যাওয়া চাই। লোকে বলে এটা সেটা আঁচলের তলায় লুকিয়ে নিয়ে যায় ছেলের বাড়িতে। সেই সঙ্গে খবর। ভাল খাওয়া ভাল থাকার খবর। যাদের মন গপ্পো চায় তারা অন্য কিছু শুনতে আগ্রহী। কিন্তু অন্নদার মা যখন কোন কাহিনী শোনাল না তখন সবিতারাণীর থাকার ব্যাপারে সেই সব চাপা-গলা ধীরে ধীরে বুজে গেল।

এখন হরিহরের মনমেজাজ কিঞ্চিৎ ভাল। মন্দিরেও পুজো হচ্ছে। হরিপুরের একজন ব্রাহ্মণকে গ্রামের মানুষ ধরে নিয়ে এসেছে পুজো চালু রাখতে। অতএব মন্দির নিয়ে তাঁর কোন মাথাব্যথা নেই। এখন বাড়িটার চেহারাই বদলে গেছে। সবিতারাণী সময় পেলেই ঘর সাজায়। পুরনো জিনিস বাতিল করে। তাঁকে একটু একটু শাসনও করছে কয়েকদিন হল। এসব থেকে বঞ্চিত ছিলেন এতদিন তাই ভাল লাগাটা বেড়েই যাচ্ছিল। তার ওপর ভাল রান্না। আহা, জিভ যেন বর্তে যায় সবিতারাণীর রান্না খেলে। মাঝে মাঝে অবশ্য মনে হয় বোনের চেয়ে দিদি সব

বিষয়েই নিপুণা ছিল। সে যদি আসত এ বাড়িতে, তাহলে—। এই অবধি ভাবার পর আর ভাবতে পারেন না তিনি। ছবিরাণীকে যেহেতু তিনি কোন ভাবেই মা বলে ডাকতে পারবেন না, তুই বলে সম্বোধন করা অসম্ভব ছিল, তাই এ বাড়িতে কোনদিনই তার আসা সম্ভব ছিল না। যা হতো না তা ভেবে লাভ কি! তবে এই সুখের সময়ে একটাই অস্বস্তি হল অন্নদার মা। বুড়ী তাঁকে একা পেলেই বকরবকর শুরু করে। বুড়ীর বউমা কি ধরনের খারাপ মেয়ে তা শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হবার যোগাড়। কিন্তু হরিহর কিছুই বলেন না। এতদিনে তিনি বুঝে গিয়েছেন পৃথিবীতে কোন সুখই নিটোল পাওয়া যায় না। দুধ পেতে গেলে গরুর লাথি একটু-আধটু সহ্য করতে হয়। গোলাপেরও কাঁটা আছে। তিনি ধরে নিয়েছেন এও তেমনি। অন্নদার মা যখন বলে যায় তখন তিনি ক্রমাগত মাথা নেড়ে যান, কোন মন্তব্য করেন না। জানেন, তাঁর মুখ থেকে বেরুনো একটা কথাই অন্নদার মায়ের অস্ত্র হয়ে যাবে ছেলের বাড়িতে।

কদিন আগে হলে এইরকম অবস্থায় বিরক্ত হতেন হরিহর। এখন এক ধরনের মজা লাগছে। এই যে সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে থাকার আনন্দটা বেশ উপভোগ করছেন। পুকুরধারে দাঁড়িয়ে জলের দিকে তাকিয়ে ছিলেন তিনি। এই পুকুরে স্নান করতে আসত ছবিরাণী।

'বাবা!'

ডাকটা শুনে চমকে পেছন ফিরে তাকিয়ে হরিহর দেখলেন সবিতারাণী তাঁর দিকে চেয়ে আছে। মেয়েটি কখন এসেছে টের পাননি। কিন্তু বাবা ডাকটি কানে লাগল। ছবিরাণীর চিন্তায় বিভোর ছিলেন, তার বোন তাঁকে বাবা বলে ডাকছে। তিনি হাসলেন, 'তুমি আমাকে বাবা বললে!'

সবিতারাণী বলল, 'আপনি আমার বাবার বয়সী। আমার আশ্রয়দাতা। এ গ্রামে আপনি আমার বাবার মত কাজ করেছেন। আপনার খারাপ লাগছে?'

তাড়াতাড়ি মাথা নাড়লেন হরিহর, 'না, না। খুব ভাল। আজ পর্যন্ত কেউ আমাকে বাবা বলে ডাকেনি। মানে, তোমার বয়সী ছেলেমেয়েরা। বল, কোন প্রয়োজন হয়েছে?'

'আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল।'

'বেশ, বল।'

'যে রাত্রে আপনার গাছ কাটা হয়েছিল সেই রাত্রে খুব বৃষ্টি হয়। আপনার ছেলে সন্ধ্যে থেকেই ঘরে ছিল। আমি সাক্ষী। তবু পুলিশ তাকেই ধরে নিয়ে গেল। এটা কেন হল আমি বুঝতে পারিনি এখনও। আপনি জানেন?' সবিতারাণী সরাসরি তাকাল।

হঠাৎ গলার ভেতর কাঠ-কাঠ হয়ে গেল হরিহরের। আবার ওই প্রসঙ্গ উঠবে তিনি ভাবতেই পারেননি। প্রশ্নটা সবিতারাণীর মনে এখনও রয়ে গেছে? হরিহর বললেন, 'পুলিস যখন ওকে ধরে নিয়ে যায় তখন আমি কি চেষ্টা করেছিলাম তা তো তুমি জানো।'

'কিন্তু গাছটা আমাদের বাড়ির সামনে কে ফেলল?'

'আমি তা কি করে বলব ?'

'যে-ই ফেলুক সে জানত সকালে এমন ঘটনা ঘটবে।' আমাকে অনেকে বলেছে এই গ্রামে চুরি হলেও কখনও পুলিস আসেনি।' সবিতারাণীর গলার স্বর পাল্টালো।

হরিহর এক পা এগিয়ে এলেন, 'তখন মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল আমার। উম্মাদ হয়ে গিয়েছিলাম। তারপর থেকে বিবেকদংশনে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছি মা।'

হঠাৎ সবিতারাণী বলল, 'আপনি আমাকে মা বলেছেন। কিন্তু আপনাকে আমি ক্ষমা করব না। আপনি আমাকে যতই আরামে রাখুন না কেন, স্বামীকে ছাড়া স্ত্রীর জীবন যে কি ভয়ঙ্কর তা কোন পুরুষ বুঝবে না।' কথা শেষ করেই সবিতারাণী দৌড়ে বাড়ির ভেতর চলে গেল। পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইলেন হরিহর। মেয়েটা কি সব বুঝে গিয়েছে ? না বুঝলে কেন বলবে তাঁকে কখনও ক্ষমা করবে না! শরীর মন অকস্মাৎ ভারাক্রান্ত হয়ে গেল হরিহরের। তিনি চোখ বন্ধ করলেন।

'মেয়েটা কি বলল ?'

গলা শুনে হরিহর দেখলো অন্নদার মা সামনে দাঁড়িয়ে। তিনি মাথা নাড়লেন, 'কিছু না।'

জেলখানার ভাতে আরাম নেই। কিন্তু অভ্যেস হয়ে গেলে যেমন সব কিছুই ধাতে এসে যায় তেমনি কারাবাসের জীবনে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিল শ্রীনিবাস। জলপাইগুড়ির জেলখানায় তার চারপাশে যেসব কয়েদী থাকত তারা খুনখারাপি চুরিচামারিতে অভ্যস্ত। কথা বলতে গিয়ে অশ্লীল শব্দ ব্যবহার না করে বাক্য শেষ করতে পারে না। শ্রীনিবাস এদের কাছ থেকে প্রচুর অশ্লীল শব্দ শিখল। প্রথমদিকে কেউ জিজ্ঞাসা করলে সে জেলে আসার কারণটা শুনিয়ে সমবেদনা পাওয়ার আশা করত। উল্টে তাকে নিয়ে হাসাহাসি শুরু হয়ে যেত। খুনের আসামীরা ছাড়া কেউ জেলখানায় সারাজীবন থাকে না। তাকে থাকতে হতে পারে। ঘরে বউ রেখে এসেছে। এক খুনী মাথা নেড়ে বলেছিল, 'তোমার কি! জে বসে ভাত বিড়ি খাবে। চাইলে মাঝেমধ্যে মালও পাবে। মেয়েছেলেটা পাবে না। কিন্তু তোমার বউ-এর দুঃখ কমে গেলে চারধারে মাড়িয়ে বেড়াবে। আহা, যৌবনবতী মেয়েছেলে বন্ধাছাড়া বলে কথা!'

প্রচণ্ড খেপে গিয়েছিল শ্রীনিবাস। লোকটাকে মারতে উঠেই খেয়াল হয়েছিল সেটা ভুল হবে। তিন-তিনটে খুন করে এসেছে। তখন খুব খারাপ লেগেছিল। ব্যাপারটা দেখে আশেপাশের কয়েদীরা খ্যা-খ্যা করে হেসেছিল। একজন বলেছিল, 'একদম সচ বাৎ! গোসা করে কি লাভ ? তোমার বউ-এর বয়স কত ? বিশ-বাইশ ? তোবা তোবা! তুমি এখানে আর সে সেখানে লবেঞ্চুশ খাবে ?'

শ্রীনিবাসের মনে হয়েছিল এটা কখনই সম্ভব হবে না। সবিতারাণী সেই রকম মেয়ে নয়। কিন্তু কি খাবে ? কি পরবে বউটা ? কে খাওয়াবে ? যে চিন্তাটা মাথায় ছিল না তাই তৈরি করে দিল ওই লোকগুলো। সবিতারাণীর দিদি

ছবিরাণী বারো বছরের ওপর একা একা ছিল। হ্যাঁ, শাশুড়ী সঙ্গে থাকত বটে কিন্তু ছবিরাণী ইচ্ছে করলে যা-ইচ্ছে করতে পারত। করে নি। তবে করতে ইচ্ছে ছিল কিনা কে জানে। হরিপুরের সনাতনের কাছে গিয়েছিল জনার্দনের সঙ্গে, এমন কথাও কানে এসেছে। কেউ কেউ বলেছে, হরিহর জ্যাঠা এত সাহায্য কি বিনাস্বার্থে করেছে? যাই বলুক কেউ কোন প্রমাণ দিতে পারবে না। সেই দিদির বোন হয়ে সবিতারাণী কেন অসৎ হবে?

প্রথমদিকে এই ভাবনাটাই বুক জুড়ে থাকত। তারপর হঠাৎ মনে হল সে যদি সারাজীবন জেলে থাকে, তাহলে সবিতারাণীর কি হবে? মেয়েটা যদি কাউকে বিয়ে করে সুখে থাকে তাতে ক্ষতি কি? ব্যাপারটা কল্পনা করতেই পারল না সে। কিন্তু এইসব সময়ে পাশের লোকদের কুশ্রী কাণ্ডগুলোয় সে নিজের অজান্তেই জড়িয়ে পড়ল। ওইসব অপরাধীদের কারাজীবনের গল্প শুনতে শুনতে তার মনে হত সে কত ব্যাপারে বঞ্চিত হত। দু'তিনটি নারী পয়সা পেলে জামাকাপড় খুলে সামনে নাচবে এমন অভিজ্ঞতা সে কল্পনা করেছে কখনও? অথচ এদের অনেকেই সেই দৃশ্য দেখেছে। শ্রীনিবাসের মনে হল, এতকাল গ্রামের বন্ধ জায়গায় থেকে সে পৃথিবীটা সম্পর্কে কিছুই জানে না। একটু একটু করে বেশ কিছু অশ্লীল শব্দ তার জিভে বসে গেল। শব্দগুলো উচ্চারণ করার সময় বেশ মজা পেত সে।

তারপর হঠাৎই তাকে সরিয়ে আনা হল বহরমপুর জেলে। মিসায় বন্দী আসামীদের রাখা হল একটা দিকে, কারণ সাধারণ খুনীদের সঙ্গে তারা থাকতে চাইছিল না। শ্রীনিবাস এতদিনে অনেক অভিজ্ঞ। একটি ভদ্রচেহারার আসামী তাকে প্রশ্ন করেছিল, 'আপনি কোন দলের?'

শ্রীনিবাস হেসেছিল, 'দল? দল কি বে? কি আনসান বলছো?'

॥ ২২ ॥

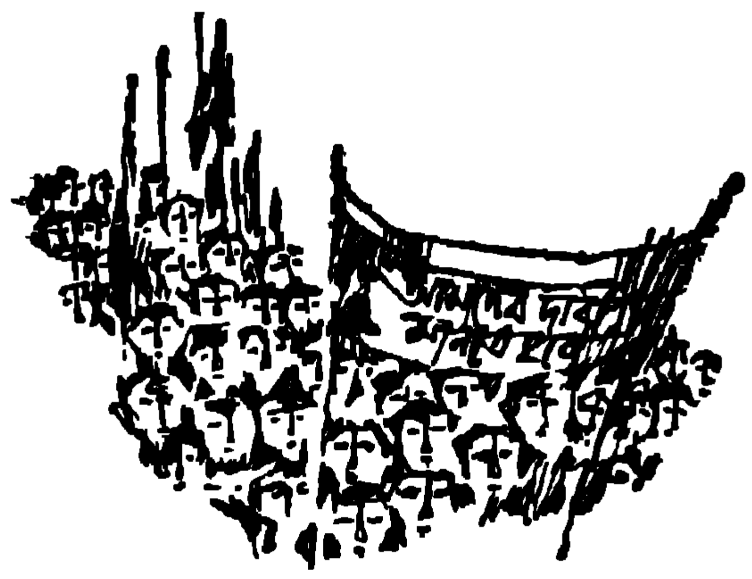

বহরমপুর জেলে তখন মিসায় বন্দী রাজনৈতিক কর্মীদের জড়ো করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে নেতার সংখ্যা নেই বললেই চলে। কিন্তু পৃথিবীর সব দেশেই নেতাদের থেকে প্রকৃত কর্মীরা আদর্শের ব্যাপারে অনেক বেশি আবেগপ্রবণ। দেশের বিশৃঙ্খল রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে সরকারের ওই দমননীতির বিরুদ্ধে এঁরা স্বভাবতই বিক্ষুব্ধ ছিলেন। জেলে বসে রোজই এই নিয়ে আলোচনা চলত। যেভাবে নকশালেরা বিপ্লবের ডাক দিয়েছিল সেই পথকে এঁরা সমর্থন করতেন না। অথচ ঠিক কোন্ পথে গেলে এতকালের জমানো আদর্শ বাস্তবায়িত হবে তাও ভেবে পাচ্ছেন না। ভারতবর্ষের মত এক দশ ঘোড়ার দেশে একটি বিপ্লবের লাগাম যোগাড় করা যে স্বপ্নাতীত ব্যাপার এই বোধ অনেককেই আক্রমণ করেছে। কিন্তু মিসায় বন্দী হয়ে আর এক ধরনের আক্রোশে তিক্ত হচ্ছেন তাঁরা। শ্রীনিবাস এই দলের মাঝখানে এসে পড়ল।

এতকাল শ্রীনিবাসের সম্বল ছিল সারল্য। অরাজনৈতিক জীবনে অভ্যস্ত সে, মানবিক সম্পর্কগুলোকে সশ্রদ্ধায় মেনে চলত। দারিদ্র্যসীমার অনেক নিচে বাস করলেও স্বল্প চাহিদার জন্যেই বিপুল ক্ষোভ ছিল না। যে কারণে পার্টির বাবুরা বক্তৃতা করে যাওয়ার পরেও গ্রামে বসে সে হরিহরকে জোতদার অত্যাচারী বলে ভাবতে পারেনি। হরিহরের জমি সে চাষ করে। বীজ, সার হরিহর দেন। ফসলের একটা অংশ হরিহরকে দিতে হয়। সেই অংশ না দিলে বীজ এবং সারের জন্যে যে খরচ করতে হত সেই টাকা সে জমিয়ে রাখতে পারত না। আসলে ওই অংশটুকু না দিলেও তার অবস্থার তেমন উন্নতি হত না। শুধু চাষের ওপর নির্ভর করে যেমন চলা উচিত তেমনই চলছিল তার। অর্থ উপার্জনের অন্য কোন পথ জানা না থাকায় আক্ষেপ হত এই মাত্র। জলপাইগুড়ির জেলে ঢুকে সে চোর বদমাস খুনীদের সংস্পর্শে এল। অশ্লীল শব্দের অসাড়ে ব্যবহার করতে শিখলেও রক্তে মেশা সারল্য কিন্তু নষ্ট হল না এত সহজে। শুধু সবিতারাণীর কথা ভাবলে প্রথমে যে কষ্ট হত তা একসময় শেখানো বুলির ছড়া কেটে কেটে ভোঁতা হয়ে যাচ্ছিল। এই টানাপোড়েনের সময় বহরমপুর জেলে এক কর্মী যখন তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমায় মিসা করল কেন ভাই?' তখন সে সজোরে মাথা নেড়েছিল, 'জানি না। হয়তো গান্ডু বলেই আমাকে ধরেছিল।'

কর্মীটি বলেছিল, 'ছিঃ! এভাবে কথা বলবে না। সরকার যে দমননীতি চালাচ্ছে তা যারা মানবে না বলে আশঙ্কা করছে তাদেরই মিসায় আটকাচ্ছে। সেদিক চিন্তা করলে তুমি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ মানুষ। বুঝলে?'

শ্রীনিবাস হাঁ হয়ে গিয়েছিল। একটু সামলে বলেছিল, 'আপনি মাইরি এক

নম্বরের খাজা। শুয়েছিলাম বউ-এর পাশে। সকাল হতেই পুলিশ কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে এল। তার আগে কেউ আমার দিকে তাকাত না। গাঁয়ের বাইরে কেউ নামই শোনেনি। আমাদের অনন্ত মাতালকে সাত গাঁয়ের মাতাল তার মাতলামির জন্যে চেনে—আমাকে কেউ চেনে না। আর আপনি বলছেন আমি গুরুত্বপূর্ণ মানুষ? ফোট্!'

'তুমি কি গ্রামে এই ভাষায় কথা বলতে?'

'না। জলপাইগুড়ির জেলে শিখেছি। বললে বেশ জোর পাওয়া যায়।'

'গ্রামে তুমি কি কাজ করতে? পার্টি করতে নিশ্চয়ই?'

শ্রীনিবাস মাথা নেড়েছিল, 'আমাদের গাঁয়ে কেউ ওসব করে না।'

'সে কি! ওখানে কোন রাজনৈতিক দল নেই?'

'না। বাইরে থেকে গিয়ে লেকচার দিয়ে আসে মাঝে মাঝে।'

'চমৎকার! তুমি কি গ্রামের বাইরে পার্টি করো?'

'আমি ওসব কিছুই করি না।'

'তাহলে তোমাকে ধরে নিয়ে এল কেন?'

'হরিহর জ্যাঠার গাছ চুরি গিয়েছিল। পুলিশ সেই গাছটাকে আমার বাড়ির সামনে পেয়ে থানায় ধরে নিয়ে এল। থানা থেকে জলপাইগুড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিল, সেখান থেকে এখানে।'

'গাছটাকে চুরি করেছিলে তুমি?'

শ্রীনিবাস লোকটার দিকে তাকাল। এমন বোকার মত কথা সে কখনও শোনেনি, 'আপনি বহুৎ বোকা দেখছি। যে চুরি করে সে কি নিজের বাড়ির সামনে চোরাই জিনিস দেখাবার জন্যে ফেলে রাখে? গ্রামেরই কেউ আমাকে ফাঁসাবার জন্যে এই নক্সা করেছিল। এক-একবার মনে হচ্ছে, হরিহর জ্যাঠাই করেছে।'

'হরিহর জ্যাঠা কে?'

'আমাদের গ্রামের সবচেয়ে বড়লোক। ওরই জমি আমরা চাষ করি। কিন্তু লোকটা খারাপ না। না চাইতেও অনেক দেয়। এই যে আমার বউ সবিতারাণী, ওর বিয়েটা তো আড়ালে থেকে হরিহর জ্যাঠাই দিয়েছে। কিন্তু ওঁর সামনে ইনকিলাব জিন্দাবাদ বলেছিলাম বলে হয়তো চটে গিয়েছিল আমার ওপর।' শেষ কথাগুলো নিজের মনেই বিড়বিড় করল শ্রীনিবাস।

'ইনকিলাব জিন্দাবাদ বলতে চটে গেছে? লোকটা তো বুর্জোয়া, শোষক! কয়েক পুরুষ ধরে অত্যাচার করে গেছে গ্রামের সর্বহারা মানুষের ওপর, তাই না?'

'ধুস! একেবারে উল্টো। ওরকম মানুষ হয় না।'

কর্মীটি গম্ভীরমুখে ফিরে গেল। এরকম সমস্যার মুখোমুখি সে হয়নি। এতদিন জেনে এসেছে পৃথিবীতে দুটো জাত থাকে। একদলের আছে অন্যদলের নেই। যার আছে সে বুর্জোয়া যার নেই সে সর্বহারা। সেই সর্বহারাদের একত্রিত করে আন্দোলন করতে হবে বাঁচার দাবিতে। বুর্জোয়া মানে শোষক, অত্যাচারী। তাদের টেনে নামাতে হবে মাটিতে। এই কাজটি কেউ করে বন্দুকের নল দেখিয়ে, কেউ মানুষের মানসিকতাকে তৈরি করে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের মাধ্যমে। এই

কর্মীটি দ্বিতীয় পথে কাজ করছে। কিন্তু একজন সর্বহারা শোষকের প্রশংসা করছে এমন কথা কখনও শোনেনি সে।

মাঝারি এক নেতার কাছে সে প্রসঙ্গটি জানাল। এই নেতা ওপরের সারিতে উঠতে না পারলেও প্রচুর পড়াশুনা করেছেন। জিজ্ঞাসা করলেন, 'রাজনীতি না করা সত্ত্বেও ওকে মিসা করেছে ?'

'হ্যাঁ দাদা।'

'পুরোনো আক্রোশে ফাঁসিয়েছে। চাষবাস করে—, নিজের জমি ?'

'না, জোতদারের। আবার তারই প্রশংসা করছে।'

'ওই যে—বিয়েটা জোতদার দিয়ে দিয়েছে, তাই। মানুষকে কত সহজে ভোলানো যায়! তুমি বলছ ওর মনে এর আগে কেউ রাজনৈতিক চেতনা ঢোকাবার চেষ্টা করেনি ?'

'না দাদা, একদম ফ্রেশ। যাকে বলে সান অফ দি সয়েল।'

'কিন্তু ওকে এখানে ধরে আনল কেন ?'

'সেইটে বোঝা যাচ্ছে না। সম্ভবত ওর গ্রামের জোতদারের চক্রান্ত আছে এর পেছনে।'

'গুড। ওর মনে প্রথমে সেইটে ঢুকিয়ে দাও। জোতদারকে ঘৃণা করতে শিখুক আগে। এই ঘৃণা যত তীব্রতর হবে নিজের অধিকার সম্পর্কে ততই সচেতনতা আসবে।'

জলপাইগুড়ির জেলের আবহাওয়ার সঙ্গে এখানকার কোন মিল নেই। শ্রীনিবাস চারপাশে যাদের দ্যাখে তারা বেশ ভদ্রলোক, পার্টির বাবুদের মত চেহারা। অশ্লীল কথা এখানে কানে আসে না। বাবুরা নিজেদের মধ্যেই উত্তপ্ত আলোচনা করেন এবং সেইসময়ে যেসব শব্দ কানে আসে প্রায়ই সেগুলো সে মনে রাখার চেষ্টা করছে। গণতান্ত্রিক অধিকার, বুর্জোয়া পদক্ষেপ, সংশোধনবাদ, সর্বহারা। শব্দগুলো বেশ খটোমটো কিন্তু মনে মনে কয়েকবার উচ্চারণ করে সে বুঝল এতে জোর পাওয়া যায়। শব্দগুলোর মানে সে বুঝতে পারছে না। যে কর্মী ছেলেটির সঙ্গে তার আলাপ হয়েছে সে বলেছে সব ঠিকঠাক বুঝিয়ে দেবে। ছেলেটির নাম ব্রজেন। বাড়ি মেদিনীপুরে। ব্রজেন বলেছিল, 'এই যে তুমি জেলে বসে আছ, তা তোমার জমি চাষ করছে কে ?'

শ্রীনিবাস মাথা নেড়েছিল, 'জানি না। হয়তো এমনি পড়ে আছে। নয়তো হরিহর জ্যাঠা আর কাউকে দিয়ে চাষ করিয়ে নিচ্ছে।'

'তার মানে তোমার জমি তিনি এই সুযোগে দখল করে নিচ্ছেন ?'

'জমিটা তো আমার নয়।'

'আহা, এতদিন যখন চাষ করতে—লাঙল যার জমি তার। তা তোমার মা বাবা বউ যদি ফসল না পায় তাহলে তো না খেয়ে মরবে !'

'আমার মা-বাপ নেই। কিছুদিন আগে বিয়ে করেছি, সেই বউ—।'

'তিনি একা আছেন গ্রামে ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। প্রথম প্রথম তার জন্যে দুশ্চিন্তা হত, এখন হয় না।'

'হয় না কেন ?'

'কি হবে ভেবে ? এই জেলেই তো সারাজীবন পচে মরতে হবে। কোনদিন তার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারব না। মিসা মানে জীবনভোর এখানে থাকা।'

'এসব কথা কে বুঝিয়েছে তোমাকে ? ইয়ার্কি নাকি ? বিনা বিচারে কতদিন ওরা আমাদের জেলে আটকে রাখতে পারবে ? ওই অর্ডিন্যান্সের মেয়াদ কতদিন ? এক বছর—দু বছর ? তারপর ইমার্জেন্সি তুলে নিলেই আমাদের ছেড়ে দিতে হবে। নইলে দেশের মানুষ ওদের ছেড়ে দেবে না।'

'বলছো ?'

'নিশ্চয়ই।'

'তাহলে সবিতারাণীর সঙ্গে অল্পদিনের মধ্যেই আমার দেখা হবে ?'

'বাঃ, সুন্দর নামখানি তো! অবশ্য দেখা হওয়াটাই সব নয়, তোমাদের জোতদার তাকে কি অবস্থায় রাখে তার ওপর সব নির্ভর করছে।'

'তার মানে ?' চমকে উঠল শ্রীনিবাস।

'ব্যাপারটা বোঝ। তোমাদের জোতদার বড়লোক এবং সে জোতদার বলেই শোষক। তাঁর হাতে টাকা আছে। সে কেন তোমার ঘরের সামনে নিজের গাছ কাটিয়ে রাখতে যাবে ? কেন সেপাইরা তোমাকে এমন সময় ধরল যখন মিসায় চালান যাচ্ছে ? এমন তো হতে পারে, জোতদার চাইছিল না তুমি ওই জমি আর চাষ করো! এমন তো হতে পারে, তোমাকে সরিয়ে দিতে পারলে তোমার স্ত্রী যখন দুর্দশায় পড়বেন তখন ওই জোতদার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে নিজের মতলব পূর্ণ করতে! এছাড়া তো অন্য কোন কারণই দেখতে পাচ্ছি না।'

'হরিহরজ্যাঠা ?' শ্রীনিবাস বিশ্বাস করতে পারছিল না।

'তোমার নিজের জ্যাঠা ?'

'না। কিন্তু—'

'ওসব আত্মীয়ের সম্পর্ক এই জোতদার বুর্জোয়ার জাতরা কেয়ার করে না। এই হরিহর লোকটার চরিত্র কেমন ? মানে মেয়েঘটিত ব্যাপারে বলছি!'

'জেঠিমা মারা গেছে অনেকদিন। কখনও কোন বদনাম রটেনি। গাঁয়ের সব মানুষের বিপদে-আপদে পাশে গিয়ে দাঁড়ান। ঘর থেকে পয়সা খরচ করেন। অনেকে ব্রহ্মচারী বলে ওঁকে। শুধু—'

'শুধু ?'

'মানে, আমার সন্দেহ, কোন প্রমাণ নেই, ছবিবউদির ওপর উনি একটু বেশি দুর্বল ছিলেন!'

'ছবিবউদি কে ?'

শ্রীনিবাস বুঝতে পারছিল না, ছবিরাণীর প্রকৃত পরিচয় দেওয়া ঠিক হবে কিনা। কিন্তু বলতে আরম্ভ করার পর তার আর সেই হুঁশ রইল না। শিবরামের কথা, ছবিরাণীর একা থাকার কথা, হরিহরের ঔৎসুক্যের কথা, ছবিরাণীর অভিনয়ের ব্যাপারে আপত্তির কাহিনীগুলো বলে সে এসে থামল বিবাহ-প্রসঙ্গে। সত্যি বলতে বিনা স্বার্থে তো কেউ অন্যের বোনের বিয়ে দেয় না। তারপর ছবিরাণীর ভৈরবী

হওয়ার পর মনে হয়েছিল হরিহর গুটিয়ে গিয়েছেন। এসব কথা কারো সঙ্গে আলোচনা করতে পারেনি শ্রীনিবাস। এখন মনে হচ্ছে, ছবিরাণীর ওপর ওঁর নিশ্চয়ই লোভ ছিল। ব্রজেন হাসল, 'তাহলে বুঝতে পারছ, এই সাধুবেশী মানুষটি যখন দেখল তোমাকে সরিয়ে দিতে পারলেই ছবিরাণীর বোনকে পাওয়া সম্ভব তখন সেই কাজটা স্বচ্ছন্দে করে ফেলল সে। আসলে এই শ্রেণীর মানুষকে বিশ্বাস করা অসম্ভব শ্রীনিবাস।'

শ্রীনিবাসের মনে হল ব্রজেন ঠিকই বলছে। হরিহরকে বিশ্বাস করা যায় না। যদি সে ছাড়া পায় এবং গ্রামে গিয়ে দ্যাখে সবিতারাণীর ক্ষতি হয়েছে তাহলে সে লোকটাকে ছেড়ে দেবে না। প্রচণ্ড আক্রোশে ফুঁসতে লাগল সে। ব্রজেন হাসল, 'এভাবে নয়, আগে নিজেকে তৈরি করতে হবে। সংগঠনে যোগ দিতে হবে। সর্বহারার আন্দোলনের শরিক না হলে তুমি একা বুর্জোয়াদের সঙ্গে লড়াই করতে পারবে না। এসো আমার সঙ্গে।'

কয়েকদিন ধরে গ্রামে একটা গুজব পাক খাচ্ছিল। মধ্যরাতে যারা মাঠে যেতে বাধ্য হয়েছে তারাই দেখেছে মন্দিরের সামনে দুটি ছায়ামূর্তি হেঁটে বেড়াচ্ছে। প্রথম প্রথম হাসাহাসি, কিছু মজার মধ্যে ছিল গুজবটা। কিন্তু অনন্ত মাতাল মাঝরাতে হরিপুর থেকে ঘুরতি পথে গ্রামের দিকে আসছিল। হঠাৎ তার চোখে পড়ে ছবিরাণী মন্দিরের চাতালে বসে গান গাইছে। প্রথমে তার মজা লাগছিল। কিন্তু তার পরেই শিবরামকে এগিয়ে আসতে দেখে সম্বিৎ ফিরে এসেছিল। পাগলের মত দৌড়ে গ্রামে ঢুকে চিৎকার শুরু করেছিল অনন্ত। তার চিৎকারে যাদের ঘুম ভেঙেছিল তারা প্রথমে ভেবেছিল এটা মাতালের প্রলাপ। কিন্তু অনন্ত দিব্যি দিয়ে বলেছিল, পয়সা না থাকায় সে সেই সন্ধ্যেবেলায় হরিপুরে মদ খেতে পারেনি। তার যে টনটনে জ্ঞান আছে তার প্রমাণ দেওয়ার জন্যে সে নানারকম কসরত করে দেখিয়েছিল।

পরদিন সকাল হতেই অনন্তর দেখা দৃশ্যটি নিয়ে আলোচনা শুরু হল। অনন্ত যদি নেশাগ্রস্ত থাকে তাহলে অতটা রাস্তা ওই শরীর নিয়ে ছুটে আসা সম্ভব নয়। গ্রামে যাই ঘটুক, তা শেষ পর্যন্ত হরিহরের কাছে পৌঁছায়। হরিহর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'কেউ যদি কিছু দেখে থাকে তো কি করা যাবে?'

নীলাম্বর বলল, 'এ কথা বললে চলে? গ্রামের কল্যাণ অকল্যাণ বলে একটা ব্যাপার আছে, তাই না? দু'দুটো অতৃপ্ত আত্মা মন্দিরে পাক খাচ্ছে আর আমরা হাত গুটিয়ে বসে থাকব?'

হরিহর বললেন, 'বেশ তো, আজ রাত্রে তোমরা দল বেঁধে লাঠিসোঁটা নিয়ে তাদের মন্দির থেকে তাড়িয়ে দিয়ে এস। তাহলেই ল্যাঠা চুকে যাবে।'

গণেশ ঘোষ খেঁকিয়ে উঠল, 'কি কথার ছিরি! মন্দির থেকে তাড়ালে তারা তো এই গ্রামে এসে বাসা বাঁধতে পারে! আমি বলি কি গয়ায় গিয়ে পিণ্ডি দিয়ে এসো আর মন্দিরে একটা শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করো।'

'এতে তো খরচ আছে!' হরিহর গম্ভীর মুখে বললো।

হরিহরের মুখে এইরকম কথা শুনবে এমন কেউ ভাবেনি। যে মানুষ গ্রামের সবার ভালর জন্যে আগবাড়িয়ে টাকা দেয় তার এ কি রকম কথা! পীতাম্বর কথা ঘোরাবার জন্যে বলল, 'তার একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কিন্তু পিণ্ডিটা দেবে কে?'

এই সময় ভেতর থেকে সবিতারাণীর গলা পাওয়া গেল, 'আমি দেব।'

হরিহর চমকে উঠলো। সবিতারাণী ততক্ষণে বারান্দায় বেরিয়ে এসেছে, 'আমার দিদি-জামাইবাবুর পিণ্ডি আমি দেব। এই দিদি আমার মায়ের মত। তার আত্মা যদি কষ্ট পায় তাহলে আমার কিছু করা উচিত। কিন্তু আমি তার আগে নিজের চোখে দেখতে চাই।'

নীলাম্বর অবাক হল, 'কি দেখবে মা?'

'সত্যি মন্দিরের সামনে রাত্রে ওরা ঘুরে বেড়ায় কিনা?'

'তুমি মেয়েছেলে হয়ে ওখানে রাত্রে যাবে?'

'মেয়েছেলে বলে যাওয়াটা কি দোষের?'

'তা বলছি না। তবে কিনা যাওয়াটা শোভন নয়।'

'যত বাজে কথা! মেয়েছেলে আর পুরুষে তফাৎ কি? আমার স্বামীকে ওরা যার হুকুমে ধরে নিয়ে গিয়েছে তিনিও একজন মেয়েছেলে। শুনেছি সমস্ত দেশটাকে তিনি কঠোর হাতে চালান। সেটা শোভন নয়?'

হরিহর বললেন, 'মা যা বলল তাতে যুক্তি আছে। শোনা কথায় বিশ্বাস না করে সে নিজে যাচাই করে নিতে চায়। তবে রাত-বিরেতে ওই জায়গায় একা যাওয়া ঠিক হবে না। কয়েকজন যদি ওর সঙ্গে যায় তাহলে ভাল। দ্যাখো কে কে যাবে!'

বৃদ্ধ খগেন ঘোষ বলল, 'যেতে হলে আজ বাদে কাল ঘোর অমাবস্যা, তখনই যাওয়া ভাল।'

কিন্তু দেখা গেল অমাবস্যায় সবিতারাণীকে প্রেতাত্মা দেখার সঙ্গ দিতে কেউ রাজী হতে পারছে না। সাহসীদের একটা-না-একটা সমস্যা তৈরি হয়ে যাচ্ছে। কোন মহিলা এগিয়ে এলেন না। খবরটা যে বেশ চাউর হয়েছে তা বোঝা গেল অমাবস্যার বিকেলে যখন হরিপুরের সনাতনকে হরিহরের গেট খুলে ঢুকতে দেখা গেল।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে সনাতন ডাকল, 'হরিহরবাবু, হরিহরবাবু বাড়ি আছেন?'

হরিহর এইসময় পুকুরপাড়ে থাকেন। তাঁর কানে ডাক পৌঁছাবার আগেই সবিতারাণী বেরিয়ে এল, কোত্থেকে আসছেন?'

সনাতন অবাক হয়ে তাকাল। সে শুনেছে সবিতারাণী এই বাড়িতেই এখন থাকে। ছবিরাণীর বোন যে এতটা স্বাস্থ্যবতী হয়ে উঠেছে তা সে ভাবতে পারেনি। তবে দিদি যদি বিল হয় তবে এ মেয়ে এখনও দীঘি। সনাতন হাসল, 'আমাকে চেনা যাচ্ছে না? আমি সনাতন, হরিপুরে থাকি। তুমি তো ভাই সবিতারাণী, তাই না? তোমার দিদির সঙ্গে আমার ভাল আলাপ ছিল।'

'ও, আপনি নাটক শোনাতেন?'

'হ্যাঁ, ওই আর কি! কলকাতায় বড় বড় গুরুর কাছে তালিম পেয়েছিলাম, কিছুই কাজে লাগল না। আজ সকালে শুনলাম তুমি একটা সাহসী কাজ করতে

চলেছ। দ্যাখো ভাই, ভূত-পেত্নী বলে কিছু আছে কিনা আমি জানি না। চোখে না দেখা পর্যন্ত জানব না। তুমি তোমার দিদির প্রেতাত্মাকে দেখতে চলেছ, আমি সঙ্গী হতে চাই।'

সবিতারাণী অবাক হয়ে গেল, 'আপনি সঙ্গে যাবেন?'

'অবশ্য তোমাদের আপত্তি না থাকলে। তোমার দিদি তোমাকে খুব ভালবাসতেন। যেবার তোমার জন্যে ওষুধ আনতে হরিপুরে গিয়েছিলেন সেবার জনার্দনের সঙ্গে আমার বাড়িতেও যান। ওই মানুষ পেত্নী হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আমি বিশ্বাস করছি না।' সনাতন কথা বলতে বলতেই দেখল হরিহর পাশের পথ দিয়ে এগিয়ে আসছেন। সে হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করল, 'আমায় চিনতে পারছেন হরিহরবাবু?'

হরিহর এ বাড়িতে সনাতনকে আশা করেননি। গম্ভীর গলায় বললেন, 'কি ব্যাপার? আবার ছেলেছোকরারা নাটকের বায়না ধরেছে নাকি?'

'আজ্ঞে না, নাটক নয়।'

এইসময় সবিতারাণী বলল, 'বাবা, উনি আমার সঙ্গে আজ রাত্রে দিদির প্রেতাত্মা দেখতে যেতে চান। কেউ যখন এগিয়ে এল না তখন ইনি এসেছেন। আর চিন্তা নেই।'

হরিহরের কপালে ভাঁজ পড়ল। সনাতনকে তিনি পছন্দ করেন না। তাছাড়া আত্মীয় দূরের কথা, সে এই গ্রামের মানুষ নয়। স্বভাব-চরিত্রও সন্দেহজনক। মধ্যরাত্রের নির্জনে এর সঙ্গে সবিতারাণীকে একা কি করে ছেড়ে দেওয়া যায়?

॥ ২৩ ॥

হরিহর সনাতনকে মুখের ওপর সত্যি কথাটা বলে দিলেন।

কিন্তু সনাতন একটুও অপমানিত হল না, সে হাসল, 'আপনাদের দিক থেকে একথা বলতেই পারেন। আমি অনাত্মীয়, এই গ্রামেরও মানুষ নই। তবে ওঁর দিদিকে চিনতাম। তিনি আমাকে বিশ্বাস করতেন। সেই সুবাদেই চলে এসেছিলাম যখন শুনলাম উনি দিদির প্রেতাত্মার সন্ধানে যাচ্ছেন।'

হরিহরের এইসব কথা শুনতে ভাল লাগছিল না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার সঙ্গে ছবিরাণীর এমন সম্পর্ক ছিল তা আমি জানতাম না তো!''

সনাতন হাত কচলালো, 'দেখুন, আপনি বোধহয় একটু অতিরিক্ত বলছেন। সাধারণ বিষয় একটু অন্যরকম স্বরে বললে অর্থ বদলে যায়। তবে হ্যাঁ, তিনি বিশ্বাস করতেন। এই গ্রাম্যজীবন তিনি সইতে পারছিলেন না। তাঁর অভিনয়-ক্ষমতা ছিল কিন্তু আপনাদের অনিচ্ছায় এখানে সেটা প্রকাশ করতে পারেননি। তাই তিনি আমার সঙ্গে শহরে যাওয়ার কথা চিন্তা করেছিলেন। কলকাতায়।'

'প্রমাণ দিতে পারেন?' হরিহর চাপা স্বরে জানতে চাইলেন।

'এই দেখুন! আমি কি সেসব কথা টেপে ধরে রেখেছি? তবে তাঁর প্রেতাত্মা নিশ্চয়ই মিছে কথা বলবে না। আজ্ঞে, আপনার দাওয়ায় একটা মোড়াও দেবেন না এই ভর-বিকেলে।' সনাতন হাসল।

হরিহর সবিতারাণীকে বলল, 'মা, তুমি ভেতরে যাও এখন।'

সবিতারাণীর আদেশ মান্য করার বিশেষ ইচ্ছে ছিল না কিন্তু বাড়ির গেটে ধীরেনকে দেখে সে ভেতরে চলে গেল। বিয়ের আগে থেকেই ধীরেন তার দিকে বাঁকা চোখে তাকায়। শ্রীনিবাসের বন্ধু হলেও বিয়ের পর তাদের বাড়িতে আসত না। শ্রীনিবাসের জেল হবার পর হরিহরের কাছে আসা-যাওয়া যেন বেড়ে গেছে। দেখা হলেই সেই দৃষ্টি ফিরে আসে। স্ত্রীলোকমাত্রই ওই দৃষ্টির ভাষা পড়তে পারে। পড়ার পর পুলকিত হবার কারণ এখনও খুঁজে পায়নি সবিতারাণী।

ধীরেন সামনে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। হরিহর জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি সত্যি কি চাইছেন?'

'ওই তো বললাম, শ্মশানে যাওয়ার অনুমতি!'

'সেটা আমি দিতে পারি না। তবে শ্মশান তো সর্বসাধারণের জন্যে, আপনি যদি প্রয়োজনবোধ করেন তাহলে নিশ্চয়ই যেতে পারেন, কিন্তু সবিতা-রাণীর সঙ্গে নয়। এবার আসুন।' হরিহর বললেন।

সনাতন কিছু বলার আগে ধীরেন জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার জ্যাঠামশাই?'

'তুমি তো এনাকে চেন?'

'হ্যাঁ।' ধীরেন মাথা নাড়ল।

'আজ রাত্রে সবিতারাণী দিদি-জামাইবাবুর সন্ধানে যাবে জেনে উনি এসেছেন সঙ্গী হতে। ওঁর দাবী, সবিতারাণীর দিদির সঙ্গে ওঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল।'

'মাপ করবেন।' সনাতন প্রতিবাদ করে উঠল, 'তিনি আমাকে বিশ্বাস করতেন। আমি আপনাকে একবারও বলিনি যে ঘনিষ্ঠতা ছিল। আপনি অযথা বিকৃত করছেন!'

'ওই হল—ঘনিষ্ঠতা না থাকলে বিশ্বাস করা যায় না।'

এসব কথা শুনে ধীরেনকে একটু উত্তেজিত দেখাল। সে সনাতনকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কেন ওঁর সঙ্গে যেতে চাইছেন? কি লাভ হবে আপনার?'

'নিজের লাভলোকসানের কথা ভেবে কখনও কোন কাজ করিনি ভাই। শুনলাম ওঁর সঙ্গে এ গ্রামের কেউ যেতে চাইছে না তাই সঙ্গী হতে এলাম।' সনাতন বলল।

'অনেক ধন্যবাদ। এবার আপনি হরিপুরে ফিরে যান। অমাবস্যার রাত, পথ হাঁটতে অসুবিধা হবে।'

সনাতন এক মুহূর্ত চিন্তা করল। তারপর বলল, 'জানেন, জীবনে কোন ক্ষেত্রেই আমি জিততে পারিনি। অথচ আমি জানি জেতার সবরকম পথ আমার জানা ছিল! ঠিক মুহূর্তে প্রয়োগ করতে পারিনি বলেই এই দশা। কোথায় শুরু করেছিলাম আর কোথায় এসে পৌঁছেছি। নিজের ওপর এখন ঘেন্না লাগে। এই ধরুন ছবিরাণী। সুন্দরী মার্জিতা কুশলী অভিনেত্রী হবার সব গুণ ওঁর মধ্যে ছিল। আপনারা প্রতিবন্ধক হবেন ভেবে কলকাতায় যেতে পারছিল না। আমি যদি চাইতাম তাহলে মধ্যরাত্রে ওঁকে গ্রাম ত্যাগ করতে বললে নিশ্চয়ই করতেন। কিন্তু তার বদলে মন্দিরের সেই পাগলা সাধু ওঁকে ভৈরবী বানিয়ে দিয়ে গেল। আর ওঁর শ্যামও রইল কুলও বাঁচল।'

'তার মানে? কি বলতে চাইছেন?' ধীরেন জোর গলায় বলল।

'ওরকম একটা চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ ওঁর মত মেয়ে ছাড়বেন কেন? হাজার মানুষের সামনে ভৈরবী চরিত্রে অভিনয় করা কি কম আনন্দের কথা! আর এ অভিনয় পৃথিবীর মঞ্চে। এর জন্যে কলঙ্কের বদলে শ্রদ্ধাও পাওয়া গেল। আমি এসে দেখে গেছি সেইসময়। তার চোখ দেখে বুঝেছি তিনি বেশ মজা পাচ্ছেন। প্রতি রাত্রে একা থাকার সময় উনি নিশ্চয়ই নিঃশ্বাস ফেলতেন। ওঁর স্বামী যদি মাঝখানে না এসে পড়ত তাহলে ওঁকে—। না, তাই বা কি করে হবে? এক চরিত্রে কতদিন অভিনয় করা যায়? বিরক্তি আসবেই। নতুন চরিত্রে যাওয়ার আগেই ওঁকে মরে যেতে হল।' চোখ বন্ধ করল সনাতন। ধীরেন হরিহরের দিকে তাকাল।

হরিহরের মুখচোখ অস্বাভাবিক মনে হল তার। যেন এমন কিছু শুনেছেন যা তাঁর স্বপ্নের বাইরে ছিল। ধীরেন চটপট সনাতনের কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। যদি শ্মশানে যাওয়াই আপনার উদ্দেশ্য হয় আপনি একাই যান। সবিতারাণীর সঙ্গে আর কেউ না যাক, জ্যাঠামশাই যেতে পারেন, আমিও পারি। উঠুন আপনি।'

নিতান্ত বাধ্য হয়ে সনাতন বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

হরিহর সেদিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করলেন, 'এসব কি শুনলাম!'

'কোন প্রমাণ নেই জ্যাঠামশাই। সনাতনদা হয়তো কল্পনা করেছে ওসব।'

'সাহস পায় কি করে? ও যদি চাইত তাহলে ছবিরাণী ওর সঙ্গে গ্রাম ছাড়ত?'

ধীরেন কিন্তু-কিন্তু করে বলল, 'ছোট মুখে বড় কথা হয়ে যায়—।'

'হ্যাঁ, তবু বল।'

'মেয়েদের মন বোঝা মুশকিল।'

'হুম্। বল কি কারণে এসেছ?'

সঙ্গে সঙ্গে ধীরেন একটু থিতিয়ে গেল, 'না, মানে, ও হ্যাঁ, গ্রামের সবাই তো ওঁর এই দুঃসাহসটাকে পছন্দ করছে না। কেউ সঙ্গে যেতে রাজী নয়। দেখুন না, বাইরের একটা লোক এই সুযোগে নাক গলাতে চাইছে! আর আপনি বলেছেন নিজের চোখে দেখে গয়ায় গিয়ে পিণ্ডি দেওয়া ভাল। তাই বলছিলাম, আপনার আপত্তি না হলে আমি সঙ্গে যেতে পারি।'

'তুমি সঙ্গে যাবে?' হরিহর ধীরেনের দিকে তাকালেন।

'আপনার যদি আপত্তি না হয়?'

'আমার আপত্তি কিসের—তোমরা শ্রীনিবাসের বন্ধু ছিলে—তার স্ত্রীকে সাহায্য করতেই পার। ভালই হল, বুড়ো বয়সে আমাকে রাত জাগতে হল না।'

অনেক চেষ্টায় খুশির প্রকাশ আটকাতে পারল ধীরেন। স্বাভাবিক ভঙ্গীতে জিজ্ঞাসা করল, 'উনি কখন রওনা হবেন? সময়টা জানলে আমি তৈরী হয়ে আসতে পারি।'

'রাত সাড়ে দশটার আগে গিয়ে কোন লাভ নেই।' হরিহর ভেতরে চলে গেলেন। হঠাৎ ধীরেনের মনে হল, সবিতরাণীর সঙ্গে তার যাওয়াটাকেও যেন বুড়ো পছন্দ করছেন না। সে মুখ বেঁকাল—শালা বুড়ো ভাম! বউ-মরা বুড়োগুলো এইরকম সন্দেহবাগীশ হয়।

দিদি-জামাইবাবুর প্রেতাত্মা দেখতে যাবে সবিতারাণী—গ্রামের মানুষ ভিড় জমিয়েছিল হরিহরের বাড়ির সামনে সন্ধ্যের পরেই। কেউ কেউ হরিহরকে বোঝাচ্ছিল সবিতারাণীকে নিষেধ করা উচিত, এসব ব্যাপারে রসিকতা করা ঠিক নয়। কোত্থেকে কি হয়ে যাবে তার ঠিক নেই, বিশেষ করে যে মেয়ের স্বামী গ্রামে নেই। হরিহরের সম্পূর্ণ অন্য কারণে সবিতারাণীকে শ্মশানে পাঠাতে ইচ্ছে করছিল না। প্রেতাত্মা দেখতে চাইলেই যে পাওয়া যাবে তার কোন স্থিরতা নেই। আজ পর্যন্ত কেউ ঘোষণা করে গিয়ে প্রেতাত্মা দ্যাখেনি। ধরেই নেওয়া যায় সবিতারাণীও দেখবে না। আর না দেখলে সে গয়ায় গিয়ে পিণ্ডি দিতে চাইবে না। সেক্ষেত্রে ছবিরাণীর আত্মা কখনই মুক্তি পাবে না। তাছাড়া এইসব মানুষজনের এত আগ্রহ তাঁর ভাল লাগছিল না। সবিতারাণী এ বাড়িতে আসার পর তার সঙ্গে কথা হয় কম। কিন্তু মাঝেমধ্যেই তাকে দ্যাখেন। ওর চলা-বলার মধ্যে ক্রমশ ছবি-

রাণীর আদর্শ ফুটে উঠছে। সেটা দেখে ম নে মনে তৃপ্তি পান হরিহর। ছবিরাণীর স্মৃতিকে যত্নে লালন করাই এখন তাঁর কর্তব্য বলে ঠিক করেছেন। তাই এই সব ঝামেলা ভারী অপছন্দ হচ্ছিল। কিন্তু যাকে নিয়ে এত কথাবার্তা সে ঠিক সাড়ে ৯টায় দরজায় এসে দাঁড়াল। লোকে দেখল সবিতারাণী সাদা শাড়িতে মাথায় ঘোমটা টেনেছে। হরিহরকে সে বলল, 'আমি যাই ?'

হরিহর বললেন, 'তোমাকে একা যেতে দিই কি করে ? চল, আমিও যাচ্ছি !'

'না, আপনি যাবেন না।'

'কেন ?'

'আপনার বয়স হয়েছে। রাত জাগা ঠিক হবে না। তাছাড়া আমার দিদিকে আমি একা দেখতে চাই।' মুখ নিচু করে বলল সবিতারাণী।

'তা হয় না মা। তুমি আমার বাড়িতে আছ। এখন তোমার যে-কোন ভালমন্দের জন্যে আমি শ্রীনিবাসের কাছে দায়ী। 'আমি তোমাকে একা যেতে দিতে পারি না। শ্মশানে তুমি একা থেকো, আমি না হয় দূরে অপেক্ষা করব।' হরিহর বললেন।

অতএব যাত্রা শুরু হল। কৌতূহলী গ্রামবাসীরা ওদের সঙ্গে হাঁটতে লাগল। হরিহর খানিকটা যাওয়ার পর দাঁড়িয়ে পড়লেন, 'আপনারা যে যাঁর বাড়িতে ফিরে যান। বুঝতেই পারছেন, ও কোন আনন্দ করতে যাচ্ছে না। যান সবাই।'

ভিড় থমকে গেল। গুঞ্জন হচ্ছিল। কিন্তু হরিহরের গলার স্বরে এমন কিছু ছিল যে আর কেউ ওঁদের অনুসরণ করল না। খানিকটা যাওয়ার পর হরিহর বললেন, 'মা, ভেবে দ্যাখো, এভাবে রাত জেগে শরীর নষ্ট করো না।'

'আমার শরীর রেখে লাভ কি ?' হাঁটতে হাঁটতেই জবাব দিল সবিতারাণী।

'এমন কথা বলো না। তোমার স্বামী জীবিত।'

'সে তো আর এ জীবনে ছাড়া পাবে না।'

'ঈশ্বরের ইচ্ছার কথা কি কেউ বলতে পারে ?'

'ঈশ্বর আবার কি ? মানুষই তাকে জেলে পাঠিয়েছে !'

হরিহর থমকে গেলেন। অন্ধকারে তাঁর হাতে যে লণ্ঠনের আলো তা বেশীদূরে যাচ্ছে না। সবিতারাণীর মুখ দেখা অসম্ভব। এই মেয়ে কি তাঁকে সন্দেহ করেও আশ্রয়ে আছে ?

খানিকটা হাঁটার পরে হরিহর গলার স্বর পরিবর্তন করলেন, 'আসলে কি জানো, লোকে যাই বলুক, ভূতপ্রেত বলতে কিছু নেই। আজ পর্যন্ত একজন আর একজনকে দেখাতে পারেনি। যে দেখেছে সে নিজেই ভেবেছে দেখেছি। তাই—।'

'তাহলে তো দিদির আত্মার জন্যে পিণ্ডি দিতে যাওয়ার কোন মানে হয় না। তার আত্মাই যখন নেই তখন কারো মুক্তি পাওয়ার কথাও নয়।' সবিতারাণী দাঁড়িয়ে পড়ল।

'না, আমি তা বলিনি।' হরিহর বিড়বিড় করলেন।

'এবার আমি একাই যাই।' সবিতারাণী কথা শেষ করে রওনা হল। হরিহর কি করবেন বুঝতে পারলেন না। ওইটুকুনি মেয়ের কাছে কথায় হেরে যাচ্ছেন তিনি—কি করা যায় ? এই সময় পেছন থেকে গলা ভেসে এল, 'জ্যাঠামশাই !'

হ্যারিকেনের আলোয় ধীরেনের মুখ দেখতে পেলেন তিনি। ধীরেন জিজ্ঞাসা করল, 'জ্যাঠামশাই, ওঁকে আপনি একা একা যেতে দিলেন ?'

'শুনতে চাইছে না।'

'এটা ঠিক হল না। সেই সনাতন লোকটা ওখানে থাকতে পারে।'

'তাই তো!'

'আমি সঙ্গে যাব ?'

'এ্যাঁ! ও, যাও, নিশ্চয়ই যাও।' হরিহরের কথা শেষ হওয়া মাত্র ধীরেন জোরে জোরে পা ফেলল। হরিহর পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইলেন। অমাবস্যার অন্ধকার আজ পৃথিবীকে যেন বড্ড বেশি কালো করে দিয়েছে।

পা চালিয়ে ধীরেন কয়েক মিনিটের মধ্যে সবিতাবাণীকে ধরে ফেলল। অন্ধকারেও তার সাদা শাড়ি বোঝা যাচ্ছিল। পায়ের শব্দ পেয়ে সবিতারাণী থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কে আসছে পেছনে ?'

হঠাৎ যেন গলা শুকিয়ে কাঠ, তবু ধীরেন বলল, 'আমি, ধীরেন।'

'ও, আপনি! কি ব্যাপার ?' সবিতারাণী যেন একটুও অবাক হয়নি।

'তুমি একা যাচ্ছ, তাই ?' ধীরেন খানিকটা তফাতে দাঁড়িয়ে বলল।

'পাহারা দিতে পাঠাল।' সবিতারাণীর গলায় ঈষৎ ব্যঙ্গ।

'আমাকে কেউ পাঠায়নি। আমি নিজই এসেছি।'

'ও। হঠাৎ ?'

'আমার আসতে ইচ্ছে করল, তাই।'

'বন্ধুর বউকে সাহায্য করতে ?'

'ঠিক তা নয়।'

'আমি ভাবলাম আপনাদের জ্যাঠামশাই পাঠিয়েছেন।' সবিতারাণী হাসল।

'জ্যাঠামশাই তোমাকে-খুব স্নেহ করেন।'

'নইলে তাঁর বাড়িতে আছি কি করে ? গাছের ডালপালা ছেঁটে গোড়ায় জল দিয়ে যাচ্ছেন! যাকগে, আমি একাই যেতে পারব।' সবিতারাণী হাঁটা শুরু করল।

ধীরেন তার সঙ্গ ছাড়ল না, 'আমি গেলে আপত্তি আছে ? আমি কি খুব খারাপ ?'

'খারাপ ভালর কথা আসছে কেন ?'

'না, মনে হল।'

'আমার উপকার করার খুব ইচ্ছে আপনার ?'

'তুমি আমাকে যা বলবে তাই করতে পারি।'

'সত্যি ?'

'তিন সত্যি।'

'কেন ? হঠাৎ এমন মন হল কেন ?'

'জানি না—তবে আজ থেকে নয়।'

'বেশ। আমাকে বহরমপুরে নিয়ে যাবেন ?'

'বহরমপুরে?'

'হ্যাঁ। জেলে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করব। সবাই বলে, গেলে নাকি দেখা করতে দেবে না। কিন্তু আমার বিশ্বাস, দেবে। যাবেন আমাকে নিয়ে?'

'কিন্তু আমার সঙ্গে জ্যাঠামশাই ছাড়বে?'

'আবার জ্যাঠামশাই!'

'কিন্তু কি ভাবে যাবে? গ্রামের পাঁচজন কি বলবে?'

'তাহলে আমার সঙ্গে আপনার আসা উচিত ছিল না।'

'বেশ, নিয়ে যাব।'

'আমি সবাইকে বলব আপনি আমাকে বহরমপুরে নিয়ে যাবেন।'

'বেশ, তাই বলো।'

'কথা দিচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।'

ওরা মন্দিরের কাছে শ্মশানের ধারে পেঁছাতেই কুকুরের ডাক শুনতে পেল। অমাবস্যার রাত্রে মানুষের গন্ধ পেয়ে কুকুরগুলো যেন পাগল হয়ে গেছে। হঠাৎ সনাতনের গলা পাওয়া গেল, 'আর এগিও না। ছবিরাণী আর তার স্বামীর দশা করে ছাড়বে কুকুরগুলো।'

ধীরেন চমকে উঠেছিল, 'আপনি এখানে?'

'তখন থেকেই আছি। ঢিল মেরে একটাকে ঘায়েল করেছি। ফেরার সময় তোমাদের ডায়ালগ কানে এল। ছবিরাণীর বোনের কথা বলার ভঙ্গী খুব ভাল। নাটক করলে বেশ নাম করবে। বহরমপুর থেকে কলকাতায় গেলে আমি সাহায্য করতে পারি।' সনাতন খুব গম্ভীর গলায় বলল।

'মুখে আগুন!' বিড়বিড় করল সবিতারাণী।

'তা বলতে পার। তবে ওই কুকুরগুলো তোমার দিদির প্রেতাত্মাকেও ছাড়বে না, বিশেষ করে ওদের একজন যখন ঘায়েল হয়েছে।' সনাতন হাসল।

হঠাৎ সবিতারাণী পেছন ফিরল। তারপর হনহন করে গ্রামের দিকে হাঁটল। সনাতন ধীরেনের কাছে এল, 'চালিয়ে যাও ভাই, সাহসী এবং উদ্যমী পুরুষেরাই জয়মাল্য পায়।'

॥ ২৪ ॥

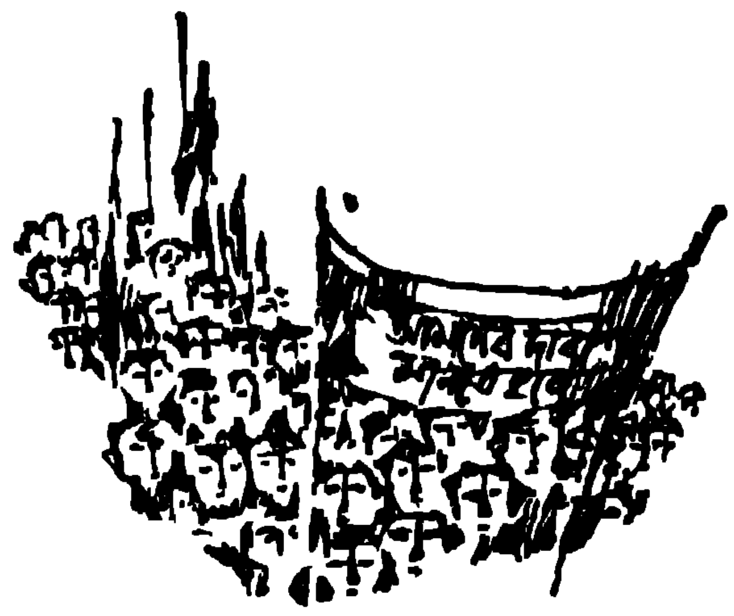

গ্রামের দশটা মানুষ তাজ্জব হয়ে গেল। মেয়েটা বলে কি!

হ্যাঁ, স্বামীকে দেখতে যাওয়া নিশ্চয়ই দোষের ব্যাপার নয় কিন্তু যাচ্ছে কার সঙ্গে?

যুবতী স্বামীছাড়া হলেই মানুষের মনে সন্দেহের ছোবল ওঠে, তার ওপর এই মেয়ে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছে স্বামীর বন্ধুকে নিয়ে বহরমপুরে যাবে! বহরমপুরটা ঠিক কোথায় তাও অনেকের আন্দাজে নেই। ধীরেনের অন্য বন্ধুরাও বেশ হকচকিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তারা এ নিয়ে চেঁচামেচি করেনি। শ্রীনিবাস তাদের বন্ধু, ধীরেনেরও বন্ধু। সে যদি বন্ধুর বউকে একটু সাহায্য করে তাহলে দোষ কি, এমন ভাবনা ভেবে নিজেদের নির্লিপ্ত রাখার চেষ্টা করেছিল। গোল পাকাল প্রবীণেরা। এ হতে দেওয়া যায় না। এ ভ্রষ্টাচার।

হরিহর বসেছিলেন তাঁর বাড়ির বারান্দায়। তাঁর সামনে ছিলেন অনেকে। প্রবীণ খগেন ঘোষ বললেন, 'তোমার আশ্রয়ে সে আছে, অতএব বলার অধিকার তোমার আছে।'

হরিহর বললেন, 'কি বলব?'

খগেন ঘোষ খেঁকিয়ে উঠলেন, 'কি বলব মানে? এটা করতে অনুমতি দিলে গ্রামের আর পাঁচটা ছেলে-মেয়ে কি রকম উৎসাহ পাবে ভেবে দেখেছ?'

পীতাম্বর মাথা নাড়ল, 'ঠিক কথা। এই যে যেমন আমাদের অনাদি পিওনের মেজ মেয়ে হরিপুরে যায় প্রেম করতে, ফস করে বলে বসবে তাকেই বিয়ে করব, তখন? এ গাঁয়ে আজ পর্যন্ত কেউ প্রেম করে বিয়ে করতে পেরেছে?'

অনাদি পিওনের আজ ছুটি ছিল। জটলার এক কোণে বসে চোখ বন্ধ করে বিড়ি টানছিল। হঠাৎ পীতাম্বরের গলায় নিজের নাম শুনে সে হকচকিয়ে গেল। তারপর ঘটনাটা শোনামাত্র তিড়িং করে একটা লাফ মারল, 'কে বলেছে, কোন্ শালা বলেছে আমার মেয়ে প্রেম করছে? সে সেলাই শিখতে হরিপুরে যায়। পীতে, তোকে প্রমাণ দিতে হবে আমার মেয়ে প্রেম করে!'

পীতাম্বরের গলা একটু নামল, 'আমি শুনেছি।'

'শুনেছি বললে চলবে না, আমি প্রমাণ চাই। আমার মেয়ের নামে কলঙ্ক, আমার বংশের নামে কলঙ্ক, এ হামি নেহি মানে গা। প্রমাণ দাও।' অনাদি পিওন উত্তেজিত।

কেউ কেউ তাকে থামাতে চাইল। খগেন ঘোষ গলার স্বর বদলে জানতে চাইলেন, 'হ্যাঁ পীতাম্বর, সত্যি প্রেম করে নাকি?'

পীতাম্বর বলল, 'আমি দেখতে গিয়েছি নাকি? শুনেছি।'

এবার হরিহর হাত তুললেন, 'এভাবে উড়ো কথা ছুঁড়ে দেওয়া আমি পছন্দ করি না। তাছাড়া তোমরা ও ব্যাপারে আলোচনা করার জন্যেও এখানে আসোনি।'

নীলাম্বর বলল, 'আমি একমত। হ্যাঁ, শ্রীনিবাসের বউ স্বামীর বন্ধুর সঙ্গে

যেতে চাইছে বহরমপুর—।'

পীতাম্বর বাধা দিল, 'যেতে চাইছে না, যাবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'

হরিহর মাথা নাড়লেন, 'ঠিক। খগেনকাকা, তুমি বলছিলে না, কেন আমি অনুমতি দিয়েছি? আমার অনুমতি শোনার প্রয়োজন বোধ করেনি সে।'

'সে কি! এত বড় স্পর্ধা?' খগেন ঘোষ চেঁচিয়ে উঠল।

নীলাম্বর বলল, 'আমার মনে হয় মেয়েটিকে ডেকে ভাল কথায় বুঝিয়ে বললে সমস্যাটার সমাধান হয়ে যায়।'

খগেন ঘোষ বললেন, 'মেয়েছেলের সঙ্গে আলোচনা করবে?'

নীলাম্বর বলল, 'দিন পালটেছে খুড়ো। দেশের প্রধানমন্ত্রীই তো মেয়েছেলে।'

পীতাম্বর উশখুশ করল, 'বেশ, ডাকুন ওকে। শুনে যাই।'

হরিহর একটি কাজের লোককে দিয়ে ভেতরে খবর পাঠালেন। সবিতারাণী এল চটজলদি। এসেই হরিহরকে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার?'

হরিহর বললেন, 'এঁরা গাঁয়ের বিশিষ্ট লোক। তোমায় কিছু বলবেন।'

ছবিরাণীর বোন ঘাড় কাত করে বলল, 'বলুন।'

সবাই একটু চুপ, হঠাৎ খগেন ঘোষ বলে উঠলেন, 'তোমার বহরমপুরে যাওয়ার বাসনার কথা শুনলাম মা। এবারে যাওয়া চলবে না।'

সবিতারাণী জিজ্ঞাসা করল, 'কেন?'

'অশোভন, দৃষ্টিকটু, তাই।' খগেন ঘোষ বললেন।

'কেন অশোভন?'

পীতাম্বর এবার জবাব দিল, 'ধীরেন তোমার অনাত্মীয়। যুবক। তোমারও বয়স কম। দুজনে একসঙ্গে গ্রামের বাইরে গেলে তোমার বদনাম হবে।'

'কারা করবে? আপনারা?'

'কার মুখ তুমি চাপা দেবে?' পীতাম্বর বলল।

'ধীরেনবাবুকে একথা বলেছেন?'

খগেন ঘোষ বললেন, 'ধীরেন ব্যাটাছেলে। ব্যাটাছেলের আবার ভয় কিসের?'

'হীরের আংটি, তাই তো?'

খগেন ঘোষ মাথা নাড়লেন, 'সবই তো জানো।'

'না, জানি না। আমরা হরিপুর থেকে বাসে চেপে জলপাইগুড়িতে যাব। সেখান থেকে বাসে চেপে বহরমপুরে। আমার স্বামীর সঙ্গে দেখা করে আবার ওইভাবেই ফিরে আসব। রাস্তা চেনা থাকলে একাই যেতাম। একবার চিনে এলে পরের বার কাউকে দরকার হবে না। তা এই যাতায়াতে কলঙ্ক লাগার সুযোগ কোথায়?'

'তোমাকে তো রাত কাটাতে হচ্ছে বাইরে!' পীতাম্বর বলল।

'কি ভাবে কাটাচ্ছি?'

'লোকে সেটা বুঝবে কেন?' পীতাম্বর বলল।

'লোক মানে তো আপনারা। আচ্ছা, এই যে আমার স্বামীকে পুলিস ধরে নিয়ে গেল তখন আপনারা কোথায় ছিলেন?'

পীতাম্বর বলল, 'পুলিসের সঙ্গে আমরা কি করে পারব? তবু হরিদা তো থানায় গিয়ে ধরাকরা করেছিলেন!'

'কিন্তু আপনারা তখন বললেন না কেন, অতবড় গাছটাকে কেউ একা কেটে বয়ে নিয়ে যেতে পারে না! চোরেরা সংখ্যায় অনেক ছিল। ধরতে হলে সবাইকে ধর। তাছাড়া পৃথিবীর কোন চোর নিজের বাড়ির সামনে চোরাই মাল রাখে?'

নীলাম্বর বলল, 'হ্যাঁ, এটা খুব অস্বাভাবিক।'

'অস্বাভাবিক যখন তখন এ নিয়ে মিটিং করেননি কেন? এই গাঁয়ের কে কে গাছটাকে বয়েছিল তা জানতে চাননি কেন?'

খগেন ঘোষ বললেন, 'কোন প্রমাণ ছিল না।'

'ঠিক। ধীরেনবাবু যদি আমার সঙ্গে রাত কাটান বহরমপুরে, তাহলে কি প্রমাণ থাকবে আমরা কোন অন্যায় কাজ করেছি?'

'সে তো সবাই দেখতে পাবে তোমরা একসঙ্গে যাচ্ছ! করছ কিনা তা কে ভাববে?' খগেন ঘোষ জবাব দিতে পেরে খুশি হলেন।

'একসঙ্গে গেলেই দোষ? আর থাকলে?'

'তার মানে?' খগেন ঘোষ বুঝতে পারলেন না।

'এই যে আমি ওঁর বাড়িতে আছি, একসঙ্গেই তো আছি। উনি তো আমার আত্মীয় নন, রক্তের সম্পর্ক দূরের কথা, কোন সম্পর্কই নেই। এ নিয়ে তো আপনাদের মাথা খারাপ হচ্ছে না?' সবিতারাণী চাঁচাছোলা গলায় জিজ্ঞাসা করল।

অকস্মাৎ সমবেত জনতা মূক হয়ে গেল। এমন কি হরিহর পর্যন্ত পাথর।

সবিতারাণী বলল, 'কি, জবাব দিন?'

এবার নীলাম্বর বলল, 'ছি ছি, তুমি কার সম্পর্কে এমন কথা বলছ?'

'একজন মানুষ সম্পর্কে। উনি মানুষ।'

নীলাম্বর রেগে গেল, 'ন্যাকামি করো না, তোমার বাপের বয়সী একজন প্রবীণ মানুষকে তুমি অপমান করছ?'

'একটুও না। উনি আমাকে এ বাড়িতে স্থান দিয়েছেন বলে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমি আপনাদের বলছি যে যুক্তি দিয়ে ধীরেনবাবুর সঙ্গে আমার যাওয়া আপনারা বন্ধ করতে চান সেই একই যুক্তি এক্ষেত্রে উঠছে না কেন?'

পীতাম্বর বলল, 'উনি বয়স্ক, ধীরেন যুবক।'

'বয়স্ক? এই সেদিন জগদীশ জেঠার ছেলে হয়নি? তিনি তো ওঁর সমবয়সী, তাই না? আপনারা এক-একজনের বেলায় এক-এক রকম যুক্তি খাড়া করবেন তা হতে পারে না। আপনারা যা ইচ্ছে করতে পারেন, আমি আমার স্বামীকে দেখতে যাবই। ধীরেনবাবুকে যদি ভয় দেখিয়ে না যেতে বাধ্য করতে পারেন তো করুন। সেক্ষেত্রে আমি একাই যাব। আসছি।' সবিতারাণী বড় বড় পা ফেলে চলে গেল ভেতরে। সবাই সেই যাওয়া দেখল।

খগেন ঘোষ কথা বললেন, 'এ তো দেখছি কালকেউটে!'

পীতাম্বর বলল, 'যুক্তিতে আমরা কিন্তু হেরে গেলাম।'

খগেন ঘোষ বললেন, 'রাখ যুক্তি, এ হচ্ছে ভ্রষ্টাচার।'

হরিহর বললেন, 'তাহলে তো ও ঠিকই বলেছে। আমার বাড়িতে ওর থাকাটাও ভ্রষ্টাচারের পর্যায়ে পড়ে।'

খগেন ঘোষ কিছুক্ষণ তাকালেন, 'তুমি বাধা দেবে না?'

'না।' হরিহর মাথা নাড়লেন।
'সে বহরমপুর থেকে ফিরে এলে আবার বাড়িতে জায়গা দেবে?'
'শ্রীনিবাস না ফেরা পর্যন্ত আমি প্রতিশ্রুতি পালন করব।'
'যা ইচ্ছে কর। আমি তোমাদের কোন ব্যাপারে নেই। সব ধ্বংস হয়ে যাবে, নষ্ট হয়ে যাবে, যাক।' খগেন ঘোষ চেঁচিয়ে বলতে বলতে বেরিয়ে গেলেন।

ধীরেনের পক্ষে বহরমপুরে যাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। গ্রামের কিছু মানুষের চাপ তো ছিলই, বাড়ির মানুষজন বেঁকে বসেছিল। তার মা তো অন্ন-জল ত্যাগ করার কথা ঘোষণা করে দিল। ছবিরাণীকে এ গ্রামের বউ-ঝিরা কখনই ভাল চোখে দ্যাখেনি। অমন যৌবন নিয়ে সে যখন শিবরামের অনুপস্থিতিতে দাপিয়ে বেড়াত তখনই তাদের বুক টনটন করত। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও কেউ তার চরিত্রে কালি দিতে পারেনি। সেই ছবিরাণী যখন ভৈরবী হল তখন এদের কেউ কেউ হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিল। স্বামীছাড়া যুবতী বউ মানে সর্বনাশ এমন ধারণা তাদের মনে বদ্ধমূল ছিল। সেই ছবিরাণীর বোন সবিতারাণীর স্বামীকে যখন পুলিস চিরদিনের জন্যে ধরে নিয়ে গেল তখন তার উপস্থিতিকে মেনে নিতে একই অসুবিধে হল। তবে সবিতারাণী তার দিদির মত ছলবলে নয়। তাকে হরিহরের বাড়িতে আশ্রয় পেতে দেখে কেউ কেউ স্বস্তি পেয়েছিল। আড়ালে আবডালে তার নাম হরিহরের সঙ্গে জড়িয়ে প্রবীণারা মস্করা করেছে বটে কিন্তু সেটা মিথ্যে জেনেই করেছে। হরিহরের চরিত্র সম্পর্কে কারো কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু ধীরেনের মা কিছুতেই মানতে পারেন না যে তাঁর আইবুড়ো ছেলে ওই বেওয়ারিশ মেয়েটার সঙ্গে বাইরে যাবে। ছেলের যুক্তি, এতে কোন অন্যায় নেই। বন্ধুর স্ত্রীর বিপদে সে যদি নিজে না দাঁড়ায় তাহলে নিজেই ছোট হয়ে যাবে। তার মা এই যুক্তি মানতে রাজী নন। তিনি বলছেন, হরিহর কেন মেয়েটাকে নিয়ে বহরমপুরে যাচ্ছে না? ধীরেনের বউদিদি ভেবে পাচ্ছে না, সবিতারাণীর যাওয়ার দরকারটা কি? যে স্বামী জীবনে ফিরে আসবে না তাকে একবার চোখের দেখা দেখে কি লাভ?

এইসময় হরিহর এলেন ধীরেনের বাড়িতে। তাঁকে দাওয়ায় মোড়া পেতে দেওয়া হল। হরিহর বললেন, 'বৌঠান, আমি আপনার কাছে একটা অনুরোধ নিয়ে এসেছি। আমার বাবা, তাঁর বাবা এই গ্রামের সুনামের জন্যে যা করে এসেছেন এতকাল আমি তাই অনুসরণ করে এসেছি। এবার যে সুনামে হানি হয়।'

ধীরেনের মা ঘোমটা আর একটু সামনে টেনে বলেছেন, 'সে যেখানে ইচ্ছে যাক, কিন্তু একাই যাক।'
'একা সে যেতে পারবে না।'
'আমার ছেলে যাবে না।'
'আপনি নিশ্চয়ই তাই বলতে পারেন। কিন্তু ধীরেন না গেলে হরিপুরের সনাতন সঙ্গে যাবে। সে দুশ্চরিত্র, মদ্যপ। তার সঙ্গে সবিতারাণী যদি যেতে বাধ্য হয় তাহলে আমাদের মুখে চুনকালি পড়বে। সেটা হলে বেঁচে থাকার কোন পথ খোলা থাকবে না আমার সামনে।'

'তার সঙ্গে যাওয়ার কি দরকার?'

'তার কাছে যাওয়াটাই বড় কথা, কে সঙ্গে যাচ্ছে সেটা গৌণ।'

'আপনি কি বলতে চাইছেন?'

'ধীরেন সঙ্গে যাক। এতে আমি নিশ্চিন্ত হব। গ্রামের একটি চরিত্রবান ছেলের সঙ্গে যাচ্ছে। হয়তো আমি নিজেই যেতাম কিন্তু শরীরের যা অবস্থা ঠিক ভরসা পাচ্ছি না। খরচাপত্র যা হবে তা আমিই দেব।'

'সেই রাক্ষুসী যদি ধীরুকে বশ করে ফেলে?'

'প্রথমত সবিতারাণী রাক্ষুসী নয়। আর বশ করা সোজা কথা কি!'

'সোজা? আপনি আপনার ভাইকে চিনতেন না? মাঝরাত পর্যন্ত বাইরে আড্ডা দিত, লুকিয়েচুরিয়ে চোলাই খেত। না বলে হরিপুরে যেত যাত্রা দেখতে। যেই আমি আলাদা ঘরে বিছানা করলাম সঙ্গে সঙ্গে মেনি বেড়াল হয়ে গেল! স্পষ্ট বলছি, পুরুষমানুষকে মেয়েমানুষ যে ভাবে কব্জা করতে পারে, সেইভাবেই আমার ধীরু কামাখ্যার ছাগল হয়ে যাবে।' ধীরেনের মা সরাসরি বলে দিলেন।

সজোরে মাথা নাড়লেন হরিহর, 'অসম্ভব। আমি সবিতা মাকে এতদিনে খুব ভালভাবে চিনেছি। সে ওই ধরনের মেয়েই নয়। স্বামীচিন্তা ছাড়া আর কোন চিন্তা তার নেই। আমি গ্যারাণ্টি দিচ্ছি।'

হরিহরের পীড়াপীড়িতে ধীরেনের মা নিমরাজী হলেন। হরিহর এই নিয়ে অনেক ভেবেছেন। মেয়েটা স্বামীকে দেখতে চায় একথা তাঁকে বলল না কেন? শরীর খারাপের যে দোহাই তিনি দিচ্ছেন সেটা সত্য নয়। তাঁকে বললে তিনি ওকে যত্ন করে মেয়ের মত বহরমপুরে নিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু তাঁকে সবিতারাণী বলেনি। এ গ্রামের অনেকেই শ্রীনিবাসের বন্ধু। জনার্দনকেও সে বলতে পারত। জনার্দনের বিয়ে তো ঠিকই হয়ে গেছে। তাহলে ধীরেনকে বলতে গেল কেন? অবিবাহিত পুরুষকে পছন্দ করা কি নেহাৎই আকস্মিক? হরিহর কোন কিনারা পাননি। অনেক রকমের প্রতিজ্ঞা ছেলেকে দিয়ে করিয়ে ধীরেনের মা তাকে যাওয়ার অনুমতি দিলেন।

হরিপুরে ওরা এসেছিল হেঁটেই। হরিহর গরুর গাড়ি দিতে চাইলেও সবিতা-রাণী রাজী হয়নি। কিন্তু হরিহরের দেওয়া একশটা টাকার নোট নিতে আপত্তি করেনি। নিজেকে বুঝিয়েছিল, কেউ যদি প্রায়শ্চিত্ত করতে চায় তাহলে তাকে সেই সুযোগ দেওয়া উচিত। ওরা রওনা হয়েছিল ভোর-ভোর। হরিহর গ্রামের প্রান্ত পর্যন্ত সঙ্গে এসেছিলেন। অত ভোর বলেই গ্রামের অনেকেই ব্যাপারটা জানতে পারেননি। বিদায় নেবার সময় হরিহর অনেক সাবধানবাণী উচ্চারণ করে-ছিলেন। ওরা চুপচাপ শুনেছিল।

হরিপুরের বাসস্ট্যাণ্ডে যখন ওরা অপেক্ষা করছে তখন মতীশ রায়ের বাড়িতে সারারাত কাটিয়ে সনাতন ফিরছিল। বিস্ফারিত চোখে এদের সে দেখল। তারপর লম্বা পা ফেলে একেবারে সবিতারাণীর সামনে এসে দাঁড়াল, 'যাওয়া হচ্ছে?'

'হ্যাঁ।' সবিতারাণী জবাব দিল।

'ভাল। তাহলে এই ছোকরার দেখছি সাহস আছে। ভাল। এখান থেকে তোমরা বহরমপুরে যাচ্ছ, সেখান থেকে কলকাতায় যাওয়া হবে?' সনাতন প্রশ্ন করল।

'কোন দুঃখে?'

'তোমার দিদির ছিল, তোমারও আছে। গেলেই থিয়েটারে চান্স পাবে।'

'মরণদশা! দিদিকে নিয়ে যান!'

'ও, আচ্ছা!' সনাতন আর দাঁড়াল না। যেভাবে এসেছিল সেভাবেই চলে গেল। তার যাওয়া দেখতে দেখতে সবিতারাণী বলল, 'পাগল!'

ধীরেন এর আগে একবারই গ্রাম ছেড়ে জলপাইগুড়ি শহরে এসেছিল। সেবার তার সঙ্গীসাথী ছিল। আজ বাস থেকে নেমে সে ধন্দে পড়ল। কোনখান থেকে বহরমপুরের বাস ছাড়ে তা তার জানা নেই। এতক্ষণ তারা পাশাপাশি বসে আসেনি। সবিতারাণী আলাদা বসেছিল। তার হাতে একটা ব্যাগ আছে কাপড়ের। সেটাই কোলের ওপর রেখেছিল। সারাটা পথ বেশ উত্তেজনায় কেটেছে ধীরেনের। কত বাধা অতিক্রমের পর সে যে শেষ পর্যন্ত সবিতারাণীকে দেওয়া কথা রাখতে পারছে। উত্তেজনা সেই কারণে যতখানি তার চেয়ে দূরে বসে মেয়েটিকে দেখায় বেশী ছিল। সবিতারাণীকে তার খুব সুন্দর লাগছিল। ওর দিদির বর একবার উধাও হয়ে ফিরে এল যখন তখন সে মৃত আর এর বর জেলে বসে আছে। সবাই বলছে আর ফিরবে না। যদি না ফেরে তাহলে সে নিশ্চয়ই প্রস্তাব দিতে পারে। অবশ্য সেই প্রস্তাব মানবে না মা বা অন্য আত্মীয় স্বজন। সেক্ষেত্রে সবিতারাণী যদি রাজী থাকে তাহলে গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে ওরা। মুশকিল হল চাষবাস ছাড়া তেমন কোন কাজকর্ম জানে না সে। আলাদা বাসা নিলে কিভাবে সংসার চালাবে সেটাই সমস্যা।

হরিপুর থেকে আসার সময় বাসের টিকিট সে কেটেছিল। কন্ডাক্টারকে বলেছিল, 'দুটো, একটা লেডিস।' বলতে আরাম লেগেছিল।

ধীরেন একটা রিক্সাওয়ালাকে ডাকল, 'ভাই, বহরমপুরের বাস যেখানে পাওয়া যায় সেখানে নিয়ে যাবে?'

রিক্সাওয়ালা বলল, 'দুটো টাকা লাগবে।'

রাজী হতে হল। সবিতারাণীর পাশে রিক্সায় বসে ধীরেনের মনে হল যে শহরে এসে তো রিক্সা চালাতে পারে! সাইকেল আর রিক্সায় তফাৎ কি? একবারে যদি দু'টাকা রোজগার হয় তাহলে দিনভর কত হবে কে জানে! মনে মনে বেশ স্বস্তি পেল সে। সবিতারাণী বলল, 'একটু সরে বসুন।'

সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল হল। ছোট্ট রিক্সায় প্রায় গায়ে গা লেগে যাচ্ছে। সে সসংকোচে শরীরটা রিক্সার বাইরে বের করে দিতেই সবিতারাণী হাসল, 'ওমা, ওভাবে বসতে বলেছি নাকি? থাক, আগের মত বসুন!'

'গায়ে গা লেগে যাচ্ছে যে!'

'লাগুক। এখানে কে চেনে আমাদের?'

ধীরেনের ভাল লাগল। সত্যি তো। শহরের রাস্তায় যখন কেউ তাদের চিনতে পারবে না তখন লজ্জা করে লাভ কি!

সে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার খিদে পায়নি?'

'আপনার পেয়েছে?'

'হ্যাঁ। মানে কাল রাত্রে তো খাইনি।'

'সে কি! খাননি কেন?'

'মায়ের জন্যে। আসছি বলে শেষবার ঝামেলা করছিল।'

সবিতারাণী অন্যদিকে তাকাল, 'আচ্ছা, এত অসুবিধে করে আপনি এলেন কেন?'

'না এলে তুমি কি করতে?'

'আমি একাই যেতাম।' সবিতারাণী বলল। সঙ্গে সঙ্গে ধীরেনের বুক মুচড়ে উঠল। সে মুখ নামাল। কিন্তু কিছু বলল না।

॥ ২৫ ॥

ধীরেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না সবিতারাণীকে। বন্ধুর স্ত্রী হিসেবে সে এখনও ওকে যথেষ্ট সমীহ করে যাচ্ছে। কিন্তু ওর ব্যবহারে একটা তাচ্ছিল্যের সুর শুনতে পাচ্ছিল। এইরকম একটা কথা ওর দিদি ছবিরাণী সম্পর্কেও চালু ছিল। শিবরামদা ফিরে আসবে না জেনেও তিনি কোন পুরুষমানুষকে পাত্তা দেননি। জলপাইগুড়ির বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে ধীরেনের মনে হল, পরিণতি তো দেখাই গেল, গলায় দড়ি দিয়ে মরতে হল। সবিতারাণীর দিকে না তাকিয়ে সে মনে মনে বলল, 'এত ডাঁট কিসের! শ্রীনিবাস তো আর এজন্মে ফিববে না! তবে?'

ঠিক তখনই সবিতারাণী জিজ্ঞাসা করল, 'খিদে পায়নি?'

'না।' মুখ না ফিরিয়েই জবাব দিল ধীরেন।

'আমার পেয়েছে।'

ইচ্ছে করছিল বলে দেয়, নিজে দোকানে গিয়ে খেয়ে এসো, কিন্তু শেষমুহূর্তে পারল না। জিজ্ঞাসা করল, 'কি খেতে ইচ্ছে করছে?'

'ভাত, ডাল, তরকারি আর মাংস। ও জেলে যাওয়ার পর থেকে মাংস খাইনি।'

'এখন ওসব খাওয়ার সময় নাকি?'

'কেন? স্বামী জেলে গেলে বুঝি মাছমাংস খায় না?'

'আমি তা বলিনি। এখন বেলা গড়িয়ে গেছে, একথাই বলছি।'

'বেলা গড়িয়ে গেলে ভাত খাওয়া যায় না? এটাই বা মেনে নিতে হবে কেন?'

ধীরেন জবাব না দিয়ে একাই এগিয়ে গেল। তিনটে হোটেল বাসস্ট্যান্ডের লাগোয়া। এখন সেখানে ভিড় কম। খোঁজ নিয়ে জানল ভাত পাওয়া যাবে সন্ধের পর। এখন চা-জলখাবার পাওয়া যাচ্ছে। হঠাৎ তার মনটা একটু নরম হল। শ্রীনিবাস জেলে যাওয়ার পর থেকে ওর বউ মাংস খেতে পারেনি। আশ্চর্য! টাকার অভাবে পারেনি, না গ্রামের বুড়ীগুলো ওকে বিধবার জীবনযাপন করতে বাধ্য করেছিল? হয়তো মাছমাংস না খেয়ে শরীর ঠান্ডা থাকবে, তাই খেতে নিষেধ করেছিল।

খুব অন্যায়। এইজন্যেই এখন মুখে অমন ক্যাটক্যাট কথা। সে ফিরে এসে জানাল, ভাতের জন্যে সন্ধ্যে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

ওরা বাসস্ট্যান্ড থেকে জেনেছে বহরমপুরের বাস ছাড়বে সন্ধ্যে সাতটায়। এখন প্রায় বিকেল। দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া কোন উপায় নেই। ধীরেন জিজ্ঞাসা করল, 'চা খাবে?'

'না, আমি চা খাই না। খিদে নষ্ট হয়।'

'ও। হরিহর জ্যাঠার বাড়িতে কি খেতে? মাছমাংস হত না?'

'মাংস হত না। মাছ হত, আমি খেতাম না।'

'কেন?'

'আমার ভাল লাগত না।'

'তুমি অদ্ভুত!'

'কেন? আমার কি তিনটে পা আছে?'

ধীরেন জবাব না দিয়ে দুটো করে নিমকি আর সন্দেশ কিনে আনল। এগুলো কেনার সময় তার মনে হচ্ছিল, সে কেন পকেটের টাকা খরচ করছে তা নিজেই জানে না।

ভাত খাওয়া হল না। টিকিটের দাম বেশ বেশী বলে মনে হল ধীরেনের। সবিতারাণী আঁচলের খুঁট খুলছিল কিন্তু এবারও দরাজ হল ধীরেন। টিকিট কেনার সময় জানল বহরমপুরে পেঁছাতে ভোর তিনটে সাড়ে তিনটে হবে। পাশাপাশি দুটো আসনে বসার পর যখন গাড়ি ছাড়তে বেশ কিছু দেরী, তখন ধীরেন নামল সিগারেট খাওয়ার জন্য। অনেকক্ষণ সিগারেট খাওয়া হয়নি, বাস চললে নিশ্চয়ই খেতে দেবে না। সিগারেট ধরাতে গিয়ে সে ভাবল একটা পাঁউরুটি আর তরকারি কিনলে কেমন হয়! গ্রামে পাঁউরুটি পাওয়া যায় না। হরিপুরের পাঁউরুটিতে কেমন একটা গন্ধ আছে। এখানকারটা নিশ্চয়ই ভাল হবে। এইসময় একটা লোক তার সামনে এসে বলল, 'দাদা, আপনার স্ত্রী আপনাকে ডাকছেন।' বলে বাসের দিকটায় হাত নাড়ল।

হতভম্ব ধীরেন বাসের দিকে তাকাতেই দেখল ঘোমটা মাথায় সবিতারাণী জানলা দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। আমার স্ত্রী! লোকে তো তাই ভাববে! সে আড়ষ্ট পায়ে কাছে যেতেই সবিতারাণী জানলা দিয়ে বলল, 'ইনি কি বলছেন!'

সবিতারাণীর পেছনের সিটে একজন ভদ্রমহিলা বসেছিলেন বাচ্চা নিয়ে। তিনি ধীরেনকে বললেন, 'আপনার স্ত্রী শুনলাম এই প্রথম লং জার্নি করছে। আপনি ওর জন্যে একটা লেবু কিনে নিন।'

'লেবু? কেন?'

জিজ্ঞাসা করার সময় সবিতারাণীর দিকে তাকাল ধীরেন। সঙ্গে সঙ্গে সবিতারাণী মহিলার দিকে মুখ ফেরাল, 'উনি আমার ভাসুর।'

'ওহো, সরি! তা আপনার ভাদ্দরবউ বাসের ঝাঁকুনিতে বমি করতে পারে। গ্যাসের গন্ধ সহ্য হবে না। প্রথমবার আমারও হয়েছিল। লেবু নাকের কাছে ধরে থাকলে ওটা হবে না।' ভদ্রমহিলা বললেন।

পা থেকে মাথা রাগে জ্বলে যাচ্ছিল ধীরেনের। আগ বাড়িয়ে ভাসুর বলার

কি ছিল! এরা যে যা ভাবছে ভাবতে দিলে নিশ্চয়ই মহাভারত অশুদ্ধ হত না! আচ্ছা ঢ্যামনা মেয়েছেলে! তাছাড়া সে কখনই শ্রীনিবাসের চেয়ে সম্পর্কে বড় না। রাগত মুখে সরে গিয়ে সিগারেট শেষ করল ধীরেন। পাঁউরুটি আর তরকারিটা একা দোকানে বসে খেয়ে লেবুর সন্ধান করল। পান খেয়ে গম্ভীরমুখে লেবু হাতে নিয়ে বাসে উঠতেই বাস ছাড়ল। কথা না বলে পাশে বসে সে সবিতারাণীর কোলে লেবু ফেলে দিল। চাপাহাসি শুনতে পেল ধীরেন। বাসের আওয়াজে সেটা স্পষ্ট হল না। সে কোন কথা বলল না। মাঝে মাঝে বাস থামছে, আবার এগিয়ে চলেছে। অন্ধকারে বাইরের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ড্রাইভার ভেতরের আলো নিভিয়ে দিয়েছে কণ্ডাক্টর টিকিট দেখে যাওয়ার পর। হঠাৎ ধীরেনের মনে হল সে কোথায় যাচ্ছে, কোন্ পথ দিয়ে তা জানে না। শিলিগুড়ি, ইসলামপুর নামগুলো মাঝে মাঝে কানে আসত, এখন সেই জায়গাগুলো এমন অন্ধকারে ঢাকা যে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। সবিতারাণীর বদলে সে যদি গ্রামের বন্ধুদের সঙ্গে দল বেঁধে আসতে পারত তাহলে অনেক মজা পেত। শ্রীনিবাসের বউকে বহন না করলেই ভাল হত। কেন যে সবার আপত্তি কানে নেয়নি!

এইসময় সে কনুই-এর ওপরে একটু চাপ অনুভব করল। আড়চোখে দেখল ঢুলতে ঢুলতে সবিতারাণী তার হাতে মাথা রেখেছে। এত কাছে কোন যুবতী কখনও মুখ রাখেনি তার এই জীবনে। আলো নেই। অন্ধকারে আদলও বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু একটা সুবাস নাকে আসছে। একটা নরম অনুভূতি যা অদ্ভুত রোমাঞ্চকর। ঠিক তখনই খেয়াল হল ভাসুরের কাঁধের পাশে ভাদ্দরবউ কখনও মাথা রাখতে পারে না। সে সবিতারাণীকে সচেতন করার জন্যে নিজেকে একটু সরিয়ে নিতেই ঢলে পড়তে পড়তে সামলে নিল সবিতারাণী। বিরক্ত গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কি হল, এ্যাঁ?'

'ভাসুরের কাঁধে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছ যে!'

সবিতারাণী সোজা হয়ে বসল।

বহরমপুর জেলে গিয়ে মিসায় বন্দী মানুষের সঙ্গে দেখা করা যে খুবই মুস্কিল তা হাড়ে-হাড়ে টের পেল ওরা। এমনিতেই রাত তিনটেয় ওরা বাস থেকে নেমে কি করবে ভেবে পায়নি। অন্ধকারেই বাসস্ট্যাণ্ডে চুপচাপ বসেছিল যতক্ষণ না সকাল হয়। ওদের আসার কারণ জেনে এক দোকানদার পরামর্শ দিয়েছিল সস্তার হোটেলে গিয়ে উঠতে। একদিনেই যে শ্রীনিবাসের দর্শন পাওয়া যাবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু ধীরেন তাতে রাজী হয়নি। হোটেলে গেলে তাকেই টাকা দিত হবে। যত কষ্ট হোক, আজ দিনে দিনে দেখা শেষ করে সন্ধ্যের বাস ধরে সে ফিরে যেতে চায়।

সকালে রিক্সা নিয়ে জেলখানায় এসে জানতে পারল, এমনি এমনি দেখা হবে না। দরখাস্ত করতে হবে। জেলার সাহেব রাজী হলে ভাগ্য খুলবে। আর দেখা হবার সময় বিকেল চারটে থেকে পাঁচটা।

এতক্ষণ স্নান-পায়খানা নেই, ঠায়-বসে-থাকা সবিতারাণীর পক্ষেও সম্ভব হচ্ছিল না। উত্তরবাংলার গ্রাম থেকে হঠাৎ আসা দুটো মানুষকে সাহায্য করার

জন্যে লোকের অভাব বহরমপুরের জেলখানার সামনে হল না। এক প্রৌঢ় এসে জানাল, 'আপনাদের কোন চিন্তা নেই, আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। জেলার আমাকে খুব ভালবাসে। যে আছে সে কে হয়?'

এমন ক্ষেত্রে সত্যি কথা না বলে উপায় নেই। ধীরেন বলল, 'ওর স্বামী।'

'হুম। এমন কেসে তো অনুমতি পাওয়া যাবেই। তবে খরচ করতে হবে।'

'খরচ?'

'হ্যাঁ। সেপাই থেকে আরম্ভ করে একের পর এক। আমাকে একটা দরখাস্ত লিখে জমা দিতে হবে এগারটার মধ্যে। মোট একশ টাকা পড়বে।'

'একশ? বাপরে!'

'ভাই, যে পুজোর যা নৈবেদ্য! দিয়েথুয়ে আমার আর কি থাকবে!'

'অত পারব না।' ঘনঘন মাথা নাড়ল ধীরেন।

দরকষাকষি চলে। শেষ পর্যন্ত ষাট টাকায় রফা হল। প্রৌঢ় বলল, 'এখানে দাঁড়িয়ে থেকে তো লাভ নেই। বউমার কষ্ট হচ্ছে। চল তোমরা ধর্মশালায়।'

'ধর্মশালা?' ধীরেন বুঝতে চাইল। লোকটা তুমি বলছে দেখে স্বস্তি হল।

'বিনি পয়সায় হয়ে যাবে। যাওয়ার সময় দুটো টাকাই অনেক দেওয়া হবে। ওখানে স্নানটান সেরে খেয়েদেয়ে তিনটার সময় চলে এসো।'

লোকটাই তাদের ধর্মশালায় পৌঁছে দিল। পুরোনো বাড়ি, চারপাশে নোংরা কিন্তু দোতলার ঘরটা ভাল। লোকটা পৌঁছে দিয়ে পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে জিজ্ঞাসা করল, 'সই করতে পারো তো মা?'

'সই কেন?' ধীরেন জানতে চাইল।

'দরখাস্ত করতে হবে না? অনুমতি কি আকাশ থেকে মিলবে?'

সবিতারাণী মাথা নাড়তে লোকটা একটা কলম বের করে এগিয়ে দিল। মাটিতে কাগজ রেখে লোকটার দেখানো জায়গায় সই করল সবিতারাণী। কাঁপা কাঁপা অথচ গোটা গোটা।

লোকটা শ্রীনিবাসের নামধাম জিজ্ঞাসা করে দশটা টাকা আগাম নিয়ে চলে গেল। তারও একঘণ্টা পরে ধর্মশালার নোংরা বাথরুম থেকে ওরা দুজনে পরিষ্কার হয়ে বেরিয়ে যখন পুরি আর তরকারি খেতে পারল তখন মনে হল চিন্তাটা অনেক কমে গেছে। শরীরও ভাল লাগছে।

ঘরটা বড় নয়। জানালা আছে। ওপাশের রাস্তা দিয়ে রিক্সাগাড়ি যাচ্ছে হরদম। তার শব্দ কানে বাজছে। সবিতারাণী জানলা দিয়ে তাকিয়ে ছিল। ধীরেন বলল, 'আমি বাইরে গিয়ে বসি।'

'কেন?'

'যা সম্পর্ক দুজনের তাতে এক ঘরে থাকা উচিত নয়। গ্রামের লোক জানতে পারলে আর দেখতে হবে না!'

'এখানে গ্রামের লোক কোথায়?'

'দেওয়ালের কান থাকে, বাতাসের চোখ।'

'এতই যখন ভয় তখন সঙ্গে না এলেই হত!'

'তখন কি জানতাম ভাসুর হয়ে থাকতে হবে!'

'কি জানতেন?'

'স্বামীর বন্ধু ভাসুর নয়!'

'আচ্ছা বাবা, ঘাট হয়েছে। এই ঘরেই থাকুন, বাইরে যেতে হবে না।'

দুপুরে ভাত মাছ খেয়ে চমৎকার ঘুমিয়ে নিল ধীরেন খালি মেঝেতে শুয়ে। সবিতারাণী বসে রইল। তার নাকি ঘুম পাচ্ছে না। ধীরেনের মনে হচ্ছিল মেয়েটা নিশ্চয়ই স্বামীকে খুব ভালবাসে। তার নিজের মনে যেসব ভাবনা এসেছিল তা কোনদিন সবিতারাণী সমর্থন করবে না। অতএব এই যাত্রায় তার পাওয়ার কিছু নেই। না থাক, জীবনে সব কিছু নিজের জন্যে করতে হবে এমন কথা নেই।

প্রৌঢ় দাঁড়িয়েছিল গেটে। হেসে বলল, 'আমার হাতযশে তোমাদের ভাগ্য খুলে গেল। তবে একজন দেখা করতে পারবে। দশমিনিট সময় পাবে।'

ধীরেন সবিতারাণীর দিকে তাকাল, 'যাও।'

'আমি একা যাব?' সবিতারাণীকে হঠাৎ ভীত দেখাল।

'শুনলে তো?'

প্রৌঢ় বললে, 'তোমার স্বামী, অতদূর থেকে এসেছ, তুমিই তো যাবে। কোন ভয় নেই। মন খুলে কথা বলে এসো। হ্যাঁ, বাকি টাকাটা?' সে হাত বাড়াল।

ধীরেন জিজ্ঞাসা করল, 'এখনই দিতে হবে?'

'হ্যাঁ ভাই। এসব পরের জন্যে ফেলে রাখা যায় না।'

ধীরেন কিছু বলার আগে সবিতারাণী তার আঁচলে যা বাঁধা ছিল তা খুলে ধীরেনের হাতে দিল। ধীরেন গুনল, নব্বই টাকা। এত টাকা সবিতারাণী নিয়ে এখানে এসেছে? কোথায় পেল? সে পঞ্চাশ টাকা নিয়ে প্রৌঢ়ের হাতে দিতেই প্রৌঢ় বলল, 'মা, খাওয়ার জন্য কিছু দিও। না না, এখন নয়। ফিরে এসে।'

চল্লিশ টাকা আবার আঁচলে বেঁধে সবিতারাণী প্রৌঢ়কে অনুসরণ করল। সিগারেট ধরাল ধীরেন। শ্রীনিবাস তাহলে ভালই টাকা রেখে গিয়েছে বউ-এর জন্যে! নাকি হরিহর জ্যাঠা দিয়েছে? যে-ই দিক সে আর পকেট থেকে একটা পয়সাও খরচ করছে না! স্বামী-স্ত্রীকে মিলিয়ে দিচ্ছে এই ঢের!

একজন পুলিশ বসে আছে দরজার পাশের চেয়ারে। জবুথবু হয়ে দাঁড়িয়ে সবিতারাণী মাথার ঘোমটা আরও টেনে দিল। প্রৌঢ় তাকে ছেড়ে দিয়েছিল যে সেপাই-এর কাছে সে তাকে এখানে পেঁৗছে দিয়ে গেছে। তাকে বলা হয়েছে শ্রীনিবাস এখানেই আসবে। প্রায় পনের মিনিট চলে যাওয়ার পর একজনের গলা কানে এল, 'তাড়াতাড়ি কথা শেষ করবে।' সবিতারাণী তাকাল ঘোমটার ফাঁক দিয়ে।

শ্রীনিবাস তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। তাকে চেনা যাচ্ছে না। মুখে একগাল দাড়ি। শ্রীনিবাস জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার? তুমি? কি করে এলে?'

'তোমার বন্ধুর সঙ্গে।' ঘোমটার আড়ালেই কথা বলল সবিতারাণী।

'কে?'

'ধীরেনবাবু।'

'অ। তা আসার কি দরকার ছিল?'

'দেখতে ইচ্ছে করছিল।'

'গ্রামের কেউ কিছু বলল না? কেমন আছ?'

'ভাল না।'

'কেন? চাষের ভাগ পাওনি?'

'পেয়েছি।'

'তবে? ওই বাড়িতেই আছ তো?'

'না, হরিহর জ্যাঠার বাড়িতে।'

'সেকি! ওই বুর্জোয়াটার বাড়িতে? ছি ছি ছি!'

'কি বললে?'

'বুর্জোয়া। সাম্রাজ্যবাদী। রক্তচোষা বাদুড় হল জোতদার।'

'আমি হরিহর জ্যাঠার কাছে আছি।' বুঝিয়ে বলতে চাইল সবিতারাণী।

'তার কথাই তো বলছি। সমস্ত গ্রামের গরীব মানুষদের শুষে খাচ্ছে।'

'এ কি বলছ তুমি?'

'ঠিক বলছি। আমাকে কে জেলে পাঠাল? ওই শালা। আমি অত বড় গাছ একা কেটে নিজের বাড়ির সামনে আনব? কেস করল?'

'জানি না।'

'তোমার জন্যে—তোমার দিদির ওপর ওর লোভ ছিল। সেটা তোমাকে পেয়ে মেটাচ্ছে। এবার ছাড়া পেলে গ্রামে গিয়ে ঘেরাও করব।'

'তুমি—তুমি হরিহর জ্যাঠার নামে এসব কথা বলছ?'

'ঠিক বলছি। তোমার কি দরকার ছিল ওর বাড়িতে যাওয়ার?'

'গাঁয়ের সবাই বলল একা থাকা ঠিক নয়।'

'আসলে তুমি ভেবেছ আমি আর ফিরব না। জেলে পচে মরব। তাই তুমি ফুর্তি করতে ওখানে গিয়েছ। আর ধীরেনের সঙ্গে কেন এলে?'

'কেন?'

'ও শালা বিয়ে করেনি। আইবুড়ো ছেলের সঙ্গে—! অবশ্য নারী পুরুষ সব সমান। তোমার স্বাধীনতা আছে যা ইচ্ছে করার। করো।'

'তুমি—তুমি কবে ছাড়া পাবে?'

'ছাড়তেই হবে। কতদিন আটকে রাখবে? তবে লাভ হয়েছে আমার। এখানে এসে রোজ ক্লাস করছি। কত নতুন শব্দ শিখেছি। বুর্জোয়া সাম্রাজ্যবাদী তো আগেই বলেছি। সংশোধনবাদী, মেহনতী মানুষ, প্রতিক্রিয়াশীল, বিপ্লবী, প্রতি-বিপ্লবী—বুঝেছ?'

'না।'

'তুমি বুর্জোয়ার দালাল হয়ে গেছ!'

'দালাল?'

'হুঁ। তোমার কাছে টাকা আছে?'

'আছে।'

'কত?'

'চল্লিশ।'

'দাও।'

'আমি সব দিয়ে দিলে গ্রামে ফিরব কি করে?'

'তার মানে তোমার সতীত্বও গিয়েছে? আগে আমাদের দেশের মেয়েরা স্বামীর জন্যে জীবন দিয়ে দিত, তুমি চল্লিশ টাকা দিতে পারছ না? তিরিশ দাও। পকেটে কিছু নেই, বিড়ি খেতে পারছি না।'

আঁচল থেকে তিরিশ টাকা বের করে সবিতারাণী স্বামীর হাতে দিল। দরজায় বসে থাকা পুলিশ বলল, 'এদিকে দশ।'

শ্রীনিবাস বলল, 'হবে।'

'তুমি কবে ছাড়া পাবে?'

'আর একটু তৈরী হই, তারপর। তুমি মাইরি বেশ জুটিয়েছ। তোমার দিদির মত। ধীরেনের সঙ্গে মজে যাওনি তো?'

'ছি! এসব কি বলছ?'

'মেয়েছেলে হল বেওয়ারিশ মালের মত। পড়ে থাকলে কেউ ছাড়ে?'

'আমি চললাম। আমার এখানে আসাই ভুল হয়েছে।'

'কেন?'

'তুমি নষ্ট হয়ে গেছ।'

'এই তো বুর্জোয়াদের মত কথা। হরিহর শালা শিখিয়েছে।'

এই সময় সেপাই বলল, সময় হয়ে গিয়েছে। সবিতারাণী আর দাঁড়াল না। সে শ্রীনিবাসের মুখের দিকে তাকালও না। তাকে বাইরে পেঁাছে দেবার সময় সেপাই বলল, 'ভয় নেই। বেশীদিন আটকে থাকবে না। বসে বসে গবমেণ্ট আর কতদিন এদের খাওয়াবে? সব শালা ধম্মের ষাঁড়!'

কথাগুলো কানে ঢুকছিল না। সবিতারাণীর শরীর-মনে যেন আগুন লেগেছিল।

ধীরেন দাঁড়িয়ে দেখল সবিতারাণী আসছে। নিশ্চয়ই খুব কান্নাকাটি হয়েছে, নইলে মুখ অমন লাল কেন? সবিতারাণী কাছে এসেই বলল, 'চলুন।'

গলার স্বরে এমন একটা উষ্মা ছিল যে ধীরেন বলল, 'স্বামীদর্শন হল?'

হাঁটতে হাঁটতে সবিতারাণী বলল, 'ওই লোকটা আমার স্বামী নয়!'

'তার মানে?' হাঁ হয়ে গেল ধীরেন, 'শ্রীনিবাস এখানে নেই?'

'আছে। তবে যার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল সে মরে গিয়ে ওই শরীরে অন্য লোক এসেছে। আমি সহ্য করতে পারছি না।'

'তুমি আমার সঙ্গে এসেছ বলে রাগ করেছে নাকি?'

'তাতে বয়ে গেল আমার! তিরিশ টাকা দিয়ে দিলাম বলে আফসোস হচ্ছে!'

'টাকা নিল কেন?'

'বিড়ি ফুঁকবে বলে। নচ্ছার! আমাকে অসতী বলে! হরিহর জ্যাঠার সঙ্গে সন্দেহ করল। আর এমন সব কথা বলল যে মানেই বুঝতে পারলাম না।' হনহনিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল।

'তা এখন কি করবে?'

'আমি জানি না।'

'গ্রামে ফিরবে তো?'

'আমার তো আর যাওয়ার জায়গা নেই।'

'তুমি আমার ওপর ভরসা রাখো!'

হঠাৎ হেসে উঠল সবিতারাণী, 'দূর! আপনি পুরুষমানুষ। আপনাদের ওপর ভরসা রাখা যায়? একজনের ওপর এতদিন সেটা করে এসে আজ কি হাল হল দেখতেই পাচ্ছি!'

॥ ২৬ ॥

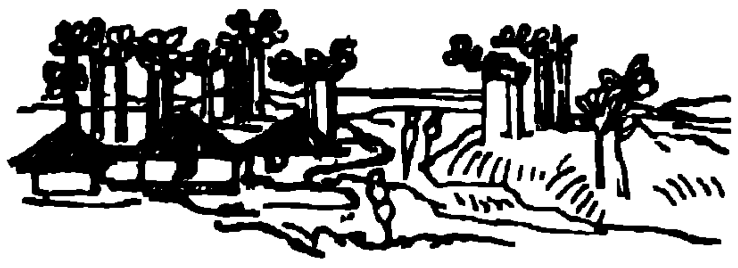

ইতিমধ্যে যে গল্পগুলো জন্মেছে, বড় হয়েছে, দৌড়াদৌড়ি করছে তা কে জানত! সবিতারাণী এবং ধীরেন যে বহরমপুরে যাওয়ার নাম করে গ্রাম থেকে উধাও হয়ে গেছে এ ব্যাপারে সবাই প্রায় নিশ্চিত হয়ে পড়েছিল। মেয়েটার স্বভাবচরিত্রের মধ্যে এক ধরনের টেটিয়া ভাব ছিল। নিজের গ্রামে রেখে মামারা বিয়ে দিতে পারেনি বলে দিদির কাছে পাঠিয়েছিল। কেন পারেনি তা নিয়ে কেউ কথা তোলেনি। শ্রীনিবাস থাকতেই নাকি সে ধীরেনের দিকে ঢলে ঢলে কথা বলত। নইলে এখন এত সাহস আসে কোত্থেকে! কথাটা হরিহরের কানে তোলার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু তিনি কান দেননি।

কিন্তু সবাইকে হতভম্ব করে ওরা ফিরে এল।

ধীরেন ফিরে গেল নিজের বাড়িতে. সবিতারাণী হরিহরের গেট পেরিয়ে সোজা তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াল, 'আপনার সঙ্গে কথা ছিল।'

'ওহো, তুমি এসে গিয়েছ! দেখা হয়েছে? কেমন আছে সে?'

'চমৎকার আছে। মোটা হয়েছে।'

'আহা—!'

'আহা বলার কি আছে? কেউ মোটাসোটা হলে আবার আহা বলে নাকি! সারারাত বাসে জেগে এসেছি, খুব কষ্ট হয়েছে। এ বাড়িতে ঢোকার আগে আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলে নিতে চাই। মতে মিললে ঢুকব, নইলে বেরিয়ে যাব।'

হরিহর হাসলেন, 'বেরিয়ে কোথায় যাবে?'

'যেদিকে দু'চোখ যায়।'

'ধীরেন এসেছে?'

'হ্যাঁ। সে তার বাড়িতে গেছে। লোকটা খুব ভদ্রলোক।'

হরিহর মন্তব্যটাকে উপেক্ষা করলেন, 'কি বলছিলে যেন?'

'শুনুন। আপনার বয়স হচ্ছে। বাড়িতে দেখাশোনা করার লোক তেমন নেই। আপনি যদ্দিন বাঁচবেন তদ্দিন যদি আমাকে ওই কাজে রেখে দেন, তাহলে আমি বিনা দ্বিধায় কাজ করতে পারি। কাজের লোককে লোকে মাইনে দেয়, আমাকে দিতে হবে না!'

'আশ্চর্য! এসব কথা বলছ কেন? তুমি এতদিন যেভাবে ছিলে—।'

'এতদিনের কথা ছেড়ে দিন। তখন আমার অন্য আশা ছিল। এখন আর সেটা নেই। আমার কোন ভবিষ্যৎ নেই। তাই এখন অন্য কথা বলছি।'

'তোমার যেমন ভাল লাগে তেমন থাকো।'

'সারাজীবনের জন্যে থাকতে হলে আপনাকেও কিছু দায়িত্ব নিতে হবে।'

'সেকথা আবার কেন? নেব না এমন মনে হবার কারণ আছে কি?'

'না—আমি পরিষ্কার কথা বলে নিলাম। জেল থেকে তিনি ছাড়া আদৌ পাবেন কিনা কেউ বলতে পারল না। আর ছাড়া যদি পানও, তাহলে মনের যে পরিবর্তন এর মধ্যেই দেখলাম তাতে পরে একসঙ্গে থাকা বোধহয় অসম্ভব হবে। বোধহয় বলছি কেন, নিশ্চয়ই। তাই আপনাকে এত কথা বলছি।'

'মতিগতির পরিবর্তন? তুমি অতদূরে গিয়েছ বলে কি সে রাগ করেছে? মানে ধীরেনকে সঙ্গে দেখে কোন প্রতিক্রিয়া হয়েছে তার?'

সবিতারাণী জবাব দিতে পারল না। এতক্ষণ জেদের বশে যেসব কথা সে বকে যাচ্ছিল, তার সঞ্চয় ফুরিয়ে যেতে ভেতরে ভেতরে কি রকম একটা কাঁপুনি হচ্ছিল তার। সে দৌড়ে ভেতরে চলে গেল, গিয়ে যেন বাঁচল।

গুঞ্জন উঠেছিল। ধীরেনকে নিয়ে যতটা নয়—সবিতারাণীকে কেন্দ্র করে অনেক বেশী। মেয়েটা তার তোয়াক্কা করত না। কেউ কথা শোনাতে এলে মুখের ওপর বলে দিত, 'বেশ করেছি গিয়েছি ধীরেনবাবুর সঙ্গে। শাস্তি দিতে গেলে কোর্টে গিয়ে নালিশ কর।'

গ্রামের মানুষ ধীরে ধীরে চুপ করে গেল কিন্তু সবিতারাণী এরপর একদম একা হয়ে পড়ল। কেউ তার সঙ্গে কথা বলে না। মেয়েরা তো তাকে দেখলেই মুখ ঘুরিয়ে নেয়। হরিহরের সংসারের কাজ করা আর আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া সময় কাটতে চায় না সবিতারাণীর।

এই সময় দুটো ঘটনা প্রায় পরপর ঘটে গেল।

শ্রীনিবাসের জেল হয়েছে প্রায় তেইশ মাস। এক বিকেলে গ্রামে পুলিসের জিপ ঢুকল। জিপে দারোগাবাবু স্বয়ং বসে। খোঁজখবর নিয়ে তাঁর জিপ এসে থামল হরিহরের বাড়িতে। হরিহর তখন বাড়িতেই ছিলেন। গাড়ির আওয়াজ পেয়ে বেরিয়ে এলেন, 'আরে কি সৌভাগ্য, আসুন আসুন।'

'পুলিস বাড়িতে এলে কেউ সৌভাগ্য বলে মনে করে এই প্রথম শুনলাম মশাই। বাঃ, বাড়িখানা তো বেশ।' জিপ থেকে নেমে দারোগা বললেন।

'পূর্ব-পুরুষেরা রেখে গিয়েছেন। আমার সাধ্য কি এসব করার!'

দারোগা দেখলেন ইতিমধ্যে তাঁর জিপকে ঘিরে জটলা তৈরী হয়ে গিয়েছে। পুলিস দেখছে সবাই এবং সেই সঙ্গে অনেক কৌতূহল। দারোগা ধমকালেন, 'এই শালারা, এখান থেকে ভাগ! নইলে সবকটাকে অ্যারেস্ট করব। যা বলছি!'

এতেই কাজ হল। পিলপিল করে যে যেদিকে পারল ছুটে পালাল। দারোগা হাসলেন, 'সরি! যেঁ রোগের যা ওষুধ, বুঝলেন না!'

'আসুন, ভেতরে আসুন।'

নিজেই বারান্দায় চেয়ার এনে দিলেন হরিহর। দারোগা তাতে বসলে তিনি একটি মোড়া টেনে নিলেন। দারোগা ভণিতা করলেন না, 'বুঝতেই পারছেন, আমি নিছক বেড়াতে আপনার গ্রামে আসিনি। আপনি হরিপুরের সনাতন নামে কাউকে চিনতেন?'

'কোন্ সনাতন?'

'ভ্যাগাবণ্ড ধরনের লোক। কিছুদিন আগে একটা দোকানে কাজ করত। ইদানীং দালালি শুরু করেছিল। কলকাতায় থাকত একসময়। মদ খেতো খুব। নাটকের বাতিক ছিল।'

হরিহর মাথা নাড়লেন, 'বুঝেছি।'

'সেই সনাতন আজ দুপুরে মারা গিয়েছে। সে যে ঘরে থাকত সেখানেই তার বডি পাওয়া গিয়েছে। বুকে ছুরি বসানো।'

'সে কি!'

'হ্যাঁ। আপনাকে ওর মৃত্যু নিয়ে আমি বিব্রত করতে চাইনি। কিন্তু মনে হল, আপনি সাহায্য করলে আমার পক্ষে তদন্ত করা সহজ হয়।'

'নিশ্চয়ই। বলুন কি করতে হবে?'

'সনাতনকে কে মার্ডার করেছে তা এখনও ধরতে পারিনি। হত্যাকারী কোন ক্লু ফেলে রেখে যায়নি। লোকটার এখানে কোন আত্মীয়স্বজন নেই—যাকে বলে একদম ভুঁইফোঁড়! তাই খুনীকে বের করার জন্যে আমার ওপর তেমন প্রেসার আসবে না। কিন্তু খুন করে একটা লোক বেঁচে যাবে, এ মানতে পারছি না।'

'ঠিক কথা।'

'খুঁজতে খুঁজতে ওর ঘরে হঠাৎ একটা ছবি আঁকার খাতা পেয়ে গেলাম। তাতে একটি মেয়ের নানান ধরনের ছবি আঁকা। কোনটার তলায় লেখা জাহানারা, কোনটার তলায় ঝাঁসির রাণী, সীতা, সোনাই। সব ছবির মেয়ের মুখ এক। অর্থাৎ সনাতন একজনকে ভেবেই অতগুলো ছবি এঁকেছে। আঁকার হাতটি খারাপ ছিল না। তা আশেপাশের লোককে দেখাতে তারা কোন হদিস দিতে পারল না। সে কোথায় যেত খোঁজখবর নিতে শুনলাম, আপনাদের গ্রামেও কয়েকবার এসেছে। তাই আমি ভাবলাম আপনি যদি কোন হদিস দিতে পারেন!'

'হ্যাঁ, সনাতন এখানে কয়েকবার এসেছে। নাটক করতেই প্রথমবার এসেছিল, কিন্তু সেবার নাটক করা সম্ভব হয়নি।' হরিহর মনে করতে পারলেন।

'যাক, আমার খবর দেখছি ঠিক।' দারোগা হেঁকে জিপে বসা সেপাইকে হুকুম করতে সে একটা খাতা দিয়ে গেল। সেটাকে এগিয়ে দিয়ে দারোগা জিজ্ঞাসা করলেন, 'দেখুন তো, এই মুখের মেয়ের এখানে থাকে কিনা?'

হরিহর খাতাটাকে খুললেন। লম্বাটে পাতা। প্রথম পাতায় চোখ রাখতেই চমকে উঠলেন তিনি। এ তো ছবিরাণী! অবিকল সেই নাক চোখ মুখ চিবুক। শুধু পরনে ঝাঁসীর রাণীর পোশাক। ছবিরাণীর ছবি খাতায় আঁকল কেন সনাতন? পরের ছবিটা অহল্যার। চিনতে একটুও ভুল হচ্ছে না। এমন কি চুলের ধাঁচটাও এক। ওই মুখটি যেন জ্যান্ত হয়ে উঠেছে ছবিতে। পরের ছবি জাহানারার। কি ব্যাকুল দৃষ্টি ছবিরাণীর! প্রতিটি ছবির নিচে মূল চরিত্রের নাম লেখা হয়েছে—ইনি পদ্মাবতী। সোনাই। মিশরকুমারী নামের ছবিটা দেখতে গিয়ে একটু অবাক হলেন হরিহর। একটু যেন সরে এসেছে সনাতন, বরং মুখের মিল এখন সবিতা-রাণীর সঙ্গে বেশী। ছবিরাণীর এত সুন্দর নাক ছিল না। শেষ ছবিটা দেখেই চোখ সরিয়ে নিলেন। নগ্ন ছবি। ম্যাডোনার। একটা হাত কাটা। কিন্তু এ না সবিতা

না ছবি, অথচ দুজনেই আছে।

'চিনতে পারছেন? আপনার গ্রামের কেউ?' দারোগা জিজ্ঞাসা করলেন।

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' মিথ্যে বলতে পারলেন না হরিহর।

'সাবাস!' এগিয়ে এলেন দারোগা, 'কে? কি নাম?'

'কিন্তু—।'

'দ্বিধা করবেন না। হয়তো ওই মহিলাকে কেন্দ্র করেই গোলমাল। মহিলার স্বামী অথবা প্রেমিক গিয়ে খুন করে আসতে পারে ঈর্ষায়। খুনীকে শাস্তি দেওয়া দরকার। কে এই মহিলা?'

'ছবিরাণী।'

'ছবিরাণী! নামটা শোনা-শোনা মনে হচ্ছে—কোথায় থাকে?'

'ওর আর শিবরাম মানে ওর স্বামীর মৃতদেহ মন্দিরের কাছে পাওয়া গিয়েছিল, নিশ্চয়ই আপনার স্মরণে আছে।'

'যাচ্চলে, সেই ছবিরাণী? সে তো অনেকদিন আগে মারা গিয়েছে!'

'বোধহয় সে জীবিত থাকাকালীন এগুলো এঁকেছিল সনাতন।'

'হুম্! রাবিশ! গেল সব ভেস্তে। আপনি সিওর, এ সেই মেয়েছেলেটা?'

'ছবিরাণী মন্দিরের ভৈরবী হয়েছিল।'

'জানি জানি।' দারোগাকে খুব হতাশ দেখাচ্ছিল।

'কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না, সনাতন কেন তার ছবি আঁকতে গেল।'

'ঠিক। কেন গেল?'

'জানি না। তবে ছবিরাণীর কেউ নিশ্চয়ই সনাতনকে খুন করেনি!'

'ছবিরাণীর কে এই গ্রামে আছে?'

'শাশুড়ী। তিনি জীবন্মৃত। আর—।' থমকে গেলেন হরিহর। সবিতারাণীর কথাটা দারোগাকে বলা ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছিলেন না।

'আর?' দারোগা জিজ্ঞাসা করলেন।

'যে ছেলেটিকে আপনি এ গ্রাম থেকে মিশায় ধরেছিলেন সে ছবিরাণীর ভগ্নীপতি। আমি শ্রীনিবাসের কথা বলছি।'

'ওহো, আপনার মনে ও ব্যাপারে এখনও অসন্তোষ আছে দেখছি! তা আপনি যদি টাইট দিতে না বলতেন তাহলে এটা হত না। কি করি বলুন তো? গ্রামের আর পাঁচজনকে দেখাবো?'

'কি দরকার? যে মানুষ মরে গেছে তার সম্পর্কে কলঙ্ক রটবে।'

'কিন্তু পুলিসের কাজ, বুঝতেই পারছেন!'

'দুশো টাকা দিচ্ছি।'

'আহা, আপনি কেন দিতে যাবেন?'

'মেয়েটি আমার গ্রামের বলে।'

'তাহলে তিনশো দিন। আচ্ছা, শেষ ছবিটা দেখেছেন—ম্যাডোনার? সনাতন হারামজাদা ছবিরাণীকে ওই অবস্থায় দেখেছে বলে মনে হয়?'

হরিহর জবাব না দিয়ে ভিতরে চলে গেলেন। সিন্দুক থেকে টাকা বের করার সময় শব্দ হতেই ঘুরে দাঁড়ালেন, 'আপনাকে একটা অনুরোধ করব?'

'বল মা।'

'টাকাটা যখন দিচ্ছেন তখন খাতাটা চেয়ে নিন।'

'খাতাটা? দেবে কি?'

'বলুন দাম হিসেবে দিচ্ছি টাকাটা।'

সিন্দুক বন্ধ করে টাকা নিয়ে হরিহর বেরিয়ে এলেন। খাতাটা মোড়ার ওপর রাখা ছিল। সেটা তুলে নিয়ে তিনশো টাকা দারোগার হাতে দিয়ে বললেন, 'এটা আমার কাছে থাকল।'

'সে কি, এটা এভিডেন্স!'

'আমি এর জন্যে দাম দিলাম আপনাকে!'

দারোগা হেসে উঠলেন, 'ওহো, বুঝেছি—বুঝেছি। ঠিক আছে। ইণ্টারেস্টিং ছবি—আমিও চেপে যাব। চলি। হরিপুরে গেলে থানায় এসে এক কাপ চা খেয়ে যাবেন। পুলিস বলে হেলাফেলা করবেন না।'

জিপটা বেরিয়ে গেল। হরিহর ভেতরের ঘরে ঢুকে খাতাটা রাখতেই গ্রামের মানুষ দল বেঁধে এল। সবাই খুব কৌতূহলী। দারোগা কেন এসেছিল? আবার কি হল? হরিহর তাদের আশ্বস্ত করলেন। কেউ বিশ্বাস করল, কেউ করল না।

সবাইকে বিদায় করে ঘরে ঢুকে হরিহর দেখলেন, খাতাটা যেখানে রেখেছিলেন সেখানে নেই। তিনি নিঃশ্বাস ফেললেন। সবিতারাণী ছবিরাণীর চেয়ে অনেক বেশী বুদ্ধিমতী। খাতাটা কিনে নেওয়ার ব্যাপারটা তাঁর নিজের মাথায় আসেনি। বাইরের লোক এসে তাঁর সঙ্গে কি কথা বলছে তাও মেয়েটা খবর রাখছে। এত বুদ্ধিমতী যে মেয়ে, তার কাজকর্ম সহজে প্রকাশ পাবে না। বেশ কয়েকবার প্রশ্ন করেও তিনি জানতে পারেননি শ্রীনিবাস ঠিক কি কথা বলেছে। এমন কি ধীরেন পর্যন্ত স্বীকার করেছে, তাকে নিয়ে সবিতারাণী শ্রীনিবাসের কাছে যায়নি।

দ্বিতীয় ঘটনাটা ঘটল দিনসাতেক বাদে এক মধ্যরাত্রে। সন্ধ্যে থেকে একটু সর্দিজ্বর হয়েছিল বলে হরিহর সাত-তাড়াতাড়ি দুধ খেয়ে শুয়ে পড়েছিলেন। বাড়িতে যে বুড়িটি থাকে তার বাতের ব্যথা বেড়েছে। কাজকর্ম শেষ করে খাওয়া-দাওয়ার পর ভেতরের বারান্দায় বসে চুল বাঁধছিল সবিতারাণী, এমন সময় খসখস আওয়াজ কানে এল। পেছনের বাগান এবং পুকুরে মাঝে মাঝে শেয়ালের আগমন হয়। কিছুদিন আগে প্রায় আসন্নপ্রসবা এক শেয়ালকে দেখেছিল সে। উঠোনের কোণে ওর জন্যে ভাত রেখে দিলে ঠিক খেয়ে যেত। গতকাল আসেনি। এমন হতে পারে, তার বাচ্চা হয়েছে। সবিতারাণীর মনে হল, মা হওয়া শেয়ালটা ফিরে এসেছে আজ। চিৎকার করলে পালিয়ে যাবে ভয় পেয়ে। সবিতারাণী আবার রান্নাঘরে ঢুকল। বাড়তি ভাত থেকে কিছুটা একটা বাটিতে তুলে উঠোনের কোণে ঢেলে দিয়ে যখন ফিরে আসছিল তখনই সে চাপাগলায় ডাক শুনতে পেল। কেউ ডাকছে তাব নাম ধরে। সে দাঁড়িয়ে পড়তেই আবার শুনতে পেল, 'সবিতা, সবিতারাণী!'

এ গলা ধীরেনের। সে খুব অবাক হল। বহরমপুর থেকে ফেরার পর এতদিন চলে গিয়েছে, ধীরেন ভুলেও কখনও এমুখো হয়নি। কুৎসা রটানোর সময় মানুষ প্রথমে মেয়েদেরই আক্রমণ করে। সেইজন্যে ধীরেন অনেক রক্ষে পেয়েছে। লোকটা

তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেনি এটা ঠিক, যে সাহস দেখিয়েছে তা এই গ্রামের কেউ দেখাতে পারত না। তবু এত রাত্রে ওভাবে চোরের মতন পুকুরপাড় ঘুরে তাকে ডাকতে আসার কারণ সে বুঝতে পারছিল না। এ ডাকে সাড়া দিলে যে ক্ষতি হবে সেটা তারই। ধীরেন পুরুষ বলে ঠিক বেঁচে যাবে। তবু কথা না বলে পারল না সবিতারাণী, 'কি?'

'একটু আসতে পারবে? কথা আছে।'

'ঘুরে আসছি।'

সবিতারাণী রান্নাঘরে চলে এল। বাটি রেখে দরজা বন্ধ করে হাত ধুয়ে শোওয়ার ঘরে এল। বুড়ি বলল, 'কি ব্যথা রে! কোমর গেল! যত রোগ কি আমারই হয়!'

'আমি পুকুরধারে যাচ্ছি।' সবিতারাণী বলল।

'এত রাত্রে? এইজন্যে বলি স্বামী থাকতে যে বিধবা, তার খাবারে লোভ করতে নেই। আলো নিয়ে যা। উঃ, বাবা!'

চমৎকার! সারা গ্রামের লোক ওই আলোতে দেখুক, না?'

সতিবারাণী নিঃশব্দে নেমে এল উঠোনে। বুড়িকে তার ভয় নেই, ভয় যাকে তার না হয় আজ সর্দিজ্বর হয়েছে কিন্তু ঘুম তো ফিনফিনে। আওয়াজ হলেই উঠে পড়বে। যাদের বেশী টাকা থাকে তাদের ঘুম কম হয়।

কলাগাছের ঝোপটা পেরিয়ে অন্ধকারে কয়েক পা হাঁটতেই ধীরেন তার সামনে এসে দাঁড়াল, 'উঃ, কি ভাবে যে তোমার দেখা পাব তাই ভেবে মরছিলাম!'

'কেন? দেখা পাওয়ার কি দরকার?'

'এখন টাইম কম, তুমি মাইরি রাগ করো না!'

'কি বলতে চাইছ?'

'শোন। বাড়ির লোক খেপে গেছে। তারা আমার বিয়ে দেবেই। কিন্তু আমার পক্ষে তোমাকে ছাড়া কাউকে বিয়ে করা সম্ভব নয়।'

'সে কি? আমার তো স্বামী বেঁচে?'

'ভ্যাট! ও কখনো ফিরবে না।'

'বেশ। কিন্তু আমাকে কেন?'

'আই লাভ ইউ!'

ইংরেজি জানুক বা না জানুক এই তিনটি শব্দের অর্থ বাল্যকাল থেকে জেনে এসেছে সবিতারাণী। হঠাৎ সে কেঁপে উঠল। ঘাম জমল নাকে। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে ধীরেন খপ করে তার হাত ধরল, 'তোমাকে ছাড়া আমি কিছু ভাবতে পারছি না। কৃপা করো আমাকে!'

হঠাৎ সবিতারাণীর মনে হল, প্রতিশোধ নেবার এই সুযোগ। শ্রীনিবাস তার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছে তা কখনই ভুলবে না সে। শ্রীনিবাসকে জব্দ করতে হলে ধীরেনকে হ্যাঁ বলতে হয়। সে জিজ্ঞাসা করল, 'আমায় কি করতে হবে?'

'কাল রাত্রে আমরা এই গ্রাম থেকে চলে যাব শহরে।'

'তারপর?'

'তারপর সেখানে ঘর নেব। আমি সাইকেল-রিক্সা চালাব। চলে যাবে।'

'তুমি আমাকে খুব ভালবাস?'

'খ্ব-উ-ব!'

'তাহলে আমি—আমরা কোথাও যাব না।'

'তার মানে?'

'আমরা এখানেই থাকব। এই গ্রামে। মন্দিরে গিয়ে মালাবদল করে সবার সামনে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে থাকব। পারবে না?'

'কিভাবে?'

'যেভাবে সবাই থাকে।'

'কেউ সেটা মেনে নেবে না। মারপিট হবে।'

'হোক। মরে যাব তব্ব চোরের মত কিছ্ব করব না। কাল রাত্রে এই সময় এখানে এসে আমাকে জানিয়ে যাবে, তুমি রাজী আছ কিনা।'

হতভম্ব ধীরেন জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি সত্যি বলছ?'

'মিথ্যে কেন বলব?'

'বেশ, তাই হবে। আমি আগামীকালই আসব।'

'ভাল করে ভেবে নিও।'

'হ্যাঁ, শোন—।'

'কি?'

'তুমি কিছ্ব মনে করবে, যদি তোমাকে একট্ব জড়িয়ে ধরি?'

চমকে হাত ছাড়িয়ে নিল সবিতারাণী। তারপর বলল, 'বললাম না, চোরের মত কিছ্ব করতে আমার ঘেন্না হয়। তুমি তো বাইরে গিয়ে এসব করতে চাওনি!'

'তখন ব্বঝতে পারিনি নিজেকে। ঠিক আছে, কাল আসব। তুমি যাও।'

সবিতারাণী ফিরে এসেছিল। ধীরেনের শেষ প্রতিক্রিয়া শ্বনে তার ততক্ষণে খারাপ লাগতে শ্বর্ব করেছে। মান্বষটা সত্যিই ভাল। আজ হয়তো আবেগে জড়িয়ে ধরার কথা বলেছে, কিন্তু ব্যাপারটা কিরকম হবে—শ্রীনিবাসকে উপেক্ষা করে সে যদি ধীরেনের সঙ্গে এই গ্রামের মান্বষের নাকের ওপর থাকে? জ্বলেপ্বড়ে মরবে সবাই। তাকে অসতী বলবে। পঞ্চায়েত বসবে। শাস্তি দেবার চেষ্টা হবে। সেরকম ব্বঝলে তখন না হয় শহরে চলে যাওয়া যাবে। তার কেবলই মনে হতে লাগল, ধীরেন যদি তার স্বামী হত এবং জেলে থাকত, তাহলে শ্রীনিবাস কখনই তাকে নিয়ে বহরমপ্বরে যেত না। সেই মনের জোর শ্রীনিবাসের নেই।

রাতে ভাল ঘ্বম এল না। পরের দিনটা কেটে গেল ঘোরের মধ্যে। হরিহর আজ বেশ স্বস্থ। কিন্তু সবিতারাণী মরীয়া হয়ে গেল। যদি ধীরেন সম্মত থাকে এবং হরিহর ওই রাত্রে তাদের দেখতে পান, তাতে সে বিন্দ্বমাত্র ভয় পাবে না। প্রয়োজনে তখনই সত্যি কথাটা বলে দেবে।

সন্ধ্যে হল, রাত নামল। রাত ঘনাল।

বারান্দায় বসে বসে একসময় ঝিম্বনি এসে গিয়েছিল। হঠাৎ হরিহরের গলা কানে এল, 'এ কি! এখানে সারারাত বসে আছ নাকি?'

ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াল সে। আকাশে শ্বকতারা জ্বলজ্বল করছে।

॥ ২৭ ॥

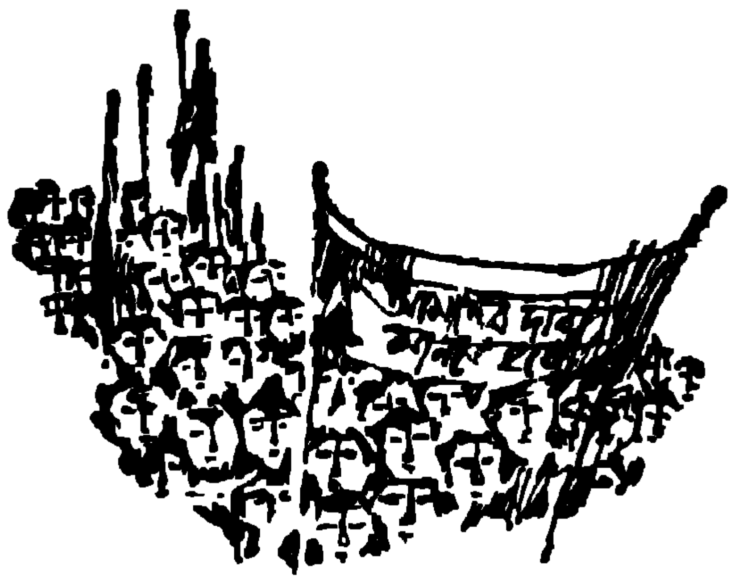

কাজেকর্মে হরিপুরে যেতেই হয়, হরিহর সেই-রকমই এসেছিলেন। বাজারের সামনে একেবারে দারোগাবাবুর মুখোমুখি হয়ে গেলেন। ভদ্রলোক এক-হাট মানুষের সামনে বলে উঠলেন, 'এই যে হরিহরবাবু, আপনাকে একটা ভাল খবর দেব না খারাপ খবর—ঠিক বুঝতে পারছি না!'

হরিহর হাসার চেষ্টা করলেন, 'যাই দেবেন সেটা খবর হলেই হল।'

'আলবৎ খবর। এখান থেকে যে ছেলেটাকে মিসা করে পাঠানো হয়েছিল সে ফিরে এলে কার ওপর বেশী রাগ দেখাবে বলুন তো?'

দারোগার গলা সবাই শুনতে পাচ্ছিল। অনেকেই কাছাকাছি সরে এল। হরিহর উত্তরটা এড়িয়ে গেলেন, 'ওর ব্যাপারে কোন খবর আছে নাকি?'

'হ্যাঁ। মিসায় বন্দীরা সব ছাড়া পাচ্ছে। দেশ জুড়ে আবার নির্বাচন হবে। আপনার গাঁয়ের ছেলে যে-কোনদিন ফিরে এলো বলে। ওর স্ত্রী তো আপনার কাছে থাকে। স্বামী এলে ফিরে যাবে তো?'

'তার মানে?' প্রশ্নটা করার আগেই হরিহরের কানে জনতার চাপা হাসি পেঁছে গিয়েছিল। দারোগার রসিকতা যে গুঞ্জন হয়ে ছড়িয়ে পড়বে তা তিনি জানেন।

'আহা, আপনার বাড়িতে পাঁচটা ভালমন্দ খেতে পাচ্ছে, স্বামীর ঘরে গেলে তো শাকসেদ্ধ! ভগবান তো মেয়েছেলেদের ঘর পাল্টে ফেলার অসীম ক্ষমতা দিয়েছেন! শুনেছিলাম গ্রামের যে ছেলেটার সঙ্গে একটু মাখামাখি হয়েছিল সে দুম করে বিয়ে করে ফেলায় বেচারা আর ঘর ছেড়ে বের হয় না। তাই নাকি?'

'দারোগাবাবু, আপনার কাজের সুবাদে এত খবর রাখতে হয় তা জানা ছিল না আমার। আপনি যার কথা বলছেন সে আমার মেয়ে। কোন বাপই মেয়ের কেচ্ছা হাটে দাঁড়িয়ে শুনতে চায় না, সত্যিমিথ্যে যাই হোক,—চলি।' হাতজোড় করে রওনা হবার চেষ্টা করলেন হরিহর।

'আরে আরে, আপনি ক্ষেপে গেলেন নাকি!' দারোগাবাবু ঝটপট এগিয়ে এলেন, 'আপনি কি জানেন, শেয়ালকে বাঘ বলতে বলতে একসময় সেটা সত্যি বাঘ হয়ে যায়?'

'তার মানে?' হরিহর বুঝতে পারলেন না।

'শ্রীনিবাসদের অভ্যর্থনা করতে শহরে কমিটি তৈরী হয়েছে!'

'অভ্যর্থনা? কিসের অভ্যর্থনা?'

'এই যে বীরের মত জেল খেটে এলেন, তাই। যেদিন তিনি এবং তাঁর সঙ্গীরা শহরে পা দেবেন সেদিন মিছিল বের হবে তাঁদের নিয়ে। তার মানে যাকে বলে রাজনৈতিক নেতা তাই হয়ে যাচ্ছেন তিনি। গ্রামে যাতে রাজনীতি না ঢোকে তাই

ব্যস্ত হয়েছিলেন আপনি, এবার তো রাজনৈতিক নেতা ঢুকে পড়বেন! কি করে সামলাবেন ভেবে দেখুন!' দারোগা খুব গম্ভীরমুখে কথাগুলো বললেন।

হরিপুরের কাজ শেষ করে বাসস্ট্যাণ্ডের চায়ের দোকানে বসেছিলেন হরিহর। দারোগার কথা শোনার পর তাঁর দু'রকমের অনুভূতি হচ্ছে। শ্রীনিবাস রাজনীতির অ-আ জানত না। বিনা অপরাধে তাকে জেলে পাঠানো হয়েছিল। এই কারণে সে দারোগা এবং হরিহরের ওপর রাগ করতেই পারে। ফিরে এসে যদি ঝামেলা বাধায়, তাঁকে একটা সাফাই গাইতে হবে। ওর স্ত্রীকে আশ্রয় দিয়ে তিনি কিছুটা উপকার নিশ্চয়ই করেছেন। কিন্তু জেলে থেকে সে কি করে রাজনৈতিক নেতা হয়ে গেল? গ্রামে ফিরে তো তুলকালাম বাধাবে! বাধাক। তেমন হলে তিনি ভাগচাষীদের মালিকানা দিয়ে দেবেন। চাই না তাঁর জমির ফসলের ভাগ। যে যার মত করে খাক। যা জমিয়েছেন তা নিয়ে কোন তীর্থে চলে যাবেন। শেষ জীবনটা একটু আরাম করে থাকা যাবে। এই পর্যন্ত ভাবলেই তাঁর ছবিরাণীর মুখ মনে পড়ে যায়। কি বোকামি করে গেল সে! যাক গে। কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটা কথা তাঁকে খুব তোলপাড় করছে। শ্রীনিবাসকে শহরের লোক অভ্যর্থনা জানাবে! তাকে নিয়ে মিছিল বের হবে! ওঃ, ভাবাই যায় না। তাঁর গ্রামের কোন মানুষের কপালে কখনও এমন সম্মান জোটেনি। নারাণপুরের মুখ উজ্জ্বল করে দেবে ছেলেটা। এক্ষেত্রে তাঁদেরও কিছু করা উচিত।

'দাদা যে! এখানে বসে?'

গলার স্বর শুনে তাকিয়ে প্রথমে চিনতে পারলেন না হরিহর।

প্রশ্নকারী সেটা বুঝে মাথা নাড়লেন, 'ঠাওর করতে না পারাই স্বাভাবিক। অনেককাল আগে দেখাশোনা হয়েছে। আমি মতীশ,—মতীশ রায়।'

'ও হ্যাঁ। এমনি বসে আছি।'

'শরীর খারাপ নাকি?'

'নাঃ। আপনি ভাল আছেন?'

'আর ভাল! বন্ধুবান্ধবরা এক এক করে চলে গেলে কি ভাল থাকা যায়? সনাতনটা আসতো—সন্ধ্যে কেটে যেত। সে ব্যাটাও আত্মহত্যা করল!'

'আত্মহত্যা?'

'আমি তো তাই বলি। কার মাথায় পোকা আছে যে ওকে খুন করবে! দারোগা সনাতনের ঘরে ওর আঁকা ছবি পেয়েছিল। আপনাদের গ্রামের ভৈরবীর ছবি। মেয়ে-ছেলেটার মধ্যে প্রতিভা আছে বলে বিশ্বাস করত সে। অনেকবার বলেছে আমাকে। তা সেই ভৈরবীও তো মরে গেছে অনেক আগে! ওকে মারবে কে?'

'আমি ওর সম্পর্কে কিছুই জানি না।'

'আমি জানি। সেই ভৈরবীর এক বোন আছে শুনেছি আপনার গ্রামে। তাকে দেখতে কি তার দিদির মত? নয়? তাহলে তো চুকেই গেল!' মতীশ রায় হাসল, 'ভৈরবীর স্বামী দেশছাড়া হয়েছিল, ওর বোনের স্বামীও তো তাই, এবার বোন-টাকেই ভৈরবী হয়ে যেতে বলুন, পাঁচজনে দেখতে পাই। আচ্ছা চলি, দরকার-অদরকারে চলে আসবেন। নমস্কার।' মতীশ রায় চলে গেল।

গ্রামে ফিরে আসার পথে হরিহর মতীশ রায়কে ভুলতে পারছিলেন না। বোকাটা জানে না শ্রীনিবাস ফিরে আসছে বীরের মত। শিবরাম হারিয়ে গিয়ে গ্রামে ফিরেছিল চোরের মতন, ফিরে কুকুরের কামড়ে মারা পড়েছিল। শ্রীনিবাস গ্রামে ফিরে যাকে ইচ্ছে তাকে কুকুরতাড়া করবে, এটাই পার্থক্য।

বাড়িতে ফিরে হাত পা ধুয়ে দাওয়ায় বসতেই সবিতারাণী দরজায় এসে দাঁড়াল, 'মুড়ি বাতাসা দেব?'

'নাঃ। এক কাপ চা খেয়ে ফেলেছিলাম লোভে পড়ে, খিদে চলে গেছে। চলে যেও না, তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।'

'বলুন।'

'কাল নিজেদের বাড়িটাকে দেখে এসো। ভেঙেচুরে গিয়েছে তো, সারাই করতে হবে। কি কি প্রয়োজন তা দেখে এসো। আমি মিস্ত্রিকে খবর দিচ্ছি।'

'হঠাৎ এ কথা কেন?'

'বাঃ, শ্রীনিবাস ফিরে এলে নিজের বাড়িতেই তো উঠবে! ঠিকঠাক করে না রাখলে সেটা কি করে সম্ভব?'

'আসার কি কোন কথা হয়েছে?'

'হ্যাঁ। আজ দারোগাবাবুর মুখে তাই শুনলাম। সে নেতা হয়ে গেল। শহরে তাকে নিয়ে মিছিল বের হবে। সবই আনন্দের কথা।'

'কবে আসছে?'

'দিনটা জানি না, তবে খুব বেশী দেরী নেই।' হরিহর মুখ ফেরালেন, 'তাই বাড়িটাকে বাসযোগ্য করে ফেলা উচিত। খরচের কথা তোমাকে চিন্তা করতে হবে না।'

সবিতারাণী হাসল, 'এসব নিয়ে আপনি মিছিমিছি ভাবছেন।'

'তার মানে?'

'যার বাড়ি সে যদি বাস করতে চায় তাহলে নিজেই সারাবে। আপনি এসব ভেবে নিজের শরীর খারাপ করবেন না।'

'আহা, তুমি বুঝতে পারছ না,—গ্রামে পা দিয়ে সে উঠবে কোথায়?'

'তার তো বন্ধুর অভাব নেই।' সবিতারাণী ভেতরে চলে গেল।

হরিহর চুপচাপ বসে রইলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল, সবিতারাণী স্বামীর ব্যাপারে তাঁর কাছে মাথা নিচু করতে চায় না। এটাই বোধহয় স্বাভাবিক। কিন্তু এই করতে গিয়ে বেচারা অনেক সমস্যা ডেকে আনবে। জেল থেকে বেরিয়ে শ্রীনিবাসের পকেট নিশ্চয়ই খালি থাকবে। ঘর সারাবার খরচ দেবে কি করে? হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল, সবিতারাণী বলেছে যার বাড়ি সে যদি বাস করতে চায়—যার বাড়ি বলল কেন? বাড়িটা তো ওরও! তিনি এখন আর কিছুই হদিস করতে পারছিলেন না।

মধ্যরাত্রে ঘুম ভেঙে গেল হরিহরের। কেউ যেন যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে। কে? তিনি টর্চ নিয়ে বিছানা থেকে নামলেন। দাওয়ায় পা রাখা মাত্র বুঝলেন শব্দটা আসছে পাশের ঘর থেকেই যেখানে সবিতারাণীর শোওয়ার কথা। তিনি বন্ধ দরজায় আওয়াজ করলেন, 'কি হয়েছে মা? শরীর খারাপ নাকি?'

প্রথমে কোন সাড়া এল না। গোঙানিটা একটু নিচু হল মাত্র। হরিহর এবার

জোরে দরজায় ধাক্কা দিলেন। তৃতীয়বারে দরজাটা খুলে গেল এবং সেই সঙ্গে মাটিতে আছড়ে পড়ল সবিতারাণী। তার চুল আলুথালু, কাপড় শরীরে নেই বলতে গেলে। মুখ থেকে ফেনা বের হচ্ছে। টর্চের আলোয় হরিহরের বুঝতে অসুবিধে হল না যে সে বিষপান করেছে। তিনি চিৎকার করে উঠলেন, 'এ কি করেছিস?'

সবিতারাণী গোঙাল। তাতে কান্নার সঙ্গে কথার মিশেল ছিল, 'বাঁচান, আমাকে বাঁচান!' হরিহর অসহায়ের মত তাকালেন। যে বৃদ্ধার এখানে থাকার কথা তার শরীর খারাপ হওয়ায় আত্মীয়ের বাড়িতে ফিরে গেছে। সাহায্যকারী বলতে দুটি চাকর। এই সময় তারাও গভীর ঘুমে মগ্ন। তিনি রান্নাঘরে ছুটলেন। কাঁচা তেতুল তুলে নিয়ে চটকে জলে গুললেন। তারপর সেই জল গ্লাসে নিয়ে ফিরে এলেন সবিতারাণীর কাছে। জোর করে সেটার অনেকটাই গিলিয়ে দিলেন তিনি। এবং তারপরেই মেয়েটার শরীরে ঝাঁকুনি এল। হড়হড় করে বমি করতে লাগল সে। এমন কালো বমি জীবনে দ্যাখেননি তিনি। বমি করে মেয়েটা নেতিয়ে গেল। ওকে ওই অবস্থায় রেখে টর্চ নিয়ে ছুটলেন হরিহর।

কিভাবে সেই রাত্রে গরুর গাড়ির ব্যবস্থা করে সবিতারাণীকে তাতে শুইয়ে হরিপুরে নিয়ে গিয়েছিলেন তা তিনিই জানেন। হরিপুরে সম্প্রতি একটি সরকারী হেলথ সেণ্টার হয়েছে। নতুন বলেই এখনও উদ্যম রয়েছে। সবিতারাণীর জন্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা ওই ভোর-ভোর-সময়েও করা সম্ভব হল। ডাক্তার বললেন, আর্সেনিক খেয়েছে সবিতারাণী। বমি হয়ে যাওয়ায় কিছুটা উপকার হলেও এখনই বলা যাচ্ছে না বাঁচানো সম্ভব কিনা। কারণ আর্সেনিকের বিষ অনেকদিন পর্যন্ত সক্রিয় থাকে। তখন সবিতারাণী অজ্ঞান হয়ে রয়েছে। হেলথ সেণ্টারের বাইরে বসে সূর্যদেবের উদয় দেখতে দেখতে হরিহর প্রার্থনা করছিলেন, এযাত্রায় যেন ঈশ্বর নির্দয় না হন। শ্রীনিবাস ফিরে এসে তার স্ত্রীকে সুস্থ অবস্থায় দেখতে না পেলে —তিনি নিঃশ্বাস ফেললেন। মেয়েটা বিষ খেতে গেল কেন? কিছুদিন থেকেই অন্যমনস্ক এবং গম্ভীর হয়ে ছিল অবশ্য, কিন্তু স্বামীর ফিরে আসার খবর শুনে যে মেয়ে বিষ খায় তার স্বামী সম্পর্কে কোন আকর্ষণ থাকতে পারে না। কেন এমন হল?

হরিহর যখন গ্রামে ফিরল তখন খবরটা চাউর হয়ে গেছে। মেয়েটা মাঝরাত্রে অসুস্থ হয়ে পড়ায় ওকে হেলথ সেণ্টারে নিয়ে যেতে হয়েছে, এই কাহিনী অনেকেরই বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হচ্ছিল না। এত সাদাসাপটা ব্যাপারে কারও মন ভরছিল না। হরিহরের নির্দেশে গরুর গাড়ির গাড়োয়ান যখন একই কথা বলল তখন কেউ কেউ আগ্রহ হারাল। কেউ ভেবে নিল, গঞ্জে গেলে হেলথ সেণ্টারে খোঁজ নিতে হবে।

আজ ভোরে ডাক্তারবাবু কথাটা বলেছিলেন। আত্মহত্যার জন্যে বিষপান করা রোগী হেলথ সেণ্টারে এলে সেটা থানায় জানানো কর্তব্য, কারণ আত্মহত্যার চেষ্টা করা একটা অপরাধ। তাছাড়া নিজে না খেয়ে অন্য কেউ খাইয়ে দিতে পারে—সেক্ষেত্রে হত্যার অভিযোগ উঠবে। হরিহর জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আপনার কি মনে হয়, ও বেঁচে যাবে?'

'মনে হচ্ছে।'

'তাই যদি হয়, তাহলে এসব করলে বেঁচে থাকার পর ওর জীবন নষ্ট হয়ে

যাবে।'

'হ্যাঁ, সেটা সম্ভব। কিন্তু আমার কিছু করার উপায় নেই। আপনি দারোগাবাবুর সঙ্গে কথা বলুন। উনি ইচ্ছে করলে কেসটা নিয়ে না এগোতে পারেন।'

হরিহর বলেছিলেন, 'আপনি অন্তত চব্বিশ ঘণ্টা অপেক্ষা করুন। এখন পর্যন্ত আমি না জানালে আপনার পক্ষে বিষ কি ধরনের তা জানা সম্ভব ছিল না। ধরুন, ওর পেটের যন্ত্রণার কারণে এখানে ভর্তি হয়েছে!'

ডাক্তার কোন জবাব দেননি কিন্তু হরিহর ভরসা পেয়েছিলেন। বিকেলবেলায় সেই ভরসাটা চলে গেল। সাইকেল চালিয়ে একজন সেপাই খবর দিতে এল, দারোগাবাবু এক্ষুনি ডাকছেন। অগত্যা যেতে হল।

ভদ্রলোক টেবিলের ওপারে বসে চিৎকার করলেন, 'ভেবেছেনটা কি, অ্যাঁ? শ্রীনিবাস ফিরে এসে আপনার আমার লাইফ হেল করে দেবে, তা জানেন?'

'বুঝলাম না!'

'বুঝলেন না? মেয়েটা বিষ খেল কেন?'

'আমি কি করে জানব?'

'আপনি জানবেন না তো পাড়ার রামবাবু জানবে? নিজের হেফাজতে কেন রেখেছেন ওকে? এবার শ্রীনিবাস যদি জানতে পারে তাহলে কি হবে? গ্রামের কজন জানে সে বিষ খেয়েছে?'

'এখনও কেউ জানে না।'

'বাঁচালেন। আমি তো ঘেরাও-মিছিলের দুঃস্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলাম! শুনুন মশাই, কাউকে বলার দরকার নেই। সবাই জানবে ওর পেটে আলসার আছে, তাই যন্ত্রণা বমি হয়েছে। বাংলাদেশের অর্ধেক মেয়েই ওই অসুখে ভোগে। ডাক্তার আমাকে বলেছে, মরে যাওয়ার কোন চান্স নেই। একবার ভেবেছেন, স্বামীর অনুপস্থিতিতে বউ বিষ খেয়েছে শুনলে কোন স্বামী তাকে ঘরে নেবে?'

হরিহর ঠিক বুঝতে পারছিলেন না। মানবিকতা না ঝামেলামুক্তি,—দারোগা কোন্‌টা চাইছেন?

হরিপুর গঞ্জে পোস্টার পড়ে গেল। চায়ের দোকানে, গাছের শরীরে—সর্বত্র হাতে-লেখা পোস্টার মারা হয়েছে। খবরটা গ্রামে বসে হরিহরের কানেও পৌঁছাল। কমরেড শ্রীনিবাস জিন্দাবাদ, বিপ্লব জিন্দাবাদ। আগামী রবিবার বিকেল পাঁচটায় হরিপুরের বাসস্ট্যান্ডে কমরেড শ্রীনিবাসের জেল থেকে প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে বিরাট জনসভা। দলে দলে যোগদান করুন।

রিক্সার পেছনে মাইক বেঁধে ছেলেরা এই গ্রামেও প্রচার করে গেল। হরিহর বসেছিলেন বাইরের বারান্দায়, সঙ্গে পীতাম্বর ছিল, জিজ্ঞাসা করল, 'গেল জিরো হয়ে—এল হিরো বনে! থাকবে কোথায়?'

'আমার এখানেই থাকতে পারে। গাঁয়ের ছেলে, গর্ব হচ্ছে না তোমার?'

'একটু যে হচ্ছে না তা বলব না, তবে গ্রামটার বারোটা বেজে গেল!'

'হুম্! সময়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে হবে হে। মেনে নেওয়াই ভাল। উঠি, মেয়েটাকে খবরটা দিয়ে আসি।' হরিহর উঠে দাঁড়ালেন।

'আছে কেমন শ্রীনিবাসের স্ত্রী?'

'একটু ভাল। হাঁটাচলা করতে পারছে। তবে পেটে যন্ত্রণা আছে।' তিনি আর দাঁড়ালেন না। ভেতরে ঢুকে সোজা চলে এলেন সবিতারাণীর দরজায়। এসে দেখলেন সে চোখে কনুই চেপে শুয়ে আছে। হেলথ সেণ্টার থেকে ফিরে প্রচণ্ড রোগা হয়ে গিয়েছে মেয়েটা। ফিরে আসার পর তিনি ওকে একটাও প্রশ্ন করেননি, কেন বিষ খেতে গিয়েছিল জানতে চাননি।

'শরীর কেমন আছে?'

'ভাল।'

'যন্ত্রণা হচ্ছে?'

'অল্প।'

'ওষুধ খেয়েছ মা?'

'হ্যাঁ।'

'আগামী রবিবার শ্রীনিবাস আসছে। ভাবছি গঞ্জে যাব। সেখানে তাকে নিয়ে সভা হবে। তোমার এই শরীর নিয়ে যাওয়াটা ঠিক হবে না বোধ হয়।'

হাত সরাল না সবিতারাণী চোখ থেকে। উত্তরের জন্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে যখন পাশ ফিরছেন হরিহর তখন কানে এল, 'আপনাকে একটা কথা দিতে হবে!'

'হ্যাঁ, বল?'

'সে না জিজ্ঞাসা করলে তাকে আপনি আমার কোন কথা বলবেন না। এমন কি এখানে যে আছি তাও নয়।' সবিতারাণী স্পষ্ট জানিয়ে দিল।

হরিহর চমকে গেলেন। মানুষের সঙ্গে মানুষের এত মিল কি করে যে হয়ে যায়!

॥ ২৮ ॥

আজ হরিপুরে হেঁটে আসতে বেশ পরিশ্রম হল। ঠিক বের হবার আগে হরিহর খবর পেলেন গাড়োয়ানের জ্বর এসেছে আচমকা। অন্য গাড়ি যোগাড় করার সময় ছিল না। হনহনিয়ে হাঁটা শুরু করেছিলেন। পথ তো কম নয়।

বাস-স্ট্যাণ্ডেই দারোগাবাবুর সঙ্গে দেখা। সকালে খবরটা পাঠিয়েছিলেন তিনিই। হরিহর কিছু বলার আগেই দারোগাবাবু বললেন, 'খবর পেয়েছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, অনেক ধন্যবাদ।'

'এখন কি করবেন?'

'ঘরের ছেলে ঘরে ফিরছে, যাই নিয়ে আসি।'

'আই বাপ! আপনি নিয়ে আসতে যাচ্ছেন মানে?' দারোগা হতভম্ব।

'আপনার সেপাই বলে এল আজ সে শহরে আসছে!'

'ঠিকই বলেছে। কিন্তু আপনি কেন নিয়ে আসতে যাচ্ছেন?'

হরিহর হাসলেন, 'আমি ওকে জন্মইস্তক দেখছি। চোখের সামনে বড় হল। তা এতদিন জেলে শুকিয়ে মরল, গ্রামের মাথা হয়ে আমি যদি না যাই তো কে যাবে?'

দারোগা গলা নামালেন, 'সে জেলে গিয়েছিল আপনার জন্যেই।'

হরিহর মাথা নাড়লেন, 'ভুল হল। আমি আপনাকে দুদিন রাখতে বলেছিলাম বিষ মারার জন্যে, আপনি সদরে চালান করেছিলেন কৃতিত্ব নেবার জন্যে!'

'ওই এক হল। আপনি না বললে ওর বদলে অন্য কেউ যেত। কিন্তু আপনার কি দায় পড়েছে শহরে যাওয়ার? তার পেছনে এখন পার্টি আছে।'

'পার্টি?' হরিহর মাথা নাড়লেন, 'সে সাতজন্মে পার্টি করে না!'

'এক জন্মেই হয় মশাই। জেলে বসে পার্টির লোক হয়ে গিয়েছে। আমার কাছে খবর আছে, শহরে ওকে নিয়ে আজ পার্টির লোক মিছিল করবে। এখানেও তোড়-জোড় চলছে। ও হ্যাঁ, সনাতনের মৃত্যুর ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত আমি চেপে গেলাম। পেছনে কোন খুঁটি নেই যে তাগাদা করবে, খামোকা মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই।' দারোগাবাবু পকেট থেকে কৌটো বের করে সশব্দে নস্যি নিলেন, 'আমার সমস্যা বাড়ল।'

'মানে?'

'পাঠিয়েছিলাম বেড়াল করে, ফিরে আসছে অন্তত একটা খ্যাঁকশিয়াল হয়ে। ইলেকশন আসছে। এখন তো বাবুদের গায়ে হাত দেওয়া যাবে না। সেই সুযোগে আমার ওপর ঝাল ঝাড়বে রোজ।'

'না না। আমাদের শ্রীনিবাস অমন ছেলে নয়।'

হরিহরের কথা শুনে হাসলেন দারোগাবাবু। তারপর অদ্ভুত গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওর বউটা তো এখনও আপনার কাছে আছে, তাই না?'

মাথা নাড়লেন হরিহর, 'হ্যাঁ।'

'ভাগ্যবান পুরুষ আপনি!' দারোগাবাবু হাঁটতে শুরু করলেন।

কথাটায় খোঁচা আছে। হরিহর সবিতারাণীর মুখ মনে করলেন। বেচারার পেটে আজকাল প্রায়ই যন্ত্রণা হয়। ঠিক সময়ে সন্তান হলে সে ওর চেয়ে বড়ই হত। অথচ দারোগা সম্পর্কটাকে বুঝল না। যাক গে। স্বামী ফিরে আসছে। আজ সকালে খবর পাওয়ামাত্র তিনি সবিতারাণীকে বলেছেন সেকথা। মেয়েটার মুখের চেহারা পাল্টে গিয়েছিল, পেটের যন্ত্রণাটাও উধাও। শ্রীনিবাস গ্রামে ফিরে এলে বলতে হবে সবিতারাণীকে যেন ভালভাবে চিকিৎসা করায়। ছিদাম ঘরামীকে বলতে হবে ওদের ঘর নতুন করে তৈরী করে দিতে। সেই কটা দিন শ্রীনিবাস তাঁর বাড়িতেই থাকতে পারে। এটুকু তাঁকে করতেই হবে।

শহরে পৌঁছাতে বেলা দুপুর। রিক্সা নিয়ে জেলখানায় গিয়ে হরিহর হতভম্ব। গেটের সেপাইটা একগাল হেসে বলল, 'তেনাকে তো কখন নিয়ে গেছে ওরা!'

'কারা?'

'পার্টির বাবুরা। রিক্সায় চাপিয়ে গলায় মালা দিয়ে নিয়ে গিয়েছে। ওনারা দুজন ছিলেন। সেখানে গেলে খোঁজ পেয়ে যাবেন।'

রিক্সাওয়ালা বলল, সে পার্টির অফিস চেনে। ব্যাপারটা মাথায় ঢুকছিল না

হরিহরের। জীবনে যে কখনও পার্টি করল না তাকে পার্টির লোকেরা খামোকা মালা দিতে যাবে কেন? নিশ্চয়ই কোথাও একটা ভুল হয়েছে!

পার্টির অফিসের কাছে পৌঁছাতেই তাঁর সন্দেহ ঘুচল। ঘন ঘন মাইকে যে স্লোগান তোলা হচ্ছে তাতে শ্রীনিবাসের নাম আছে। শ্রীনিবাস জিন্দাবাদ, কমরেড শ্রীনিবাস যুগ যুগ জিও। মহিম সেন জিন্দাবাদ।

প্রথমে পার্টির অফিসের পাশের পানের দোকান থেকে সংবাদ সংগ্রহ করলেন তিনি। দীর্ঘদিন জেল খেটে মিসাবন্দী মহিম সেন এবং শ্রীনিবাস আজ মুক্তি পেয়েছে। মহিমবাবু এই শহরের মানুষ। শ্রীনিবাস মফঃস্বলের। আজ বিকেলবেলায় ওদের নিয়ে বিরাট জনসভা হবে। হরিহর চমকিত। নারাণপুরের কোন মানুষকে নিয়ে শহরে জনসভার কথা তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। এ কী হয়ে গেল সব!

দরজার সামনেই ছোটখাটো ভিড়। পার্টির লোকেরাই সেখানে দাঁড়িয়ে খুশী-গলায় আলোচনা করছিল। হরিহর তাদের একজনকে অনুরোধ করলেন শ্রীনিবাসকে ডেকে দেওয়ার জন্যে। বোঝাই যাচ্ছিল সে ভেতরে আছে। লোকটা জিজ্ঞাসা করল, 'কোত্থেকে আসছেন?'

'আজ্ঞে নারাণপুর থেকে।'

লোকটি মাথা নাড়ল, 'আপনি আমাদের হরিপুর লোকাল ইউনিটের সঙ্গে যোগাযোগ করুন, ওরাই আপনাকে বলে দেবে কবে সভা করতে পারবেন!'

'সভা? সভা মানে?'

'আরে মশাই, আপনারা ওকে নিয়ে সভা করতে চান তো?'

'আজ্ঞে না।'

'না? তাহলে কি জন্যে এসেছেন?'

'শ্রীনিবাস আমাদের গ্রামের লেছে। আমাকে জ্যাঠামশাই বলে।'

'ও। পার্সোনাল রিলেশন!' দাঁড়ান দেখছি। চলে গেল ভেতরে লোকটি।

হরিহর তল পাচ্ছিলেন না। শ্রীনিবাস সভা করবে? সর্বনাশ! ও যাতে আর পার্টির লোকদের খপ্পরে না পড়ে তাই তিনি দারোগাকে বলেছিলেন দু'চারদিন থানায় রেখে শিক্ষা দিতে। এ যে উল্টো হয়ে গেল। এইসময় লোকটি বেরিয়ে এসে তাঁকে ডেকে নিয়ে গেল। ভেতরের ঘরে অনেক লোক। শ্রীনিবাস তাঁদের মধ্যে বসে আছে। বেশ স্বাস্থ্য ভাল হয়েছে, গায়ের রঙ অনেক উজ্জ্বল।

'বাবা শ্রীনিবাস!' হরিহরের গলা ধরে গেল।

'ও, আপনি? কি ব্যাপার?' শ্রীনিবাস সত্যি অবাক হয়েছে।

'তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এলাম বাবা।'

'তাই নাকি? কিন্তু আমাকে গ্রামে নিয়ে গেলে আপনার তো সুবিধে হবে না?'

'মানে?'

'আপনি এতদূরে কেন এসেছেন তা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না হরিহর জ্যাঠা। আমাকে হাতে রাখলে এখন আপনার আখেরে লাভ হবে।'

'এ কি বলছ বাবা?'

'ঠিকই বলছি। আপনি বুদ্ধিমান মানুষ। বুদ্ধিমান না হলে এতবছর ধরে গরীব চাষীর ওপর অত্যাচারের রোলার নিশ্চিন্তে চালিয়ে যেতে পারতেন না।'

শ্রীনিবাস পাশের মানুষটির দিকে তাকাল, 'মহিমদা, ইনি একজন জোতদার। আমাদের গ্রামের বেশীর ভাগ জমিই স্বনামে বেনামে ইনি ভোগ করেন। কিন্তু দিন বদলাচ্ছে খুব দ্রুত। হরিহর জ্যাঠা, দেওয়ালের লিখন পড়তে শিখুন। তবে হ্যাঁ, একটা ব্যাপারে আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। আপনার বাড়ির গাছ যদি চুরি না যেত তাহলে এখনও আমি অন্ধকারে পড়ে থাকতাম।'

'আমি তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।' হরিহর অসহায় গলায় বললেন।

এবার মহিমবাবু বললেন, 'আপনি এখান থেকে চলে যান। আমাদের সংগ্রাম সর্বহারাদের পক্ষে, আপনাদের বিরুদ্ধে। এই অফিসে আপনার মত একটি বুর্জোয়া এসেছে জানলে ছেলেরা উত্তেজিত হবে। আমাদের কাছে খবর আছে, আপনিই বিনা কারণে শ্রীনিবাসকে মিসা করিয়েছেন। আবার আজ তাকে নিতে এখানে এসেছেন। আপনি যে একটি মতলববাজ মানুষ তাতে কোন সন্দেহ নেই। দয়া করে আপনি চলে যান।'

হরিহর নির্বাক। তাঁর সর্বাঙ্গে কাঁপন এল। শ্রীনিবাস এখন তাঁর মুখের দিকে তাকাচ্ছে না। যে লোকটি তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিল সে প্রায় ঠেলেঠুলে তাঁকে বাইরে বের করে দিল। ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিচ্ছিলেন তিনি। এমনভাবে অপমানিত কখনও হননি তিনি। এইসময় তাঁর একবারও মনে এল না যে মহিমবাবুর কথাগুলো খুব মিথ্যে নয়। স্বনামে বেনামে তাঁর জমি আছে, শ্রীনিবাস তাঁর জন্যেই, হয়তো পরোক্ষভাবে, মিসায় বন্দী হয়েছে, এ খবর তো ঠিকই। কিন্তু এসব ছাপিয়ে তাঁর কেবলই মনে হচ্ছিল, এতকাল গ্রামের মানুষের উপকার করে তিনি অন্যায় করেছেন। কাউকে কখনও শোষণ না করেও শোষক জোতদার হিসেবে তাঁকে চিহ্নিত করা হল আজ।

গ্রামে ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে গড়িয়ে গেল। ঢুকতেই নীলাম্বরের সঙ্গে দেখা। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে নীলাম্বর আঁতকে উঠল, 'আরে! কি হয়েছে?'

'কিছু না। তুমি একটা উপকার কর তো হে। আটটা নাগাদ গ্রামের সবাই, যারা আমার জমি চাষ করে তাদের আমার বাড়িতে আসতে বল। খুব জরুরী কথা আছে।' হরিহর আর দাঁড়ালেন না।

জল গামছা এনে দিতে গিয়ে সবিতারাণী থমকে দাঁড়াল, 'কি হয়েছে আপনার?'

'কেন? একথা বলছ কেন?' মুখে ঘাড়ে জল ঢালতে লাগলেন হরিহর।

'মুখচোখ অন্যরকম দেখাচ্ছে! শহরে গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ। তোমাকে এখনই কোন সুসংবাদ দিতে পারছি না। সে কবে আসবে তা আমাকে খোলসা করে বলেনি। তবে শহরে যখন এসে গেছে তখন গ্রামে নিশ্চয়ই আসবে। আর হ্যাঁ, শরীর স্বাস্থ্যের বেশ উন্নতি হয়েছে।'

আটটা নাগাদ সবাই এসে গেল। বারান্দায় একটা চেয়ারে বসেছিলেন হরিহর। এর মধ্যে অনেকেই এইভাবে ডাকার কারণ জিজ্ঞাসা করেছে কিন্তু তিনি জবাব দেননি। সবাই না এলে কোন কথা বলবেন না বলে স্থির করেছিলেন। একসময় পীতাম্বরকে বললেন, 'দ্যাখো তো, উত্তর থেকে পূর্বে, এই কাগজে লেখা জমিগুলো

মিলিয়ে নিয়ে সবাই এসেছে কিনা।'

পাতাম্বর একটু-আধটু পড়তে পারে। সে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে নাম ডেকে যাচাই করে নিয়ে বলল, 'সবাই হাজির। শুধু শ্রীনিবাসের পক্ষে কেউ আসেনি।'

'ঠিক আছে। দাও কাগজটা।' হাত বাড়িয়ে কাগজ নিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন হরিহর। সঙ্গে সঙ্গে গুঞ্জন বন্ধ হয়ে গেল।

শেষ পর্যন্ত গলাখাঁকারি দিয়ে হরিহর শুরু করলেন, 'তোমরা আমার জমি চাষ কর। তোমাদের পিতা-পিতামহরাও করতেন। একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি, এই চাষ করা নিয়ে আমি তোমাদের ওপর কখনও কোন অত্যাচার করেছি?'

কেউ জবাব দিল না। গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল।

হরিহর বললেন, 'না—চুপ করে থাকলে চলবে না। মুখ খুলে কথা বল।'

নীলাম্বর জিজ্ঞাসা করল, 'আজ হঠাৎ এই কথা উঠল কেন?'

'কারণ আছে নীলাম্বর। কারণ না থাকলে এতরাত্রে তোমাদের বিরক্ত করতাম না।'

পীতাম্বর বলল, 'অত্যাচার করলে তোমার সঙ্গে সবার সম্পর্ক ভাল থাকে?'

'কিন্তু আমি জোতদার। তোমাদের ওপর অত্যাচার করছি, শোষক আমি। আজ শহরে এসব কথা শুনতে হয়েছে আমাকে। তোমার বিপদের দিনে তুমি আমার কাছে দশ টাকা ধার নিলে। অনেকদিনের পরেও শোধ করছ না দেখে আমি সেটা ফেরৎ চাইলাম। এটাও বোধহয় অত্যাচার হয়ে যাচ্ছে? ভগবান! যাহোক, ঠিক করেছি আর বদনাম কিনব না। আমি জমি বিক্রী করে দেব। তোমরা চাষ করো তাই আগে তোমাদের কাছেই প্রস্তাব দিলাম। এ তল্লাটে এখন যা বাজারদর তার সিকিভাগ দাম তোমারা দিও। এক মাস সময় দিলাম।'

অনন্ত চুপচাপ শুনছিল, বলল, 'বাঃ, চমৎকার! তুমি বিক্রি করছ, সিকিদামে দিচ্ছ, কিন্তু আমাদের কেনার সামর্থ্য আছে? টাকা পাব কোথায়?'

'আমি তো সস্তায় দিচ্ছি।'

'আশ্চর্য! যার পকেটে টাকা নেই তার কাছে সস্তার কোন মূল্য আছে?'

'ঠিক আছে, তোমরা সময় নাও। এক মাসে না পারো ছয় মাসে কিনে নাও। কিন্তু বিক্রী আমাকে করতেই হবে। এসো এবার সবাই।'

মানুষজন বিভ্রান্ত। গুঞ্জনটা ক্রমশ হরিহরের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গ্রামের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ল।

সবাই চলে যাওয়ার পর পীতাম্বর তাঁর কাছে এল, 'এরা কেউ কিনতে পারবে না। তবে তুমি যদি চাও তাহলে আমি বিক্রীর ব্যবস্থা করতে পারি।'

'কি রকম?'

'হরিপুরে লোক আছে। একজন না পারলে দশজনে মিলে কিনবে।'

মাথা নাড়লেন হরিহর, 'না'। বাইরের লোক আগে নয়। আমি ছয় মাস অপেক্ষা করব। জমি যেমন আমার বাপ-পিতামহের কাছ থেকে পাওয়া, ওই জমিতে চাষের অধিকারও তো ওরা সেইভাবে পেয়েছে। আগে ওরা না বলুক, তারপর ভাবব।'

॥ ২৯ ॥

হরিপুরের বাসস্ট্যান্ডে সকাল থেকে মাইক বাজছিল। ঘোষক একই কথা বারংবার জানিয়ে যাচ্ছিল, 'বিখ্যাত সংগ্রামী, কেন্দ্রীয় সরকারের চক্রান্তের শিকার কমরেড শ্রীনিবাস আজ দুপুর এক ঘটিকায় এই মঞ্চে উপস্থিত হয়ে আপনাদের সামনে ভাষণ দেবেন। মিসায় বন্দী করে কমরেড শ্রীনিবাসের ওপর যে অত্যাচর করা হয়েছে তার বিবরণ নিজের কানে শোনার জন্যে আপনারা দলে দলে যোগদান করুন।'

সকালে ঘোষণা শুরু হওয়ামাত্র মানুষজন উসখুস শুরু করেছিল। খবরটা পেঁছেছিল নারাণপুরেও। শ্রীনিবাসের বন্ধুরা সাইকেলে চেপে হরিপুরে পেঁছে গিয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে। উদ্যোক্তা পার্টিকর্মীরা তাদের তেমন পাত্তা দেয়নি প্রথমে। নগেন তাদের কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে জানল শ্রীনিবাস সাড়ে বারোটার বাসে আসছে।

খবরটা হরিহরের কানেও পেঁছেছিল। শ্রীনিবাস সরাসরি গ্রামে আসছে না, বাস থেকে নেমে হরিপুরের বাসস্ট্যান্ডে সভা করবে। ব্যাপারটা আদৌ পছন্দ না হলেও তাঁর কিছুই করার নেই। এখন পর্যন্ত গ্রামের কেউ তাঁর প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসেনি। মুশকিল হল এসব অঞ্চলে জমিজমা বিক্রী করে দেব বললেই খদ্দের পাওয়া যায় না। অনন্ত মাতাল অবশ্য এসেছিল অন্য প্রস্তাব নিয়ে। হরিপুরের বড় ব্যবসায়ী মাখনলাল আগরওয়াল জমিজমা নিয়ে তেমন আগ্রহী না হলেও একটু সস্তায় পেলে না বলবে না। হরিহর মাথা নেড়েছিলেন। সেটা বুঝতে পেরে অনন্ত আর কথা বাড়ায়নি।

ছাতা হাতে বাড়ি থেকে বের হবার সময় তিনি সবিতারাণীকে ডাকলেন। মেয়েটা আজকাল খুব চুপচাপ থাকে। আজ মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল, ঠিক সুস্থ নয়। জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার কিছু হয়েছে?'

সবিতারাণী না বলল মাথা নেড়ে, শব্দ উচ্চারণ না করে।

'আমি হরিপুর যাচ্ছি। শ্রীনিবাসের আজ আসার কথা। সেখানে আজ সভাটভা হবে। এতদিন পরে আসছে, কোথায় সোজা বাড়িতে আসবে না ওইসব করা হচ্ছে। আমার ভাল লাগে না।' মনের কথা বলে ফেললেন হরিহর।

সবিতারাণী জবাব দিল না। কোন মন্তব্যও করল না। হরিহর বুঝলেন এই পরিস্থিতিতে বেচারা কিছু বলতে পারে না।

একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। মঞ্চে একজন মাইক ফাটিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে। তার পাশে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে শ্রীনিবাস। উপস্থিত মানুষের সংখ্যা শ'-খানেকের বেশি নয়। হরিহর সেই ভিড়ের একপাশে দাঁড়ালেন। বক্তা বক্তৃতা শেষ করে বলল, 'এবার মহান বিপ্লবী কমরেড শ্রীনিবাসের বক্তব্য আপনারা শুনতে পাবেন।'

হাততালি পড়ল। শ্রীনিবাস মাইকের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সবাইকে দেখল।

তারপর গলা খুলল, 'আপনারা আমার বিপ্লবী অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আজ আমি এই বুর্জোয়া সরকারের জেল থেকে মুক্তি পেয়ে আপনাদের সামনে এসেছি তা কোন বিশেষ ঘটনা নয়, ধারাবাহিকভাবে ঘটতে যাওয়া অবশ্যম্ভাবী ঘটনাবলীর একটা অংশ মাত্র। পৃথিবীর ইতিহাস বলে, কখনই অত্যাচারী শোষকশ্রেণী নির্যাতিত সাধারণ মানুষকে চিরকাল পায়ের তলায় চেপে রাখতে পারে না। আমাকে এবং আমার মত অগণিত মানুষকে ওরা বন্দী করে রেখেছিল ভয় পেয়ে। কেন ভয়? আমরা গুন্ডা বদমাশ নই। আমাদের হাতে বন্দুক কামান নেই, তবু ভয় কেন? ওরা ভয় পেয়েছিল সত্যিকথাকে। তুমি শোষক আমি শোষিত এই কথা বলার ক্ষমতা আমাদের হয়েছে এটা ওরা মানতে পারে নি।

অথচ ওরা বলে দেশে গণতান্ত্রিক সরকার চলছে। সাধারণ মানুষ নাকি ওদের ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছে। আমরা যা বলছি বা করছি তা দেশের স্বার্থবিরোধী। কিন্তু কারা নির্বাচিত হচ্ছে? যাদের অনেক আছে, যাদের বাপঠাকুর্দা অনেক রেখে গিয়েছে এবং তাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে লোভ দেখিয়ে ভোট কিনে আরও সম্পত্তি বাড়াচ্ছে, তারাই একথা বলছে। এই সরকার বড়লোকদের সরকার। ভোটের আগে গরীব মানুষদের লোভ দেখিয়ে তারা ভোট নেয় এবং পাঁচ বছরের জন্যে ভুলে যায়। আর এদের কাজে কারা সাহায্য করে? না যাদের স্বার্থ থাকে। সেইসব মানুষেরা আরও বেশি ভয়ানক। এরা ছড়িয়ে আছে শহরে, গ্রামে, গঞ্জে। কেউ জোতদার, কেউ ব্যবসায়ী। শোষকের এক এক রকম চেহারা। আমরা গরীব মানুষের কাছে, সর্বহারার পাশে এসে বোঝাতে চাই তোমরা আর লোভের ফাঁদে পা দিও না। ওই বদমাশগুলোর সত্যিকারের চেহারা দেখে গর্জে ওঠ। মানুষের প্রকৃত বন্ধুর কাজ করতে চাই বলে ওরা আমাদের সহ্য করতে পারছে না। কিন্তু আমরা থেমে থাকব না।

আপনারা সতর্ক থাকুন। আপনাদের এই এলাকায় ওইসব শয়তান শোষককে সাহায্য করার জন্যে অনেক মানুষ আছে। তাদের মুখোশ ছিঁড়ে ফেলতে হবে। পার্টি আমাকে দায়িত্ব দিয়েছে স্থানীয় কমরেডদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সেই কাজ করতে। আমি আপনাদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি আমাদের সঙ্গে সামিল হতে। ইনকিলাব জিন্দাবাদ।' শ্রীনিবাস বক্তৃতা শেষ করতেই প্রচুর হাততালি পড়ল।

হরিহর অবাক হয়ে শুনছিলেন। ছেলেটা ভাল বলল। একটা সরল হাবাগোবা ছেলে এই কয়মাসে যেন রাতারাতি বদলে গিয়েছে। বক্তৃতা শুনতে শুনতে তাঁর ভয় হচ্ছিল, ও যদি এই জনতার কাছে ফাঁস করে দেয় মিথ্যে গাছ চুরির দোষ দিয়ে হরিহর তাকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছিলেন তাহলে কি হবে? কিন্তু বক্তৃতা শুনতে শুনতে একসময় এই ভয় কেটে গেল হরিহরের। শ্রীনিবাস নিজের অতীতের কথা এই জনতাকে জানাতে চাইছে না। সে যে কোনকালেই বিপ্লবী ছিল না তা প্রকাশ পেয়ে যাবে সত্যি কথা বললে। তাই ইচ্ছে হলেও হরিহরের কথা বলতে পারবে না সে।

ভিড় ফাঁকা হয়ে গেলে হরিহর এগিয়ে এলেন, 'বাবা শ্রীনিবাস!'

শ্রীনিবাস তাকাল। তার সঙ্গীসাথীরা স্বাভাবিক—কিন্তু ওর কপালে ভাঁজ ফুটল, 'ও আপনি? কি চাই?'

'গ্রামে যাবে তো? চল, গাড়ি এনেছি।'

'গাড়ি?'

সঙ্গের একজন বলল, 'গরুর গাড়ি।'

'না না। আমি অসুস্থ অথবা বুর্জোয়া নই যে গরুর গাড়িতে চেপে কোথাও যাবো। আপনি আমাদের ভাবেন কি?' খেঁকিয়ে উঠল শ্রীনিবাস।

সঙ্গী ছেলেটি বলল, 'আমরা ঠিক করেছি দাদাকে নিয়ে সাইকেলে প্রসেশন করে যাবো। পঁচিশটা সাইকেল রেডি আছে। আপনি বাড়ি যান।'

হরিহর কথা বাড়ালেন না। শ্রীনিবাসের বলার ধরণ তাঁর একটুও ভাল লাগে নি। বারংবার মনে হচ্ছিল এই ছেলেকে তিনি চেনেন না।

তাঁর চোখের সামনে পঁচিশটা সাইকেল শ্রীনিবাসকে সামনে রেখে রওনা হয়ে গেল হরিপুর থেকে। রাস্তার দুপাশের মানুষদের সঙ্গে হরিহরও তাদের দেখলেন। স্লোগান দিতে দিতে ওরা যাচ্ছে বিজয়ী সেনার মত। যাকে পুলিশ কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে গিয়েছিল সে ফিরে যাচ্ছে যুদ্ধজয়ীর মত। এভাবে কেউ কখনও তাঁদের গ্রামে কোনদিন প্রবেশ করে নি। আগ বাড়িয়ে এসে তিনি গালে চড় খেলেন।

মাথা নিচু করে হাঁটছিলেন হরিহর হঠাৎ পেছন থেকে কেউ তাকে ডাকল, 'হরিহরবাবু নাকি?'

ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। লোকটিকে এর আগে দু-একবার দেখেছেন। শহরে ব্যবসা আছে। এই গঞ্জেও বাড়ি কিনেছেন। নমস্কার করে বললেন, 'আমাকে চিনতে পারছেন না নিশ্চয়ই!'

'না, ঠিক—তবে দেখেছি।'

'সামান্য মানুষ, চোখে পড়ার কথা নয়। শ্রীনিবাসের জন্যেই এলাম। ও বাসে আসতে চেয়েছিল, শুনে বললাম, তা কি করে হয়, আমার গাড়িতে চল। এখানে কিছু বিলিব্যবস্থা করে আজই ফিরে যাব শহরে। একটু সময় দিলে বড় খুশী হই।'

'আপনি কি আমাকে কোথাও যেতে বলছেন?' হরিহর জানতে চাইলেন।

ভদ্রলোক হাসলেন, 'এই একটু যদি আমার বাড়িতে জলস্পর্শ করে যান। আমার নাম ত্রিদিবেশ সান্যাল। পাশেই বাড়ি।'

লোকটিকে এড়াতে পারলেন না হরিহর। নিশ্চয়ই কিছু বক্তব্য আছে ওঁর। বিনা কারণে কেউ অপরিচিত মানুষকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে যায় না।

ত্রিদিবেশবাবুর বাড়িটি তাঁর তৈরী নয়। এটি আগে হরেন রায়ের ছিল। এককালে এ অঞ্চলে হরেন রায়ের প্রতিপত্তি অনেকেই ঈর্ষা করত। অপুত্রক হরেন রায় মারা যাওয়ার পর তাঁর বিধবা স্ত্রী এখানে থাকতেন। তিনি দেহ রাখার পর ভাইপো বাড়ি বিক্রি করে দিয়েছে ত্রিদিবেশকে। যৌবনে হরেন রায়কে অনেকবার দেখেছেন হরিহর। আজ তাঁরই বৈঠকখানায় ঢুকে নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল আচমকা। এই বিষয়সম্পত্তি কে কার জন্য তৈরী করে? মানুষের আয়ু তো পদ্মপাতায় জল, এই কথাটা ভুলে যেতে খুব ভালবাসে মানুষই।

কাঁচের গ্লাসে জল আনিয়ে ত্রিদিবেশ হরিহরের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'আপনি হরিপুরের সম্পন্ন মানুষ। আপনার কথা আগেও শুনেছিলাম, আজ বাসস্ট্যাণ্ডের

সভায় একজন আপনাকে দেখিয়ে দিল।'

'আপনি সেখানে ছিলেন বুঝি?' জল খেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন হরিহর।

'হ্যাঁ। আপনাকে তো বললাম শ্রীনিবাস আমার গাড়িতেই শহর থেকে এসেছে। তবে হ্যাঁ, আমি ওদের এখন সমর্থন করছি। সক্রিয়ভাবে কোন পার্টির সদস্য আমি নই। ব্যবসাপত্তর করি, বুঝতেই পারছি এই সরকারের আয়ু শেষ হয়ে আসছে।' ত্রিদিবেশ অদ্ভুত একটা হাসি হাসলেন।

'আপনি কি বলবেন বলছিলেন?'

'ও হ্যাঁ, সামান্য ব্যাপার। এদিকে বাড়ি কিনেছি, মাঝে মাঝে শহর থেকে পালিয়ে আসি টাটকা বাতাসের জন্যে। তা গিন্নীর খুব শখ জমিজমা কেনার। শুনলাম আপনি কিছু বিক্রী করবেন। তা আজকাল তো স্বনামে বেশি জমি রাখা যায় না। আপনি নিশ্চয়ই সেসব কাগজপত্র ঠিক রেখেছেন?'

'আমার জমি তো এখানে নয়, হরিপুরে।'

'তা জানি। আমি সব খবর নিয়েছি, লোক পাঠিয়ে জরিপও করে নিয়েছি। বিঘে কত হলে আপনার সুবিধে হয়?'

হরিহর এমন প্রস্তাব পাবেন বলে আশা করেন নি। তিনি একটু শক্ত হয়ে গেলেন, 'আপনি কি জানেন আমার সমস্ত জমিতেই কয়েক পুরুষ ধরে কিছু মানুষ ভাগে চাষ করে আসছে?'

'সব জানি।'

'ও। কিন্তু আমি জমি বিক্রী করব সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর আগে তাদের কাছে প্রস্তাব দিয়েছি কিনে নেওয়ার জন্যে। সেটাই উচিত। তারা না পারলে—'

'পারবে না।' হাসলেন ত্রিদিবেশ।

কথাটা নিজেও জানেন হরিহর। বললেন, 'মোট জমি কত এবং তার দাম কি হওয়া উচিত আপনি আন্দাজ করতে পারেন?'

'নিশ্চয়ই পারি। শুনুন মশাই, আপনি আপনার গ্রামের লোকদের যে দামে দেবেন আমাকে সেই দামে দেবেন না। এটা অন্যায় নয়। আপনার গ্রামের লোকের কেনার ক্ষমতা নেই কিন্তু আমি তাদের টাকা দিয়ে ওদের নামে আপনার কাছ থেকে কিনে নিতে পারি। তাতে ঝামেলা বাড়বে অবশ্য। দলিল আমার কাছে থাকলেও আমি সরাসরি মালিক হতে পারছি না। গিন্নীর সাধ পূর্ণ হবে না। তাই একটু বেশী দাম হলেও আমার স্ত্রী, আমাদের যত আত্মীয়স্বজন সবার নামে কিনে নিতে চাই। টাকা রেডি।'

'এত জায়গা থাকতে হঠাৎ আমাদের গ্রামের জমির ওপর আপনার নজর পড়ল কেন?' হরিহর জানতে চাইলেন।

'গ্রামটা ভাল, ছবির মত। পাশেই নদী আর মন্দির—চমৎকার।'

'ওই মন্দির-সংলগ্ন জমি কিন্তু বিক্রীর জন্যে নয়!'

'সে কি? আপনি বাড়ি বিক্রী করছেন আর ঠাকুরঘর বেচবেন না?'

'না। ওইটে পারব না।'

'আপনি দেখছি ভাল ব্যবসাদার, দর বাড়াচ্ছেন।'

'আজ্ঞে না। ওটা আমাদের বংশের ব্যাপার।' হরিহর উঠে দাঁড়ালেন, 'তাহলে

চলি। অনেক কথা হল।'

ত্রিদিবেশ উঠে দাঁড়ালেন, 'হরিহরবাবু দিনকাল দ্রুত বদলে যাচ্ছে। এতকাল যারা ক্ষমতায় ছিল তারা খেয়ে খেয়ে অলস হয়ে গেছে। এখন যারা আসছে তারা অনেক বুদ্ধিমান, অনেক শিক্ষিত। এরা ইচ্ছে করলে আপনাকে রাতারাতি ভিখিরী করে দিতে পারে।'

'কারা ?'

'এই নতুন রাজনীতির মানুষজন। এদের সঙ্গে আপনি থাকতে পারবেন না, আমি পারব। অতএব ওই মন্দির নিয়ে মাতবেন না।'

'কি করব বলুন। ধর্মই বলুন আর ঈশ্বর বলুন, ওঁকে ছেড়ে তো থাকতে পারি না। রাজনীতি মানুষকে নিঃস্ব করতে পারে কিন্তু ধর্ম তো চিরকাল আশ্রয় দেয়, তাই না?' হরিহর বেরিয়ে গেলেন।

সাইকেলের মিছিলটা এগিয়ে যাচ্ছিল গ্রামের দিকে। মাঝে মাঝে বিভিন্ন নামে জিন্দাবাদ ধ্বনি ছিটকে উঠছিল আকাশে। শূন্য মাঠে যেসব মানুষেরা কাজে অকাজে এসেছিলেন তাঁরা অবাক চোখে দেখলেন দৃশ্যটা। মিছিলের প্রথমেই শ্রীনিবাসের সাইকেল।

এসব খবর হাওয়ার আগে ছোটে। গ্রামে মিছিল ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই পিলপিল করে মানুষজনেরা বেরিয়ে এল। সবাই শ্রীনিবাসকে দেখে অবাক। যার নাকি সারা জীবন জেলের ভাত খাওয়ার কথা সে ফিরে এল বেশ শাঁসেজলে বাবু-বাবু-মার্কা চেহারা নিয়ে। শ্রীনিবাসের নির্দেশে দুটো সাইকেল জড়ো করা হল। তার ওপর উঠে দাঁড়াল সে। হঠাৎ মনে হল এই গ্রামে জন্মেছে সে, এখানকার সবকিছু তার চেনা। এখন থেকে এখানে সে যা বলবে তাই হবে। মানুষের উপকারের জন্যে সে জান লড়িয়ে দেবে। শ্রীনিবাস শুরু করল, 'বন্ধুগণ। আপনারা আমার সংগ্রামী অভিনন্দন গ্রহণ করুন। যে অস্বাভাবিক অবস্থায় আপনাদের বাস করতে হচ্ছে বছরের পর বছর তার অবসান ঘটতে বেশী দেরি নেই। আমি জানি এই গ্রামের জোতদার কিভাবে আপনাদের শোষণ করে চলেছেন। যে জমিতে কয়েক পুরুষ ধরে রক্তে ভিজিয়ে ফসল তুলছেন তার একটা বড অংশ ওই মানুষটার ঘরে তুলে দিতে হচ্ছে। কারণ কবে কখন তাঁর পূর্বপুরুষ হয়তো একটি রুপোর টাকায় এক বিঘে জমি কিনে রেখেছিলেন বলে মালিকানা-সত্ব কব্জা করে নিতে পেরেছেন। এটা হতে দেওয়া যায় না। আপনারা এও জানেন পুলিশ আমাকে গ্রামে ঢুকে কোমরে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে গিয়েছিল। আমার অপরাধ? না আমি নাকি ওই জোতদার মশাই-এর গাছ কেটে নিয়ে গিয়েছি চুরি করে। সেই গাছ পাওয়া গিয়েছিল আমার বাড়ির সামনে। একবারও কেউ ভাবল না যে আমি যদি গাছ চুরি করি তাহলে সেটাকে আমার বাড়ির সামনে ফেলে রাখব না। অতবড গাছ আমার একার পক্ষে কাটা সম্ভব নয়, বয়ে নিয়ে যাওয়া তো অসম্ভব। আমার স্ত্রী জানেন ওই বৃষ্টির রাত্রে আমি নিজের ঘর থেকে বের হইনি। কিন্তু পুলিশ কি করল? অপরাধ প্রমাণিত হলে যেখানে বড়জোর দিন দশেকের জেল হতে পারে তার বদলে আমাকে মিসায় ঢুকিয়ে দেওয়া হল। মিসা মানে আমি নাকি দেশদ্রোহী,

অস্ত্র হাতে নেতাদের মারতে যাচ্ছি। আমি জানি এই ঘটনার সঙ্গে পুলিশ এবং জোতদারের যোগাযোগ আছে। উনি জেলখানায় গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করে কান্নাকাটি করেছেন। এসব কুমীরের কান্না। তারপর যেই আমি ছাড়া পেলাম, অমনি শহরে গিয়ে আমায় অভ্যর্থনা করলেন। আমাকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামে ফিরতে চান। কারণ উনি বুঝে গিয়েছেন ওঁর কীর্তি ফাঁস হয়ে যাবে। তাই আমাকে হাত করতে এখন আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এদের চরিত্র জেনে নিন। বন্ধুগণ, নির্বাচন আসছে। এই শোষকদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে আপনারা আমাদের হাতে হাত মেলান। ইনকিলাব, জিন্দাবাদ।' শ্রীনিবাস সাইকেল থেকে নেমে পড়ামাত্র তার নামে জয়ধ্বনি দিতে শুরু করল অন্যান্য সাইকেল-সঙ্গীরা। দেখাদেখি গ্রামের মানুষও তাতে যোগ দিল।

ভিড় ঠেলে ধীরেন এগিয়ে এল, 'কেমন আছিস?'

'এই তো। ভাল।'

শ্রীনিবাস অদ্ভুত হাসল। হাসিটা পছন্দ হল না ধীরেনের। তবু সে জিজ্ঞাসা করল, 'এখন থেকে এখানেই থাকবি তো?'

'মাঝে মাঝে। এদিকের চারটে গ্রামের দায়িত্ব আমার ওপর। আজই হরিপুরে ফিরে যেতে হবে ভাই।'

'তোর বউ এর শুনলাম শরীর ভাল নয়।'

'কি হয়েছে?' শ্রীনিবাস এগিয়ে এল।

'জানি না। আমার ওয়াইফ বলছিল। হরিহর কাকা ওষুধ এনে দিয়েছেন।'

'অ। তিনি কেন দিতে গেলেন?'

'বাঃ। তাঁর ওখানেই তো আছে তোর বউ। তুই চলে যাওয়ার পর গ্রামের আর কেউ দায়িত্ব নিতে চাইল না। তোদের ঘরটাও ভেঙ্গে গিয়েছে।'

'বুঝলাম। তাকে একবার ডেকে নিয়ে আয় তো!'

'তার মানে? তুই বাড়ির বউ-এর সঙ্গে এই ভিড়ে দাঁড়িয়ে কথা বলবি?' ধীরেনের গলার স্বরে এমন কিছু ছিল যাতে মন পাল্টালো শ্রীনিবাস। সঙ্গীদের অপেক্ষা করতে বলে ধীরেনকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হল। তার পেছন পেছন একটা দঙ্গল মজা দেখার মত মুখ করে অনুসরণ করে যাচ্ছিল।

'আমার বাড়িটার মেরামতি করে নিতে হবে।'

'থাকতে হলে তো করতেই হবে।' ধীরেন বলল।

'দূর। থাকবে কে? ওখানে আমাদের পার্টি অফিস করব। পজিশনটা তো খুব ভাল। কি বলিস?'

'এই গ্রামে পার্টি ঢোকাবি?'

'তার মানে?'

'পার্টি ছাড়াও তো আমরা শান্তিতে ছিলাম।'

'জোঁক যখন রক্ত চোষে তখন মানুষ বুঝতে পারে না।' শ্রীনিবাস চেঁচিয়ে উঠল, 'তোদের হরিহর জ্যাঠা বা কাকার কথায় আর কাজ হবে না, বুঝলি?'

ওরা হরিহরের বাড়ির সামনে পৌঁছে গেল। গেট খুলে ভেতরে পা দিয়ে ধীরেন বলল, 'আমি এখানে দাঁড়াচ্ছি, তুই ভেতরে যা। হরিহর কাকা বোধহয় বাড়িতে

নেই।'

শ্রীনিবাস এগোল। সদর বন্ধ। পাশের খিড়কি দরজা দিয়ে এগিয়ে উঠোনে পা দিতেই সে সবিতারাণীকে দেখতে পেল। এলোচুলে উদাস চোখে দাওয়ায় বসে আকাশ দেখছে। পায়ের শব্দে চমকে তাকিয়ে ঘোমটা টানল। টেনে লাজুক হাসল।

'কেমন আছ?' শ্রীনিবাস এগিয়ে এল।

'ভাল।' নরম হয়ে গেল সবিতারাণীর গলা।

'শরীর খারাপ শুনছিলাম! ব্যাপারটা কি?'

'ও কিছু না। তুমি কেমন আছ?'

'কেমন দেখছ?'

'আমি বুঝি না।'

'মিথ্যে অভিযোগ করে ফাঁসিয়ে দিয়েছিল, বুঝলে! তা তোমাকেই বলি, এতে শাপে বর লাভ হয়েছে। যেসব নেতাদের কাছে এ জীবনে পেঁছাতে পারতাম না তাদের সঙ্গ পেয়েছি। একেবারে কুয়োর ব্যাঙ হয়ে ছিলাম, এখন সামনে খোলা আকাশ। চার-চারটি গ্রামের দায়িত্ব আমার ওপর। এদের রাজনৈতিক সচেতনতা এনে দিতে হবে। শোষকের বিরুদ্ধে লড়াই-এ একজোট করতে হবে। অনেক কাজ।'

'আমাদের বাড়িটা ভেঙ্গে গিয়েছে।'

'শুনলাম। ওখানে পার্টি অফিস করব।'

'আমরা থাকব কোথায়?'

'আমার তো তোমাকে নিয়ে সমস্যা, দেখি!'

'তুমি এই গ্রামে পাকাপাকি থাকবে না?'

'বললাম তো, একটা গ্রাম নিয়ে আমার কাজ নয়।' শ্রীনিবাস হাসল, 'তা তুমি বসে থাকবে কেন? তুমিও নেমে পড়!'

'আমি কি করব?'

'কত কাজ। মহিলা সমিতি গড়ে তোল। মেয়েদের একত্রিত কর। তুমি যদি মেয়েদের দায়িত্ব নাও তাহলে দুজনে দুদিকটা সামলাতে পারি।'

'আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না।'

'তোমাকে রাজনীতিতে নামতে হবে সবিতা।'

'তুমি চাষ করবে না?' অদ্ভুত গলায় জানতে চাইল সবিতারাণী।

'ওঃ। একটা ছোট্ট জমিতে লাঙ্গল দিয়ে সময় নষ্ট করার কোন মানে আছে? আমাকে অনেক বড় জায়গায় লড়াই করতে হবে!'

'তাহলে আমাকে ভাতকাপড় দেবে কে?'

'বোকা-বোকা কথা! সে হয়ে যাবে ঠিক।' শ্রীনিবাস বলল, 'চল এখান থেকে। আমার সঙ্গে ঘুরলে দুদিনেই সব বুঝতে পারবে।'

সবিতারাণী মাথা নাড়ল, 'না আমি যাব না। যে স্বামী চাষ করবে না, ভাত কাপড় দিতে পারবে না, তার সঙ্গে আমি যেতে পারব না।' সে ঘরে ঢুকে গেল।

সন্ধ্যের খানিক বাদে হরিহর বাড়ি ফিরলেন। গ্রামে ঢুকতেই নীলাম্বরের সঙ্গে দেখা। নীলাম্বর খুব উত্তেজিত। গ্রামে জনসভা করে শ্রীনিবাস যা বলেছে তার সঙ্গে নিজে কিছু যোগ করে হাত-পা নেড়ে বলে গেল। হরিহর চুপচাপ শুনলেন।

শ্রীনিবাস যে গ্রামের লোকের কাছে হাঁড়ি ভেঙেগ গেছে বলে নীলাম্বরের ধারণা হয়েছে—তার জবাবেও কিছু বললেন না। নীলাম্বর খুব হতাশ হল। হরিহর যে জমি বিক্রী করে দিতে চাইছেন সেই জমির একটা অংশ সে-ও চাষ করে। আর পাঁচজনের মত তার মনেও আজ বিকেল থেকে আশা জেগেছে জমিটা বিনি পয়সায় পাওয়া যাবে। কিন্তু এ ব্যাপারে হরিহরের প্রতিক্রিয়া না জানা পর্যন্ত সে স্বস্তি পাচ্ছিল না। হরিহর আর কথা না বাড়িয়ে বাড়ির দিকে চললেন।

বাড়ি অন্ধকার। খিড়কিপথে ভেতরে ঢুকে হরিহর দেখলেন বারান্দার এককোণে হ্যারিকেন জ্বলছে। তিনি মৃদু কাশলেন। কোন সাড়া না পেয়ে গলা-খাঁকারিতে জানান দিলেন। এবং তখনই আওয়াজটা কানে এল। সবিতারাণীর ঘর থেকে আওয়াজটা আসছে।

দরজা ভেজানো ছিল। ঘর অন্ধকার। হরিহর দরজা খুলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হল? ও বউমা, কি হয়েছে? অমন করছ কেন?'

একটু বিরতি এবং সেই সঙ্গে সবিতারাণীর গলা, 'আর পারছি না। পেটে—।'

হরিহর ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন। শ্রীনিবাস গ্রামে এসেছিল এবং তার বাড়িতে এসে সবিতারাণীর সঙ্গে দেখা করে গেছে এ খবর নীলাম্বর তাঁকে বলেছে। হয়তো ওর বাড়ি ভেঙেগ পড়েছে বলে সঙ্গে নিয়ে যায় নি। কিন্তু তখন কি সবিতারাণী এমন অসুস্থ ছিল না?

লোকজন যোগাড় করে প্রথমে তিনি শ্রীনিবাসের হদিস চাইলেন। জানা গেল সে এই গ্রামে নেই, কোথায় গেছে কেউ জানে না। সাইকেল বাহিনী বেরিয়ে গেছে। হরিপুরের অবিনাশ কবিরাজকে খবর পাঠানো হল। গাঁয়ের কিছু মহিলা এলেন। বৃদ্ধারা সবিতারাণীর পেটে তেল মালিশের ব্যবস্থা করলেন। কেউ বললেন, লক্ষণ স্বাভাবিক নয়।

অত রাত্রে অবিনাশ কবিরাজকে নিয়ে আসা সম্ভব নয়, কিন্তু তিনি এলেন। হয়তো হরিহরের জন্যেই নয় আজ বিকেলের জনসভার কথা শুনেছেন বলে তাঁকে আসতে হল। সবিতারাণীকে দেখে তিনি ওষুধ দিলেন। দিয়ে বললেন, 'ভোরের আগে যদি যন্ত্রণা না বন্ধ হয় তাহলে সদরের হাসপাতালে নি যেতে হবে। এই অসুখ সামান্য নয়। আমার ওষুধে কাজ না হলে বাঁচার আশা কম।'

হরিহর বিপাকে পড়লেন। অত রাত্রে শ্রীনিবাসকে তিনি কোথায় খুঁজবেন? এক-সময় ভোর হল কিন্তু সবিতারাণীর যন্ত্রণার উপশম হল না। শেষ পর্যন্ত গ্রামের লোকের সঙ্গে পরামর্শ করে গরুর গাড়িতে শুইয়ে তিনি সবিতারাণীকে নিয়ে চললেন সদরের পথে হরিপুরের দিকে। ধীরেনদের বলে গেলেন যে করেই হোক শ্রীনিবাসকে খবরটা যেন দেওয়া হয়। স্ত্রীর এই অবস্থায় স্বামীর পাশে থাকা উচিত।

বাসে নয়, ট্যাক্সি ভাড়া করে পেছনের আসনে সবিতারাণীকে শুইয়ে হরিহর ওকে নিয়ে এসেছিলেন সদরে। সঙ্গে অনন্ত মাতাল ছিল। মদ না খেলে লোকটা খুব কাজের হয়। ও-ই চেঁচামেচি করে সবিতারাণীকে ভর্তি করিয়ে দিল।

ডাক্তার ওষুধ দিলেন। তাতে ব্যথা সামান্য কমলেও দূর হল না। সেই রাতটা হরিহরকে সদরে থাকতে হল। পরদিন হাসপাতালে গিয়ে দেখলেন শ্রীনিবাস এসেছে

সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে। তাঁকে দেখে বলে উঠল, 'কেসটা কি রকম হল?'

'মানে?' হকচকিয়ে গেলেন হরিহর।

'আমি বিকেলে দেখে এলাম সে ঠিক আছে আর তারপরই এমন হয় কি করে? পেটে বিষ যায় নি তো?'

'বিষ যাবে কি করে?'

'তা আমি কি করে জানব?'

'ডাক্তারের সঙ্গে কথা বল।'

'তাই বলব বলে অপেক্ষা করছি।'

ডাক্তারবাবু এলেন। হরিহর পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'ইনি রোগিণীর স্বামী।'

শ্রীনিবাস বলল, 'আমি তখন বাড়ি ছিলাম না—'

'শুনুন, ব্যাপারটা খুব সিরিয়াস। অপারেশন করতে হবে।'

'কেন? অপারেশন কেন?' শ্রীনিবাস হতভম্ব।

'খুব খারাপ ধরনের আলসার হয়েছে বলে সন্দেহ করছি।'

'ওষুধে কাজ হবে না?'

'হবে। সাময়িক। কিন্তু পরে সামলানো যাবে না।'

'অপারেশন করলে যদি মরে যায়?'

'সেটার সম্ভাবনা কম তবে হ্যাঁ, ঝুঁকি তো থাকছেই।'

'তাহলে ওষুধ দিয়ে কমিয়ে দিন। একটু ভেবে দেখি।'

ডাক্তার চলে গেলেন মাথা নেড়ে। শ্রীনিবাস হরিহরকে বলল, 'একজন ডাক্তার অপারেশন করবে বললেই হ্যাঁ বলব কেন? আরও পাঁচটা ডাক্তার দেখুক।'

এক্ষেত্রে কিছুই বলার নেই হরিহরের।

দুপুর নাগাদ সবিতারাণী ঘুমোতে পারল। এর মধ্যে নার্স এসে তাঁকে বলে গেছে, 'অপারেশনে রাজি না হয়ে খুব ভুল করেছেন।' কথাটা শ্রীনিবাসকে বলবেন ভেবে খুঁজতে গিয়ে দেখা পেলেন না। স্ত্রীর যন্ত্রণা কমেছে শুনেই সে উধাও। তাকে আজ অন্যত্র সভা করতে যেতে হবে। বিকেলে আবার যন্ত্রণাটা ফিরে এল। হরিহর ভেবেছিলেন শেষ বাসে হরিপুরে ফিরে যাবেন, তা হল না। হাসপাতালের সামনের বটতলায় দাঁড়িয়ে কি করবেন যখন বুঝে পাচ্ছিলেন না তখন পাশ থেকে গলা শুনলেন, 'মৃত্যুর ছায়া দেখতে পাচ্ছি।'

হরিহর দেখলেন বিশালদেহী এক মানুষ পাশে দাঁড়িয়ে। পরনে গেরুয়া পাঞ্জাবি, গেরুয়া ধুতি। কাঁধে ঝোলা। মাথায় বাবরি চুল। গায়ের রঙ পোড়া সোনার মত। দেখলেই ভক্তি হয়। হরিহর নমস্কার করলেন। মানুষটি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে আছে এখানে?'

হরিহর বললেন, 'মেয়ে।' এছাড়া কী-ইবা বলতে পারেন তিনি।

'ডাক্তার কি বলছে?'

'বলছেন অপারেশন করতে হবে। পেটে আলসার আছে। কিন্তু ওর স্বামী রাজী নয়।'

'চলো—দেখাও তাকে।'

অতএব হরিহর অগ্রসর হলেন। গম্ভীর মুখের মানুষটি তাঁর সঙ্গে চললেন।

বিছানায় মড়ার মত শুয়েছিল সবিতারাণী। তাঁদের দেখে নিঃশ্বাস ফেলল। মানুষটি বললেন, 'যন্ত্রণা ওপরে উঠছে না, নিচে নামছে—তাই না?'

সবিতারাণী নিঃশব্দে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

'হুঁ। শুনুন মশাই, এর শরীরে ছুরি-কাঁচি ছোঁয়ালে আর বাঁচানো যাবে না।' ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে একটা শেকড় বের করলেন তিনি। তার একটা অংশ এগিয়ে ধরলেন সামনে, 'এটা মুখে রেখে আস্তে আস্তে চিবোও তো মা!'

হরিহর কিছু বলতে পারার আগেই সবিতারাণী আদেশ পালন করল। ঠিক কি করা উচিত ভেবে পাচ্ছিলেন না হরিহর। সাধু-সন্ন্যাসী তাঁকে তেমন টানে না। কিন্তু এই লোকটার বেশ ব্যক্তিত্ব আছে।

মানুষটি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার নাম?'

'হরিহর।'

'পাঁচ মিনিট অপেক্ষা কর হরিহর।'

সেই বিশাল ঘরে অনেক রোগিণীর দৃষ্টির সামনে তাঁরা দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁদের চোখের সামনে ধীরে ধীরে সবিতারাণীর মুখের চেহারা স্বাভাবিক হয়ে উঠল। মানুষটি জিজ্ঞাসা করলেন, 'যন্ত্রণা আছে?'

সবিতারাণী নিশ্চিন্তে জবাব দিল, 'না।'

'ওষুধে যা হয় না, মা তা সহজেই করে দেন। কিন্তু এ সাময়িক। কয়েকদিন থাকবে। কিন্তু হরিহর, একে যদি রোগমুক্ত করতে চাও তাহলে মায়ের পূজা করতে হবে। তোমাদের গ্রামে কোন কালীবাড়ি আছে?'

'আজ্ঞে, আমাদের নিজস্ব মায়ের মন্দির আছে। তবে গাঁয়ের বাইরে।'.

'তাহলে চলবে না। তোমার বাড়িতেই মায়ের পতিষ্ঠা করব। যজ্ঞ হবে তিনদিন ধরে। কিন্তু সেই যজ্ঞের কয়েকটা শর্ত আছে।'

'কি রকম?'

'যে তিনদিন যজ্ঞ করব সেই ক'দিন তুমি দিনের বেলায় জলগ্রহণ করবে না। বাড়িতে অতিথি এলেই পেট ভরে ভোজন করাবে। তৃতীয় দিনে যজ্ঞাগ্নিতে তিরিশ ভরি সোনা এবং পাঁচশো রজতমুদ্রা উৎসর্গ করবে। মনে পাপ না থাকলে সেগুলো বিনষ্ট হবে না। মা বিপত্তারিণী সন্তুষ্ট হবেন এবং এই মেয়ে রোগমুক্ত হবে।'

'বেশ, তাই হবে। আপনাদের আশীর্বাদে ভগবান আমাকে প্রচুর দিয়েছেন। এই সামান্য আয়োজন করা আমার পক্ষে অসাধ্য নয়।'

'তাহলে তুমি আগামীকাল এই কন্যাকে হাসপাতাল থেকে ছাড়িয়ে গ্রামে নিয়ে যাও। আগামী পরশু আমি তোমার গ্রামের বাড়িতে যাব।'

'আপনি আমার ঠিকানা জানেন?'

'প্রকৃত অবধূতের কাছে এসব কোন সমস্যা নয়।' মানুষটি বেরিয়ে গেলেন হতবাক হরিহরকে সেখানেই দাঁড় করিয়ে রেখে।

'উনি কে?' সবিতারাণী উঠে বসল।

'আমি জানি না মা। এসব কখনও বিশ্বাস করিনি। কিন্তু আজ সব গুলিয়ে যাচ্ছে। তুমি উঠে বসেছ, কষ্ট হচ্ছে না?'

'না। মনে হচ্ছে একদম ভাল হয়ে গেছি।'

'শেকড়টা কিসের কে জানে! গল্পে শুনেছি এরকমটা হয়। আচ্ছা, শ্রীনিবাস কি দেখা করে গেছে?'

'আমি জানি না, আমার কাছে ওর নাম করবেন না!'

'ছিঃ, একথা বলতে নেই।'

'না, যে স্বামী স্ত্রীর দায়িত্ব নেয় না—'

হরিহর বাকিটা শোনার জন্যে দাঁড়ালেন না। আজ নয় কাল শ্রীনিবাস নিশ্চয়ই তার ভুল বুঝবে। কিন্তু ডাক্তারকে হার মানালো ওই অবধূত!

তিনি হাসপাতাল-চত্বরের অনেককে জিজ্ঞাসা করলেন অবধূতকে তারা চেনে কিনা। বেশীর ভাগ মানুষই চিনতে পারল না। তারা এমন কাউকে গত দু'বছরে দ্যাখেনি। শুধু একজন দারোয়ান গোছের তাঁর কাছে এগিয়ে এসে বলল, 'আপনি খুব ভাগ্যবান। বছর পাঁচেক আগে উনি এসে এক মরণাপন্ন রোগীকে বাঁচিয়ে গিয়েছিলেন। আপনার মেয়েও বেঁচে যাবে। শুধু বিশ্বাস রাখুন।'

অতএব হরিহর পরের দিন সকালে সবিতারাণীকে হাসপাতাল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে হরিপুরের বাসে উঠলেন। এখন সবিতারাণীকে একটুও অসুস্থ বলে মনে হচ্ছিল না। হরিহরের মনে হল, ভাগ্যিস শ্রীনিবাস অপারেশনে আপত্তি করছিল!

সবিতারাণীকে দেখলে কে বলবে যে ক'দিন আগে হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল। এখন সে কুলো হাতে এঘর থেকে ওঘরে যাচ্ছে, জিনিসপত্র বের করে দিচ্ছে। উৎসাহ তার প্রচণ্ড। বাড়ির পাশে বাগানের খোলা জায়গায় যজ্ঞের বেদি তৈরি হচ্ছে। খোদ তান্ত্রিক সেটার তদারক করছেন। দু'মানুষ উঁচু বেদি, ইটের ওপর ইট সাজানো—সঙ্গে সিমেণ্ট। বেদীর মাঝখানে গর্ত, সেখানে যজ্ঞের আগুন জ্বালানো হবে। কোন ত্রুটি নেই কোথাও।

খবরটা পাঁচকানে ছড়িয়ে পড়তে দেরি হয়নি। একজন জাগ্রত তান্ত্রিক হরিহরের বাড়িতে এসে তিনদিন যজ্ঞ করবেন, শত্রু-মিত্র সবাই পুলকিত হয়েছিল। এসব কথা লোকে শুনেই এসেছে এতদিন কিন্তু চোখে দ্যাখেনি। যজ্ঞ শুরু হবার আগেই তাই এ বাড়িতে ভিড়। সেই সঙ্গে রটে গেল শ্রীনিবাসের বউ-এর অসুখ সারাতে হরিহর তান্ত্রিকের সাহায্যে যজ্ঞের আয়োজন করেছেন। অনেকেই সাধুবাদ দিল। এই কলিকালে পরের জন্যে কে এতটা করে ?

হরিহর কথা বলছিলেন এক মেছোর সঙ্গে। তাঁরই পুকুরে জাল ফেলে মাছ তুলবে লোকটা। এমন সময় দেখলেন ঘোমটামাথায় সবিতারাণী এগিয়ে আসছে। অবিকল তার দিদির মত হাঁটার ধরন। ধক্ করে উঠল বুক। ছবিরাণী এই বাগানে হেঁটে যেতো কখনও কখনও। এখন সে কোথায় ? মানুষ মরে গিয়ে কি কিছু মনে রাখতে পারে ?

'বাবা!'

'হ্যাঁ, বল মা।'

'আপনি এই যজ্ঞ করছেন কেন ?'

'এ প্রশ্ন কেন ?'

'আমি জানতে চাইতে পারি না ?'

'অবশ্যই। কিন্তু তোমার মুখের চেহারা এমন কঠিন কেন ?'

'শুনলাম আমাকে সুস্থ করার জন্যে নাকি এই যজ্ঞের আয়োজন হচ্ছে ?'

'তুমি তো সুস্থই মা।'

'না, আপনি সত্যি কথা বলুন। তান্ত্রিকের দেওয়া শেকড় খেয়ে আমি এখন হেঁটেচলে বেড়াচ্ছি কিন্তু একদম সুস্থ করার জন্যেই কি এই আয়োজন ?'

হরিহর কি জবাব দেবেন বুঝতে পারছিলেন না। সেটা লক্ষ্য করে সবিতারাণী বলল, 'তাহলে আপনি এসব বন্ধ করুন। আমি মানতে পারছি না।'

'কেন ?'

'আমার জীবন এমন দামী নয় যে এত খরচ করে যজ্ঞ করতে হবে। এই টাকা গরীব-দুঃখীকে দিলে তারা পেটভরে একদিন খেতে পেত।' বেশ জোরে জোরে বলল সবিতারাণী।

'ঠিক বলেছ মা।' পেছন থেকে খড়মের শব্দ ভেসে এল, 'নরনারায়ণের সেবার জন্যেই তো এই যজ্ঞের আয়োজন। এই তিনদিন যে মানুষ এখানে আসবে সে-ই দুবেলা অন্ন পাবে। তুমি মা হিসেবে যা চাইছ তাই তো করতে চলেছি আমরা। তবে হ্যাঁ, শুধু তোমার রোগমুক্তির জন্যে এই যজ্ঞের আয়োজন করা হচ্ছে না। হরিহরের ওপর বিরাট কালো ছায়া নেমে এসেছে। এই ছায়া আর একটু ঘন হলেই বজ্রপাত হবে। মা, হরিহর চলে গেলে এই বিষয়আশয় কার উপকারে লাগবে? মানুষটাকে বাঁচানো দরকার বলে মনে করো না ?'

'নিশ্চয়ই।' জোরের সঙ্গে বলল সবিতারাণী।

'আমি সেই চেষ্টাই করছি মা। এই যজ্ঞের ফলে সমস্ত অশুভ শক্তি বিনষ্ট হবে। আমি মায়ের কাছে তাকে উৎসর্গ করতে পারলে কেউ তার ক্ষতি করতে পারবে না। হ্যাঁ, এ বড় কঠিন যজ্ঞ, খুঁটিনাটি অনেক নিয়ম মানতে হয়। এবার বল, তোমার আপত্তি আছে ?'

সবিতারাণী হরিহরের দিকে তাকাল, 'আমায় ক্ষমা করুন।'

হরিহর হাসলেন, 'দূর! মা তো একটু-আধটু রাগ করবেই। হ্যাঁ, শ্রীনিবাসকে এখানে আসার জন্যে আমি চিঠি পাঠিয়েছি। ও এখন আমবাড়িতে আছে।

'ব্যস্ত যে তাকে বিরক্ত করার কোন মানে হয় না।' সবিতারাণী দাঁড়াল না।

এইসময় অনন্তকে দেখা গেল। দুহাত জড়ো করে কাছে এসে বলল, 'বাবা, এনেছি।'

'জাল নয় তো ?'

'না বাবা, একদম এক নম্বর।'

'বেশ। মহাকারণ বারি। চল দেখি কি জিনিস এনেছ !'

তান্ত্রিক অনন্তকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে গেলেন বার-বাড়িতে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হতে হয়েছে। নীলাম্বর বলেছিল, 'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে হরিহর। তন্ত্রমতে যে সাধনা করে সে কারণবারি পান করবেই।' ঠিক জুটে গিয়েছে ওই অনন্ত মাতাল। হরিহরের পয়সায় মদ কিনে এনে দিনদুপুরে তান্ত্রিকের সঙ্গে বসে প্রাণভরে সেবন করে যাচ্ছে। যাক, কত আর মদ গিলবে দুজনে! হরিহর আয়োজন তদারক করছিলেন। গ্রামের কিছু বউ-ঝি এরই মধ্যে সবিতারাণীর সঙ্গে হাত লাগিয়েছে। যজ্ঞের দায়িত্ব

তান্ত্রিকের। তাঁকে সাহায্য করার জন্যে কয়েকজন আছেন। কিন্তু অন্নভোগ খেতে যারা আসবে তাদের জন্যে ব্যবস্থা করা কম জরুরী নয়। তান্ত্রিকের আদেশ, কেউ যেন অভুক্ত অবস্থায় ফিরে না যায়। অতএব মাটি খুঁড়ে ইট বসিয়ে উনুন হচ্ছে। বড় বড় হাঁড়িতে ভাত চড়বে সারাদিন। ভাত ডাল আর তরকারি। সাদাসাপটা ব্যাপার। গ্রামের মানুষ দুবেলায় আর কত খাবে!

কিন্তু একটু একা হলে হরিহর হিসেব নিয়ে বসলেন। যজ্ঞ আরম্ভ হলে এসব দেখার ফুরসৎ পাবেন না। গ্রামের মানুষরা ভাত বেশিই খায়। তা হাজারতিনেক মানুষ যদি দুবেলা খায় তো ছয় হাজার মুখ। প্রতিটি মুখে যদি গড়পড়তা দুশো চাল যায় তো বারোশো কিলো দরকার। তাঁর সঞ্চয়ে তিনদিনের চাল মজুদ আছে। ডালও। এখন প্রয়োজন তরিতরকারির। গ্রামের হাটে এত পাওয়া যায় না। আলু কুমড়োর ঘ্যাঁট হলেও হরিপুরে যেতে হবে। নীলাম্বরকে তিনি দায়িত্ব দিয়েছেন সেইসব কিনে আনার। কয়েক হাজার টাকা বেরিয়ে গেল পকেট থেকে। সাদা-সাপটা ব্যবস্থা করতেও কম খরচ হয় না।

আমবাড়ির ময়দানে তেমন ভিড় হয়নি। সভায় সদর থেকে আসা দুজন নেতা জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়েছেন। তৃতীয় বক্তা হিসেবে শ্রীনিবাস বলেছে পুলিশের অত্যাচারের কথা। কি করে বুর্জোয়াশ্রেণী পুলিশকে দিয়ে গরীব মানুষের ওপর অত্যাচার চালায় তার বিশদ বিবরণ। এখনও বেশি কথা একসঙ্গে বললে তার খেই হারিয়ে যায়। আজও হয়েছে। মঞ্চে বসা নেতারা তাকে সাহায্য করেছেন। তাঁদের ধারণা সান অফ দি সয়েলের বক্তৃতা মানুষের মনে বেশি কাজ করবে।

বক্তৃতার পর পার্টি অফিসে মিটিং ছিল। শহরে চলে যাওয়ার আগে নেতারা উপদেশ দিলেন, সাতদিনের মধ্যে গ্রামে গ্রামে কৃষক ফ্রন্ট, মহিলা ফ্রন্ট খুলতে হবে। জনসাধারণকে সচেতন করতে তাদের দলে টানতে হবে। তাদের বোঝাতে হবে সংগ্রামে আসা ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা নেই। শ্রীনিবাসের ওপর যে চারটে গ্রামের দায়িত্ব আছে সেখানে অবিলম্বে কাজ শুরু করা উচিত।

সন্ধ্যের পর শ্রীনিবাস পার্টি অফিসে বসে কর্মীদের সঙ্গে কথা বলছিল। নারায়ণপুর ছাড়া বাকি তিনটি গ্রামের কৃষক ফ্রন্ট এবং মহিলা ফ্রন্টের জন্যে নেতা নির্বাচিত হয়ে গিয়েছে। শ্রীনিবাস তাদের জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারা বলুন ওখানে জোতদাররা কিরকম বাধা দিতে পারে?'

কেনাপুর গ্রামের কৃষ্ণ মণ্ডল বলল, 'আমাদের ওখানে কোন সমস্যা নেই। স্কুলের দুই দিদিমণি মহিলা ফ্রন্টের দায়িত্ব নিয়েছে। মেয়েদের ঘরের কাজ ছাড়িয়ে বাইরে বের করা মুশকিল বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু কাজে নেমে দেখা গেল তা নয়। বাইরে বের হবার ছুতো পেলে অনেকেই আর ঘরে বসে থাকতে রাজী নয়। হেঁ হেঁ।'

'কৃষক ফ্রন্ট? জোতদার বাধা দিচ্ছে না?'

'আমার ওপর কথা বলবে কার ধড়ে কটা মাথা আছে?' কৃষ্ণ মণ্ডল হাসল। তারপর নিচু গলায় বলল, 'বলে দিয়েছি যারা কৃষক ফ্রন্টে নাম লেখাবে না তাদের জমিতে সামনের বছর লাঙল পড়বে না। একেবারে টাইট।'

সেইসময় একজন ঘরে ঢুকে জানাল শ্রীনিবাসের নামে চিঠি আছে। চিঠি নিয়ে এসেছে নারাণপুরের লোক। তাকে দেখে চিনতে পারল শ্রীনিবাস। মজুরের কাজ করলেও লোকটাকে সে একসময় কাকা বলে ডাকত। আজ গম্ভীর মুখে চিঠিটা নিয়ে খুলে দেখল। তার মুখে হাসি ফুটল।

কৃষ্ণ মণ্ডল জিজ্ঞাসা করল, 'কার চিঠি ?'

'একজন জোতদারের। এই লোকটার চক্রান্তে আমাকে জেলে যেতে হয়েছিল। না বুঝে অবশ্য আমার ভালই করেছিল। জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর নানান ভাবে আমার সঙ্গে ভাব করতে চাইছে। বুঝে গিয়েছে আমাকে হাতে না রাখলে ওর পক্ষে টেঁকা মুশকিল। এবার নেমন্তন্ন করেছে ঘটা করে।'

'কিসের নেমন্তন্ন ?'

'তিনি এবার বাড়িতে যজ্ঞ করছেন। লোক খাওয়াবেন। সেই বারোয়ারি খাওয়া আমাকে খেতে হবে।'

'যাচ্চলে! লোকটার নাম কি ?'

'হরিহর রায়। এমন ধান্দাবাজ মানুষ খুব কম আছে।'

কৃষ্ণ মণ্ডল একটু নড়েচড়ে বসল। হরিহর রায়ের নাম সে জন্মইস্তক শুনে এসেছে। তার বাবার সঙ্গে আলাপ ছিল। বাবা বলতেন, 'মানুষকে কিভাবে হাতে রাখতে হয় তা নারাণপুরের হরিহরকে দেখে শেখো। লোকে মান্যি করে আবার ফসলের ভাগও দেয়।' বাবার কথা কানে নেয়নি কৃষ্ণ। চোখ রাঙিয়ে চালিয়ে আসছিল এতকাল। এখন পার্টির নেতা হয়ে পড়ায় তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার কেউ রইল না। বাবা তো এই কায়দাটা জানত না। কিন্তু হরিহরের বাড়িতেই তো শ্রীনিবাসের বউ আছে বলে সে শুনেছিল। শ্রীনিবাস একজন গরীব চাষী, জেলে গিয়েছিল গাছ চুরি করে—এসব সে জানে। কিন্তু নেতা হিসেবে সে শ্রীনিবাসকে মেনে নিয়েছে তার কারণ গ্রামের বাইরে গিয়ে রাজনীতি করার কোন ইচ্ছে তার নেই। গ্রামটাকে কব্জায় রাখতে যা দরকার তাই সে করছে। ওপরের শ্রেণীর নেতা হতে গেলে যে গরুখাটুনি খাটতে হয় তা শ্রীনিবাসরা খাটুক।

সে জিজ্ঞাসা করল, 'যাবে না ?'

'দূর!'

'আমার মনে হয় যাওয়া উচিত।'

'কেন ?'

'হরিহর রায় একজন বাঘ। লোকে তাকে ভয় পায়, আবার কেউ কেউ শ্রদ্ধাও করে। ওখানে আমাদের কোন ফ্রন্ট আজও খোলা হয়নি। তোমার সুবিধে হল বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা আছে।'

'তার মানে ?'

'তোমার স্ত্রী তো ওই বাড়িতেই থাকেন!'

'তা থাকেন। হরিহর ওকে মেয়ের মত দ্যাখেন। আমার ঘর অযত্নে পড়ে গেছে। সেই ঘর নতুন করে তৈরী করে দেবে হরিহর, ততদিন তার সেখানেই থাকার কথা।'

'হরিহরের কত টাকা কেউ জানে না।'

'ভোগ করার কেউ নেই তো।'

'লোকে বলে লোকটা মরলে সব সরকারকে দিয়ে যাবে। আবার শুনছি জমিজমা যা আছে তা বিক্রি করে দিচ্ছে। যাহোক, লোকটাকে হাত করা দরকার।'

'সহজ ব্যাপার নয় হে।'

'সেইজন্যে তোমার স্ত্রীর সাহায্য নিতে হবে। তুমি যদি নেমন্তন্নে যাও তো লোকটা তোমার পক্ষে আসতেও পারে। এতে গ্রামের সবাই তোমাকে মেনে নেবে।'

'কিন্তু বদনামও তো হতে পারে। লোকে বলবে আমি জোতদারের সঙ্গে হাত মিলিয়েছি।'

'তা বলতে পারে। তবে ওর যা সম্পত্তি, আহা—।' কৃষ্ণ মণ্ডল চুকচুক শব্দ করল।

শ্রীনিবাস চিঠি নিয়ে আসা লোকটিকে জিজ্ঞাসা করল, 'যজ্ঞটা কেন হচ্ছে?'

লোকটি এতক্ষণ শ্রীনিবাসের ব্যাপার-স্যাপার দেখে তল পাচ্ছিল না। সেই গ্রামের যুবকটিকে যেন এখন তার অচেনা মনে হচ্ছিল। বলল, 'আমি ঠিক জানি না। তবে অনেকেই বলছে বউমার যাতে আর অসুখ না করে তাই তান্ত্রিকঠাকুরকে দিয়ে উনি যজ্ঞ করাচ্ছেন।'

খবরটা মোটেই পছন্দ হল না শ্রীনিবাসের। সে চেঁচিয়ে উঠল, 'যত্ত কুসংস্কার! বুঝলে, এই কারণে দেশটার উন্নতি হচ্ছে না। শুনলে মেজাজ ঠাণ্ডা রাখা যায় না।'

কৃষ্ণ মণ্ডল বলল, 'তবু ইচ্ছেটা ভাল। ক'জন অন্যের স্ত্রীর উপকারের জন্যে এমন পয়সা খরচ করে? তা তুমি না গেলেও লোকে দেখছি তোমার নাম তুলতে ছাড়বে না।'

শ্রীনিবাস লোকটিকে বলল, 'ধীরেনকে চেনো তো? ওকে বলবে আগামীকাল বিকেলে আমি গ্রামে যাব। আর হরিহরবাবুকে জানাবে একবার সময় পেলে নাহয় ঘুরে আসব।'

যজ্ঞ শুরু হয়ে গেল। এলাহি কাণ্ড। হঠাৎ দেখলে মনে হবে বড় জমিদারের দুর্গাপুজো এর কাছে নস্যি। তান্ত্রিকের গমগমে গলায় মন্ত্রপাঠ সবাই মুগ্ধ হয়ে দেখছিল। এক ঘণ্টা অন্তর হরিহরকে ছেড়ে দিচ্ছিলেন তান্ত্রিক। সেইসময় যজ্ঞবেদী থেকে নেমে এসে তিনি তদারকি করতে পারছিলেন। পীতাম্বর নীলাম্বররা বাকি কিছু সামাল দিচ্ছিল। বেলা এগারটায় প্রথম পাত পড়ল। কলাপাতায় ভাত ডাল তরকারি। তিনটে নাগাদ যখন শেষ লোক খেল তখন সংখ্যাটা তিন হাজার ছাড়িয়েছে। পরিবেশনকারীদের হিমসিম খাওয়া অবস্থা। পীতাম্বর তাদের উদ্দীপ্ত করছিল এই বলে, 'ওরে তোরা জানিস না কি পুণ্যসঞ্চয় করছিস। এই মহাযজ্ঞের সব পুণ্য ওদেরও হচ্ছে।'

দিকে দিকে রটে যাচ্ছিল যজ্ঞের কথা। তিনটেয় শেষপাত বলে যা ভাবা হচ্ছিল তা হল না। হরিপুর থেকে লোক এল যজ্ঞ দেখতে। এসে বসে পড়ল খেতে। আবার ভাত চড়ল হাঁড়িতে। উনুন জ্বলতে লাগল খা-খা করে। রাতদুপুরে

যখন মানুষের আনাগোনা বন্ধ হল তখন দেখা গেল নয় হাজার মানুষ খেয়ে গেছে। কলাপাতা শেষ।

ক্লান্ত হরিহরকে নীলাম্বর জানাল সমস্যার কথা। প্রথম দিনেই নয় হাজার মানুষ খেল। ব্যবস্থা ছিল তিন দিনে আঠারো হাজারের। কাল যদি মানুষের সংখ্যা বাড়ে তো জিনিসপত্র আরও লাগবে। উনুন ও ঠাকুর আনতে হবে অনেক। কি করা যায়? হরিহর বললেন, 'এখন তো পিছিয়ে যাওয়ার পথ নেই ভাই। তিনদিন ধরে সব কিছুই করতে হবে আমাদের।'

দ্বিতীয়দিন তিন গাঁয়ের মানুষ এল ভিড় করে যজ্ঞ দেখতে। বাড়ির সামনের মাঠে যেন মেলা বসে গেল। তান্ত্রিককে কে যেন একটা মাইক এনে দিয়েছে। চরাচরে তার গলা থেকে উচ্চারিত মন্ত্র ছড়িয়ে পড়ে অন্যরকম পরিবেশ তৈরি করে ফেলেছে। দুপুর নাগাদ পীতাম্বর এসে জানাল লোকসংখ্যা আজ ইতিমধ্যে দশে পৌঁছে গিয়েছে। রাত্রিতে যা ছিল সব শেষ। নারাণপুরের মুদির দোকান খালি। আনতে হবে হরিপুর থেকে এবং তার জন্যে টাকা দরকার। হরিহর হিসেব করলেন মাথা পিছু যদি পাঁচ টাকা খরচ হয় তো বাকি দেড় দিনে কুড়ি হাজার মানুষের জন্যে এক লক্ষ লাগবে। তিনি হরিপুরের ব্যাঙ্কের নামে চেক কাটলেন। রাতদুপুরে দেখা গেল সংখ্যাটা পঁচিশে পৌঁছেচে। এখন ডাল তরকারি ভাত নয়—খিঁচুড়ি আর তরকারি।

হরিহর তান্ত্রিকের সামনে হাত জোড় করে দাঁড়ালেন, 'বাবা, একটা কথা বলব?' তান্ত্রিক যজ্ঞের বেদীতে বসে বিরক্ত চোখে তাকালেন। মুখে কিছু বললেন না।

'যেভাবে মানুষের সংখ্যা বাড়ছে, শেষ পর্যন্ত সামলানো মুশকিল হয়ে যাবে।'

'বুঝলাম না। আইনশৃঙ্খলার ব্যাপার হলে পুলিশকে খবর দাও।'

'আজ্ঞে সেসব কিছু নয়। এত হাজার হাজার মানুষকে খাওয়ানো প্রায় অসম্ভব ব্যাপার হয়ে পড়েছে।'

'অসম্ভকে সম্ভব করতে হবে হরিহর। এই মহাযজ্ঞের কোন ত্রুটি ঘটলে তোমার সর্বনাশ হয়ে যাবে, এই মেয়েটি মারা পড়বে। যাও, ওর কথা বাড়িও না। হ্যাঁ, সেই অনন্ত কোথায় গেল বল তো? চটজলদি পাঠিয়ে দাও।' তান্ত্রিক গলা তুলে বললেন।

হরিহর নেমে এলো মঞ্চ থেকে। বাড়িভর্তি লোক এখন। খেয়েদেয়ে যে যেখানে পারে ঘুমিয়ে পড়েছে। এদের অনেককেই তিনি চেনেন না। আজ রাত্রে এখানেই ঘুমাচ্ছে কাল সকালে উঠেই খেতে পাবে বলে। বাড়িটার আর গোপনীয়তা কিছু রইল না। তিনি এঘর ওঘর খুঁজে নিজের বিছানায় অনন্তকে আবিষ্কার করলেন। আকণ্ঠ মদ্যপান করে অঘোরে ঘুমাচ্ছে সে। টেনে তুলে রাগ সংবরণ করতে পারলেন না, 'তোমার এতবড় স্পর্ধা আমার বিছানায় এসে শোও!'

'কি করব? কোথাও তো শোওয়ার জায়গা নেই! চেঁচামেচি করার কি আছে? আমি নিচে নেমে যাচ্ছি। মাঝরাত্রে ঝামেলা ভাল লাগে না।'

'তোমাকে তান্ত্রিক ডাকছে।'

'সর্বনাশ!' অনন্তর মুখ শুকিয়ে গেল, 'লোকটা দেখছি পিপের বাবা!'

'মানে?'

'এত বছরে আমি যা খেতে শিখেছি লোকটা তার ডাবল খায়। মাল নেই।'

'নেই কেন? তোমাকে টাকা দিয়েছিলাম এনে রাখতে!'

'রেখেছিলাম। খেতে খেতে শেষ হয়ে গিয়েছে।'

'কথাটা গিয়ে বলে এসো।'

'বাণ মেরে দেবে। তুমি গিয়ে বল দাদা।'

হরিহর চিন্তা করলেন, এতে যজ্ঞের ত্রুটি হবে না তো! এই বাহাত্তর ঘণ্টায় কেউ যেন এখানে এসে অভুক্ত না থাকে—মদ্যপানও এর মধ্যে যদি পড়ে! তিনি অনন্তকে বললেন, 'ভাই, যেখান থেকে পার তান্ত্রিককে কিছু মদ এনে দাও।'

অনন্ত অবাক হয়ে তাকাল, 'ধন্যি তোমার হিন্দুধর্ম। মদ খেতাম বলে এতকাল ঘেন্নার চোখে দেখতে, আজ তোমার মত লোক ধর্মের ভয়ে মদ নিয়ে আসতে যাচ্ছ।'

'ধর্মের ভয় নয় অনন্ত। এ কিসের গেরো তা আমি নিজেই জানি না। যাও।'

অনন্তকে টাকা দিয়ে বিদায় করে হরিহর খাটে বসলেন। এখন মধ্যরাত। সকাল হলেই দলে দলে লোক আসবে। হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল যজ্ঞ শুরু হবার পর সবিতারাণীর সঙ্গে দেখা হয়নি। ভাবতে না ভাবতেই দেখতে পেলেন দরজায় সবিতারাণী দাঁড়িয়ে আছে। তিনি হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন আছ মা?'

'বাবা, এসব বন্ধ করুন।' সবিতারাণীর গলা পরিষ্কার।

'ছি মা! মাঝপথে এসে কি বন্ধ করা যায়?'

'কিন্তু পাঁচ-ভূতে আপনার সর্বনাশ করে ফেলবে। আমার সহ্য হচ্ছে না।'

'সহ্য করতে শেখো মা। যা হচ্ছে তা থেকে তো ভালও হতে পারে।'

'কি ভাল হতে পারে! হাজার হাজার লোক এসে গাণ্ডেপিণ্ডে গিলে যাচ্ছে। কাল শুনেছি পঞ্চাশ হাজার লোক খেতে আসবে।'

'পঞ্চাশ হাজার!' শিউরে উঠলেন হরিহর। 'মা, তোমার এ কী পরীক্ষা!

'হ্যাঁ, আমার মনে হচ্ছে এসব ওই তান্ত্রিকের মতলব।'

'মতলব বলছ কেন? যে পুজোর যা নিয়ম! উনি খুব ভক্তিভরে যজ্ঞ করছেন। ও হ্যাঁ, কাল বিকেলে অগ্নিদেবের সাধনা হবে। তাতে এক হাজার রৌপ্যমুদ্রা, দশভরি সোনা আর কিছু তামার পয়সা লাগবে। তোমাকেও যজ্ঞে থাকতে হবে।'

'ওসব নিয়ে তিনি কি করবেন?'

'আগুনে আহুতি দেবেন।'

'ছাই দেবেন! চিন্তায় চিন্তায় আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। যদি আমার শরীর খারাপ না হত, তাহলে আপনার এমন সর্বনাশ হত না!'

হরিহর হাসলেন। তারপরই তাঁর মনে পড়ল 'হ্যাঁ মা, শ্রীনিবাস কোন খবর দিয়েছে?'

'না।' মাথা নাড়ল সবিতারাণী, 'কিন্তু সে গ্রামে এসেছে।'

'তাই নাকি ? কোথায় আছে সে ?'

'ধীরেনবাবুর বউ বলল তাদের বাড়িতে উঠেছে।'

'আঃ, এখানে এল না কেন ? আমি এখনই—'

'না।' থামিয়ে দিল সবিতারাণী। 'আপনি তার খবর নেবেন না। চিঠি পাঠিয়েছেন, আসার হলে সে নিজে আসবে। আগবাড়িয়ে তাকে আনলে আমার মরা মুখ দেখবেন।' আর দাঁড়াল না সবিতারাণী।

স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলেন হরিহর। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কগুলো কী অদ্ভুত ধরণের! কোন আন্দাজ পাওয়া যায় না!

নীলাম্বর ও পীতাম্বর খুবই ক্লান্ত। এই দুই ভাইকে তাঁর সত্যিকারের বন্ধু বলে মনে হল হরিহরের। দিনরাত এরা যেভাবে পরিশ্রম করে যাচ্ছে তার তুলনা নেই। হরিহর পীতাম্বরকে ডাকলেন বাইরে এসে, 'কাল কি রকম লোক হবে বলে মনে হচ্ছে ?'

'ভাবতে পারছি না।'

'আমার তো নগদ সঞ্চয় শেষ। জমি বিক্রি করা ছাড়া উপায় নেই।'

'কিনবে কে ? যারা চাষ করে তাদের তো ট্যাঁক খালি !'

'কিন্তু এছাড়া তো উপায় নেই !' হরিহরকে খুব বিচলিত দেখাচ্ছিল।

'বুঝলাম। কিন্তু আমাদের গাঁয়ের কারো ক্ষমতা নেই পয়সা দিয়ে জমি কেনার তা যত কম দামেই পাওয়া যাক। কোথাও যদি ধার পাওয়া যায়—'

'কে আমাকে ধার দেবে ?'

'পঞ্চাশ হাজার লোকের জন্যে অন্তত দেড়লক্ষ টাকার দরকার।' পীতাম্বর জিজ্ঞাসা করল, 'ঘরে সোনাদানা নেই ?'

'পীতাম্বর, সারাজীবনে নিজের জন্যে সঞ্চয় করার কথা মনে আসেনি কখনও। তোমাদের বউঠান চলে যাওয়া সময় যে গয়না রেখে গিয়েছেন তা কাল যজ্ঞের জন্যে লাগবে। যে ফসলের ভাগ পেতাম তার সামান্য নিজের জন্যে রেখে বাকিটা তো—।'

'বুঝলাম। তবু মানুষের ধারণা ভিন্ন।'

পীতাম্বর বলামাত্র তান্ত্রিকের গলা শোনা গেল, 'এত আলোচনা কিসের ?'

পীতাম্বর হাত জোড় করল, 'বাবা, বড় সমস্যা। হাতে টাকা নেই। কাল মানুষজনকে যদি খাওয়াতে হয় তাহলে টাকার প্রয়োজন হবে। উনি জমি বিক্রি করতে চাইছেন কিন্তু খদ্দের কোথায় ?'

'এই কথা !' মিটিমিটি হাসলেন তান্ত্রিক।

'কথাটা খুব সামান্য নয় বাবা।'

'এক কাজ করো। আমার এই মাইকটা নিয়ে ওই রাতেই বেরিয়ে পড়। সবাইকে ডেকে ডেকে বল যে যে জমি কিনবে সে কাল ভোরেই যেন টাকা নিয়ে হাজির হয়ে যায়।'

'আশ্চর্য ! এই রাত্রে তারা টাকা পাবে কোথেকে ?'

'মা আছেন, তাঁকেই চিন্তা করতে দাও। তোমরা তো ভেবে কোন কূল পাচ্ছ না।'

হরিহরও পীতাম্বরের সঙ্গে একমত, কিন্তু মানুষ যখন দিশেহারা হয়ে পড়ে তখন তার নিজস্ব ভাবনা বলে কিছু থাকে না। একটা গরুর গাড়ি যোগাড় করে সেই রাত্রেই মাইক নিয়ে বেরিয়ে পড়ল নীলাম্বর। নির্জন রাত্রে গ্রামের সমস্ত মানুষকে জানিয়ে মাইকে ঘোষণা করে যেতে লাগল, 'এতদ্বারা নারাণপুরের জনসাধারণকে জানানো হইতেছে যে তাহারা যদি নিজ নিজ চাষের জমি ক্রয় করিতে চান তাহলে বাবু হরিহর রায়ের নিকট হইতে আগামীকাল সকালে নগদমূল্যে দিয়া ক্রয় করিতে পারেন। আগামীকাল সকাল পর্যন্ত তিনি নামমাত্র মূল্যে জমি বিক্রয় করিবেন।'

হরিহর নিজের বিছানায় পুতুলের মত বসে রইলেন। তাঁর কানে মাইকের মাধ্যমে প্রচারিত ঘোষণা বারংবার হাতুড়ির আঘাত করে যাচ্ছিল। এটাও কি মায়ের ইচ্ছে ছিল? কিন্তু তিনি নিঃসন্দেহ এই ঘোষণায় কোন কাজ হবে না। কেউ আসবে না সকালে টাকা নিয়ে। আর দিনের আলো বাড়লেই পিলপিল করে মানুষ এসে জুটবে খাবারের জন্যে। তখন তিনি কি করবেন? ভাবতে ভাবতে তাঁর মাথায় যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেল।

মধ্যরাতেও যতীনের বাইরের ঘরে গুলতানি চলছিল। আজ রাত্রে এই ঘরের প্রায় সবাই হরিহরের বাড়ির খাবার খেয়ে এসেছে। শ্রীনিবাস যায়নি বলেই যেতে পারেনি যতীন। ওরা হিসেব করে থৈ পাচ্ছিল না মানুষটার কত টাকা আছে! নইলে একটা তান্ত্রিকের কথায় কেউ এত খরচ করতে পারে? উদ্দেশ্যটাই কি? শ্রীনিবাস বলছিল, 'এইসব জোতদাররা সন্তানের চেয়ে টাকাকে বেশি ভালবাসে। যখনই একটা টাকা খরচ করবে তখনই ধান্দা থাকবে দুটো টাকা যাতে ফেরৎ আসে। আমার মনে হচ্ছে এই তান্ত্রিক ওকে আরও বড় কিছু পাওয়ার লোভ দেখিয়েছে।'

'বড় কিছু আর কি পাবে? কদিন আগে উনি নিজেই সব জমি বিক্রি করতে চেয়েছিলেন!'

'বেড়াল কখনও তপস্বী হয় যতীন?' শ্রীনিবাস হেসে জিজ্ঞাসা করেছিল।

'তবু রোজ এক-দেড় লাখ খরচ হচ্ছে। সে টাকা উঠবে কি করে?'

একজন বলল, 'তান্ত্রিকরা সব পারে!'

শ্রীনিবাস তাকে ধমকালো, 'অন্ধ সংস্কারের শিকার হয়ো না।'

যতীন বলল, 'তাছাড়া আমার স্ত্রী বলছিল, বউঠানের শরীর ভাল নয়। তুমি এসেছ গ্রামে। তা শুনে কোন কথা বলেননি। তোমার একবার যাওয়া উচিত ছিল।'

'তোমার স্ত্রীকে বলেছিলাম তাকে এখানে আসতে বলতে!'

'বলেছিল কিন্তু বউঠান জবাব দেয়নি।'

'তাহলেই বোঝ, বুর্জোয়াদের সম্মোহন করার ক্ষমতা কতখানি! শোন, আমি ভেবে দেখলাম, এই লোকটাকে কথা বলে শোধরানো যাবে না!'

'তাহলে?'

'সরাসরি তাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে গ্রামের মানুষকে নিয়ে ছেলেখেলা বন্ধ

করবে কিনা ? প্রশ্নটা আমিই করব। নাও শুয়ে পড় সবাই, রাত হয়েছে।'

'তুমি কাল সকালে যাবে ? যজ্ঞের মধ্যে গিয়ে ঝামেলা করলে জনতা ভাল চোখে দেখবে না।'

'তাই ? ঠিক আছে। কালই তো যজ্ঞ শেষ হবে, তাই না ?'

'হ্যাঁ। কাল সন্ধ্যের পর।'

'বেশ, কাল রাত্রে যাব।'

ঠিক তখনই মাইকে পীতাম্বরের গলা ভেসে এল। হরিহর গ্রামের মানুষদের কাছে প্রস্তাব দিচ্ছেন, তারা যদি জমি কিনে নিতে চায় তাহলে সকালের মধ্যে দিলে তিনি নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করে দেবেন।

যতীন অবাক হয়ে বলল, 'এ কি ব্যাপার ?'

শ্রীনিবাস বলল, 'লোকটা জেনে গিয়েছে আমি এখানে এসেছি, তাই গ্রামের লোককে হাত করতে এই চালটা চেলেছে ! কিন্তু জমি কিনবে কে ? টাকা কোথায় পাবে মানুষ ?'

যতীন মাথা নাড়ল, 'কি জানি ! আমার ভাল ঠেকছে না !'

ভূতের মত সারারাত জেগেছিলেন হরিহর। চোখের পাতা এক করার কথা মনেও আসেনি। যখন সকাল হল, পাখি ডাকল, তখন বুকের ভেতরটা হু-হু করে উঠল তাঁর। কিন্তু অনন্ত মাতাল ছুটে এল তাঁর কাছে, 'আসুন আসুন, ভগবান মুখ চেয়েছেন !'

অবাক চোখে তাকালেন তিনি। অনন্ত হাত নেড়ে বোঝালো, 'বাড়ির সামনে লাইন পড়েছে। টাকা নিয়ে এসেছে লোকে জমি কিনবে বলে।'

'কারা এসেছে ?'

'কারা আবার ? গ্রামের মানুষ ?'

'সে কি !' তাড়িঘড়ি বেরিয়ে এলেন হরিহর। পীতাম্বর, নীলাম্বর সামনে দাঁড়িয়ে বিচলিত ভঙ্গীতে। হরিহরকে দেখে পীতাম্বর বলল, 'ত্রিনেত্রকবাবা অসাধ্য সাধন করেছেন !'

হরিহর পরিচিত মুখদের লাইনে দেখলেন। নীলাম্বর বলল, 'আর দেরি করবেন না। জমির দলিল নিয়ে এসে হাতচিট দিয়ে দিন। আমাকে এখনই বাজারে ছুটতে হবে।'

হরিহর বিড়বিড় করলেন, 'এরা টাকা পেল কোথায় ?'

'সেকথায় আমাদের দরকার কি ?' পীতাম্বর বলল।

হরিহর তবু এগিয়ে গেলেন, 'তোমরা টাকা পেলে কোথায় ?'

বিপিন দাঁড়িয়েছিল সামনে। তার টাকার অভাব এমনই যে লোকে তাকে ধেরো বিপিন বলে ডাকে। দেখা হলেই ধার চায়। জবাব দিল, 'পেয়েছি।'

'নামমাত্র মূল্যে দলিল ফেরৎ দিয়ে সঙ্গে সাদা কাগজে টাকা নেবার প্রমাণ-পত্র। একটার পর একটা সই করতে লাগলেন হরিহর। গ্রামের সমস্ত জমি মাত্র দেড়লক্ষ টাকায় বিক্রি হয়ে গেল। শেষ ক্রেতা পীতাম্বর। হরিহর তার

দিকে তাকালেন, 'তুমি টাকা পেলে কোথায় ?'

পীতাম্বর সলজ্জ হাসল, 'আজ্ঞে, ধার নিলাম।'

'ধার! এখানে ধার দিল কে ?'

'তা জানি না। সকালে একজন এসে বলল, জমি কিনতে চাইলে টাকা ধার দিতে পারে। কাগজে কিসব লিখে সই করিয়ে নিয়ে টাকাটা দিয়ে গেল। নিয়ে নিলাম।'

'কিসে সই করলে, কে টাকা দিল খোঁজ করলে না ?'

'ভেবেছিলাম, পরে মনে হল সবাই যখন নিয়েছে তখন আমিই বা বাদ যাই কেন ? এ জমি তো কোনদিন তোমার কাছ থেকে ন্যায্যদামে কিনতে পারতাম না!'

নীলাম্বরও টাকা দিয়ে দলিল নিল। হরিহর জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমিও ?'

নীলাম্বর মাথা নাড়ল, 'না, ধার নিইনি আমি।'

'তাহলে টাকা পেলে কোথায় ?'

'পেয়ে গেলাম।' দলিল এবং কাগজ সযত্নে রাখল নীলাম্বর।

অনন্ত মাতালের জমি নেই, কেনার প্রশ্নও নেই। সে বিড়বিড় করল, 'যজ্ঞের বাজার করে নীলাম্বর জমির মালিক হয়ে গেল!'

বাড়ির উঠোন ছাড়িয়ে রাস্তা, রাস্তা ছাড়িয়ে সামনের মাঠ জুড়ে মানুষ বসে পড়েছে খিচুড়ি আর তরকারি নিয়ে। উনুনের সংখ্যা বেড়ে গেছে একের পর এক। সকাল নটা বাজতে না বাজতেই সেই যে মানুষের মিছিল শুরু হয়েছিল তার আর যেন শেষ নেই। এক গ্রামের বদলে দশ গ্রামের মানুষ এসেছে প্রসাদ নিতে। প্রথম দিকে যারা ভেবেছিল এসব গরীব দুঃখী কাঙালীদের পেট ভরানোর আয়োজন, তারাও মত বদলেছে। এখন প্রত্যেকের বিশ্বাস এই যজ্ঞ দেখে প্রসাদ নিলে অনেক অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে। হবিপুর থেকে পুলিশের থানা যেন চলে এসেছে নারাণপুরে হরিহরের বাড়ির সামনে। ভিড় সামলাতে তারাও হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে।

আজ তান্ত্রিকের চেহারা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। তাঁর শিরদাঁড়া টান-টান, মুখে অনর্গল মন্ত্র। বেদীর চারপাশে যারা বসে আছে তারা মন্ত্রমুগ্ধ। হরিহর তাঁর কিছুদূরে বাবু হয়ে বসে আছেন। মাঝে পীতাম্বর প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে তার কাছে পৌঁছে ফিসফিস করে জানিয়ে যাচ্ছে কত লোক খেল। যজ্ঞ শেষ হয়ে গেলে আর খাওয়াবার দায় নেই, অতএব যজ্ঞটা সন্ধ্যের মধ্যে শেষ করে ফেলাই মঙ্গল। যা সঞ্চয় আছে তাতে ওই অবধি কুলোবে বলে মনে হচ্ছে না। মানুষের সংখ্যা আজ সীমাহীন।

তান্ত্রিকের কণ্ঠ হতে উচ্চারিত সংস্কৃত মন্ত্র শুনতে শুনতে বিহ্বল হরিহর বললেন, 'মা যা করবেন তাই মেনে নিতে হবে পীতাম্বর। প্রয়োজন হলে এই বসতবাটিও বিক্রি করে দেব। তুমি লোক দ্যাখ।'

'সেকি! বসতবাড়ি বিক্রি করবেন ?' পীতাম্বর চমকে উঠল।

'সত্য রাখতে রামচন্দ্র বনবাসে গিয়েছিলেন, এ তো কোন্ ছার!'

পীতাম্বর চিন্তা করল। এই গাছগাছালি, পুকুর, বাড়ি, নীলাম্বর কত টাকা আলাদা সরিয়ে রেখেছে? রেখেছে তো নিশ্চয়ই। খেটে মরবে পীতাম্বর। আর নীলাম্বর পকেট ভারি করবে এ তো হতে পারে না! পীতাম্বর ফিসফিস করে জানতে চাইল, 'কততে বন্ধক রাখবে?'

'বন্ধক?'

'বিক্রি করার চেয়ে বন্ধক রাখা ভাল না?'

'দ্যাখো, কত পাও! আর বিরক্ত করো না।'

পীতাম্বর হামাগুড়ি দিয়ে নেমে এল বেদী থেকে। তারপর ভাইকে খুঁজে বের করে একপাশে সরে এল, 'যা মাল আছে তাতে কতক্ষণ চলবে?'

'সন্ধ্যে পর্যন্ত টানতে পারব। কমিয়ে কমিয়ে দিচ্ছি।'

বেশ। সবাই জানবে এর মধ্যেই টান পড়েছে!'

'মানে?'

'তোর কাছে এখন কত এসেছে সত্যি করে বল!'

'কি এসেছে?'

'কত টাকা সরালি?'

'দাদা. মাইরি, তোমার সন্দেহ করার অভ্যেস গেল না!'

'শোন, হরিহর এই বসতবাড়ি বন্ধক রাখবে। কততে নিতে পারবি?'

'সত্যি? বিক্রি করবে?'

'বিক্রি না বন্ধক! বিক্রিতে অনেক টাকা দিতে হবে। বন্ধক রাখলে ছাড়াবে কোত্থেকে।'

'বিশ্বাস নেই। তুমি বিক্রি করতে রাজী করাও। আমি বিশ হাজার দেব।'

'দূর! বিশে কি এত সম্পত্তি পাওয়া যায়?'

'বেশ, পঁচিশ?'

'চল্লিশ বলেছে। তোর বিশ আমার বিশ।'

'তুমি বিশ পাবে কোথায়? জমি কিনেছ ধারের টাকায়।'

'সেট তোকে ভাবতে হবে না। কোনমতে রোজগার করে লুকিয়ে রেখেছিলাম। বাড়িটা কিনে নিলে তোর অর্ধেক হবে আমার অর্ধেক। মনে থাকে যেন!'

'বেশ। দামটা আমি দেব ওঁর হাতে। তুমি টাকা আনো।'

'তুই দিবি মানে?'

'আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না। হয়তো কুড়িতেই ঠিক করে এসেছ!'

পীতাম্বর রেগে যেতে চাইল, কিন্তু পারল না। সত্যি তার টাকা নেই। হরিহরকে কুড়িতে রাজী করিয়ে সে নীলাম্বরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে সম্পত্তির অর্ধেক মালিকানা চাইছিল। কিন্তু তার ভাই যে এত শয়তান তা কে জানত! সে মিনমিন করে জিজ্ঞাসা করল, 'আমি কিছু পাবো না নীলে?'

নীলাম্বর মাথা নাড়ল, 'নিশ্চয়ই পাবে। দাদা বলে কথা। হাজারখানেক টাকা নিয়ে যেও।'

সন্ধ্যের মুখে শুরু হল ঘৃতাহুতি। মাইকে তখন তান্ত্রিকের প্রায় ভগ্নকণ্ঠের জড়ানো মন্ত্র সোচ্চারে বাজছে। উঠে দাঁড়িয়েছেন তিনি। ঘি এবং অন্যান্য সাহায্য পেয়ে যজ্ঞের আগুন তখন দাউদাউ করে ওপরে উঠছে। চারধার সেই আলোয় আলোকিত। দর্শকরা মন্ত্রমুগ্ধ। তান্ত্রিকের শরীর সেই আগুনে রহস্যময় দেখাচ্ছিল। লাল আগুনের শিখার সঙ্গে তাঁর রক্তবস্ত্র যেন একাকার হয়ে যাচ্ছিল। সেই অবস্থায় তিনি চিৎকার করে ডাকলেন, 'হরিহর ?'

'বলুন।' হরিহর কাঁপছিলেন।

'তুমি প্রস্তুত ?'

'হ্যাঁ বাবা।'

'সোনা রুপো এবং তামা সঙ্গে এনেছ ?'

'হ্যাঁ বাবা।'

'ওই পবিত্র জিনিসগুলো অগ্নিদেবের পায়ে প্রণামী হিসেবে অর্পণ কর।'

সামনে রাখা পুঁটুলি খুললেন হরিহর। তাঁর শেষ সঞ্চয়। তারপর সোনার গহনা, রুপোর টাকা এবং তামার পয়সাগুলো যজ্ঞের আগুনে ফেলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তান্ত্রিক চিৎকার করতে লাগলো তারস্বরে, 'মা-মা, শান্তি দাও, স্বস্তি দাও, মঙ্গল কর মা-মা-মাগো !'

হরিহর ধীরে ধীরে বসে পড়লেন।

পীতাম্বর অনেক ভাবল। মাত্র এক হাজার টাকার জন্যে সে নীলাম্বরকে এই বিশাল বাড়ির মালিক করে দিতে পারে না! সে থাকবে পরিবার নিয়ে ভাঙ্গা বাড়িতে! আর নীলাম্বর এখানে, অসম্ভব। অতএব যজ্ঞ শেষ হওয়ামাত্র সে হুকুম দিল উনুন নিভিয়ে ফেলতে। নীলাম্বর খবর শুনে ছুটে এল, 'এ কি! নিভিয়ে ফেলতে বলেছ কেন ? কত লোক এখনও অভুক্ত আছে, তা জানো ?'

'থাকলেও কিছু করার নেই নীলে। ধর্মের শর্ত হল যজ্ঞ অবধি খাওয়াতে হবে।'

'খুব শর্ত দেখছ! আমি এদিকে বিশ হাজার রেডি করে রেখেছি। কাগজে টিপসই দিয়ে বসতবাড়ি বিক্রি করিয়ে নিয়ে চালডাল কিনে এনে পাবলিককে খাওয়াবো। তার কি হবে ?'

'হবে না। কেউ খেতে পাবে না।'

'হরিহরদার বদনাম হয়ে যাবে তে।'

'মোটেই না। যজ্ঞ শেষ তো খাওয়াও শেষ!'

'দাদা, এক হাজার পাবে সেকথা ভুলে যাচ্ছ ?'

'অসম্ভব।'

'ঠিক আছে, দুই দেব। চামার। দুইই দেব।'

'অসম্ভব।'

'একি মাইরি! বেশ, তিন—তিনে হবে ?'

'আমার কুড়ি চাই।'

'কুড়ি ? পাগল নাকি! এই বসতবাড়ির দাম কত হবে জানো ?'

'অন্তত পঞ্চাশ। দশ লাভ করবি।'

নীলাম্বর রেগেমেগে সরে গেল। দাদাকে বিশহাজার নগদ তুলে দেওয়ার চেয়ে হরিহরকে টাকাটা দিলে সে বেশি শান্তি পাবে। জনতার উদ্দেশে সে চেঁচাতে লাগল, 'শান্ত হোন, শান্ত হোন আপনারা। যজ্ঞ শেষ হয়ে গেছে।'

নিজের জিনিসপত্র ভাল করে বেঁধে নিয়েছেন তান্ত্রিক। বেদীর ওপর পাথরের মত বসে থাকা হরিহরের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, 'হরিহর, এখন তুমি মুক্ত। মুক্ত মানুষ। কোন অমঙ্গল তোমাকে স্পর্শ করবে না। যেভাবে তুমি মায়ের ইচ্ছে পূর্ণ করেছ তার তুলনা হয় না। এবার আমাকে যেতে হবে।'

হরিহরের প্রচণ্ড ঘাম হচ্ছিল। বুকে মৃদু যন্ত্রণা। তিনি চোখ তুললেন। বিড়বিড় করলেন, 'যেতে হবে ?'

'হ্যাঁ। এখনই। আর অপেক্ষা করার উপায় নেই।' তান্ত্রিক বেদী থেকে নেমে এলেন। পেছনে তাঁর মালপত্র নিয়ে অনন্ত। গেটের বাইরে এক সাইকেল ভ্যান দাঁড়িয়েছিল। তান্ত্রিক তাতে উঠে বসতেই সেটা চলা শুরু করল। ভিড় কমে যেতে লাগল হু-হু করে। দশটা নাগাদ সব ফাঁকা। কলাপাতা আর এঁটো ছড়ানো চারধারে। শুধু পীতাম্বর বসে আছে দাওয়ায়। বেদীর দিকে তাকিয়ে।

লোকজন নেই। নীলাম্বরটাও চলে গিয়েছে। অনেকক্ষণ থেকে একটাই চিন্তা মাথায় পাক খাচ্ছিল পীতাম্বরের। কাজটা করার সময় হয়েছে এখন। সে ধীরে ধীরে উঠল। হরিহর বসে আছেন বেদীতে। কোনদিকে তাঁর দৃষ্টি নেই। চেহারাটা অদ্ভুত হয়ে গেছে।

পীতাম্বর সন্তর্পণে যজ্ঞের বেদীর পেছনে চলে এল। তার হাতে একটা লম্বা চিমটে। যজ্ঞের আগুন জ্বালাবার জন্যে পেছনদিকে একটা গর্ত করা হয়েছিল। যে সোনাদানা-রুপো ওপর থেকে পড়েছে তা ওই গর্তের ভেতর চিমটে ঢুকিয়ে স্বচ্ছন্দে বের করে আনা যায়। কাছে আসতেই পীতাম্বর থমকে গেল। একটা লোক ওই গর্তের সামনে দাঁড়িয়ে খোঁচাবার চেষ্টা করছে। লোকটা কে ?

কাছে যেতেই চেনা গেল। খপ করে লোকটাকে পাকড়ালো অনন্ত, 'কি করছিস ?'

'ও, তুমি ? উঃ, কি ভয় পেয়েছিলাম! ছাড়ো!'

'কি করছিস ?'

'হরিহরদা অগ্নিদেবকে আহুতি দিয়েছিলেন যা নিতে এসেছি।'

'জানলে তোর পিঠের চামড়া খুলে নেবে।'

'তা নেবে।' অনন্ত বলল, 'তুমি এখানে কেন ?'

'একই উদ্দেশ্যে।'

'বাঃ! তাহলে এসো ভাগাভাগি করে নিই।'

'বেশ। সরে দাঁড়া, আমার সঙ্গে চিমটে আছে।' পীতাম্বর গর্তে চিমটে ঢোকাল। অনেক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কিছু ধরে বার করে আনতে দেখা গেল সেটা পোড়াকাঠ। খানিক চেষ্টার পর পীতাম্বর বলল, 'এভাবে হবে না। বেদী ভাঙতে হবে।'

'সে কি! পাপ হবে না ?'

'যতক্ষণ যজ্ঞ হচ্ছিল ততক্ষণ মা এখানে ছিল। এখন মা নেই—পাপও হবে না।'

'কেউ যদি দ্যাখে?'

'তুই ওপাশে পাহারা থাক, আমি ভাঙ্গছি।'

অনন্তর ইচ্ছে ছিল না সরে যাওয়ার। পীতাম্বর তাকে ঠকাতে পারে। কিন্তু উপায় না থাকায় সে পীতাম্বরকে নজরে রেখে কয়েক পা এগিয়ে গেল। অনেক চেষ্টার পর পীতাম্বর গর্তের মুখ বড় করতে পারল। ভেতরে গনগনে আগুন। হল্কা লাগছে মুখে। সেটা সহ্য করে চিমটে দিয়ে নেড়ে নেড়ে দেখতে লাগল পীতাম্বর। না, কোথাও সোনা নেই। রুপোর টাকাও পাওয়া গেল না, শুধু তামার পয়সা চোখে পড়ছিল। আগুনে একটু ঝলসে গেছে এই যা। গেল কোথায় ওগুলো?

অনন্তর গলা ভেসে এল, 'কি হল? পেয়েছ?'

'নাঃ!'

অনন্ত চলে এল কাছে, 'কোথায় গেল?

'নেই।' হতাশ গলায় বলল পীতাম্বর।

অনন্ত উঁকি মারল। তারপর চেঁচালো, 'শালা! ওপাশে আর একটা গর্ত আছে—তৈরি করার সময় ছিল না, এখন হয়ে গেল কি করে? আমাদের ওপর বাটপাড়ি করে গেছে কেউ—কোন্ শালা?'

সাইকেল ভ্যানটা যখন হরিপুরে পৌঁছালো তখন তান্ত্রিক বলল, 'দাঁড়া, তোকে আর যেতে হবে না। ভাড়া পেয়েছিস?'

ভ্যানওয়ালা মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ বাবা।'

তান্ত্রিক কয়েক পা এগোতেই একটা গাছের তলা থেকে সিড়িঙ্গে গোছের মানুষ অন্ধকার ঠেলে এগিয়ে এল, 'বাবা, সব এনেছি।'

'সব তো?'

'হ্যাঁ, শুধু—'

'শুধু কি?'

'তামার পয়সাগুলো কুড়োতে পারলাম না। যা গরম!'

'ঠিক আছে—দে।' হাত বাড়িয়ে একটা পুঁটুলি নিয়ে তান্ত্রিক হাসলেন, 'আজ রাত্রেই এই তল্লাট ছেড়ে চলে যেতে হবে রে! তবে তার আগে কমিশনটা নিয়ে আসি!'

'কমিশন?'

'তুই আমার চ্যালা হবার যোগ্য নসরে নিতাই। গ্রামসুদ্ধ লোকের জমির দলিল জলের দামে পেয়ে গেল যে সে আমাকে তুষ্ট করবে না? চল, তুই বাইরে থাকবি!'

সঙ্গে সঙ্গে যেতে যেতে সিড়িঙ্গে লোকটা বলল, 'হরিহর লোকটা খুব বোকা।'

'কেন?'

'নইলে এমন টুপি পরল?'

'ধম্মো—ধম্মো হল এমন জিনিস যা মানুষকে কাবু করে ফেলবেই। রাজনীতি

বল, অস্ত্র বল—সবার চেয়ে ধর্ম হল শক্তিশালী। নইলে আমরা টি*কে থাকব কি করে হারামজাদা!'

'আচ্ছা, যার কাছে যাচ্ছি সে কিছু দেবে তো?'

'আলবৎ দেবে। সে-ই তো আমাকে পাঠিয়েছিল। নগদ টাকায় কিনতে চেয়েছিল কিন্তু হরিহর তখন রাজী হয়নি। এখন জলের দামে পেয়ে গেল আমি শেকড় খাওয়ালাম বলে। আরে এরও তো ধর্মভয় আছে—না কি?'

দু'জন মানুষ হরিপুরের রাস্তায় দ্রুত হাঁটতে লাগল।

বাড়ির সামনে এসে শ্রীনিবাস জিজ্ঞাসা করল, 'সত্যি কথা বল তো, ঠিক কত লোক হয়েছিল?'

'গুনিনি। তবে কোনকালে এত মানুষ দেখিনি। পঞ্চাশ হাজার হতে পারে—এক লক্ষও।'

'যাঃ! হরিপুরের মিটিং-এ যত লোক হয়েছিল তার বেশি নিশ্চয়ই নয়?'

'সেটা এর কাছে নস্যি। পিলপিল করছিল মানুষের মাথায়।'

'এত লোক আনল কি করে এরা?'

'এরা আনেনি। ধর্ম এনেছিল।'

'হুম্‌ম্! যাক্ গে। আমার ওই বুর্জোয়ার বাড়িতে যাওয়ার কোন ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু তোমরা বলেছ বলেই না বলতে পারছি না। তাছাড়া ফাণ্ড দরকার এখানে ফ্রণ্ট চালাতে। হুমকি দিলে মনে হয় কাজ দেবে। হাজারপাঁচেক চাইব, বুঝলে?'

ওরা ভেতরে ঢুকল। চারপাশ কলাপাতা এবং ময়লায় ভর্তি। হরিহরের সুন্দর বাগান ছারখার তা অন্ধকারেও বোঝা যাচ্ছিল।

শ্রীনিবাস জিজ্ঞাসা করল, 'লোকজন কোথায়?'

ধীরেন বলল, 'খেয়েদেয়ে চলে গেছে।'

'আঃ, বাড়ির লোকজনের কথা বলছি! ভেতরে চল!'

ওরা এঘর-ওঘর ঘুরল। জিনিসপত্র দেখলেই বোঝা যাচ্ছে কদিন প্রচণ্ড অত্যাচার সহ্য করেছে। ওরা ভেতরবাড়িতে এল। উঠোনে পা দিতেই কানে এল গোঙানি। ওপাশের ঘর থেকে সেটা ভেসে আসছে। ধীরেন চাপাগলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কে?'

শ্রীনিবাস দরজার কাছে গিয়ে চাপ দিতেই সেটা খুলে গেল। ঘর অন্ধকার। স্ত্রীলোকের কণ্ঠের গোঙানিটা একটু থামল। শ্রীনিবাস জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কে?'

উত্তর এল না। ধীরেন টর্চ জ্বালল। টর্চের আলোয় দেখা গেল—একটা তক্তাপোষে কুঁকড়ে শুয়ে আছে সবিতারাণী। তার দুই চোখ জলে ভেজা, মুখ সাদা। শ্রীনিবাস ছুটে গেল কাছে, 'এ কি! তুমি এখানে পড়ে আছ কেন?'

'আমি মরে যাব। আমার পেটে কষ্ট হচ্ছে।' গোঙাতে লাগল সবিতারাণী।

'তুমি ভাল হওনি? তান্ত্রিকের—'

ধীরেন বাধা দিল, 'শ্রীনিবাস, ওকে এখনই হরিপুরে নিয়ে যেতে হবে। হরিহর

[illegible] কোথায় ? আমি চললাম একটা কিছু যোগাড় করতে। টর্চটা রাখো'।'

ধীরেন চলে যাওয়ামাত্র সবিতারাণী উঠে বসার চেষ্টা করেও পারল না। তার সমস্ত শরীর কাঁপছিল। সে কোনমতে বলল, 'বাবা কোথায় ?'

'বাবা মানে ? ও, ওই লোকটাকে তুমি বাবা বল নাকি ?' বিরক্ত হল শ্রীনিবাস।

'হ্যাঁ। যিনি আমাকে জন্ম দিয়েছিলেন তিনি বাবার কাজ করেননি—ইনি করেছেন। আমাকে ওঁর কাছে নিয়ে চল।' গোঙাতে গোঙাতে বলল সবিতারাণী।

'তুমি এখানে থাকো। আমি দেখছি উনি কোথায়।' নিতান্ত বাধ্য হয়েই শ্রীনিবাস খুঁজতে বের হল। সমস্ত বাড়িটা যেন ভূতের বাড়ির আবহাওয়া নিয়ে বসে আছে। শুধু সবিতারাণীর যন্ত্রণার চাপা শব্দ কানে বাজছে। শ্রীনিবাস বাড়ির ভেতরটা পাক দিয়ে বুঝল—শুধু দরজা-জানালা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। এবার সে দূর থেকে যজ্ঞের বেদী দেখতে পেল। যজ্ঞের আগুন এখন নিভে গেছে। কিন্তু আকাশ থেকে নেমে আসা এক চিক্কন আলোয় কাউকে স্থির হয়ে বসে থাকতে দেখা গেল। শ্রীনিবাস এগিয়ে গেল। কাছে পৌঁছে সে হরিহরকে চিনতে পারল। বেদীর নিচ থেকেই ডাকল, 'শুনছেন !'

হরিহর সাড়া দিলেন না। যেমন মাথা গুঁজে বসেছিলেন তেমনই বসে রইলেন।

শ্রীনিবাস গলা তুলল, 'আপনাকে ও ডাকছে। কী চিকিৎসা হল কে জানে ! এখন তো দেখছি যন্ত্রণায় ছটফট করছে। ওর কিছু হয়ে গেলে আমি কিন্তু আপনাকে ছাড়ব না—হ্যাঁ !'

এমন সময় শ্রীনিবাসের পেছন থেকে কাতর গলা ভেসে এল, 'মানুষটাকে নাড়াও।'

শ্রীনিবাস চমকে স্ত্রীর দিকে তাকাল। আলুথালু সবিতারাণী কোনমতে দেওয়াল ধরে এসে দাঁড়িয়েছে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'নাড়াবো মানে ?'

'তান্ত্রিক—তান্ত্রিক ওঁর সর্বনাশ করে গেল ! সব নিয়ে গেল ওঁর !' [illegible]াগল সবিতারাণী।

'সব নিয়ে গেল মানে ?'

'কি আছে এখন ! জমিজমা টাকাপয়সা গয়নাগাঁটি সব তো ধম্মের নামে [illegible] হয়ে গেছে !'

প্রচণ্ড নাড়া খেল শ্রীনিবাস। সে ধীরে ধীরে বেদীর উপর উঠে এল। হরিহর একই ভঙ্গিতে বসে আছেন। একটু ঝুঁকে কাঁধে হাত রাখল শ্রীনিবাস, 'আপনার কি শরীর খারাপ ?'

হরিহর তাকালেন। কিন্তু তিনি কিছু দেখতে পেলেন বলে মনে হল না [illegible]। মুখ তুলে চারপাশে নজর বোলানোর মত করে আবার মুখ নামিয়ে [illegible]

[illegible]াস তাঁকে ঈষৎ নাড়ালো, 'কি হয়েছে আপনার ?'

[illegible] হাসলেন। এবং সেই হাসি দেখে শ্রীনিবাসের বুঝতে অসুবিধা হল [illegible] আর প্রকৃতিস্থ নেই। এইসময় ধীরেনের গলা পাওয়া গেল, 'সাইকেল [illegible] বউঠান কোথায় ?'

ওরা সবিতারাণীকে ধরি করে সাইকেল ভ্যানে তুলল। শ্রীনিবাস বলল, 'মানুষটা মনে হচ্ছে পড়ে গিয়েছে!'

'সে কি!' ধীরেন চমকে। সে দেখল হরিহর একই ভঙ্গীতে বেদীর উপর বসে আছেন।

সাইকেল ভ্যানে সবিতারাণী চেঁচালো, 'বাবাকে নিয়ে চল। ওঁকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে বাবা না গেলে আমি যাব না।'

কাঠের গুঁড়ি পাথর বয়ে নিয়ে আসার মত ওরা হরিহরকে পাঁজা-কোলা করে নিয়ে সাইকেল ভ্যানে তুলল। জায়গা অল্পই। হরিহরকে যেভাবে বসিয়ে দে হয়েছিল সেইভাবেই বসে রইলেন। যন্ত্রণা সত্ত্বেও সবিতারাণী তাঁর তে মুখ রেখে কাঁদতে লাগল, 'আপনার এ কি হল বাবা? ও বাবাগো, আপনি বলুন!'

সেই নির্জন রাস্তায় সাইকেল ভ্যানটা দুজন অসুস্থ মানুষকে নিয়ে ধীরে ধীরে হরিপুরের দিকে এগিয়ে চলছিল। অন্ধকার পৃথিবীতে তখন তারাদের আলো। ভ্যানের পেছন পেছন ধীরেন এবং শ্রীনিবাস হাঁটছিল।

হঠাৎ ধীরেন ব 'তোরা হরিহর কাকাকে জোতদার শত্রু বলছিস, কিন্তু ওঁর সর্বনাশ তোরা করতে পারলি না। ধর্মের দোহাই দিয়ে একটা তান্ত্রিক করে গেল। তার বেশি শব্দ করতেই পারছিস!'

শ্রীনিবাস দেখল ধীরেনের ভ্যানে দুটো মূর্তি প্রায় এক। মা যেমন সন্তানকে আঁকড়ে ধরে রাখে ছা তেমনই।

শেষের পরে

প্রকৃতি এবং মানুষ পরস্পরের বন্ধু। এই বন্ধুত্ব কেউ শিখিয়ে দেয়নি, দীর্ঘ অভ্যেসে স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল সম্পর্ক। তারই ভিত্তিতে ছিল অনাড়ম্বর। ভাব ছিল কিন্তু আকাঙ্ক্ষার প্রাবল্য ছিল না।

পৃথিবী যেখানে সন্দেহ উদ্বেগে জ্বলছে সেখানে এইরকম সামাজি টিকে থাকবে। এইস মানুষকে গ্রাস করতে ট এল রাজনী ভবনাকে বাস্তবায়িত করতে রাজনৈতি

না যতক্ষণ না সে বিপাকে পা

নিজেরাই সচেতন কেন না

ওরা ঝাঁপিয়ে পড়েন তা

দুর্বলতার সুযোগ

কালিকালের পদধ

আজকের মানুষ

এখনও দেখা যাচ্ছে